নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা,

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ সাল

সূচী

গোষ্ঠ (রাজপুতানার চিত্র)

ভ্রম সংশোধন।

৯ পৃষ্ঠা	৬ পংক্তি	'চিত্তে' স্থানে 'চিত্রে'
১০ পৃষ্ঠা	১ পংক্তি	'রুশের Naturilism' স্থানে 'রুসোর Naturalism'
১৩ পৃষ্ঠা	৩০ পংক্তি	'খোলসে পড়িয়া' স্থানে 'খোলস পরিয়া'
১৬ পৃষ্ঠা	১৮ পংক্তি	'রূপকের' স্থানে 'রূপকে'
২৩ পৃষ্ঠা	২ পংক্তি	'আমি' স্থানে 'আর'

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা]   [অগ্রহায়ণ ১৩২৪ সাল।

নারায়ণ

মানুষ চিরদিন দেবতার নাম করিয়া কেবল মানুষকেই খুঁজিয়াছে। আমাদের বেদের বড় বড় দেবতারা বড় বড় মানুষ।

যে মানুষকে চক্ষে দেখি, সে মানুষকে দেবতা বলিয়া ধরিতে সহসা সাহস হয় না। সে মানুষ জন্মে ও মরে। এই মানুষের মধ্যে নিত্যবস্তু কিছু ধরিতে পারি না। সেই জন্ত এই দেহধারী মানুষকে দেবতারূপে বরণ করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই মানুষকে ঠিক দেবতা করিতে না পারিলেও, মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতে দেবতা-জ্ঞানে যাহাদের ভজনা করিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদিগকে এই মানুষেরই মতন একটা-কিছু কল্পনা করিয়াছে।

মানুষ নিজের ভিতরে যে সকল শক্তিসাধ্যের সন্ধান পাইয়াছে, কিন্তু যে সকল শক্তিসাধ্য দিয়া, তার প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা অসম্ভব ও অসাধ্য ভাবিয়াছে, সেই সকল শক্তিসাধ্যকে অনন্তগুণ করিয়া তার দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে। নিজের ভিতরে মানুষ যার সাড়ামাত্র পাইয়াছে, কিন্তু যাহাকে পরিপূর্ণরূপে ধরিতে ছুঁইতে পার নাই, সেই বস্তুকে ধরিবার ছুঁইবার আশাতেই সে দেবতাসকলকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

১

বেদের বড় দেবতা ইন্দ্র। এই ইন্দ্রের আর এক নাম—সহস্রলোচন, সহস্রাক্ষ। কিন্তু মানুষ ছাড়া এমন সুন্দর চক্ষু আর কার আছে?

বেদে বিষ্ণুকে সহস্রবদন বলিয়াছেন। মানুষ ছাড়া বদনই বা আর কার আছে?

যে-মানুষকে চক্ষে দেখি, তার দুটি বই চক্ষু নাই। এই জন্যই সে সবদিক্ দেখিতে পায় না। ইন্দ্র দিক্‌পাল, দশদিক্ রক্ষা করেন। দুটি চোক দিয়া দশদিক্ দেখা যায় না। সুতরাং দিক্‌পাল ইন্দ্রের দশচক্ষু চাই। কিন্তু দিক্ দশ হইলেও, এই দশ দিকের প্রসার বিশ্বব্যাপী, অনন্ত। সুতরাং ইন্দ্রের সহস্রচক্ষু হইল। বিষ্ণুও দিক্‌পাল। বেদে বিষ্ণু কখনও ইন্দ্র, কখনও সূর্য্যরূপে উপাসিত হইয়াছেন। দিক্‌পাল বলিয়া বিষ্ণুরও সহস্রবদন থাকা চাই। সূর্য্যের ত কথাই নাই।

এইরূপে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, বিষ্ণু, অগ্নি—বেদের যত দেবতা, সকলেই মানুষের মতন, সকলেই বড়, অতি বড়, অনন্ত-মানুষ। মানুষের ইন্দ্রিয়াদিকে অনন্তগুণ করিয়া, মানুষের শক্তিসাধ্যকে অনন্তরূপে কল্পনা করিয়া, এই সকল দেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

২

বেদের বড় বড় দেবতা ঠিক শরীরীও নহেন, ঠিক অশরীরীও নহেন। ইন্দ্রাদিতে শরীরী ও অশরীরীর, দেহী ও বিদেহীর, সাকার ও নিরাকারের একটা মাখামাখি দেখিতে পাই। আমাদের দেহ অপেক্ষা অনন্তগুণে বড় দেহ তাঁদের আছে। আমাদের ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অনন্তগুণ বেশী ইন্দ্রিয় তাঁদের আছে। কিন্তু তাঁদের শরীরাদি সর্ব্বদা আমাদের চক্ষুগোচর হয় না। তাঁরা সর্ব্বদাই আমাদের দেখেন, শোনেন, কিন্তু সর্ব্বদা আমাদের কাছে থাকিলেও চোক মেলিয়া তাঁদের দেখিতে পাই না। তাঁরা কথা কহেন, কিন্তু সর্ব্বদা সে কথা আমরা কান দিয়া শুনিতে পাই না। কেবল মন দিয়া, মানসচক্ষে ধ্যানাবেশেতেই বৈদিক ঋষি তাঁদের রূপ দেখিতে ও বাণী শুনিতে পাইতেন।

বৈদিক উপাসকের নিজের জ্ঞানেতেই দেহ যে জীবের সর্ব্বস্ব নহে, দেহ ছাড়া যে তার আর একটা কিছু আছে, যাহাতে দেহকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে, দেহের নাশে সে বস্তুর নাশ হয় না—এ সকল ভাল করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। তখনও দেহাত্মাধ্যাস সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। দেহেতে ও আত্মাতে একটা মাখামাখি ছিল।

৩

উপনিষদই প্রথমে, পরিষ্কার করিয়া জীবের দেহ যে তার আত্মা নয়, এই আত্মা-বস্তু যে দেহ হইতে স্বতন্ত্র, দেহের কোনও ধর্ম্ম যে এই আত্মাতে নাই,—এ সকল তত্ত্ব প্রচার করিলেন।

এই আত্মতত্ত্ব-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার রূপ বদ্‌লাইয়া গেল। মানুষ যখন দেহী হইয়াও দেহের একান্ত অধীন আর রহিল না, দেহ ছাড়াও মানুষ থাকে,

মৃত্যুর পরেও থাকে ; মানুষের মধ্যে যে নিত্যবস্তু, যে অজর অমর বস্তু আছে, তাহা তার দেহ নহে, কিন্তু আত্মা ; এই আত্মাকেই মানুষ "আমি" বলিয়া নির্দ্দেশ করে—

"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্"—

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ, ইহা প্রাণীদিগের অন্তরের নিগূঢ়তম স্থানে অবস্থান করে ;

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"

এই আত্মা আসীন অর্থাৎ একই স্থানে থাকিয়াও দূরে বিচরণ করে, শয়ান হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করে ;

"অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্"

এই আত্মা অনিত্য শরীরে থাকিয়াও বস্তুতঃ অশরীরী—

এই সকল তত্ত্ব যখন প্রকাশিত হইল, অর্থাৎ মানুষ নিজেকে যখন আপনার শরীর অপেক্ষা বড়, শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম, শরীর হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র, বস্তুতঃ অশরীরী বলিয়া ধরিল বা ভাবিল,তখন তার দেবতাও তার নিজেরই মতন অশরীরী হইয়া গেলেন। মানুষ তখন তার দেহটাকে অনন্তগুণ করিয়া আর দেবতার প্রতিষ্ঠা করিতে গেল না ; কিন্তু আত্মাটাকেই বড় করিয়া ব্রহ্মের বা বিশ্বাত্মার বা পরমাত্মার উপাসনায় নিযুক্ত হইল।

৪

এই নিতান্ত নিরাকারবাদও বেশী দিন টিকিল না। এই নিরাকারবাদ প্রত্যক্ষ জগৎটাকে ও জীবের দেহকে উড়াইয়া দিতে গেল, কিন্তু এই জগৎ-সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিল না। আত্মাটা যেমন সত্য, প্রত্যক্ষ বস্তু ; অনুভব দিয়া ইহা বুঝি যে দেহ ছাড়া একটা কিছু আছে, যাহার দ্বারা এই দেহ আপনার কর্ম্ম করে। সেইরূপ এই দেহটাও যে আছে, আর এই দেহের দ্বারা যে সকল শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় পদার্থের জ্ঞান লাভ করি ও এ সকলকে ভোগ করিয়া থাকি, সে জগৎটাও আছে, ইহাও অনুভবে বুঝি। এই দেহটা ও জগৎটাকেও ত নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।

নিরাকার আত্মাই যদি বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব হয়, তবে এই দেহের ও জগতের উৎপত্তি হয় কেমনে ? "নাসতো সজ্জায়তে" অসৎ অর্থাৎ যাহা নাই, তাহা হইতে সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, তার উৎপত্তি ত সম্ভব হয় না। অতএব এই দেহ ও জগৎকে আত্মারই পরিণাম, দুধ হইতে যেমন দই হয়, সেইরূপ সেই আত্মা হইতে এই জগৎ ও জীব জন্মিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

আর এটি স্বীকার করিলে, এই জগৎকে ও জীবকে ঐ আত্মার মধ্যে, তার নিত্য-প্রকৃতির ভিতরে, সেই প্রকৃতির অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে, এই বিশ্ব-সমস্যার কোনও নিঃশেষ মীমাংসা হয় না।

৫

এই রূপেই উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন জীব ও ব্রহ্মকে নিত্য নিরাকার বলিয়া ধরিয়াছিল, ভাগবত তাহা করিতে পারিল না। ভাগবত এই জীবকে ও এই জগৎকে তার নিত্য-স্বরূপেতে—শ্রীভগবানেতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এই সমস্যার মীমাংসা করিল।

এই জন্য ভগবান্ কেবল নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ নহেন; কিন্তু চিদাকার-সম্পন্ন। ভগবানের আকার ইন্দ্রাদি কল্পনার মতন, অতি-মানুষী আকার নহে। মানুষের দেহ-টাকে ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকে অনন্তগুণ করিয়া শ্রীভগবানের দেহ কল্পিত হয় নাই। কিন্তু এই দেহের শ্রেষ্ঠতম উৎকর্ষ, পরিপূর্ণ-স্বরূপেই শ্রীভগবানের দেহের ধারণা হইল।

চিত্রকর ও ভাস্কর মানসচক্ষে মানুষের যে রূপ দেখিয়া তাহাকে চিত্রপটে বা মর্ম্মর-খণ্ডে ফুটাইতে চাহেন, কিন্তু প্রাণপাত করিয়াও ফুটাইতে পারেন না; সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপই শ্রীভগবানের রূপ।

মানুষ কেবল শরীরী নহে। কেবল অশরীরীও নহে। মানুষ যে কি, এই চোক দিয়া ত তাহা দেখিতে পাইলাম না। এই সকল ইন্দ্রিয়ের কোনটাই ত মানুষের রূপ-রস-গন্ধের পূর্ণ আস্বাদন পাইল না। এই মানুষের ভিতরে সর্ব্বদাই এমন একটা কি-যেন-কি'র সাড়া পাই, যাহাকে এই রক্ত-মাংসের দেহ বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারি না, আবার এই দেহ যে একেবারেই নয়, অর্থাৎ তার যে রূপ বা অঙ্গ-সমাবেশ নাই, স্পর্শাদি ধর্ম্ম নাই, তাহাও বলিতে পারি না। এই বস্তু তাহা—যাহা মানুষের মধ্যে ফুটে ফুটে, কিন্তু যেন ফুটে না। যাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে, কিন্তু আটকাইয়া রাখিতে পারে না।

এ আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি যেখানে ও যাহার মধ্যে, আমাদের ভাগবতেরা তাঁহাকেই শ্রীভগবান্ বলিয়া ভজনা করিয়াছেন।

এই জন্যই ভগবান নর, নরোত্তম। এই ভগবান নারায়ণ। নর ভগবত-তত্ত্বের বীজ। নরোত্তম এই তত্ত্বের ফল। নর ও নরোত্তমকে ধারণ করিয়া, নারায়ণ এই তত্ত্বের সাকুল্য বৃক্ষ-স্বরূপ। আর যে ভগবদ্রসের দ্বারা নর ও নরোত্তম পরিপুষ্টিলাভ করেন, যে রস নরেতে ও নরোত্তমেতে সঞ্চারিত হইয়া, তাহাদের ফুটাইয়া তোলে ও বাঁচাইয়া রাখে, সেই চিদানন্দ-রসকেই ভাগবত সরস্বতী বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

এই জন্যই ভগবল্লীলা-কীর্ত্তনকালে সর্ব্বাদৌ নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়ধ্বনি করিবে—এই উপদেশ আছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বাঙ্গলার গীতি-কবিতা

(দ্বিতীয় কল্প)

আমার বাঙ্গলার এক চিরন্তন আদর্শ আছে। বাঙ্গলার যেমন শ্যামলশ্রী রূপ, যেমন নধর সবুজ তৃণের কোমলতা, নীল আকাশ আর গঙ্গার উচ্ছল বারি, আমার বাঙ্গলার আদর্শও তেমনি সেই শ্যামলশ্রী, সেই—

"নব রে নব, নিতুই নব,
যখনি হেরি তখনি নব"

হেরিয়া চোখ জুড়াইয়া যায়। বাঙ্গলার গানের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণের যে অবিচ্ছিন্ন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্পর্ক আছে, সেই মিনিসূতার মালার গাঁথনির কথা আপনাদের শুনাইব বলিয়া, আজ আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছি। •

বাঙ্গলার এক অখণ্ড সত্য আছে, সেই সত্য, যুগে যুগে যখনি যাহার মরমের নিভৃত আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে তখনি এই মাটীর প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নিবিড় পরিচয় পাইয়া আত্মার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাতেই নিশ্চিন্ত হয় নাই, প্রাণে প্রাণে সেই মিলনবাণী 'লোকহিতায়' 'জগতে ধর্ম্মস্থাপকায়' দেশে দেশে বিলাইয়া দিয়াছে। সেই পরিচয় হইতেই কল্পকলার সৃষ্টি, সেই পরিচয়েই ধর্ম্মের স্থাপন, সেই পরিচয় হইতেই মানুষের সমাজ, শ্রদ্ধা, সংস্কার। সেই মিলনেই এই অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের রসমূর্ত্তি বুকের ভিতর আঁকিয়া লইয়া জাতি আপনাকে বিকাশ করিতে থাকে। বাঙ্গলার একদিন ছিল, যে দিন বাঙ্গালী আপনাকে সেই পরিচয়ের জোরে জগতের কাছে বাঙ্গালী বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ তাহার বুকের ভিতর হইতে সেই সচ্চিদানন্দ চিন্ময় মূর্ত্তি কোন অবসাদের তমোগূঢ় অন্ধকারে মুছিয়া গিয়াছে। সেই যে বাঙ্গলা তাহার নিজের মাটীর পরিচয় ভুলিয়া গেল, সেই হইতেই এই দিনগুলা আঁধারেই কাটিতেছে। কিন্তু দীপের ধর্ম্মই জলিয়া উঠা। আত্মার অন্তরের পরতে পরতে যে দীপ জলিয়া আলোক বিকীরণ করে, সে আলোকের ধর্ম্মই অন্ধকারকে জ্বালাইয়া দীপ্ত করা। হাজার হাজার বছরের অন্ধকার এই দীপের আলোয় মরিয়া যায়। সকল মানবই সেই পরিচয়লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সকলকেই একদিন সেই সাযুজ্য-পরিচয়ের জন্য আত্মার আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি হইতেই হইবে। সেই মধুর পরিচয়টি করাইবার জন্য মাটী অহরহ সজাগ রহিয়াছে। তাহার

আর সে চেষ্টার বিরাম নাই, বিরতি নাই, বিশ্রাম নাই, সঙ্কোচ নাই। স্নেহময়ী জননীর মত সে তাহার অন্তর্ধৈর্য বহে। তাই মাটী আমাদের শুধু শরীর দান করে না, আমাদের মন-প্রাণের নূতন জন্ম দিয়া নবজীবন দান করে। মাটী শুধু মাটী নহে। মাটীই আমার সঙ্গে অনন্ত রসমূর্ত্তিরূপে আমার প্রাণের সঙ্গে রসলীলাভঙ্গে একদিন সেই প্রাণমণি দীপখানি জ্বালাইয়া দেয়। সেই দীপ একদিন বাঙ্গলার কবিচিন্তামণির বুকের ভিতর জ্বলিয়াছিল, সেই দীপ একদিন মহাপ্রভুর বক্ষের মণিকোটায় জ্বলিয়াছিল, সেই দীপের আলোক মুসলমানযুগের আবহাওয়ার ভিতরেও রামপ্রসাদের প্রাণের ভিতর জ্বলিয়াছিল, সেই দীপ এই ফেরঙ্গ-যুগেও গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীতলে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলার সাধনার ধারা এমনি করিয়া ধীরে ধীরে রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের ভিতর দিয়া এমনি করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই সাধনার ধারাতেই বাঙ্গলার গানের জন্ম। আজ আপনাদের আমি সেই বাঙ্গলার জীবনের ধারায় যে সাধনার গান, সমস্ত দেশকে ও দেশের প্রাণকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই কথা কহিব।

আমার বাঙ্গলার বড় মধুর রূপ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধি এত রূপ কই আর ত' কাহাকেও দেন নাই। আমার বাঙ্গলার রূপের কি তুলনা আছে! শ্যামচেলাঞ্চলময়ী বনরাজি-বিভূষিতা সরিৎবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী, মার বুকে অবিরাম নৃত্য করিতেছে, চরণতলে উদ্দাম উচ্ছল মহোর্ম্মি-বিস্ফূর্জ্জিত সাগরের দিগন্ত-মুখরিত হলহলা, শিরে নগাধিরাজ ধূর্জ্জটী, সূর্য্যকিরণে ধক্-ধক্ জ্বলিতেছে। মা আমার এক হাতে ধান্যশীর্ষ, অপর হস্তে বরাভয়, কোলে বীণা, পদতলে সহস্রদল শ্বেতপদ্ম; আকাশ উজ্জ্বল, তরুণরবি হিরণ-চূর্ণ দিখিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আশে পাশে ললিতকণ্ঠে পিককুল কল-ঝঙ্কারে মুখরিত করিতেছে! এ রূপের কি তুলনা আছে! সেই বাঙ্গলা মায়ের বাঙ্গালী ছেলে চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ, মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ; সে বাঙ্গালী যে আজিও মরে নাই, তাই সেই আশার আলোয়, সেই আনন্দে, আজ চোখে জল আসে। কি কাঞ্চন-মণি ফেলিয়া, কি কাচ আজ কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়াছি; রাশি রাশি খড়ির চাপ ও ধুলায় সকল কলঙ্ক শুভ্র করিতেছি; প্রাণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি ভয়াবহ পরধর্ম্মের খোলস পরিয়াছি। বাঙ্গলা ভুলিয়া বাঙ্গলার ভাব ভুলিয়া, রূপ ভুলিয়া, প্রাণ ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া সে মায়ের রূপকে দেখিতে পাই না, দেখিলেও আর চিনিতে পারি না। চোখে পর্দ্দা পড়িয়া গেছে, চোখ খারাপ হইয়া গেছে। আজি চোখের সম্মুখে ইউরোপীয় অবভাসের যবনিকা—চোখ আর সে রূপ চিনিতে পারে না। ইউরোপীয় ভাবের ধারার ছাঁচে, নিজেদের মা ঢালিয়া, আমরা যেন আজ কিছুই ভাবিতে পারি না। কল্পনা ফেরঙ্গ, ভাব ফেরঙ্গ, সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্গে, জীবন

ও ধর্ম্মের অঙ্গে আজ এই ইউরোপীয় ব্যভিচারী ভাব, আমাদের জীবন ধর্ম্ম সাহিত্য শিল্প ও সব কল্পকলাকে মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে।” আজ এই দুর্দ্দিনে সূচীভেদ্য তমসাচ্ছন্ন আকাশতলে এই ফেরঙ্গ বাঙ্গলার ফেরঙ্গ সাহিত্যের মাঝে অকস্মাৎ বিজলী-ঝলকের মত কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত মায়ের শ্রীরূপ দেখিলাম ; সেই পদ্মালয়া, সেই সরস্বতী, সেই অন্নপূর্ণা, সেই সিংহবাহিনী, সেই ভীমা ভয়ঙ্করী রুধিরার্দ্র-বসনা করালী—আর দেখিলাম সেই মদনমোহন,—

'বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা।'

সে যুগলরূপের কি ওর আছে! আধশ্যাম, আধরাধা যেন মেঘ-অঙ্গে বিজলী মিলাইতে চায় ; মেঘ যেন বিজলীর ঝলক দিয়া হাসিয়া উঠে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নব নব রূপ ফুটিয়া উঠিতে চায়, সকল রূপ প্রতিনিমিষেই সেই যুগলরূপে মিলাইয়া যায়।

'মিলল দুঁহু তনু কিবা অপরূপ
চকোর পাওল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি-ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥'

আর বাঙ্গালীর কবি চণ্ডিদাস সেই রূপের পাশে রহিয়া, ভাবে গদ গদ হইয়া,

"চামর ঢুলায়ত।"

এই ছবি বাঙ্গলার নিজস্ব। যে মরম জানে, সে রসিক এই রসের কথাও জানে। সেই প্রাণের ধারার সঙ্গে সাধনাঙ্গের ধারার পরিচয় রামপ্রসাদেরও ছিল। রামপ্রসাদ তাই গাইয়াছিলেন,—

"গিরিবর আর পারি না হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে,—
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারি নে হে প্রবোধ দিতে উমারে।"

এ সব গান বাঙ্গলার প্রাণের পঞ্জর হইতে বাহির হইয়াছে, জীবনের সঙ্গে এ রসের অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আজ বাঙ্গলা সেই প্রাণের প্রাণকে তাহার সাহিত্যের—তাহার জীবনের সেই রূপ, যে রূপের চরণে,—

"মদন মূরছা পায়,"

সেই রূপ ভুলিয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। নিজেদের বাঁচার মত বাঁচিতে হইবে। শুধু একটা কাব্যের খাঁচা দেখাইয়া, রসবোধের রসিক হইয়াছি বলিলে, প্রাণ বুঝে না। আত্মায় আত্মায় স্বমধে সে রস উপভোগ হয় না। মনুষ্যজীবনের যে চরম পরিচয়, তাহার পথে শুধু অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা আসিয়া ব্যবধান করিয়া দাঁড়ায়। তাই এই মিথ্যাময় ফেরঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাঙ্গলার জীবনকে মুক্ত করিতে হইবে। আজ তাহারি বার্ত্তা আমি বহন করিয়া আনিয়াছি। আমি প্রাণে প্রাণে যে অনুভূতি দ্বারা—সাধনের দ্বারা জীবনের সে রূপের যে পরিচয় পাইয়াছি, আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গলাকে তাহা শুনাইবার জন্য আমি সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া প্রস্তুত হইয়াছি। আজ এই তমসাচ্ছন্ন পুঞ্জীভূত অন্ধকারের তামসিকতার দিনে সকল রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া আমাদের জীবনের ধারাকে বাঁচাইতে হইবে। এই ভাবের অপচারের দিনে, ফেরঙ্গ-সাহিত্য ও জীবনের দিনে সমগ্র শক্তিকে একবার অন্তর্মুখী করিয়া বাঙ্গলার সেই প্রাণের প্রাণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হে বাঙ্গালী, বাঙ্গলার সেই প্রাণের গানের সন্ধান কর। দেবতা চায় অমৃত, অসুরে চায় অনৃত। মানুষের এই দেহ-মন-প্রাণ প্রতিষ্ঠাত্রয়ের ভিতর অহোরাত্র যে যুদ্ধ চলিয়াছে, সে যুদ্ধে জয়ী হইবার, মহতো ভীতি হইতে নিজেদের বাঁচিবার জন্য বাঙ্গলার সবুজ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া দিনের আলোকে নিজেদের সন্ধান করিতে হইবে, তবে সেই অমৃতে আমাদেরই অধিকার। বাঙ্গলার সশক্তিক কবি চণ্ডিদাস রামপ্রসাদের, বাঙ্গলার স্বধর্মপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর অমৃতোপম রসানুভূতিতে যেই রসসৃষ্টি হইয়াছে, প্রাণের জিনিষকে তাঁহারা যেমন বুকের ভিতরে প্রাণ ভরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, সেই সাধনের পথে—সেই অনুপম কাব্যসৃষ্টির পথে নিজেদের ও দেশের গতিকে লইয়া যাও, নিজের জীবনে ও কর্ম্মে মিলাও, তোমার নিজেরও পরিচয় পাইবে, দেশেরও পরিচয় পাইবে। ফেরঙ্গ-জীবন ও সাহিত্যের এই মহতো ভীতি হইতে তবেই রক্ষা পাইবে। স্বধর্ম্মের—বাঙ্গলার প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্মের এই পরিচয় পাইলে;

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ,'

নচেৎ সারা বিশ্ব উজাড় করিয়া বিশ্বের কাব্যভার মাথায় করিয়া আনিয়া, নিজের ও জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া, তাহার স্বাভাবিক সহজ প্রকৃতিগত চিন্তাশক্তি রোধ করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, মনকে চোখ ঠারিয়া, যাহা কিছুই রচনা কর না কেন, বেলাভূমে বালুর প্রাসাদের মত এক বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া যাইবে, তাহার লেখাও থাকিবে না, কোন চিহ্নও পাইবে না। তাই আজ দিন থাকিতে থাকিতে ফিরিতে বলিতেছি। এ ব্যাধির যে ঔষধ, তাহা ওষধি-লতার মত বাঙ্গলারই বনে জন্মিতেছে।

আজিকার দিনে এই জীবন ও সাহিত্য-সৃষ্টির যে ধারা চলিয়াছে, এই ব্যর্থকাম বৈদেশিক খোলসপরা জীবন ও কল্পরাজ্যে যে শ্রীরামপুরী খৃস্টান পাদরীর নৈতিক সভ্যতা ও পাপবোধের অপচার মিলাইয়া, আজ শতবৎসর ধরিয়া, জীবন ও সাহিত্যের নামের, জীবনের বিচিত্রতার নামে, ধর্ম্মের নামে যে পুঞ্জীভূত ধূলা, পুঞ্জীভূত অধর্ম, ক্রীতদাসের পরানুকরণ,—জীবনে ও সাহিত্যের, কর্ম্মের ও ধর্ম্মের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে ছাপ পড়িয়াছে; গানে, সুরে, চিত্রে, স্থাপত্যে যে ক্লেদ, যে পঙ্ক, যে ধূলী, যে খড়ি-মাটীর রং পড়িয়াছে, তাহাকে মুছিতে হইবে; ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মনুষ্যত্বে ভাবের দাসত্ব, ভাষার দাসত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। হে বাঙ্গালী, জানিও, তাহা ছাড়া আর কোন পথ নাই,—নাই। তাই সেই জীবন ও ধর্ম্মের, প্রাণ ও সাহিত্যের মাঝে বাঙ্গলার সেই চিরন্তন বাণীকে তোমাদের কাছে, সাহিত্যের মধুর বিচিত্ররূপের ভিতর দিয়া আনিয়া দিতেছি; গ্রহণ কর!—গ্রহণ কর! ইহাকে বৈষ্ণব-তত্ত্ব বা রসের কথা বলিয়া, তত্ত্বের কথা না জানিয়া, রসের কথা না বুঝিয়া ফেলিয়া দিও না। ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, ইহা বাঙ্গলার মাটীর ও প্রাণের মিলন-ভূমি; এই কাব্যলোকেই বাঙ্গলার মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মনে করিও না, তোমরা আজ যাহাকে বিচিত্র হওয়া বলিতেছ—তাহা সত্যসত্যই বাঙ্গলার স্বাভাবিক বিচিত্রতা। ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের কথা মুখস্থ করিয়া, সেই কথাগুলিই রসান দিয়া, বাঙ্গলায় বলিলেই বাঙ্গালীর জীবন হঠাৎ বিচিত্র হইয়া উঠে না। এই মিথ্যা বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংঘাতজনিত শতখণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্নতা মাত্র। আমি যে প্রাণ ও সাধনার দিকে ফিরিতে বলিতেছি, আমি যে বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে বলিতেছি, বাঙ্গলা তাহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিয়া, নিজে যে বিচিত্ররূপে জগতের কাছে নিজকে ধরিয়াছিল ও আপনি যে শত শত অপূর্ব ভাবে বিচিত্র হইয়া বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই বিচিত্র প্রাণ-ধারারই কথা। পাশ্চাত্যের এই ভাব-মোহ এই "বিশ্ব"-মোহ যাহা আমাদের সমস্ত মানুষকে, নাড়ী-চক্রকে ব্যাধিপীড়িত মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের উদ্ধার হইতেই হইবে। বাঙ্গলার নিজের প্রাণকে জানাই তাহার একমাত্র উপায়। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, সাহিত্য ও জীবনকে আমি চণ্ডিদাসের যুগে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাই, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। তাহা নয়; নদীস্রোত উল্টা ফিরিয়া যায় না, সে আপনার পথ আপনি কাটিয়া লয়। সৃষ্টির বীজ অন্তরেই নিহিত থাকে, আঁখির আগে আগেই রূপে ধরা দেয়, পিছনে নয়। বর্ত্তমান জীবনের ধারাকে স্বাভাবিক করিতে হইবে—চণ্ডিদাসের গানের মত স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের গানের মত আমাদের সেই স্বাভাবিকতায় ফিরাইয়া লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গলার স্বাভাবিকতা

ফরাসী রুশের Naturilism নহে। এ স্বাভাবিকতায় প্রকৃতি ও আত্মা আত্মস্থ, প্রকৃতির দাস নহে। তাই সেই যুগের প্রাণময় প্রাণের সুরে ঢালাই করা গানের ধারা ও উৎসের খোঁজ করিতে চাই। আশা করা যায় যে, বাঙ্গলার সেই কাব্যসাধনার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার, তাহার জীবনকে সত্য করিবার পথ আবার আমরা সাধন করিব এবং সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবই করিব ও তাহার সেই উৎসের মূল রসের পথ ধরিয়া সেই নিখিল রসের সকল আনন্দের মাঝে, আমাদের বাঙ্গালীজাতির জীবনের সার্থকতা অনুভব করিব।

কেহ কেহ বলেন, বহুশতাব্দী ধরিয়া আমাদের দেশ পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন। এই পরাধীনতায় তাহার অনেক মানুষী-বৃত্তিও অনুশীলন অভাবে নষ্ট হইয়া গেছে। স্বাধীনতার যে আনন্দ, জাতীয়তার যে সংবিৎ, যে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, তাহাই নাকি কারুকলার প্রাণ। এই স্বাধীনতাই তাহার বিরাট্ উপায় ও ফল। ইহা আশ্চর্য্য নয় যে, বাঙ্গলা তাহার এই স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা হইতে বিচ্যুত হইয়া, তাহার জীবনের সরল গতি হারাইয়া, সত্য সুন্দর শিবের ধ্যান ভুলিয়া গেছে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই বাঙ্গলায় সাংখ্যকার কপিলের জন্ম, এই বাঙ্গলাই শ্রীচৈতন্যকে দিয়াছে, এই বাঙ্গলাই আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়াছে। এই বাঙ্গলাই একদিন সমস্ত প্রাচ্যকে ভাবে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে অজেয় নেতার মত চালাইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলার স্বাধীনতা—তাহার আত্মার আত্মস্থ-সংবিতের অনন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠায়। এই অনন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য, আত্মার জীবন্ত রসানুভূতির জন্য বাঙ্গলা যে তপস্যা করিয়াছিল, সেই তপস্যাই কত বিচিত্ররূপে বাঙ্গলার প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার সাধনা, বাঙ্গলার স্বাধীনতার আদর্শ সেইখানে, বাঙ্গলার কারুকলার ভিত্তিও সেইখানেই। সেইখানেই আমাদের গীতিকবিতার ও গানের প্রাণ।

মনুষ্যজীবনের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা কখন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় হয় নাই,—হইবেও না। শুধু পরের দাসত্বের বোঝা ও শিকল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেই তাহাতে জীবনের স্বাধীনতা-রক্ষা হয় না। মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল প্রবৃত্তির, সকল রসের অনুভূতির, সকল যাতনার উপরে, সকল ভোগের উপরে, নিজেকে—নিজের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, স্বাধীনতা অর্থহীন দেহভোগীর প্রাণহীন বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের মনুষ্যত্ব, তাহার আত্মার সংবিতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে যুগে চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন, সে যুগও বাঙ্গলার স্বাধীনতার যুগ নয়; কিন্তু দারিদ্র্যের—পরাধীনতার—সমাজের সঙ্কীর্ণতার সমস্ত সঙ্কোচ ও ব্যবধানের মধ্যেই তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছাকে দারিদ্র্য, পরাধীনতা, সমাজের পেষণ কিছুতেই পাড়িতে পারে নাই। এই সব

মহাপুরুষদের প্রাণ-বেদীমূলে মাটী যে সমিদ্‌ভার আহরণ করিয়া দিয়াছিল, তাঁহারা একনিষ্ঠ সাধকের ধারায় নিজেদের মাটীর সম্পর্ককে এক করিয়া, সে প্রেমাগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন। কোন সমাজসংহিতা, কোনরূপ দণ্ড তাঁহাদের এই জ্বলন্ত জীবন্ত অগ্নিশিখা নিভাইতে পারে নাই। আত্মার সেই প্রেমরসের অনন্ত বিভূতি, এই পরাধীনতার ভিতর হইতেই তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রেমের সৌভরাজ্যে তাঁহারা চিরনূতন সম্রাট্‌; কেমন করিয়া অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের জীবন্ত প্রেমভরা মণিকোঠায় পৌছিয়া, সেই রসচিন্তামণি আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই সাযুজ্য-পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই আমাদের জানিবার—উপলব্ধি করিবার বিষয়।

কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য "রূপক"। মানুষের নিজের অর্থাৎ বৈষ্ণবকবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে নাকি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে। রূপ-অরূপের প্রভেদ, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ, বস্তু ও অবস্তুর প্রভেদ শুধু বিচারদ্বারা কতদূর বুঝা যায়, বলিতে পারি না। শুধু বিচার-বুদ্ধির উপরে আমার সেরূপ আস্থা নাই। খুব সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির সাহায্যে কল্পিত সত্য-মিথ্যা সৃষ্টি করিয়া, সেই সত্য-মিথ্যার সাগরসঙ্গমে দাঁড়াইলে গঙ্গাও দেখিতে পাওয়া যায় না, সাগরও দেখিতে পাওয়া যায় না। মায়া বলিয়া এই জাগ্রত বিশ্বের বিচিত্রতার মধ্যে মায়াধীশকে খাড়া করিয়া, সকল বিশ্বকে বুদ্ধির প্রাখর্য্যের দারুণ ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশ্ব উড়িয়া যায় না, মায়াও আপনার প্রকৃতরূপে দেখা দেয় না। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সেই কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া লইয়া, সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণবকবিতা বুঝিতে গেলে, বোধ হয়, রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের সে সাধনা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর সাধনা। বৈষ্ণবকবিদিগের প্রত্যেক অনুভূতি যে তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই; সেই প্রাণকে যে জানে না, জানিবার চেষ্টাও করে না, সে কেমন করিয়া বুঝিবে? বৈষ্ণবকবিদের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের রাধা, তাঁহাদের জীবনের প্রাণের মর্ম্মের শতদলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগলরূপই বাঙ্গলার সভ্যতা, সাধনা, শিক্ষা, দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্ররূপে প্রকাশিত করিয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গলার প্রাণ, যাঁহারা বাঙ্গলার প্রাণকেন্দ্র হইতে ইউরোপীয় বিশ্বসাহিত্যের ঝড়ে শতধা দীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাঁহারাই এই বিশাল বিশ্বলীলার জীবন্ত মূর্ত্তি-স্রোতের মাঝে বৈষ্ণব কবিতাকে প্রাণহীন রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। কৃষ্ণ যদি বাস্তবিকই কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দেন, তবে ত এ জীবনকে ধন্য মনে করি। কৃষ্ণ

বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনদিগকে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের কবিতা এত সরল, এত সুন্দর, এত রূপ-বৈচিত্র্যে ভরা-ভরা। এই সব কবিতা বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যের মোহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গলার যে প্রাণ, তাহার খোঁজ করিতে হইবে, মুখস্থ করা জ্ঞানের যে অহঙ্কার, তাহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

বাঙ্গলাদেশকে নূতন করিয়া বৈষ্ণব হইতে হইবে না। বাঙ্গলা যে প্রাণে প্রাণে বৈষ্ণব। বাঙ্গলার যে স্বাভাবিক শক্তি, তাহারই তপস্যা করিতে হইবে। তোমাদের ইহাই বলিতে চাই, শ্রীকৃষ্ণ রূপক নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, ভারতসভ্যতার ইতিহাসে, হিন্দুর জাতীয় গরিমার ইতিহাসে, তাঁহার স্থান অতি-অতি-উর্দ্ধে, সেই আদর্শ মহাপুরুষকে শ্রীভগবান্ বলিয়া ভারত-আপামরসাধারণ মানিয়া আসিতেছে, তাঁহার লীলার মধ্য দিয়া ভারতে সমাজ, ধর্ম্ম, সভ্যতা অঙ্গাঙ্গি-যোগে যুক্ত,—তাঁহারই লীলার মহাভাবে পুষ্ট ভারতের কাছে ইহা রূপক নয়, বাঙ্গলার কাছে ইহা রূপক নয়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। শুধু ঐতিহাসিক নয়, যুগে যুগে মহাপ্রাণের ভিতর সেই লীলা-আভাস-চঞ্চল মূর্ত্তিতে বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষ মুখরিত ও বিকসিত। যাহা জাতির প্রাণের ভিতর দিয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, ইহলোক-পরলোককে ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া লইয়া আসিতেছে, তাহাকে রূপক বলিয়া, রকম করিয়া, পাশ্চাত্যের রূপক লইয়া, এত মাতামাতি করিলে চলিবে কেন? চটুলতায় কোন অধ্যাত্মসাধন হয় না। যাঁহারা দেশের দশকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, দেশের অন্তরঙ্গ-সাধনা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, যাহাদের প্রতি কথায় প্রতি ভাবে প্রতি কার্য্যে পশ্চিমী সেপাইয়ের খাড়া নজীর দেখাইতে হয়, যাহারা সংসারে জন্ম লইয়া নিজেদের প্রাণকে প্রতিনিয়তই নিজেরা ছলনা করে, যে আলোক তপস্যার দ্বারা প্রাণের পরতে পরতে ঝলকিয়া উঠে, আত্মার সে স্বানুভূতি যাহাদের নাই, যাহাদের জীবনটা নিজেদের কাছেই রূপক, তাহাদিগকে বলিবার আমার আর কিছুই নাই; শুধু এইটুকুমাত্র যে, আপনার আত্মার পথ ধরিয়া বাঙ্গলার নবজীবন-উষার প্রাক্কালে, নবোদিত সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেশের সাধনার ধারার মধ্য দিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া, আপনার কল্যাণের পানে মুখ তুলিয়া, মন মুখ এক কর; তবে বাঙ্গলার আত্মস্থ সাধনার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে। চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের মধ্যে, তাঁহাদের নিজেদের জীবনের সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভালবাসা, মিলন, বিরহ, সমাজের সহিত বিরোধ, প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্গে প্রচলিত আচার, অনাচার, তান্ত্রিক-আচারের সঙ্গে বিরোধ ও মিলন, স্বাভাবিক হইবার—সহজ হইবার

যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারি কথা—এই বাঙলা কবিতার ভিতর হইতে আমি দেখাইতে চাই। যে সকল কলকলার ধারায় এই বাঙলা শ্রেষ্ঠ, এই চণ্ডিদাসের ও রামপ্রসাদের গান বাঙলার সেই কলকলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়াছে। আজ এই ইউরোপীয় অবভাসের দিনে আমি জোর গলায় বলিতে পারি যে, বাঙলার ঘরে সে দীপ আবার জ্বলিয়াছে। জানিও, ইহাই বাঙলার অভয়-বাণী। এই বাণীকে সত্য ও সার্থক করিতে হইবে।

আর একটা কথাও মাঝে মাঝে শুনিতে পাই যে, বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের গন্ধ বড় বেশী। আধুনিক কবিতা আর এখন instinct এর (স্ব-স্বভাবের) পর্য্যায়ে নাই; তাহা এখন ঊর্দ্ধগ, অতীন্দ্রিয়ের সুবাসে মত্ত। ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ভাব, কোন সত্তা, আজিও মানুষের ভিতরে অনুভব হয়, এমন বিশ্বাস আমার নাই। ইন্দ্রিয়ও যাঁহার সৃষ্টি, অতীন্দ্রিয়ও তাঁহারই সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপর জীবনের কোন ভিত গাঁথা যায় কি? কেহ আজিও পারিয়াছেন কি? রক্ত-মাংসকে, মাটীকে অস্বীকার করিয়া, মানুষের সাধ-সোহাগ অস্বীকার করিয়া, কাব্যলোকে কোন শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে আধুনিক নকল ইংরাজী-নবীশদের বুদ্ধির বায়নাক্কায় পড়িয়া, বহুকাল হ-য-ব-র-ল হইয়াছে। তাই এখন শুনিতে হইতেছে যে, বৈষ্ণব কবিতা erotic। বাঙলার সাধনা চিরকালই ইন্দ্রিয়কে সত্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রিয়ের সকল রস আহরণ করিয়া, ইন্দ্রিয়ের মুখে বল্গা দিয়া চালাইয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার সকল বৈচিত্র্যের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দিয়া, তাহাদের সকল বিভিন্নতাকে সে এক করিয়াছে। বহুর মধ্যে, বহু বিচিত্র রসের মধ্যে বাঙলা সমরসের আস্বাদন করিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সত্য খেলাকে বাঙলা কখন অস্বীকার করে নাই। বৈষ্ণব জানে যে, তাহার মনে, প্রাণে, দেহে এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত লীলা করিতেছে, সে যন্ত্র, যন্ত্রী তাহার প্রাণের প্রাণারাম হইয়া আনন্দ-রস লীলাচ্ছলে ভোগ করিতেছেন। এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই শুদ্ধা, ভোগ ও ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত। এ ইন্দ্রিয় ভাগবত-ভোগের ইন্দ্রিয়। বাঙলার কবি সাধক, সেই ভোগে আত্মস্থ শুদ্ধির মধ্যে ভুক্তিকে সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করে, মর্ম্মে মর্ম্মে আত্মায় আত্মায় রমণ করে,—এ ভোগ ভাগবত-ভোগ। বাঙলার গীতিকবিতার মর্ম্মে মর্ম্মে এই ভোগের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃশ্চান পাদরীর কাছে বাঙলার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের কথা ও পাপবোধের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা আমাদের আদর্শ ভুলিয়া, প্রতীচ্যের রঙিন খোলসে পড়িয়া, নিজের আত্মাকে অস্বীকার করিয়া, সাহিত্য ও ধর্ম্মে আত্মহত্যার গৌরব অর্জ্জন করিব?

আজিকালিকার দিনেও এ সব অলীক খৃষ্টানী নীতিকথার স্তাকামীতে যাহারা ইন্দ্রিয়ের ভোগকে অশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চায়, তাহারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। বাঙ্গলার বুকের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গেছে; ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অত্যাচার—সমাজরক্ষার নামে হিংসার অত্যাচার—বিজাতীয় অত্যাচার—মানুষের উপর মানুষ যত প্রকার অত্যাচার করিতে পারে, সব হইয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার রূপ, কত রঙের বিচিত্রতায় বদল হইয়া গিয়াছে। কত কবি জন্মিয়াছে, কত অকবি জন্মিয়াছে; গত কয় শতাব্দীর উপর দিয়া কত ঝঞ্চা, কত ব্যাত্যা, কত বিরোধ ও বিদ্রোহের অগ্নিতে সমাজ, মানুষ ও ধর্ম্মের আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও আলোড়ন হইয়াছে; কিন্তু তাহারই মধ্যে বাঙ্গলার যে শান্তি, পর্ণকুটীরে বসিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে করতলস্থ আমলকবৎ ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে শক্তি—সে সামর্থ্য হারাইল কেন? সে আদর্শ কেমন করিয়া এই ফেরঙ্গ-যুগ নষ্ট করিল, তাহাই ভাবিবার কথা। চণ্ডিদাস যে ব্রজপ্রদীপের প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন, সেই প্রদীপ আবার জ্বালাইতে হইবে। কত বিপদ্, কত সংঘাত ও বিপ্লবের মধ্যেও চণ্ডিদাস ও শ্রীচৈতন্ত কেমন করিয়া বাঙ্গলার পরিপূর্ণ রস-মূর্ত্তিটিকে নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা স্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই কথাটি—সেই পথটি আমাদের বিশেষরূপে ভাবিবার ও দেখিবার বিষয়; সে বিষয়ে অন্তমত থাকিতেই পারে না। সেই পথ না জানিলে দেশের সাহিত্যের ধারাকে আমরা কখনও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব না। সেই ধারা সরস্বতীর ধারার মত বালুর নিম্নে কোথায় লুকাইয়া আছে। তাই আজ সাহিত্যের কাননে মুঞ্জরিত তরু নাই। তাল-তমাল-রসাল-পিয়ালের সে বনশোভা নাই, অশ্বত্থ-বটবৃক্ষ নাই, সপ্তপর্ণ নাই। তাই এখন পোড়া বাঙ্গলা শূন্ত বনভূমিতে পুঞ্জীকৃত "এরণ্ডোৎপি দ্রুমায়তে।" বালুর নিম্ন হইতে আমরা সরস্বতীকে আবার বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠা করিব।

আজ কেন তাহা নিভিল? এর কারণ খুঁজিয়া দেখিলে, অবশ্য একেবারে তার কোন নির্দ্দেশই পাওয়া যায় না, এমন কথা নয়। সংসারের প্রত্যেক কারণ ও কার্য্য জড়াইয়া এত বিচিত্রতায় পরিণত হয় যে, অনেক সময় সেই আসল কারণটার কোন নিরাকরণই হয় না। আমাদের এ ক্ষেত্রেও তাহা যে হয় নাই, এমন কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে বোধ হয় সঙ্কোচ বোধ করিবেন; তবে সকলের চেয়ে বড় কারণ এই যে, আমরা আমাদের প্রকৃতিকে হারাইয়াছি। কেমন করিয়া যে তাহা হারাইলাম, তাহা লইয়া অনেক তর্ক উঠিবে। সে কারণ অনুসন্ধান করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা আমাদের ভুলিয়াছি। সিংহ যদি একবার নিজের মুখখানা তার প্রাণের আয়নায় মর্ম্মের আলোকরশ্মিতে দেখিতে পায়, তবেই সকল সন্দেহ ঘুচিয়া যায়।

মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য তাহাই। নিজেকে সিংহরূপে চেনা চাই—সাহিত্যের ও কাব্যের চরম কথাও তাই—আপনাকে চেনা চাই।

সেই চেনার ভিতর—সেই প্রাণের মরম-পরিচয়ের ভিতর—যত কথা সব লুকাইয়া থাকে, সেইখানেই যত খেলা। এই প্রাণ-মন-দেহ, এই প্রতিষ্ঠাত্রয় দিয়া নিজকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলে, এই যে আমার মৃণ্ময় ভাণ্ডটি মুহূর্ত্তেই চিন্ময় হইয়া উঠে। মানুষ আত্মস্থ হয়, এই আত্মস্থ অবস্থাই চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদের হইয়াছিল। এই জাগ্রত জীবনের খেলাই তিনি কৃষ্ণলীলার ভিতর দিয়া নিজের প্রাণের মহামিলন-পরিচয়ের মুহূর্ত্তগুলি গানে সুরে সৃষ্টি করিয়া গেছেন। আধুনিক কবিদের মত নিজের প্রাণের সঙ্গে কোন পরিচয় না রাখিয়া, শক্তিহীন সমালোচনার তরঙ্গ-ভঙ্গের ভাবুকতায় হাবুডুবু খাইয়া, শুধু কেবল বালুতটে ফেনা ছড়াইয়া, কীর্ত্তির ফেনা রঙ্গিন করিয়া যান নাই। আধুনিক কবিরা আত্মাকে চোখের সম্মুখে রাখিয়া, প্রেমের মধুর প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। সকল রসের—সকল রূপের সঙ্গে প্রাণমনে সবিকল্প পরিচয় করিয়া আত্মায় আত্মায় রমণে যে আনন্দ, তাহা আস্বাদ করিতে পারেন নাই। প্রাণ সাগরের ওপারে সেই আনন্দলোকে—তাহার কাছেও পঁহুছাইতে পারেন নাই। কেবলমাত্র সমুদ্রপারের তীর হইতে শুক্না সমুদ্র-ফেনা কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া বোঝা ভার করিয়াছেন।

তাই আজ ডাক দিয়া বলিতেছি, হে আমার বাঙ্গলা, আপনাকে চিনিবার সুযোগ আপনিইত হইয়াছে। আত্মা-অশ্বে বল্‌গা দিয়া, এ জীবন-রথকে চালাও, জয় অবশ্যম্ভবী। আজ তোমার ইহাই পথ, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই!—নাই!

আজিকার এই সাহিত্যের দরবারে আমি পুরান কথাটিই আবার বলিতে আসিয়াছি। গীতি-কবিতা কি? গান কি? গীতি-কবিতার প্রাণই বা কি? গানের প্রাণই বা কি? কেননা, বাঙ্গলা দেশে যাহাকে পদাবলী-সাহিত্য বলা হয় বা তাহার পরে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারায় যে সকল পদ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলগুলিই সুরে গান হয়। আমাদের গান ও বিলাতী গীতি-কবিতায় কিছু পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য না বুঝিলে দেশের প্রাণের সঙ্গে ঠিক পরিচয়লাভ হইবে না।

বিলাতী গীতি-কবিতায় কবি বিশ্বের সকল পদার্থকে তাঁহার বুকের ভিতর টানিয়া লন। তাহাই প্রাণের ভাব-রসে সিঞ্চিত করিয়া প্রকাশ করেন। সে প্রকাশে তাঁহাদের নিজত্বের ছাপ দিয়া দেন। তাহাতে হয় এই যে, প্রত্যেক রূপই কবির নিজের ভাবের ছাঁচে গড়া হয়। যে কবির আত্মায় সমস্ত বিশ্বের এই রূপ প্রতিভাত হয়, আর তাহা কবির মনের রূপের ছাঁচে গড়িয়া উঠে, সেই কবির কার্য্যই এই গীতি-কবিতা; কিন্তু এই যে গীতি-কবিতা, ইহা আমাদের দেশীয় নয়।

আমাদের দেশে চণ্ডিদাস হইতে রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালারা কেহই এই গীতি-কবিতা লেখেন নাহি। তাঁহারা রচিয়া গেছেন গান, সেখানে আমরা কবিকে দেখি দ্রষ্টা। ছজনের প্রাণের খেলায় দর্শক হইয়া আনন্দরস ভোগ করিতেছেন। সেই আনন্দের সুরের রসে সব কথাগুলি ভিজান। মানুষের যে প্রাণের প্রকৃতি, সে যেন পাঁজরা ভেদ করিয়া স্বাভাবিকভাবে পাখীর গান গাওয়ার মত গলা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাই হইল—বাঙ্গলা গীতি-কবিতার বা গানের প্রাণ। সেই জন্য আমি বলিতে চাই, বাঙ্গলার প্রাণের ভিতর হইতে গানই বাহির হইয়াছিল, ইংরাজী গীতি-কবিতা হয় নাই। ইংরাজী-প্রমুখ যে বিদেশী সাহিত্য আমাদের দেশে আমদানী হইয়াছে, তাহারই ফল এই:বিলাতী গীতি-কবিতা। এ ধারা বাঙ্গলার নিজস্ব নয়। মনকে, চক্ষুকে, প্রাণকে ঠিক ঐ বৈদেশিক শিক্ষার৲ ছাঁচের ভিতর দিয়া না লইয়া গেলে, ও গীতি-কবিতার ধারা সম্যক্ উপলব্ধি হওয়া দুষ্কর। গীতি-কবিতায় থাকা চাই,—তাহার ভাবের একাত্ম-রস আর সেই রসের একটি পরিপূর্ণস্বরূপ ফুটাইয়া তুলাই তাহার কাজ। যেখানে সেই রস খুব গাঢ় ও খুব অল্প কথা বা ভাবের দ্রুতকম্পনের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইবে, সেইখানে গীতি-কবিতার সার্থকতা। সেই ভাবের ও রস-সৃষ্টির মুহূর্তে যখন কবি তাঁহার নিজের আত্মায় প্রতি-ফলিত আসল রূপের স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখনি তাহা রূপান্তরে পরিণত হয়। আমরা আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই জিনিষটি পাই না ; এ কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। কিন্তু গান যখন আসে, তখন সুর আসে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কথা, শুধু সেই রূপকের—সুরের সেই রূপকে ফুটাইতে সহায়তা করে। সেইখানে সুরের সঙ্গে রসিক কবির আত্মায় স্বানুভূতি জাগে, পরস্পর নিজের মাধুরী আস্বাদন করে, তাহাতেই সুর ও কথা আপনিই আসে। যে গান রসের সৃষ্টমূর্ত্তিকে সুরের রূপে ঢালাই করিয়া দেয়, সেই গানই বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি। ইংরাজী গীতি-কবিতার ভাবের যে দোলন বা গতি প্রকাশ পায়, তাহা প্রায় অধিকাংশই কবির মনের গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাঙ্গলা গান তাহা নয়, তাহার গতি আত্মার আপনার নিজস্ব। তাহার সুরের ও ভাবের মাদকতা জাগে, সেই উন্মত্ততায় সে গানের ধারা সৃষ্টি করে। ইহাই সেই 'স্বাদিতে নিজ মাধুরী'। আমাদের দেশের মেয়েলী-ছড়া, গাথাকে গীতি-কবিতার স্তরে ফেলা যাইতে পারে বটে, তবে তাহার ছাঁচও বস্তুর নিজের সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবির প্রাণের ছাপ নাই, বস্তুর অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় সরস থাকে। এই বিলাতী গীতি-কবিতার আমদানীতে আমরা ঠিক নিজেদের রাখিতে পারি নাই। আমাদের আত্মস্থ হইবার পথে, এই পথ—এই ছাঁচ প্রকাণ্ড অন্তরায়। কেন না, বস্তুর সহিত ইহা আমাদের সম্যক্ পরিচয় করাইয়া দেয় না। একটা কুহেলিকাময় আবরণের ভিতর আমাদের যে নিশ্বাস, তাহা রুদ্ধ হইয়া আসে। এই যে ভাব, ইহা সত্যও নয়, অসত্যও নয়,

জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, এই এক অদ্ভুত অবস্থায় আধুনিক গীতি-কবিতা দাঁড়াইয়াছে। কেন না, মাটীর রসের সঙ্গে সেই দেশের মানুষের দেহের ও মনের রসের একটা অন্তরের মিল আছে। সেই রসের টানে, সেই রসের আবেশে যে মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার দেশের প্রাণের পরিষ্কার নিখুঁত পরিচয় করাইয়া দেয়। বিলাতী Lyricএর আর একটা দিক্ আছে, তাহাতে অনন্তের দিক্ দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু অনন্ত দুইটা হয় না; আপনাকেও দেখাইব, অনন্তকেও দেখাইব, তাহা হয় না। কল্পনা যেখানে মূক, মানুষ সহজেই সেখানে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। একটা কোন স্বচ্ছন্দ পরিষ্কার প্রাণের অনুভূতির কোন রেখাও পড়ে না; কোন রূপের দ্বারাও প্রকাশ করিতে পারে না। বাঙ্গলার কবিতায় চণ্ডিদাস রামপ্রসাদের যুগে, কি কবিওয়ালাদের সময়েও এ ভাব তাঁহারা তাঁহাদের গানে কখনও আনেন নাই। তাঁহারা প্রাণের সঙ্গে প্রাণারামের সাক্ষাৎকার না করিয়া কোন কথা কখনও কহেন নাই।

তাই সেই বাঙ্গলার গান মানুষের জীবনের ধারায় সাধনের পথে আত্মার প্রতিধ্বনি; সে যেন রাগে সুরে মাখামাখি করিয়া তন্ময় হইয়া দুলিয়া উঠিতেছে। আবার সেই আত্মার গভীর নিগম দেশে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রাণের ভাবগুলাকে গলাইয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও যেন গলিয়া রস-নির্ঝর ধারায় ঝরিয়া পড়ে। তাহাই আবার সুরের রঙে, ভাবের রঙে রঙিন হইয়া, এক নূতন জ্যোতির্ম্ময় ধ্যানলোক সৃষ্টি করে সেই ধ্যান-লোকেই কাব্যলোকের রূপান্তরের অনুভূতি হয়।

প্রথম কথা, আদর্শ কি? কাহাকে বলে? আদর্শ সেই পরিপূর্ণ রসের আকর লীলামৃত সুন্দর অনন্তশক্তির আধার শ্রীভগবান্। তিনি নিজেতে নিজেই অধিষ্ঠিত—স্বাধীন, সেই জন্য অনন্ত। লীলার মধ্যে যিনি বিশৃঙ্খলাকেও সুশৃঙ্খলায় লইয়া আসেন, সেই চিদ্‌ঘন-আনন্দ-সুন্দর পুরুষ, জড় ও জীবের যিনি আশ্রয়, লতা-গুল্ম, পশুজীবন, মানবজীবন, গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য্যলোক, মহাব্যোমে অনন্ত-কোটী নক্ষত্র-রাজী যাঁহার খেলার বুদ্‌বুদ্, যিনি প্রতিরূপেই স্বপ্রকাশ, তিনিই এই বিশ্বের আদর্শ। তিনিই সুন্দর, তিনিই কল্যাণ, তাঁহার সৃষ্ট, অনন্ত রূপই সুন্দর এবং সব সৃষ্টিই সেই জন্য সুন্দর। যেখানেই তাঁহার সুন্দররূপের প্রকাশ হয়, সেখানেই উজ্জ্বল বিভার আলোকচ্ছটায় সৌন্দর্য্য শতগুণেই ফুটিয়া উঠে। স্বপ্রকাশ স্বাধীন আত্মার যে অনুভূতি ও সৃষ্টি, তাহাই কল্পকলার রূপসৃষ্টি। আর যে রূপে অনুভূতির আদর্শ ও রূপে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে পূর্ণ সরস হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ রূপান্তর। সেই মুহূর্ত্তেই আমরা চিদানন্দ-ঘন-রসের স্ফূর্ত্তি যে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অনুভব করিতে পারি। সৌন্দর্য্য সেই জন্য সকল রকমের স্বাধীনতার উপরই ফুটে। জীবনের সাধনার ধারায় যখন মন-প্রাণ-দেহের সর্ব্ববাধা-বন্ধনবিহীন ভাবে ও আবেগে অনন্তের দিকে মুখ তুলিয়া চায়।

প্রাণের ভিতর সেই অনুভূতি যখন দেহ-মন-প্রাণে একাকীভূত হয়, তখনই জীবনের রূপান্তর। এ রূপান্তর বুদ্ধের জীবনে হইয়াছিল, যখন বুদ্ধ মহাতপস্যার পর গেহ-কারককে নিজের ভিতরেই চিনিতে পারিলেন। এই রূপান্তর—চণ্ডিদাসের জীবনে হইয়াছিল, যখন তিনি তিমির-অন্ধকার পার হইয়া সহজকে জানিলেন, যখন প্রাণের অনুভূতির কষ্টি-পাথরে 'বিষামৃতের' একত্রে মিলন-রেখা, মরমের দাগে সোনার নিকষের মত দাগ দিল। এই রূপান্তর মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল, যখন সব ঠাঁইয়ে তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফুরণ হইতে লাগিল। এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল, যখন তিনি সত্য জগন্মাতাকে রূপের লীলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেন,অবোধ বালকের মত মায়ের নিকট আবদার করিতেন, কখনও বা তাঁহাকে গালি দিতেন। এই রূপান্তর শ্রীরামকৃষ্ণেও ফুটিয়াছিল। রামপ্রসাদের সাধনা রামকৃষ্ণের ভিতর যেন জীবন্ত রসমূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই যে মানুষের জীবনের ধারায় সাধনাঙ্গের একটা সহজ দিক্ আছে, সেই রূপের পর রূপের অবিরাম রূপস্রোতের অনুভূতি ও সৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষ নিজেকে চিনিয়া ফেলে ;—অমনি রূপের আসল রূপ ধরা যায়।

বাঙ্গলাদেশের এই যে গানের ধারা—এই যে কলাকলার ধারা, যাহাকে জীবনের সাধনাঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেখিতে গেলে ভুল হয়, কেন না, বাঙ্গলা দেশ সাধন-ধর্ম্মের উপরই সকল কর্ম্মের,—সকল সৃষ্টির—সকল কলাকলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের যে সহজ সরল আদর্শ আমাদের প্রাণে ফুটিয়া উঠে, সেই আদর্শ ঐ রূপের মধ্যেই চিত্রে, সুরে, কথায় নানারূপের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ হয়, যেমনই প্রাণে অনুভূতি হয়, অমনি রূপ-সৃষ্টি। এমনি করিয়া রূপের পরে রূপ, মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি, স্রোতের মত লীলাচঞ্চল বারিধি-বুকে লহরে লহরে দুলিয়া উঠে। সেই লীলাতরঙ্গের যে দোলন-রেখা, সেই রেখার লীলার মধ্যে আমিও একটা রেখা, আমার সেই তরঙ্গ, আমার সেই দোলন, আমিও সেই অনন্ত লীলামৃতের মধ্যে রস-রেখায় রসিয়া আছি। আমি কখন এক, কখন বহু ; আবার এই এক ও এই বহুর মাঝে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি। দোল চলিয়াছে, খেলা চলিয়াছে, আমি 'জননি-জননি' আমার দেহ-মন-প্রাণ দিয়া এই রস-সাধন করিতেছি। সেই রস-সাধন যেমন আমার ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের অনুভূতির সঙ্গেই আমার যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বানুভূতি, তাহা হইতেই আমার কলাকলার সৃষ্টি। তখনই প্রাণের ভিতর আদর্শের পরিপূর্ণ রসানুভূতি হয়।

বাঙ্গলা দেশের গান ও চিত্রে সেই অধ্যাত্মসাধনের রূপ ও রূপান্তরই ফুটিয়াছে, তাই আমি সেই গান ও সেই গানের চরিত চিত্রের ধারায় বাঙ্গলা দেশের স্বরূপকে দেখিতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের জীবনে ও নিত্যানন্দের জীবনে যে প্রেমময় রসমূর্ত্তি ফুটিয়াছিল,

নবদ্বীপ সে রূপের তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। ঘরে ঘরে সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা, প্রাত গৃহেই ভক্তের ভগবান্ অধিষ্ঠান করিলেন। প্রতি গৃহই গোবিন্দের মন্দির হইয়া উঠিল। সে অমিয়ভরা হরিধ্বনি মুসলমান-সভ্যতার ছাঁচকে বদল করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্ত-ভাগবত পাঠ করুন, দেখিবেন—আজ ইংরাজী পড়িয়া যে Realism Idealism লইয়া এত মাতামাতি করিতেছেন, তাহার পরিপূর্ণ অনুভূতি ও কল্পকলার প্রতিষ্ঠা তাহাতে হইয়াছে কি না। শ্রীচৈতন্তভাগবতের মধ্যখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বর্ণন পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতেই বৈষ্ণব-পদাবলীর সে রসচিত্রের ও স্বরের খেলা নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা Ideal কি Real, তাহার বিচার করিতে পারেন কি ?

"একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া॥
'কে রে' 'কে রে' বলি ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বোলেন, 'প্রভুর বাড়ী যাই॥'
মদ্যের বিক্ষেপে বোলে কিবা নাম তোর ?
নিত্যানন্দ বোলে অবধূত নাম মোর॥
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
উদ্ধারিব দুই জন হেন আছে মনে।
অতএব নিশাভাগে আইলা সে স্থানে॥
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পরে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সোঙরে॥
দয়া হইল জগাইয়ের রক্ত দেখি মাথে।
আর বার মারিতে ধরিল দুই হাতে॥
কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দঢ়।
দেশান্তরি মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়॥
এড় বড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার॥
আথে ব্যাথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥

নিত্যানন্দ-অঙ্গ সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইয়ের ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে।
চক্র! চক্র! চক্র! প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যাথে চক্র আসি উৎপন্ন হইল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে না দেখিল॥
প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আথে ব্যাথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥"

এই যে বৈষ্ণবের শক্তি ও প্রেমের চিত্র ও চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই প্রেম-ধর্ম্মের স্রোতে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও সাহিত্য-কলকলা গঠিত হইয়াছিল; তাহার পরিচয় আমরা পাই। এই যে চরিত-চিত্র, ইহাকে আপনারা কি বলিবেন? Realism না Idealism এর কলকলা? আমি বলিব এই যে, অভিনব রূপ ও চরিত্র-সৃষ্টি, ইহা বাঙ্গলায়ই সম্ভব, কেননা, ইহা বাঙ্গলায় ঘটিয়াছিল, এবং ইহা বাস্তব সত্য। সেই সত্যের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস অতি নিখুঁত তুলিকায় সংযমের সহিত তাহার সমস্ত ভাবটি ও চিত্রটি একাত্ম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। যখন দরদরধারে রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে, তখনও সেই দুই জনের মাঝে দাঁড়াইয়া 'মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এই দুই শরীর', ইহাতে কি প্রেমের জাগ্রত রূপান্তর হয় নাই? ভগবান্ আমাদের দুই হাত দিয়া আয় আয় বলিয়া ডাকিতেছেন, আমরা কত রকমের খেলাই তাঁহার সঙ্গে খেলিতেছি। কত দুঃখই তাঁহাকে দিতেছি, তবুও প্রেমময় আয়—আবার সেই আয় বলিয়াই ডাকিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দের এ প্রেমলীলা কি ঠিক সেই শ্রীভগবানের আদর্শের অনুভূতির রসে সিঞ্চিত নয়? কোল দিয়া—মার খাইয়া, তেমনি হাসিয়া হাসিয়া খেলা করিতেছেন। নিত্যানন্দের জীবনে সাধনের ধারায় যাহা রূপান্তর হইয়াছে, চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাসের কলকলায় রস-সৃষ্টিতে সেই রূপান্তরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই রস-সাধনার ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভিতরে যথেষ্ট ফুটিয়াছে। সেই জীবনকে আদর্শ করিয়া, মহাপুরুষ-প্রদর্শিত পথে সাধন করিয়া, আত্মার ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে চাহিয়াছে ও কেহ কেহ সেই রূপান্তরের পরিচয় ও জীবনের সাধনের ধারায় ও কলকলার ধারায় গীতিকবিতা ও গানের

সৃষ্টিতে বেশ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সকলেই সেই পরিপূর্ণ আদর্শ সৃষ্টিতে পঁহুছিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের যে মধুর রসের সাধন, তাহার সঙ্গে নিত্যানন্দের এই অপূর্ব্ব সখ্য, দাস্য, বাৎসল্যমিশ্রিত যে অকিঞ্চন সমরস, তাহা আর কোন সাহিত্যে নাই। এই রসসৃষ্টি পরবর্ত্তী নরহরি, নরোত্তম, লোচন, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিরা সেই আদর্শেই নিজেরা সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোকাতীত রূপলাবণ্য, তাঁহার সেই মেঘগম্ভীর স্বর, তাঁহার সেই অসাধারণ অমানুষিক প্রতিভায় সংযম ও হৃদয়ে সমাহৃত অনুপম প্রেম, যে বন্যা বাঙ্গলায় আনিয়াছিল, সে ভাবের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সেই ভাবের ধারায় বাঙ্গলার সাধনার সঙ্গে এক অতি নিগূঢ় যোগ আছে। চণ্ডিদাস ও বৌদ্ধ-সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনার ভিতর দিয়া বাঙ্গলা তাহার এই রস-সাধনা এই সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বজাতি, সর্ব্বলোককে প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গলা তখন মৃদঙ্গের মেঘগুরুনিস্বনে ও হরিধ্বনিতে মুখরিত ছিল। পবনে গগনে সে দিগ্-দিগন্তে প্রেমের বাণীকে বহন করিয়া লইয়া দিত। সেই মহাপ্রেমিক যখন মহাসমুদ্রের বুকে রূপের নৃত্য দেখিয়া, আপনাকে সেই সৌন্দর্য্য-রসসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বলে উদ্বেলিত মহাসাগরের মহাপ্রাণের সঙ্গে যখন একাত্ম হইয়া রূপের স্বরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে মিলাইয়া নির্ব্বিকল্প-মহামিলন লাভ করিয়াছিলেন,—সেই এক চন্দ্রমাশোভিতা নিশা! শ্রীভগবানের রূপের তৃষ্ণা কেমন রূপের ধারার ভিতর দিয়া রূপে রূপে মিলিত হইয়াছিল! সে লীলা, সে খেলা, সে প্রেমের অজেয় তুলনা, কোন দেশের সাহিত্যে মিলিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।

এইটুকু প্রাণে প্রাণে ধরিয়া রাখিতে হইবে যে, এই রূপ, এ সুন্দরের হাসি, তাঁরি রূপ, তাঁরি হাসি, তাঁহারই এই উন্মাদনা, তাঁরই এই উন্মত্ততা, তাঁহারই এই আবেগ, তাঁরই এই আকুলতা। চন্দ্রমাও তাঁহার, আমিও তাঁহার, তিনিও তাঁহার। এ যে রূপে-রূপে মিলন—প্রাণে-প্রাণে মিলন। শ্রীনিত্যানন্দের এই যে উত্তম অধম বিচার না করিয়া, আচণ্ডালে প্রেম বিলাইবার কাহিনী, বাঙ্গলার গানের একটা দিক্, বাঙ্গলার ধর্ম্মসাধনের একটা অঙ্গ, তাঁহার এই লীলায় লীলায়িত।

"ভকতি রতনখনি, উড়াইয়া প্রেমমণি, নিজগুণ সোণায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তারি ঠাঁঞি, দান করে জগত বেড়িয়া॥",

লোচনদাস্ গাইয়াছিলেন—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা, হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া॥"

এই যে অভিমানশূন্য বৈষ্ণবের প্রাণ, এই যে অযাচিত প্রেমদান, এ আদর্শ বাঙ্গলারই নিজের। নিত্যানন্দ অবধূত তাহারি জীবন্ত—জাগ্রত—রূপান্তরে মূর্ত্তপ্রকাশ ছিলেন।

অবশ্য, এ কথা সত্য যে, এই বৈষ্ণব-সাধনা বাঙ্গলার নিজের আত্মার অধ্যাত্মসাধন হইলেও, তাহার একটা গতি আমরা ধরিতে পারি। সকল শক্তির ধারাই এক। একবার করিয়া কূটস্থ, একবার করিয়া কূর্ম্মবৎ সঙ্কোচ, আর একবার করিয়া সম্প্রসারণ। চণ্ডিদাসের জনমের পর যে ভাব, যে প্রেমের সাধন, তাহার সঙ্কোচ হইয়াছিল, আবার সম্প্রসারিত হইয়া শ্রীচৈতন্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল। সেই ভাব বাঙ্গলাকে কাব্যে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে সকল রূপের সৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, আবার সঙ্কুচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়েই, বাঙ্গলার সকল সমৃদ্ধি ছিল, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

তাহার পর একটা যুগ আলো ও অন্ধকারে কাটিল। শক্তি আবার কূর্ম্মবৎ সঙ্কোচে পরিণত হইল। শাক্ত ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ, জাতির নানারূপ হীনতার মধ্যে মুসলমানের অত্যাচার, সব মিলিয়া দেশ আবার অন্ধকারে ডুবিয়াছিল; নিবিড় তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার!

সেই অন্ধকারের মাঝেই রামপ্রসাদ আসিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে আবার মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, রামেশ্বর বাঙ্গলার কাব্যের ধারাকে অন্য দিকে পুষ্ট করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গলার প্রাণের গানের সুর তখন মিলাইয়া আসিয়াছিল। রামেশ্বরের শিবায়ন অনেকটা বাঙ্গলা যাত্রার পূর্ব্বাভাস বলিলেও বলা যায়। কিন্তু রামপ্রসাদের কালী-কীর্ত্তন ও রামপ্রসাদের যে গান, তাহার তুলনা হয় না। বাঙ্গলা আবার সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। এই মুসলমান-প্রভাবের মধ্যেই ভারতচন্দ্রের জন্ম।

এই যে কাল ও কালধর্ম্ম, তাহার মধ্যে আমরা একটা সত্য ধরিতে পারিতেছি। বাঙ্গলার যে খাঁটি প্রাণ, বাঙ্গলার বাঙ্গালীজাতির যে বৈশিষ্ট্যের ধারা, তাহার প্রাণ-ধারাকে লইয়া চলিয়াছে, তাহারও একটা স্রোত চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় মুসলমানী রাজার যে বিজাতীয় সভ্যতা, তাহার দ্বারা অভিষিক্ত যে ধারা, তাহাও চলিয়াছে। বাঙ্গালীজাতির খাঁটি কবি রামপ্রসাদ, আর বাঙ্গালী জাতির অখাঁটি কবি বা মুসলমানী সভ্যতার ধারায় কবি ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের ক্ষমতা অসাধারণ হইলেও, তাঁহার কাব্য সুন্দর হইলেও তাহার মধ্যে বিজাতীয় ভাব, হাবভাব, ধারা-ধরণ ছিল ও আছে। রামপ্রসাদের ভিতর হিন্দুর পৌরাণিক সত্য-সংস্কারজনিত প্রাণের পরিচয় আছে। এক দিকে মুসলমান বাঙ্গালী কবি আলোয়ালের পদ্মাবতী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মাঝে, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্ত্তন সেই যুগের দুই ধারাকে স্রোতের মত লইয়া গেছে; কিন্তু দুই স্রোত গঙ্গা-যমুনার মত মিলিতে পারে নাই, পারিবেও না। বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায়, বৈশিষ্ট্যই ভগবানের অভিপ্রেত! বিশেষেই রূপ সৃষ্ট হয়।

রামপ্রসাদ কালী-কীর্ত্তনের প্রথমেই গাইলেন,—

"গিরিবর ! আর পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আমি পারি নে হে প্রবোধ দিতে উমারে॥

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী
যেতে চায় না জানি কোথা রে॥
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে॥"
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহা সুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্য-পুঞ্জচয়
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক-উপরে ॥"

এই বাৎসল্য-রসের চিত্র ও গানটিকে এই ফেরঙ্গ-যুগে যোয়ো কবিতা বলিয়া ব্যঙ্গ করা সহজ, কিন্তু যাঁহারা সত্য মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও বাৎসল্য-রস জীবনে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া প্রাণের ভিতর অনুভূতিতে সে রস-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহার তুলনা কেহ দিতে পারে না। প্রথম ইহা সত্যই বাঙ্গলার নিতান্ত ঘরের ছবি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহা ঘর ছাড়িয়া আসল ঘরেরও ছবি। আমরা প্রথম হইতেই এই গানটিকে সকল দিক্ দিয়া দেখিতে চাই।

গিরিরাণী মেনকা গিরিবরকে ডাকিয়া কহিতেছেন, "ওগো, আমি যে আর উমাকে প্রবোধ দিতে পারিনা", শুধু এই প্রথম ছত্রটি পড়িলেই বুঝা যায়, ইহাতে রাণী মেনকার স্নেহ, বাৎসল্য, মধুর রসের যে বেদনা, তাহার সুরেতে যে প্রতি অক্ষরেই মাখামাখি। তাহার পরের চিত্র সন্তানের অভীষ্ট বস্তু না পাওয়ার জন্ত মেয়ের সেই অভিমান, ঠোঁট-ফুলাইয়া কান্না, স্তন হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া, এ সকল দিক্ কেমন অঙ্কিত জীবন্ত চিত্রের মত ফুটিয়াছে, সন্তান যেমন হাত বাড়াইয়া চাঁদের পানে চায় আর কাঁদে। এই কয়টি ছত্রের পর পুনর্ব্বার—

'আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে'

এইটা ফিরিয়া আর একবার বলায়, মার বেদনার গভীরতা কেমন ব্যক্ত হইয়াছে। তার পর,—'আয় আয়, মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথারে।'

এইখানে আমরা আর একটি নূতন রহস্য পাই, মেয়ে মা মা বলিয়া অঙ্গুলী ধরিয়া, যখন চাঁদের দিকে দেখায়, সেই হাত বাড়াইয়া দেখার ভিতর সেই ছোট মেয়েটির প্রাণের ভিতর যে রূপের ডাক, তার তৃষ্ণা, সেই পথে মিলিবার অজানিত আশা ও শব্দহীন ভাষা, তাহার ভিতর মেনকা রাণী তাঁহার বুদ্ধির দ্বারা 'কোথা যেতে চায়', ইহা ভাবিয়া পাইলেন না। কোন্ অজানিত মহাশূন্যের পানে এই ছোট মেয়ের প্রাণ ধায় কেন, তাহা মেনকা নিজের মনে মনে ঠিক ধরিতে পারেন নাই। তাই তিনি 'চাঁদ কি রে ধরা যায়' বলিলে, সে দুরন্ত মেয়ের মত বসন-ভূষণ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মা মেনকা তখন যেন আর সামলাইতে পারিলেন না। পিতা গিরিবর উঠিয়া কন্যাকে ভুলাইলেন। মুকুরে মুখ দেখিয়া মা উমা তখন শান্ত হইল। তখন দ্রষ্টা শ্রীরামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

'জগজ্জননী যার ঘরে।'

মেয়ের মুখ দেখিয়া সেই বিশ্বমাতার রূপের কল্পনা ও ধ্যান মনে পড়িল। শুধু মনে পড়িল নয়, জাতির জীবনের ধারায় যে পৌরাণিকী কল্পনা, আজও পর্য্যন্ত তাহার মেরুদণ্ড হইয়া আছে, তাহার ভিতর দিয়া সেই জগন্মাতার ভাবটিকেও মিলাইয়াছেন। তাহার পর মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িল। এই যে বাৎসল্য-রসের ছবি, ইহা বাঙ্গলার ঘোরো রস হইলেও ইহার 'বিশ্ব'মোহ নাই। বাঙ্গলার জাত মারা যায় নাই। বাঙ্গলার সকল রং গঠন, হাব-ভাব সকলই আছে, অথচ কাব্যের, গানের যে প্রাণ, যেরূপ রূপান্তর, তাহাও হইয়াছে। যখন পেটের মেয়ের মুখে বিশ্বমায়ের রূপ এমনি করিয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই রূপান্তর হয়।

আমি তুলনায় সমালোচনা করিতে চাই না। আমি আধুনিক বাৎসল্য-রসের একটি বাঙ্গলা কবিতায় প্রাণ এমনি করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে চাই।

খোকা মায়ে শুধায় ডেকে,
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?
মা শুনে কন হেসে কেঁদে,
খোকারে তার বুকে বেঁধে,
ইচ্ছা হয়েছিলি মনের মাঝারে !
ছিলি আমার পুতুল খেলায়,
ভোরে শিব-পূজার বেলায়,
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি !
তুই আমার ঠাকুরের সনে,
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।
যৌবনেতে যখন হিয়া—
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে।
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে,
জড়িয়েছিলি সঙ্গে সঙ্গে,
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে—
সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সম বয়সী।
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে,
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে,
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।

এ সকল ছত্রের ভিতর এবার আমরা দেখিব যে, বাৎসল্য-রস কেমন ফুটিয়াছে। অবশ্য, ইহাতে ঘোরো বাৎসল্য-রস নাই,—কিন্তু ঘোরাল রকমের রস আছে বটে। এখন দেখিতে চাই, এর কি রকম বাৎসল্য-রস ! মাতা তাহার সন্তানকে বলিতেছে,—

'ইচ্ছা হয়েছিলি মনের মাঝারে।'

কোন খোকা আজও পর্য্যন্ত

'এলেম আমি কোথায় থেকে
কোন খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'

বলিতে পারে কি না জানি না। ইহাতে কবি বোধ হয়, বুড়ো খোকার মত আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি তাহার জবাবগুলিও মায়ের মুখে তাঁহার নিজের বুলি বসাইয়া দিয়াছেন। আমি যাহাকে ইংরাজী গীতি-কবিতার কথা বলিয়াছি, ইহা সেই বিলাতী ছাঁচে তৈরী। ঋগ্বেদের ১২৯ সূক্তের ৪এর শ্লোকে আছে,—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" সর্ব্বপ্রথমে ইচ্ছার আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে মনের প্রথম উৎপত্তি-কারণ নির্গত হইল।

রমেশচন্দ্র দত্ত ইহার বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিয়া গেছেন। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্কের চালনার দ্বারা এই ইচ্ছার স্থানে মায়ের মুখে প্রজাপতি ঋষির বাক্যটি বসাইয়া দেওয়া খুব অসম্ভবও নয়। কেন না, বেদ তাহার পরে বলিতেছেন যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অবিদ্যমা বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন—আশ্চর্য্য নয়!

বিশ্বমায়ের অন্তরের ভিতর মা হইবার ইচ্ছা অথবা মায়ের অন্তরের মা হইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে, এবং নারী তাহার নারী-জন্মের সংস্কারগত বুদ্ধিতে এ কথা মনে করিতে যে পারে, তাহা বলিতে পারেন। তবে তাহাকে এই ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম করিবার বুদ্ধি মায়ের মধ্যে থাকে কি?

তাহার পর কবি যতগুলি শ্লোক রচিয়াছেন, সবগুলির ভিতর কোন একটিতেও মার কথা নাই। মায়ের মুখের দার্শনিক কবির বুদ্ধির ভাষা ছন্দে গাঁথা। ইহাতে বাৎসল্য-রসের গভীরতা দূরে থাকুক, রসিকজন ইহাতে বুদ্ধির খেলাই দেখিতে পান, রসের কোন আভাসই পান না। যৌবনে মাতার অঙ্গে অঙ্গে সৌরভের মত মিলিয়া থাকা, নিত্যকালের পুরাতন হওয়া, জগতে স্বপ্ন হইতে এই আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া আবার তাহার পর মায়ের খোকা রূপে ফুটিয়া উঠা একটা বুদ্ধির কারচুপি হইতে পারে, ইংরাজী সাহিত্যের ধারার বুদ্ধি-রস হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে বাৎসল্য রস বলে না। যে বাঙ্গালী সত্য পিতা হইয়াছে, যে বাঙ্গালী সত্য মাতা হইয়াছে, সে এমন করিয়া ভাবেও না, মনেও করে না। তারপর কবি ঐ কবিতার শেষে বলিতেছেন,—

> জানিনে কোন মায়ার কেঁদে
> বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
> আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে!

এই শেষ কয় ছত্রে একটা সত্যই মায়ের প্রাণের ভাবের কথা বটে, তাহা অস্বীকার করি না, বিশ্বের ধন বলিয়া সন্তানকে মনে করা খুব অসম্ভবও নয়, তবে

কোন স্বাভাবিক মাতাই নিজের ছেলেকে 'বিশ্বের ধন' মনে করে না। 'জগতের সেরা মাণিক' মনে করিতে পারে, কিম্বা সন্তানের মুখে ভগবানের সৃষ্টিসম্পর্কের গূঢ় বাৎসল্য রস প্রাণে প্রাণে জানিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকাশ এরূপ নহে। ইহার আগাগোড়াই কবিতা নয়, রস নয়, বুদ্ধির দ্বারা, ছন্দের দ্বারা জোর করিয়া কবিতার প্রাণ সৃষ্টি করিয়া তোলা। ইহা বাঙ্গালার গান, রাগিনী, কবিতা নয়;—তাই আবার বলিতে হয় যে, বুদ্ধিমান অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন।

এই ধরায় যে আমরা স্বর্গের কল্পনা ও আভাস পাই, পরিপূর্ণ আনন্দের উচ্ছল ধারায় নিজেরা আর্দ্র হইয়া যাই, এমন করিয়া সেই গলাইয়া মজাইতে পারে শুধু প্রেম। প্রেমেই সেই সুরের ধ্যানে আমাদের এই সুখ-দুঃখ-সিঞ্চিত জীবনকে সত্য জীবন করিয়া তুলে। পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে সত্য বস্তু দেখি প্রেম—মানুষের প্রেম। রামপ্রসাদের গানে আমরা দেখাইয়াছি যে, এই মানুষের যে প্রেম, এই মানুষের যে বাৎসল্য, এই মানুষের যে মাতৃত্ব, তাহার সঙ্গে জগন্মাতার যে ভাব, সে সত্য অনুভূতি, রূপে, ভাষায়, সুরে রামপ্রসাদের গানে ফুটিয়াছে, তাহা এই আধুনিক শিশু কবিতার জন্মকথায় নাই, থাকিতেই পারে না। কেন না, মাতার প্রাণের পরিচয় ইহাতে নাই, আছে শুধু জ্ঞানের বোঝা তাহার দার্শনিক তত্ত্ব, মাতার যৌবনের সৌরভের স্মৃতি আর যে রহস্যের নিগূঢ় পরিচয় দিয়াছেন, সেই রহস্যের কথা।

'সবার ছিলি আমার হলি কেমনে?'

এই যে রহস্যের ভিতর এক প্রশ্ন তুলিয়া খাড়া করা, এ রহস্য জগতের সকল রহস্যে মিলাইয়া দেখার মত ভাব, কবির নিজস্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুসন্ধানের পরিচয় হইতে পারে, ইহাকে রহস্য-রস বলা যাইতে পারে। এত বিচার বিপত্তি মা'র হয় না। মাতা সন্তানের মুখে বিশ্বের সকল পরিচয়ই পাইতে পারেন ও বিশ্বের মধ্যে সন্তানের সকল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কগুলাও দেখিতে পারেন; কিন্তু তাহা এমন বিচার করা পর্দ্দা-ঠিক-করা শুষ্ক জ্ঞানের মধ্য দিয়া নয়, সে মাধুর্য্য আর এক রসের ধারা। সেই রসেই বাঙ্গলার জাত বজায় থাকে ও আছে; এই আধুনিক কবিতায় বাঙ্গলার জাত মারা গিয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিতায় এমন করিয়া আমাদের জাত হারাইতে আমরা প্রস্তুত নহি। আর একটা কথা, রামপ্রসাদের ঐ গানে শুধু বাৎসল্য-রস নহে, মধুর রসের ভিতর, যুগল সম্বন্ধের ভিতর বাৎসল্য কেমন অঙ্গাঙ্গি-ভাবে ফুটিয়াছে, তাহা একটু মনকে ঠিক রাখিয়া দেখিলে বুঝিবার অসুবিধা হইবেও না। দেশভেদে মানুষের যেমন চেহারার পার্থক্য আছে, বিশিষ্ট জাতি আছে, তেমনি কবিতারও জাতি আছে।

ইহা ত গেল বাঙ্গলার খাঁটী কবি রামপ্রসাদ ; ইহাকে অবশ্য বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেহ ফেলিবেন না ; কিন্তু বাঙ্গলার কবি-চিন্তামণি চণ্ডিদাসের যশোদার বাৎসল্য সম্বন্ধে একটি গান আছে। সেটি এই :—

"তুমি মোর প্রাণ-পুতলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি ॥
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন
পাইয়া আনন্দ বড়ি।
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দ-হিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি ॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।
আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা ॥
মরু যেন যত ধেনু গাই
তোমার বালাই লয়ে।
কালি হ'তে বাপু ধেনু গোঠ মাঠ
না পাঠাব বন দিয়ে ॥
কি বলিব নন্দ তোমার যুকতি
কানু পাঠাইয়া বনে।
না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে ॥
বনে ভয়ঙ্কর বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দ্দুল ভুজঙ্গ রহে।
জানি বা কখন করয়ে দংশন
এ বড়ি বিষম মোহে ॥
আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি ॥

চণ্ডীদাস বলে অতি বড় স্নেহ
দেখিল যশোদা মায়।
এ না কভু শুনি জগতে না দেখি
জগতে এ যশ গায়॥"

ইহাও সেই ঘোরো বাৎসল্য-রস, তাহা ঠিক, কিন্তু এ ছাড়িয়া যে কখন বাৎসল্য হয় না, তাহাও ঠিক।

"আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি॥"

মাতৃ-হৃদয়ের ভিতরের যে কথা, তাহা কি ব্যক্ত হয় নাই? খাঁটী বাঙ্গলা ভাষায় ছেলের "ভাল মন্দ কিছু হওয়া" মা ছেলের সম্পর্কে সে কি প্রাণের অন্তরতম রসের কথা ফুটিয়া উঠে; তাহা যে মাকে জানে, সেই সে বুঝে। যে জানে না, তাহার বুঝিবার উপায় মার আশীর্ব্বাদ। আধুনিক কবিতায় যে ছত্র দুইটিতে—

"হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই
কেঁদে মরি একটু স'রে দাঁড়ালে!"

আর চণ্ডিদাসের—

"আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।"

এই দুই শ্লোকের সঙ্গে যে ভাবের মিলন আছে, তাহাতে কি প্রমাণ হয় না, বৈষ্ণবের বাৎসল্য সজীব—সত্যি নাড়ী-কাটার ব্যথার সাড়া? ইহাতে মাতার যৌবন-স্মৃতি সুরভি মার মনের মধ্যেই আছে, ছেলেকে সে কথা জানাইবার অবসর হয় নাই। সন্তানকে পাইয়া মার মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইয়া মাতৃত্বের সার্থকতা হইয়াছে, মা দার্শনিকতা করিয়া কবির মুখে তাহার জন্মকথা কহিবার অবসর পান নাই।

চণ্ডিদাসের যশোদা ও রামপ্রসাদের গিরিরাণী এই দুই চরিত-চিত্রের যে রঙ তাহা খাঁটী বাঙ্গালী মায়ের রঙে অঙ্কিত। মায়ের মুখের অঙ্কন, তাঁহার মুখের কথা কটি শুনিলেই তাহা বেশ কেমন আমাদের বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করে, মায়ের মতই মনে হয়। 'কোথা হইতে?' বা 'কোথায়?' এ সব প্রশ্ন তাহার

মধ্যে পরিস্ফুট ব্যঞ্জনা না থাকিতে পারে। এখানে ভবিষ্যৎ ও অতীত বর্ত্তমানের মাতৃত্বেই পূর্ণতমরূপে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাতেই ডুবিয়া গেছে। এখানে জীবন মাতৃত্বে ও বাৎসল্যের মধুর রস-মুহূর্ত্তে কেন্দ্রগত স্থির ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল। এই প্রেমের চেয়ে সুন্দর কি আছে, এই মাতৃত্বের মত পূর্ণতা আর কি আছে? 'কোথা হইতে' ও 'কোথায়' ছেলের মুখের রূপ দেখিয়া মায়ের মনে ঠিক ঐ ভাবের রস ফুটে, এমন ত কখন মনে হয় না।

তাহার পর রামপ্রসাদের গান আমরা কয় ভাগে ভাগ করিতে পারি। কালী-কীর্ত্তন, শিবসঙ্গীত, কৃষ্ণসঙ্গীত ও তত্ত্বসঙ্গীত। রামপ্রসাদ তাহা ছাড়া বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য অনেক রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার গীতি-কবিতার এই দ্বিতীয় পল্লবে আমরা রামপ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। আজু গোঁসাই, রাম দুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই যে ফেরঙ্গ কবিতা বাঙ্গলার এবং মানুষের খাঁটী মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া তৈয়ারী হইল, তাহার গুরু কে? তাহার গুরু রামমোহন রায়। "জবরদস্ত মৌলবী" রামমোহন বাল্য হইতে আরবী ফারসী পড়িয়া যে ছাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ছাপে বাঙ্গলার ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া সমাজ-সংস্কারক রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্ম-সমাজ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা একসঙ্গে যেমন নমাজ পড়ে, সেই অনুকরণে সমাজ গড়িলেন। পৌত্তলিকতার উপর এত বড় চোট দিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর অযথা অন্যায় বিচার করিলেন। অবশ্য, এ কথা মানি যে, বৈষ্ণব তখন শুক্‌না মালার ঠকঠকিতে পরিণত হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের তান্ত্রিক সাধনাঙ্গের ধারাও তখন কিছু বিশুদ্ধ ছিল না, অথচ রামমোহনের গ্রন্থাদি হইতে বৈষ্ণবের প্রতি অযথা বিদ্বেষ ও সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার প্রতি অযথা আসক্তি,—এ সকলের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। এমন কি, এই দুই সাধন-পদ্ধতির সমালোচনায় তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদিগের জাত তুলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই। যদি বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবদেবী—চরিত্রের দুর্গতিই রামমোহনের আবির্ভাবের কারণ হয়,—যেমন আধুনিক কালের কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অতি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন,—তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে, রামমোহনের দ্বারা সে নষ্ট-ধর্ম্ম ও লুপ্ত দেবদেবী-চরিত্রের উদ্ধার সাধন বা সময়োপযোগী কোন সমন্বয়ই সাধিত হয় নাই। যাহা রামমোহনের প্রায় শতাব্দী কাল পরে পূতপ্রবাহিনী গঙ্গার তীরে তীরে কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে তাহার আভাস, তাহার উন্মেষ, তাহার বিকাশ, তাহার প্রতিষ্ঠা, তাঁহাদের জীবনে সেই মহাপ্রাণের প্রতিষ্ঠা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু রামমোহনে তাহা ছিল না,—হয় নাই।

তাই আমার মনে হয় যে, রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গালার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। কেন না বাঙ্গলার নিজস্ব যে বৈষ্ণব ভাব যাহা বাঙ্গলার প্রাণকে ধর্ম্মকে জাতিকে সমাজকে সকল রকমে বাঙ্গলার সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন—মায়াবাদী বেদান্ত ও কোরাণের সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রকে বেশ করিয়া গুলাইয়া দিলেন। অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী রামমোহন তাহার বুদ্ধির অসামান্ত প্রতিভার ঘোরতর মল্ল যুদ্ধ দেখাইয়া গেছেন একথা অস্বীকার করিতে পারিব না। তবে এই কথা বলিতে আমি বাধ্য হইব যে, খৃষ্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুর হইয়া তিনি যতই তর্ক করুন না কেন, এই ফেরঙ্গ আসিত না,—কখনই আসিত না, বাঙ্গলার ভাষাকে ইংরাজী করিতে পারিত না, বাঙ্গলার ভাবকে কখন ফেরঙ্গ করিতে পারিত না,—যদি তিনি, আমাদের দেশের সাধনাকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেন ও করিয়া ইংরাজি সভ্যতা সাধনা এমন করিয়া ছুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন।

রামমোহনের আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার সাহিত্য, ধর্ম্ম ও গান রামপ্রসাদের সুরে—তাঁহার আদর্শে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ঠিক যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন—রামপ্রসাদ যে সুর গাহিয়া গেলেন, রামমোহন ঠিক তার উল্‌টা সুর ধরিলেন। রামমোহন গান করিলেন,—

"অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর কর॥"

আর রামপ্রসাদের গানের সুর এই একটি গানে বেশ বুঝা যাইবে।

"আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয়-পদ সার করেছি, ভবে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌বো না গো। ১
ধনলোভে মত্ত হোয়ে দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো,
আশা-রাহুগ্রস্ত হোয়ে, মনের কথা খুল্‌বো না গো॥ ২
মায়া-পাশে বদ্ধ হোয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো,
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো॥"

ইহার সঙ্গে চণ্ডিদাসের,—

"সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি,
দুখ যায় তারি ঠাঁই।"

তুলনা কতক হইতে পারে, ভাবের ধারা দুই জনের একই পথে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু রামমোহনের গান, গান নহে, জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের ঔষধ গেলান।

রামপ্রসাদের পর বাঙ্গলায় আর খাঁটী বাঙ্গালীর কবি জন্মে নাই। রামপ্রসাদ এই জগৎকে যেমন সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বের প্রাণকে যেমন মাতৃরূপে, জননীর মাতৃত্বের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলেন, নিজের প্রাণকে যেমন মাতৃত্বের রূপান্তরে লইয়া গিয়া, আপনি আত্মস্থ হইয়া তাহাতে নিজেকে ও নিজের প্রাণকে, বিশ্ব-মাতাকে এক করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁহার রচিত আগমনী ও বিজয়া। বাঙ্গলাদেশে, বাঙ্গলাভাষায় তাহার আগে বা পরে, অমন আগমনী কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। আজিও বাঙ্গলার পল্লী-গৃহে, সহরের কোলাহলের মাঝে শরতে মহামায়ার সে আগমনী, পরিপূর্ণ সুরে দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ গাইয়া বেড়াইতেছে।

রামপ্রসাদের গানের ভিতর প্রেমের, মানুষের প্রেমের যে রূপান্তর হইয়াছিল, তাহার কাছে বিশ্বের দর্শনাদি প্রতিপাদ্য গ্রন্থের বোঝা ও জ্ঞান গোষ্পদের তুল্য। মানুষ যখন প্রেমের ভিতর দিয়া স্বাধীন হয়, মিলিত হয়, তখন সে নির্ব্বাণ-মুক্তি চায় না, সে তখন তাহার প্রিয়তমের সহিত প্রাণের লীলাভঙ্গে আনন্দরস ভোগ করে—কে তখন তোমার মায়াবাদের সূত্র প্রতিপাদ্যের ধার ধারে। তাই রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন,—

"চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি।"

ইহার সঙ্গে মহাপ্রভুর,—

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবদাত্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি" মিলাইয়া একই সুরের, একই ভাবের, একই স্রোতের টানে চলিয়াছে—

বাঙ্গলার শাক্ত রামপ্রসাদের প্রেম-ভক্তি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ভক্তির ধারা, বাঙ্গলার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। বাঙ্গলার প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল।

রামমোহনের বৈষ্ণব-বিদ্বেষের কথা তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে অনেক পাওয়া যায়, সেই সকল প্রমাণ তুলিয়া দেখান বাহুল্য ভয়ে আমরা দেখাইলাম না। দু'একটা স্থান দেখাইলেই সুধীজন তাহা সম্যক্‌প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"* * * যে বালিশে পৃষ্ঠ প্রদান ও তাম্রকূট পানপূর্ব্বক আপন আপন ইষ্টদেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করাইয়া আমোদ করা কোন্ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? এবং দুর্জ্জয় মানভঙ্গ যাত্রায় নাপিতানীর বেশ ইষ্টদেবতার করা কোন্ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? ও বেসো, কেসো, বড়াই বুড়ী ইত্যাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার উপহাস করা কোন্ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়?"

রামমোহন রায় আজ নাই। রামমোহনের তর্ক-বিচার-ক্ষমতার কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না ও আমরাও করি না। কিন্তু প্রাণের অনুভূতির কাছে এই তর্ক-বিচার ও শাস্ত্রমীমাংসা গোষ্পদের সঙ্গে তুলনীয়। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে মায়া নয়, আর ইষ্টদেবতা, ভগবান্ যে এই আমাদেরই মত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া লীলার মধ্যে আনন্দ-ঘন চিন্ময়-রস আস্বাদন করিতেছেন, শঙ্করশিষ্য রামমোহন তাহা বুঝেন নাই। শাস্ত্রদর্শী রামমোহন তখনও রামানুজ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাহা হইলে তাঁহার এই মায়াবাদেরও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে বাঙ্গলার শিরোমণি; তাঁহার পাণ্ডিত্যও কম ছিল না, শাস্ত্র ঘাঁটিতে তিনিও বিশেষ মজবুত ছিলেন, সকলের অপেক্ষা বড় কথা, আসল কথা, খাঁটী কথা এই যে, এই সব শাস্ত্রের অনুশীলনের উপরে যে প্রেমের সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাহা রামমোহনের ছিল না। আর সেই কারণেই দেশকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

আশা করি, রামমোহনের এই বেদান্তী মায়াবাদী ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির প্রাসাদের সমস্ত খিলান আলোচনা করিয়া সুধীজন দেখিবেন। আরব, পারস্ত ও তুরস্কের মুসলমানী, দাক্ষিণাত্যি সভ্যতা ও বেদান্ত-মিশ্রিত খিচুড়ীর উপর ফেরঙ্গ ভাবা ও ফেরঙ্গ যুগ-আনয়নকারী রামমোহনকে বুঝিলে দেশের অনেকটা মঙ্গল হইবে, এবং তবেই আমরা এই ফেরঙ্গযুগকে সমূলে পরিবর্ত্তন করিতে পারিব। কবির গাইয়াছেন,—

"বহুত্তক সাহস করো জিয় আপনা।
তেহি সহবাসে ভেট না সপনা॥"

জীবনে বহুতর সাহস কর, সেই প্রাণপতির সহবাসের খেলাই চলিতেছে। এ জীবন স্বপ্ন নয়,—সত্য। মায়া নহে, মিথ্যা নহে। অণু-পরমাণু হইতে বিরাট্ বিশ্ব সব সত্য, সবই তাঁর রূপ। ইহাই সত্য। এই সত্য হারাইয়াছি। মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, পুরুষত্ব হারাইয়া এই স্ত্রী-জন-সুলভ আধুনিক দুর্ব্বল প্রেমের সাহিত্যে মসগুল্ হইতেছি। আমাদের নিজেদের উপর, আমাদের নিজেদের জীবনের উপর সে বিশ্বাস, সে আত্মনির্ভর হারাইয়াছি। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঐ যে চাষা মাটীর সঙ্গে কেমন করিয়া প্রাণ দিয়া পরিচয় লাভ করিতেছে, তাহা বুঝিবার কোনও সাধনা নাই। দেখিতেছি ধানের ক্ষেতের দোলা, আর ঐ আকাশের মেঘের রঙ। কিন্তু তাহার জীবনের পৃষ্ঠা আমাদের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের,—এই খোস-পোষাকী কর্পূর-সাহিত্যের,—এই শূন্য বিশ্বের দিকে উবিয়া যাইবার জন্ত ব্যস্ত যে, বিশ্ব-সাহিত্য—তাহার পৃষ্ঠে কিছু ফুটাইতে পারিয়াছ কি? তাহাদের প্রাণের ভাবাভাব, সুখ দুঃখ, তাহাদের যে বিচিত্র রূপের লীলা, তাহা কি কখন একদিনের, এক মুহূর্ত্তের অনুভূতিতে আনিতে পারিয়াছ? বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা ত দূরের কথা—সে সাধনা, সে সাধনের পথে যাহারা যায় নাই, তাহারা তো তাহা কোন

রূপেই প্রাণের অনুভূতিতে আনিতে পারিবে না। যদি পারিতে, তাহা হইলে মা'র, এ সাহিত্য-মায়ের অঞ্চলে অমনি সোনা ফলাইতে পারিতে, তোমাদের মানব-জন্ম এমন পতিত জমির কাঁটা ও ঘাসে ভরিয়া যাইত না; আবাদ করিলে সোণা ফলিত। শুধু তাহার আকাশ ও বাতাস তোমার প্রাণে বাঁশী বাজাইত না। তাহার প্রাণের রাগিণী তোমার বাঁশরীতে প্রাণময় সুরের রূপ ধরিয়া দেখা দিত। সুরের আবীর হাওয়ায় হানিতে হইত না। তাহার তীব্র বেদনা আকাশ ফাটাইয়া ফুকারিয়া উঠিত। নকল করিয়া এমন নাকাল হইতে হইত না। জীবন আপনি তোমাদের কাছে ধরা দিত। সাহিত্য ও জীবনে কখন ছলনা চলে না। জীবন লইয়া আজ সাহিত্যের বাজারে যে খেলা চলিতেছে, এ খেলা নয়; নবযৌবনের দলের লীলা নয়; ইহা বিলাতী Coquetry জীবনের সঙ্গে প্রাণের ছলা।

বাঙ্গলার অঙ্গনে এই একটা সুন্দর অদ্ভুত ধারা দেখিলাম। সে মুসলমানী ধারার পাশে যেমন রামপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাঙ্গলার প্রাণের স্রোতকে অনাবিলভাবে বহাইয়া লইয়া গেছেন, ঠিক তেমনি রামমোহনের সময়ে কবিওয়ালার দল, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী প্রভৃতি বাঙ্গলার খাঁটী কবির দল সেই সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। এই কবিওয়ালাদের গানের যুগের কথা আমি আর একবার বলিতে চেষ্টা করিব। কবিওয়ালাদের শেষভাগে ঈশ্বর গুপ্তের যে হাস্যরস, তাহার কথাও কহিব।

এই ফেরঙ্গ যুগের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণের এক বিরোধ পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যুগে যুগে সে একবার করিয়া সচকিত হইয়া নিজের মূর্ত্তিকে জাগাইয়া তোলে, মুসলমান যুগেও তাহাই করিয়াছিল, আজ ফেরঙ্গ যুগেও তাহাই করিতেছে। একদিকে মুসলমান-ফেরঙ্গ-ধারা আর অন্যদিকে বাঙ্গলার নিজের ধারা। কবে মাটী আবার সেই ধারার মূর্ত্ত পুরুষকে জনম দিবে, তাহারই আশায় বসিয়া আছি।

অন্ধকার আকাশ, আকাশে তারা নাই, দেশবাসী অসহ্যরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে তমসাচ্ছন্ন অবসাদ। একদিকে এই অন্ধপের বিশ্ব-মোহ, তাহার সে জ্ঞান নাই, তাহার ভবিষ্যৎ নাই, অতীত নাই—সব গিয়াছে। সংসার জ্বালাময়। সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, কোথায় বাঙ্গলার আত্মা! জাগরিত হও, বল—সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর, বল এই রূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল—আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব। আমার জীবন আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচনা করিব। গ্রহ-নক্ষত্রে জ্যোতিষ্কের দূরাগত পদধ্বনি কাণে আসিতেছে, বাঙ্গলা এ মিথ্যা রূপক ত্যাগ করিবেই করিবে। হে বাঙ্গলার সন্তান! মুখ তোল, সত্যকে—জীবনকে মুখোমুখি দেখ, ভাল করিয়া পরিচয় করিয়া লও, দেখ, ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, বিশ্বাস ও প্রেম বুকের ভিতর, ভবিষ্যৎ আমাদেরই।

দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য

সেকালের সব রাজাদের, সব বড় মানুষের এক এক জন ভাঁড় থাকিত। তাহার সংস্কৃত নাম বিদূষক। ব্রাহ্মণের ছেলে, লেখা-পড়া শিখে নাই, সংস্কৃত পড়ে নাই, সংস্কৃত বলিতে পারে না। অথচ সহবৎ ভাল, আচার ব্যবহার ভাল, কথাবার্ত্তা, চাল-চলন, বসা-দাঁড়ান, সব ভদ্রলোকের মত; এমন কি, ব্রাহ্মণের মত। ক্ষুধাও ব্রাহ্মণের মত, আহারেও ব্রাহ্মণের মতই প্রবৃত্তি, কিন্তু লোক ভাল; স্নেহ আছে, দয়া আছে, মমতা আছে; নিজের কাজ ছাড়ে না, যা মনে করে, সেটা করিয়াই লয়। এমন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে সর্ব্বদাই রাজার সঙ্গে থাকিত। দুঃখের সময় তাঁহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিত। যখন দেখিত নিতান্ত কাতর, তখন তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইত, তাঁহার দুঃখ দূর করিতে সহায় হইত। আর পাকা দরবারী লোকের মত অবসর বুঝিয়া কথা কহিয়া আপনার কাজ লইতে পারিত। তবে কেহ বা খুব চালাক চটপটে হইত, কেহ বা একটু বোকা বোকা হইত।

দুষ্মন্তের ভাঁড়টি একটু—শেষ ধরণের—একটু বোকা বোকা। মৃগয়ার সময়ে নিবিড় বনে তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম দেখা। রাজা ত বনে বনে কেবল "ঐ হরিণ, ঐ শূয়োর, ঐ বাঘ" করিয়া জানোয়ারের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়ান, আর দুপুর বেলা, পোড়া মাংস,—শিক-কাবাব খান—সোঁতার জল খান, সে জলে পাতা পচিয়া তিত হইয়া গিয়াছে। আর বিদূষক বেচারাকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটোছুটী করিতে হয়, হাত পায় ব্যথা হয়। আর এ রকম খাওয়া তার সহিবে কেন? রাত্রে ঘুম হয় না, রাত্রি থাকিতেই শিকারীরা মহা কোলাহল করিয়া বন ঘিরিতে যায়। বিদূষকের মনে মনে একটু গোদের উপর বিষফোড়া; ধিকার হইয়াছে,—এ ভাঁড়গিরি ভাল লাগিতেছে না। তাহার উপর আবার বনে একটা মেয়ে দেখে রাজার মন তাহারই উপর পড়িয়াছে, তিনি বাড়ী যাইবার নামও করেন না। বিদূষক মনে মনে স্থির করিল, আজ আর কিছুতেই শিকারে যাইবে না। পারে ত কাহাকেও যাইতে দিবে না। সকালে উঠে রাজা আসিতেছেন দেখিয়া যেন হাত পা নাড়িতে পারিবে না, এইরূপ ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা আসিলে বলিল, আজ আমি তোমায় মুখেমুখেই "জীব সহস্র" বলি; হাত তোলার আমার ক্ষমতা নাই। সোজা কথা বলিলে ত' ভাঁড়ামী হয় না। রাজা গাএর ব্যথা কি সে হইল, জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, নিজেই চোখে

কাটি দিয়া চোখে জল পড়ে কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ। রাজা বলিলেন, "বুঝিলাম না।" "আচ্ছা বেত-গাছ যে কুঁজা হইয়া পড়িয়া থাকে, সে কি নিজের সাধে করে? না, নদীর বেগে করে?" "নদীর বেগেই করে।" "তা হ'লে আমার হাত পা, আপনার জন্তেই ব্যথা হইয়াছে। আপনি রাজার কাজ সব ত্যাগ করে ত' শিকারী হইয়াছেন, কিন্তু আমার যে দেহের গাঁটগুলা কাঁড়া হ'য়ে যাচ্ছে, দেহ অবশ হয়েছে, আমায় অন্ততঃ এক দিনের জন্য ছুটী দিন।" রাজাও ভাবিলেন, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি আমারও মৃগয়ায় বড় ঝোঁক নাই, এও এই রকম বলিতেছে, কি করি। রাজাকে ভাবিতে দেখিয়া বিদূষক বলিল, "তোমার মনে কি হইতেছে, জানি না, আমার যেন অরণ্যে রোদন হইল।" রাজা বলিলেন, "না না, আমি কি, সুহৃদের কথা লঙ্ঘন করিতে পারি।" বিদূষক ভারি খুসী হইয়া "চিরজীবী হও" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা বলিলেন, "একটু থাক, আমি একটা সামান্য কাজে তোমার সাহায্য চাই।" পেটুক বিদূষক অমনি বলিয়া উঠিল; "কি মোয়া খাওয়ায় সাহায্য করিতে হইবে, তা হ'লে ঠিক লোক পাকড়াইয়াছ।" রাজা "বল্‌ছি" বলেই সেনাপতিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি আসিয়াই রাজার মন যোগাইবার জন্ত মৃগয়ার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বন ঘেরা হইয়াছে, আপনি আর বসিয়া আছেন কেন?" রাজা বলিলেন, "মাধব্য মৃগয়ায় আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।" বিদূষকেরও যে দশা, সেনাপতিরও সেই দশা; তিনি বিদূষককে বলিলেন, "ভাই, খুব শক্ত হয়ে থাক, আমি রাজার মন জোগাই।" রাজাকে বলিলেন, "ওটা মূর্খ, ওর কথা কি শুনিতে আছে। মৃগয়ায় কত লাভ, শরীর ভাল হয়, জানোয়ার চেনা যায়, লোকে চটপটে হয়, এত আমোদ কি আর কিছুতে আছে?" বিদূষক বলিল, "রাজা ত কতকটা পথে এসেছেন। তুমি যাও, বনে বনে ঘুরে ঘুরে ভালুকের মুখে পড় আর সে তোমার নাকটা ছিঁড়ে নিয়ে যাক্।" যা হোক, রাজা মৃগয়া বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন; বলিয়া দিলেন, "দেখিও যেন সৈনিকেরা তপোবনে অত্যাচার না করে।" বিদূষক বলিলেন, "কেমন, বড় যে উৎসাহ দিতে এসেছিলে।" সেনাপতি চলিয়া গেলেন। রাজা দরোয়ানকেও বিদায় করিয়া দিলেন।

মাধব্য বলিল, "একেবারে মাছিটি পর্য্যন্ত যে তাড়াইলেন। এখন এস, এই গাছ-তলায় বসা যাক, লতায় লতায় এর তলায় বেশ ছায়া হইয়াছে।" বসিলে পর, রাজা বলিলেন, "দেখিবার যে জিনিস, তাহা দেখিলে না, তোমার চক্ষু সার্থক হ'ল না।" মাধব্য বলিল, "কেন, আপনিই ত সম্মুখে আছেন।" বিদূষক বেশ বুঝিয়াছিল, রাজা সেই মেয়েটার কথাই পাড়িবেন, তাই যাতে সেটা না পাড়িতে পারেন, সেই জন্ত রাজার চেহারার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কারণ, সে ঠিক জানিত—সে বেশ জানিত যে,

নিজের চেহারার প্রশংসা করিলে খুসী হয় না, এমন লোক অতি কম। সে মনে করিয়াছিল, সেই কুৎসিত জামাইটার মত রাজাও হয় ত বলিয়া বসিবেন, "তেমৃ কত দিন ত্যাল মাখিনে।" কিন্তু বিদূষকের কোন চালাকী খাটিল না। রাজা শকুন্তলার কথাই পাড়িলেন। সে ভাবিল, কিছুতেই সে কথাটা পাড়ার সুযোগ দিবে না, বলিল, "ছি! সে যে তপস্বীর মেয়ে, তার কথা কি তোমায় ভাবিতে আছে?" রাজা বলিলেন, "না হে, সে তপস্বীর মেয়ে নয়, সে অপ্সরার মেয়ে। আকন্দ গাছে যেমন নবমল্লিকার ফুল পড়ে, তেমনি সে তপস্বীদের হাতে পড়িয়াছে।" বিদূষক তবুও আপনার গোঁ ছাড়ে না। বলিল, "খেজুর খেয়ে গলা কিটাইলে যেমন লোকে তেঁতুল চায়, আপনার হয়েছে তেমনি। এত রাণী থাকিতে আপনি চান কি না, একটা বুনো মেয়ে।" রাজা বলিলেন, "না হে, তুমি তাকে দেখ নাই, তাই এ কথা বলিতেছ।"

বিদূষক বলিল, "হবে, আপনার যখন পছন্দ হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে রূপসী, এমন কি, রূপসীদেরও সেরা। তা হ'লে এখন শীঘ্র তাহার পরিত্রাণ কর। নহিলে কোন্ দিন তেলচক্‌চকে একটা নেড়া মাথার হাতে পড়িয়া যাইবে। আপনার উপর তার নজর কেমন?" রাজা বলিলেন, "আমি তাহার দিকে চাহিলে, সে চোখ ফিরাইয়া লইত; হাসিত, কিন্তু সে আমার কথায় নয়। তার মনের কথা লুকায়ও নাই, প্রকাশও করে নাই।" বিদূষক বলিল, "দেখবামাত্রেই কি তোমার কোলে ঝাঁপ পড়িবে না কি?" রাজা বলিলেন, "আসিবার সময় পায়ে কুশ ফুটিয়াছে বলিয়া সে ফিরিয়া আমায় দেখিতে লাগিল। বাকলখানা লাগে নাই, তবু যেন ডাল থেকে ছাড়াইতেছে—ভাল করিয়া আমার দিকে চাহিতে লাগিল।" বিদূষক বলিল, "তবে আর কি? এখন পথ-খরচের জোগাড় কর। তপোবন যে তোমার শ্বশুরবাড়ী হইল দেখিতেছি।"

"কোন কোন ঋষি আমায় চিনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন কি করিয়া দিনকতক এখানে থাকি, বল দেখি?"

"তার আর ভাবনা কি? বলুন, আমায় তোমাদের উঁড়ি ধানের ভাগ দাও।" বিদূষক এইবার বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিল। রাজা তাহাকে যেন তিরস্কার করিয়াই বলিলেন, "না হে না, তাঁরা যে আমাদের তপস্যার ভাগ দেন, সেটা যে হীরা-জহরতের চেয়েও দামী জিনিস।" বিদূষকও চুপ, রাজাও চুপ। রাজা নাকি ভারি ভাগ্যবান্, তাই ঠিক এই সময়েই দুই জন ঋষিবালক আসিয়া বলিয়া গেল যে, "ঋষিরা যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন আর রাক্ষসেরা আসিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন বাধাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময়ে আবার কণ্বমুনি বাড়ী নাই। তাই আপনি যদি কেবল সারথির সহিত কয়েক রাত্রি এখানে বাস করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।"

বাঃ, রাজার কি অদৃষ্ট! তিনি কিছু দিন তপোবনে থাকিতে চান, আর ঋষিরা তাঁহাকে কয়েক রাত্রি থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আরও বলিলেন, কণ্বমুণি বাড়ী নাই এবং দুচার দিন আসিবেনও না। কারণ, তাঁহার শীঘ্র আসার সম্ভাবনা থাকিলে, রাজার দরকার না হইলেও হইতে পারিত। বিদূষক এমন ঠাট্টার সুযোগ ছাড়িতে পারিল না, সে আড়ালে বলিল, "এ যে 'অনুকূল গল-হস্ত'; আমরা বাঙ্গালার বলিতাম, 'বাঃ, এ যে মেঘ না চাহিতে জল'; এই যে মেঘ না চাহিতে জল আসিল, এটা কি, আপনি আপনি হইল। কোন কোন সামাজিক বলিবেন, এটাও মেনকার খেলা।

রাজা ঋষিবালকেরা চলিয়া গেলেই হুকুম দিলেন, "রথ আন, তাতে যেন তীর ও ধনুক থাকে।" ঋষি বালকেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শকুন্তলাকে দেখিবার ইচ্ছা আছে?" বিদূষক বলিল, "খুব ছিল, কিন্তু রাক্ষসের কথা শুনিয়া একতিলও নাই।" রাজা বলিলেন, "তুমি যে আমার কাছে থাকিবে?" "তাহা হইলেই আমার রক্ষা হইল।" বিদূষকের কথাটা ঠাট্টা কি না বুঝা গেল না। কিন্তু কবি কৌশলে বিদূষককে শকুন্তলা দেখিতে দিলেন না।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আবার এক "অনুকূল গলহস্ত।" রাণীরা খবর পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রত করিয়াছিলেন, উপবাস করিয়াছিলেন, চারিদিনের দিন তাঁহাদের পারণা। তাঁহাদের অনুরোধ, রাজা তাঁহাদের পারণার দিন কাছে থাকেন। রাজা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "ঋষিদের আজ্ঞা এক দিকে, মায়েদের আজ্ঞা আর দিকে, তবে আমার ত যাওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে যজ্ঞের বিঘ্ন হইতে পারে। তা মাধব্য, তোমায় ত তাঁহারা ছেলে বলিয়াই মনে করেন। পারণার দিন তুমি তাঁহাদের কাছে থাক।" উত্তম আহারের গন্ধ পাইয়া বিদূষক নাচিয়া উঠিল, বলিল, "আমি রাজার ছোট ভাইএর মত, কুমার বাহাদুরের মত যাইতে চাই। আমি এখন যুবরাজ।" রাজা বলিলেন, "তা ত ঠিক, সব লোকজন তোমারই সঙ্গে যাউক।" মাধব্য বলিলেন, "আমি রাক্ষসের ভয়ে পলাইতেছি মনে করিও না।"

রাজা মনে করিলেন, এ বামুনটা 'ত' বড় পেট-পাত্‌লা। যদি শকুন্তলার কথাটা বাড়ীতে ব'লে দেয়। মিছা একটা অনর্থ হইবে। বলিলেন, "দেখ ভাই! তপস্বীদের যজ্ঞের জন্যেই আমি রহিলাম। তুমি যেন তপস্বিকন্যার কথাটা সত্য বলিয়া মনে করিও না। ওটা আমি তোমায় পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম।" বিদূষকও তাই বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল। ভবিষ্যতে রাজার ভুলিয়া যাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। মাধব্য শকুন্তলাকে দেখিল না; দেখিলে সে ভুলিতে পারিত না।

এক দিন না এক দিন মনে করাইয়া দিত। রাজাকে ভুলিতে দিত না। তাহার উপর রাজা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন, ঋষি-কন্যার কথা সবটাই মিথ্যা। কেবল ঠাট্টা করিয়া আমোদ করিবার জন্য বলিয়াছি মাত্র। বিদূষকও সে কথাটা তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল না, কারণ, তাহার আহারের ভারি সুযোগ উপস্থিত। অন্য কোন কথায় তাহার মন দিবার সময় নাই। রাজা বলিলেন, আর সে বুঝিয়া গেল।

যে দিন কণ্বাশ্রম হইতে ঋষিরা আসিবেন, সে দিনও কবি কেমন কৌশল করিয়া বিদূষককে রাজার কাছ হইতে সরাইয়া দিলেন। রাজা ও বিদূষক দুজনে একটি গান শুনিতে পাইলেন; একজন গানে বলিতেছে—"ভোমর হে, তুমি নূতন মধুর লোভে আমের মুকুলে একটি চুমা দিয়া যেমন পদ্মের কাছে গিয়াছ, অমনি মুকুলের সব কথা ভুলিয়া গেলে।"

রাজা বলিলেন, "মাধব্য, বুঝিয়াছ কি বলিতেছে? আমি হংসপদিকার মহলে এক দিন মাত্র গিয়াছিলাম, তার পর বসুমতীর মহলেই থাকি। তাই সে আমায় বেশ দুকথা শুনাইয়া দিল। যাও ভাই, তাহাকে গিয়া বল, তাহার তিরস্কারটা আমার বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে।"

"যাই বটে, কিন্তু অপ্সরা ধরিলে যেমন তপস্বীদের মোক্ষ আর হয় না; তেমনি হংসপদী একজনের হাত দিয়া আমার টিকীটা ধরাইয়া আর একজনকে দিয়া আমায় যখন উত্তম-মধ্যম দিবে তখন আমার আর কিছুতেই মোক্ষ হইবে না।" রাজা বলিলেন, "তুমি নাগর সাজিয়া যাও।"

সেকালে নাগর বলিয়া এক দল লোক ছিল। নাগরদের পৈতৃক সম্পত্তি থাকিত। তাহাদিগকে রোজগার করিয়া খাইতে হইত না। তাহারা ভাল লেখাপড়া শিখিত। বিশেষ কাব্য, অলঙ্কার, চৌষট্টি কলা, কামশাস্ত্রে প্রবীণ ছিল। তাহারা নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদের মজলিস জমাইয়া দিত। কে ভাল নাচওয়ালী, কে কেমন গান করিতে পারে, কোন্ কুশীলবের দল কোথায় বায়না করিলে ভাল হয়; কোন্ নাচওয়ালী কোন মজলিসের উপযুক্ত; এ সব ঠিক করার ভার তাহারই উপর থাকিত। রাজা বিদূষককে বলিয়াছিলেন, তুমি একজন নাগরিক হইয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা কর গিয়া। আমি যে তাহার তিরস্কারটা বুঝিয়াছি, সেটাও হংসপদিকাকে জানাইয়া দিও। ইহার ভিতরও কালিদাসের একটু কৌশল আছে। বিদূষক যদি রাজার দূত হইয়া যায়, তবে তাহাকে দূতগিরি করিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইবে। আর যদি সে উদাসীন নাগরিক হইয়া রাণী সাহেব কেমন গান শিখিতেছে বলিয়া যায়, তাহা হইলে রাণীর কাছে বেশী আদরও পাইবে। আর তাহাকে অনেকক্ষণ

সেখানে বসিয়া থাকিতে হইবে। শকুন্তলা রাজসভায় যতক্ষণ থাকিবেন, সে ততক্ষণ হংসপদিকার মহলেই কাটাইয়া দিবে।

আঙটী পাওয়ার পর রাজা ও বিদূষক দুজনে বাগানে গেলেন, সেখান হ'তে মাধবীলতার কুঞ্জে গেলেন। রাজার মন বড় খারাপ, তাই এবার বসন্তকালে উৎসবটাই মাটী। বাগানে আসিয়াই রাজা বলিলেন, "আহা, আমার প্রিয়া তখন আমার মনে করাইয়া দিবার জন্য এত চেষ্টা করিলেন, তখন আমার মনটা ঘুমাইয়াই রহিল, এখন যে জাগিল, সে কেবল পস্তাইবার জন্য।" তখন বিদূষক আর এক দিকে ফিরিয়া বসিয়া বলিলেন, "এই যে, আবার শকুন্তলা-ব্যাধি উপস্থিত হইল, কেমন করিয়া ইহার চিকিৎসা হইবে জানি না।" রাজা একে একে কঞ্চুকী, প্রতিহারী সকলকেই সরাইয়া দিলেন। বিদূষক বলিলেন, "আপনি ত মাছিটি পর্য্যন্ত সরাইলেন। এখন আসুন, এই প্রমোদবনে বেড়ান যাউক, এ জায়গাটি বেশ—না ঠাণ্ডা না গরম।" রাজা বলিলেন, "বিপদের পরই বিপদ আসে। দেখ, শকুন্তলার কথাও আমার মনে পড়িল, আর মদনও ধনুতে আমের বউল চড়াইয়া বাণ মারিতে আরম্ভ করিল।" বিদূষক বলিল, "আমি এই বাঁকা লাঠীতে কন্দর্পের বাণ নাশ করি" বলিয়া আমের বউল ভাঙ্গিতে গেল। রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণের তেজটা খুব দেখাইলে। এখন থাম।" তাহার পর বলিলেন, "কোথায় বসিয়া বল দেখি চোখটা জুড়াই; লতাগুলা দেখিতে প্রিয়ার মত। চল, লতা দেখি গে।" বিদূষক বলিল, "আপনি ত এই চতুরিকাকে বলিলেন যে, আমরা মাধবীলতার কুঞ্জে গিয়া বসি, সেইখানেই আমি শকুন্তলার যে ছবিখানি আঁকিয়াছি, সেইখানি লইয়া আইস। তবে চলুন সেইখানেই যাই।" সেখানে যাইবার সময় বিদূষক কুঞ্জের শোভা বর্ণন করিয়া রাজার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে বৃথা। রাজা বলিলেন, "শকুন্তলাকে আমি যখন তাড়াইয়া দিই, তখন ত তুমি কাছে ছিলে না। কিন্তু পূর্ব্বেও ত কখন তুমি আমার কাছে তাঁহার নামও কর নাই, তুমিও কি আমার মত সব ভুলিয়া গিয়াছিলে?" সে বলিল, "না, ভুলিব কেন? কিন্তু তুমি ত অনেক কথা তার সম্বন্ধে বলিয়া শেষে বলিলে, এ সকল পরিহাসের কথা, যথার্থ বলিয়া যেন মনে করিও না। আমার বুদ্ধিটা বোকার মত কি না, তাই আমি তোমার কথাই ঠিক বলিয়া মনে করিয়া লইলাম। অথবা কি জান সবই ভবিতব্যতা! এই সময়ে শকুন্তলার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া রাজার মোহ হইবার উপক্রম হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, আমায় রক্ষা কর!" বিদূষক বলিল, "এ কি হইল, এ রকমটা ত আপনার সাজে না। ভাল, লোক কি শোকের বশ হয়? পাহাড় কি কখন ঝড়ে নড়ে?" একবার বিদূষক জিজ্ঞাসা করিলেন, "উঁহাকে কে লইয়া গেল?" রাজা বলিলেন, "তিনি পতিব্রতা, তাঁহার অঙ্গ কি কেহ

স্পর্শ করিতে পারে? মেনকা তাঁর মা, সেই সম্পর্কে কোন অপ্সরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকিবে।" বিদূষক বলিলেন, "তা যদি হয়, তোমার সঙ্গে তাঁর অবশ্যই মিলন হইবে। কেন না, মা কি আর কখন মেয়ের কষ্ট দেখিতে পারে? মেনকা অবশ্যই তাঁহাকে তোমার কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন।" রাজা বলিলেন, "সে যে স্বপ্ন, সে যে মায়া, একবার গিয়াছে আর ফিরিয়া আসিবে না।" বিদূষক বলিলেন "না, না—এই দেখুন না—এই আংটীটার ব্যাপারই দেখুন না। ইহা হইতেই মনে হয়, কোন অদ্ভুত উপায়ে আশ্চর্যরূপে আবার মিলন হইবে।" আবার খানিক কাঁদাকাঁটির পর মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামের মোহর তাঁহাকে দিয়াছিলেন কেন?" রাজা বলিলেন, "আমি নগরে ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কবে আবার খবর পাঠাইবেন?' আমি আমার হাতের আংটীটি তাঁহার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিবার সময় বলিলাম, এই মোহরে যে কটি অক্ষর আছে, একটি একটি করিয়া এক এক দিন গণিবে, যে দিন শেষ হইবে, সেই দিন আমার লোক আসিয়া তোমায় আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাইবে।" "আচ্ছা, মাছের পেটে আসিল কিরূপে?" "শচীতীর্থে স্নান করার সময় হাত থেকে পড়িয়া গিয়াছিল। এ আংটী সে হাত ছাড়িল কেন? ইহাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিই।" বিদূষক মনে মনে বলিল, "এ তো পাগলামীর পথে উঠিল; আমার কিন্তু ক্ষুধায় প্রাণ যায়।" চতুরিকা শকুন্তলার ছবি আনিলে বিদূষক ছবিখানির খুব বাহবা দিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, "এ তিনটির মধ্যে কোনটি শকুন্তলা?" তাহার পর বলিল, "ঐ যে আমগাছের তলায় একটু ক্লান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, উনিই তো শকুন্তলা।" রাজা তুলি ও রঙ চাহিলে বিদূষক জিজ্ঞাসা করিল, "উহার উপর আবার কি লিখিবে?" মনে মনে বলিল, "বোধ হয়, গোটাকত লম্বা লম্বা দাড়ীওয়ালা তপস্বী লিখিবে।" সে রাজাকে বলিল, "মুখটি ঢাকিয়া শকুন্তলা কেন চকিতভাবে রহিয়াছে?" তাহার পর প্রকাশ্যে বলিল, "এই যে একটা ভোমরা মধু-চোর ইহার সুন্দর মুখের দিকে তাড়া করিয়া আসিতেছে।" রাজা বলিলেন, "ওকে বারণ কর।" "তুমিই রাজা, দুষ্টের দমন তোমারই কাজ, তুমিই কর।" আবার বলিল, "এ বড় বাঁকা জাতি, বারণ করিলেও শুনে না" রাজা বলিলেন, "বটে, কথা শুনে না। আচ্ছা, শোন ভ্রমর, তুমি যদি পাকা তেলাকুঁচার মত উঁহার ঠোঁট দুটি ছোঁও, তোমায় আমি পদ্মফুলের পেটের ভিতর কয়েদ করিব।" "ও! কি ভীষণ শাস্তি, এতে আর ভয় পাবে না।" মনে মনে বলিল, "এটা ত পাগলই হইয়াছে, আমিও যে সেই সঙ্গে তাই হইতে চলিলাম।" আবার বলিল, "মহারাজ করেন কি? এটা যে ছবি।" বলিবামাত্র রাজার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি

এতক্ষণে শকুন্তলাই দেখিতেছিলেন, সেই ভাবেই কথা কহিতেছিলেন। এখন ছবি শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাণী বসুমতী আসিতেছেন শুনিয়া রাজা ছবিখানি বিদূষকের হাতে দিয়া বলিলেন, "ভাই, এখানি রক্ষা কর।" বিদূষক মনে মনে বলিল, "ছবি রক্ষা ত নয়, তোমাকেই রক্ষা করিতে হইবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "রাণীর হাত থেকে তোমার উদ্ধার হলে আমায় ডাকিও। আমি মেঘচ্ছন্দ নামক বাড়ীতে রহিলাম।"

খানিকক্ষণ পরে রাজা যখন সদাগরের জাহাজ ডুবি হইয়া মরার কথায় বড়ই কাতর, হঠাৎ "মেঘচ্ছন্দ" হইতে "ওরে মেরে ফেল্লে রে" বলিয়া বিদূষক চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজা বুঝিলেন, বুঝি কোন অসুর বিদূষককে ধরিয়া লইয়া যাই-তেছে। তিনি তাড়াতাড়ি ধনুক ও বাণ লইয়া সেখানে গেলেন। গিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বিদূষক কাতর স্বরে বলিল, "আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি, তুমি আমায় দেখিতে পাইতেছ না। আমায় কে একটা আক ভাঙ্গার মত তিন টুকরা করিয়া ফেলিতেছে। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে, তেমনি আমায় ধরেছে। আমার আর রক্ষা নাই।" রাজা বলিলেন, "বটে, তুমি মানুষের চোখের অগোচর থাকিতে পার বলিয়া তোমার বড় জাঁক হইয়াছে; আমার বাণ এমন নয়, তোমায় মারিবে, ব্রাহ্মণকে বাঁচাইবে। এই আমি বাণ ছুড়িলাম।" বলিবামাত্র একটি দিব্যপুরুষ রাজার সম্মুখে উপস্থিত, সঙ্গে বিদূষক কাঁপিতেছে। রাজা বলিলেন, "কে ও মাতলি, দেবরাজের কুশল ত?" বিদূষক বলিল, "বাঃ! আমায় যে প্রাণবধ করিতে উদ্যত, তুমি তাহাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতেছ!" রাজা শিষ্টা-চারের পর মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদূষকের উপর আপনি এ ব্যবহার করিলেন কেন?" মাতলি বলিলেন, "আমি দেখিলাম, কোনও কারণে আপনি বড় কাতর, তাই আপনাকে একটু রাগাইবার জন্য, একটু উত্তেজিত করিবার জন্য—এ কাজটা করিয়াছি। আমি জানি, কাঠ নাড়িয়া দিলে তবে আগুন জ্বলে, লেজে পা পড়িলে তবে সাপ ফোঁস করে। একটা হাঙ্গামা না পড়িলে মানুষের রোখ হয় না।" রাজা বলিলেন, "মাধব্য, তুমি অমাত্য পিশুনকে বল, তুমি আপনার বুদ্ধিবলে কিছু দিন রাজ্য চালাও, আমি অন্য কাজে ব্যস্ত রহিলাম।" বিদূষক চলিয়া গেল।

মাধব্য রাজার যথার্থ হিত চায়। বাড়াবাড়ি দেখিলে সে তাহাকে বেশ এক হাত লয়। শকুন্তলার ব্যাপারে রাজা যখনই বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, সে তাহাকে তখনি ঠাট্টা করিয়াছে, কিন্তু যখন জানিতে পারে, রাজা যথার্থই কাতর, তখন সে তাঁহার দুঃখে দুঃখী হয় এবং তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়। তপোবনে

রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "শকুন্তলার কথাটা সবই মিথ্যা, পরিহাস মাত্র।" সে সরল ভাবে তাহাই বুঝিয়াছিল, তাই সে কথা সে কখন আর রাজার কাছে পাড়ে নাই। সে জন্ত সে দুঃখিত, "বুদ্ধির ঢেঁকী বলিয়া" আপনার নিন্দাও করিয়াছিল। সে এক এক করিয়া সব কথা শুনিয়া লইল। শকুন্তলা কে? কে তাহাকে স্বর্গে লইয়া গেল? কেন তাকে আঙটী দেওয়া হইয়াছিল? কেমন করিয়া সে আঙটী মাছের পেটে গেল? ছবি আসিলে সে ছবির যে দোষগুণ বলিল, আর কি লিখিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। কিন্তু বুদ্ধির দোষে ছবি লইয়া রাজা যখন তন্ময়, সেই সময় বলিয়া ফেলিল, "কর কি? এ যে ছবি।" রাজার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি অধীর হইলেন, এমন সময়ে রাণী বসুমতীর খবর আসিল। সেই ছবি রাখিবার ছলে কবি মাধব্যকে সরাইয়া দিলেন। সে রাজার চমক ভাঙ্গিয়া দিয়া যে অপরাধ করিয়াছিল, এ তাড়ানটা যেন তাহারই শাস্তি। উহার উপর মাতলির যে অত্যাচার, সেও যেন সেই শাস্তিরই শেষ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

রস-বাহিনী

[অনুবাদ]

নব বলে গুরু- গিরির চরণ লঙ্ঘিয়া
ধরম করম সরমের সেতু ভঙ্গিয়া
প্রেমে উনমতি পতি-তরু পথি বর্জিয়া
উদ্দেশে তব ধাইল দুকূল মর্দ্দিয়া
রাধিকা রস-রঙ্গিনী ;—
না ধরি বক্ষে কৃষ্ণ সাগর !
কেন তুলি ছল- বচন-লহর
বিমুখিলে বৃক-নন্দিনী ?

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

কমলের দুঃখ

(সুধীর—কমল)

ভায়া,

তুমি এসেছিলে, তা আমি খবর পেয়েছি। আমার ওপর দিয়ে একটা ঢেউ চ'লে গেছে—আমি তায় ভেসে গেছি—ভাসাই যখন জগতের গতি—তখন আর খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? নদীস্রোতে একটা ঝরা পাতার মত ভেসেছি ত—ভেসেই যাই। তুমিও ভাস্‌ছ ভাস। সুখ, দুঃখ, আশা, সাধ সবই ত ঐ গণ্ডীর মধ্যে; তবে ভেসে যাও, কে কূলের ঠিকানা কর্‌তে চায়? কূল কোথায় যে, কিনারায় যাবে? কোথা থেকে? কোথায়? এর উত্তর দিতে পার—পার্‌বে না, মিছে কেন বকে মরি। যতক্ষণ আছি, ভেসে যাই—কিছু না কিছু না,—ঢাল, ঢাল, পানপাত্র পূর্ণ কর—আঙুরের বুকের রক্তে—প্রাণ যতক্ষণ আছে—ততক্ষণ তাজা কর—যে দিন ফুরুবে, সে দিন ফুরুবে—ভাব্‌বার নেই। এই দেখ, এই শোন, সুরা কি বল্‌ছে। ঐ শোন, বুলবুল কি বল্‌ছে। শুধু সুর, শুধু গান, শুধু সে সুরা—সুরা। আমি ভেসেছি—আমি যাকে গণ্ডী দিয়ে মনে করেছিলাম আমি, সে ভেসে গেল, ব'লে গেল ভাস, জানিয়ে গেল না; শুধু ভেসে গেল, কোথায়, তা জানা গেল কি?—না, শুধু ভেসে গেল, আমি ত ভেসে গেছি, আর আমার খোঁজ কেন? সুরা! সুরা! ঢাল ঢাল, পানপাত্র পূর্ণ কর, যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ তাজা ক'রে রাখ। সবই স্বপন, যদি এত বড় সত্যিই যখন স্বপ্ন, তখন দেখি—স্বপন ভাল ক'রেই দেখি। ফুল ফুট্‌ছে, হাজার ফুল ঝর্‌ছে, তায় আমার কি! আমার গন্ধ হলেই হ'ল। ওই শোন বুলবুল কি বল্‌ছে, ফুলের দিনে ফুল ফোটে, আবার ঝরে—ফুট্‌লেই ঝরে। আমি যেমন গানে মজেছি, অমনি্ ভেসে যা—যা যা ভেসে যা। তর্‌ তর্‌ তর্‌ তর্‌—ছল্‌ ছল্‌—কলল্‌—কল নদী চলেছে; আমিও ভেসেছি, আমায় আর পাবে কোথা—আমায় খুঁজ না, আমি ভেসে গেছি—গেছি নয় যাচ্ছি—কোথায়? শুধু কোথায়—কোথায়? জানি কি, জানি না—তাও বোঝবার নেই—ভেসেছি।

ওই ত অন্ধকারের উপর অন্ধকার জমাচ্ছে, ভাস্‌তে ভাস্‌তে আস্‌ছে, ভাস্‌তে ভাস্‌তে যাচ্ছে—একা ভাস্‌ছে—স্রোতের মাঝে আমি যেমন ঝরা পাতা, এ ধরাও তাই। ঢাল ঢাল, পূর্ণ কর, ঢাল, আঙুরের রসে ভোর হয়ে থাক। ডাক্তারেরা কি জানে, তারাও ত ভাসছে; যে ভাস্‌ছে, সে আবার আটকাবে কি, কিছু না—না—কিছু না; পূর্ণ কর পানপাত্র; ওই দেখ, কত শাদা কথা বল্‌ছে, মজগুল হয়ে থাক—থাক্‌,

দুনিয়াও ভাস্‌ছে, তুমিও ভাস্‌ছ। কে চায় জ্ঞান—সেত ওই অন্ধকারে বাজের আগুন—মিথ্যা ভ্রম, এই ত। যে ভ্রমণ করে, তারই ভ্রম হয়—ফেলে দাও সব, শুধু ভেসে যাও, হোক্ আঁধার, আঁধারে কি ভয়, নদী ত চলেছে, ধাক্কা লাগ্‌লেই কথা, যেই তটের বুকে আঘাত, অমনি ভাষা ফোটে এই ত ; গতিরোধ হয় না। চলেছে ; ও ভাষাও মিথ্যে—মিথ্যেত মিথ্যে—আমার কি, সুরা ! সুরা ! মজগুল হয়ে আছি—বাঃ, বাঃ ! আছি কি নেই, নেই কি আছি, কে জানে, ভেসেছি, ভেসেই যাই। দেখ, কষ্টিপাথরে ঘষে দেখে, সোণা খাঁটী কি খাদ। এ জগতের—এ জগৎ খাঁটী কি খাদ, তার কষ্টিপাথর কি জান—ওইটে ; যে আসে আর যায়, জানিয়ে যায় না,—ওই মৃত্যু! পাথরের মত, প্রকাণ্ড কাল কষ্টিপাথরের মত—জগৎটাকে ক'সে দেখা গেল ; সব খাদ অথচ দিব্যি সোনার হার ক'রে গলায় পরে হাসি! এই ত, ও জ্ঞান চাই নি, যাক্ চুলোয় যাক্, ঢাল ঢাল সুরা ! সুরা ! মজ্‌গুল হয়ে থাক। মজ্‌গুল হয়ে থাক, এ স্বপ্ন ভাঙবে ভাঙুক, ফোটা ফুল ঝরে যাবে যাক্, ঝরল ঝরল ; ফুটে ছিল, ঝরে গেল, আমার কি,—আমার সুরা, আমার সুরা আছে, ঢাল ঢাল, পূর্ণ কর পানপাত্র। ভেসেছি ত ভেসেই যাই—যাই ! ওঃ বিস্মৃতি ! বিস্মৃতি ! কত দিনে ফেলে দেব এ কালের কাহিনী ! গঙ্গায় ঢল নেবেছে, কূল ভেঙেছে, আমি ভেসেছি—ভেসেই যাই !

(ইন্দু—কমল)

সুচরিতেষু ,—

তোমার চিঠি পড়েছি ভাই ! তবে এ আমি কেমন ক'রে ফেলে দেব বল, আমার অনেক সাধনার ফুল অকালে না ফুটেই ঝ'রে গেল। যে মুকুলের মাঝে ইচ্ছা তার ফলের আশাখানি পোষণ ক'রে রাখে, সে না ফুটতেই, ফলে পরিণত না হতেই নির্ম্মম কাল তাকে ছিঁড়ে নিলে তরুর কি লাগে না,—পাকা ফল গাছ থেকে আপনি পড়ে যায়, ফোটা ফুল আপনি ঝ'রে যায়—তাতে তরুর লাগে না। তাতে সে বোঝে, ফুলের ও ফলের সার্থকতা হয়েছে—কেউ জগতে সুবাস সুগন্ধে ভ'রে দিলে কেউ জগতে মিষ্ট স্বাদে ভরে জগজ্জনকে তৃপ্ত কর্‌লে ; তাদের সার্থকতা হ'ল। এর ত তা নয়। নির্ম্মম কাল শুধু আমার মা হওয়ায় হিংসা ক'রে নিয়ে গেল, কি করব হাত নেই, তা জানি, তবু কাঁদি, না কেঁদে যে থাক্‌তে পারি না ভাই ! ফলের আশা কুঁড়িতেই শুকিয়ে গেল, মা হওয়ার সঙ্গে সংসারের সাধ সব ম'রে গেল। কি কর্‌ব, ভগবান্ দিয়েছিলেন, তিনি নিয়ে নিলেন। সামান্য মেয়েমানুষ, কিসের কার্য্য-কারণ হাত্‌ড়ে মর্‌বো, ও বুঝে কাযই বা কি ? সবাই এক জায়গাই যাব, এই ভরসা—হবে ! কবে হবে ভাই, তাই ভাবি।

দেখ শূন্যকে আশ্রয় ক'রে কেউ থাক্‌তে পারে না, হারা রতনের জন্যে মন কেবলই

যতন করে, না ক'রে, তার উপায় নেই। খালি হাতে কেউ থাক্‌তে পারে না। খালি মনে কেউ থাক্‌তে পারে না।

কা'ল একটি নতুন মুখ আমাদের বাড়ী এয়েছে, মুখখানি দেখেই আমার তাকে বুকের ভেতর ক'রে ভালবাস্‌তে ইচ্ছে হয়েছে, ঠিক আমার সেই ছোট বোনটির মত। তেমনি চোখ, তেমনি নাক, তেমনি ঠোঁট, তেমনি সব—তবে এ তার চেয়ে আরো একটু ফর্‌সা, তুমি হয় ত বুঝ্‌তে পাচ্ছ না যে কে; কিন্তু তুমি একে খুব জানো, তোমার আশ্রয়ের জন্যেই সে এসেছে। আমি কিন্তু ঠাকুরঝির কাছে একে রাখ্‌তে দেব না—এ আমার ছোট বোন, আমি একে আমার বোনের মতই রাখ্‌ব, তোমাদের আমি দেব না। আমার কাছে যখন আগে এসেছে, তখন কেন আমি তোমাদের দেব?

কা'ল বিকালে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, দেখি ওই মেয়েটা একটা সাঁওতালের মত চেহারা বেশ জোয়ান লোকের সঙ্গে, আমাদের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল। এক পা ধুলো—এ দিকে আমি তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় ফিরে দেখি, সেই মেয়েটা এসে তোমার নাম ক'রে দরোয়ানের কাছে কি জিজ্ঞাসা করছে। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কে গা তুমি?'

'এখানে কি কমলনাথ বাবু থাকেন?' বল্‌তে যেন একটু থতমত খেলে।

'না, এখানে ত থাকেন না—এ তাঁর বোনের বাড়ী।'

'থাকেন না' বলেই মেয়েটি কেঁদে ফেল্‌লে, যেন মহা ভাবনা ও নিরাশার মাঝে সে প'ড়ে গেল। আমি তাকে বল্লাম, 'তা তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? এ তাঁর বোনের বাড়ী—আমি তাঁর দিদি হই; এস, এস, তুমি ঘরে এস।'

সঙ্গে যে সেই কালপানা লোকটা এসেছিল, সে বল্লে, 'এ পাগ্‌লী, হামি তবে চলি যায়, ও বাবুকো ত ঠিকানা মিলা, আব্‌ হাম ঘর চলে'—আমার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, 'হাম্‌রা পাহাড়ী আছি মা—এর বাপটা মরিয়ে গেছে, ওকে দেখে, এমন কেউ আছে না, হামাদের সাথে তো ও থাকে কেম্‌নে, তাই বাবুর কাছে আস্‌লো। হামি সাথে সাথে বরাবর আস্‌ছি। এ সব সহর্‌কা লোক বড় কেমন আছে, সব ভাল না, তব্‌ বাবু বড় আচ্ছা আদ্‌মী। আচ্ছা হামি যায় পাগ্‌লী।' যাবার সময় একবার ছলছল-চোখে সেই প্রকাণ্ড কাল পাহাড়ের মত পাথর-কাটা গড়নের মূর্ত্তি চোখের জল ফেলে চলে গেল। এখন বোধ হয়, বুঝ্‌তে পার্‌ছ এ কে—আহা, এর বাপকে সাপে কামড়েছে, তাতেই তার মৃত্যু হয়। সেদিন তার বাপ তাদের ক্ষেতের বাঁধ ভেঙে গিছল বলে লোকজন নিয়ে সেই বাঁধ্‌তে যায়, সন্ধ্যার আগে ফেরবার সময় পথে সাপে কামড়ায়, ওই পাহাড়ীরা কোলে ক'রে নিয়ে আসে; এনে অনেক রকম চেষ্টা করে কিছুতেই কিছু হয় না। তখন ওই যে সঙ্গে করে

রাখতে এসেছিল, সে বলে যে, ওখানে মুখ দিয়ে বিষ চুষে বার করে দেব, তা ও মেয়েটা কিছুতেই রাজী হয় না; সে ওই পাহাড়ীকে সে করতে দেয় না, আর জাত-ভাইয়েরাও বলে, না। তবুও পাহাড়ী ওর নাম কি কান্নু না কি—সেই সাপের কামড়ের জায়গায় মুখ দিয়ে সেই বিষ বার করতে যায়,কার কথা শোনে না। তারপর পাহাড়ীটা খানিক পরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মেয়েটার বাপও একটু যেন চাঙ্গা হয়। হ'লে হবে কি, তখন বিষ মাথায় উঠেছে—বাপ বাঁচলো না। পাহাড়ী কান্নু তিন দিন অজ্ঞান অচৈতন্য হয়েছিল—তার পর ওরা পাহাড়ী, ওরা—অনেক ওষুধ পত্র জানে, কোন রকমে বেঁচে যায়। জবা তাই বলছিল, 'যে ওই পাহাড়ীরা আমাকে এত ভালবাসত যে, তারা আমার কান্না মোছাবার জন্যে—সাপের মুখে যেতে ভয় পেত না। তবু আমিত ওদের কাছে থাকতে পারি নি—আর বাবা মরে যাবার পর সবাই আমায় পাগ্‌লী ব'লে উড়িয়ে দিলে, খুব কাঁদ্‌লুম। পুরুতরা আমাকে শ্রাদ্ধ করাতে চায় না। ওই পাহাড়ী কান্নু কোথা থেকে বামুন নিয়ে এল, আমি ত ও সব জানি না—কি সব করলে। তার পর ভাবলুম, কোথা যাই, এখানে একলা থাকব কি ক'রে—তাতে এই সব গোঁড়েরা সব দিবারাত আমার কাছে রামায়ণ গান শোনবার জন্তে আসে, আমি এখানে কি ক'রে থাকব? কমলবাবুর এ বাড়ী থেকে একখানা চিঠিতে ঠিকানা পেয়ে ভাবলাম, এইখানে আসি, তিনি কি আমায় ফেলে দেবেন? আমার যে আর কেউ নেই। ব'লে মেয়েটা কেঁদে আকুল, আমি তাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে আমার কাছে রেখেছি। আহা! মাতৃহারা-পিতৃহারা সবাই আমরা এক জায়গায়, তাই বুঝি হয়। আহা, থাক্ আমার কাছে থাক্, সে কাল থেকেই আমায় দিদি দিদি করছে। আমি কিন্তু তোমাকে একে নিয়ে যেতে দেব না। তার এই সব শুনে খুব কষ্ট হ'ল, আমিও শুনতে শুনতে কেঁদে ফেল্লুম। জবা কান্না দেখে বললে, দিদি, তুমি কাঁদছ কেন? আমার কান্না দেখ্‌লে ওই পাহাড়ী কান্নু কেঁদে ফেলতো। তাই আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে এলুম, আমি আর কাঁদ্‌ব না, কাঁদ্‌লে সবাই কাঁদে। না, আমি আর কাঁদ্‌ব না। আহা, দিদি! ও আমায় এত ভালবাসে যে, আমি যে দিন ওকে বল্লুম, 'কান্নু, আমি কলকাতায় বাবুর কাছে গিয়ে থাকব', ও খানিকক্ষণ আকাশ পানে চেয়ে—চুপ ক'রে মাটীর দিকে নীচে তাকিয়ে রইল—কি ভাব্‌লে ওই জানে। আমি বল্লুম, 'কান্নু, আমি কাল যাব, তুই আমায় দিয়ে আস্‌বি। কান্নু বল্লে 'হামি! আচ্ছা কবে যাবি?'—আমি বল্লাম 'কাল'। শুনে, আহা বেচারা যেন কি হ'য়ে গেল, অনেকক্ষণ আমাদের সেই তুলসীতলায় ব'সে রইল, তারপর বললে, 'আচ্ছা—চল, যাবে হামি—।' তার পর ওর কাছে চাবি দিলাম, ও আমাকে সঙ্গে ক'রে কত ক'রে তবে এইখানে নিয়ে এল। পথে লোকে আমাদের মুখের দিকে তাকায় আর হাসে। আমি ভাব্‌লাম, আমরা গরিব, তাই

এরা বুঝি হাস্‌ছে। দুঃখীকে কেউ দেখ্‌তে পারে না দিদি। তবে কমল বাবু ত এমন নয়।'

কমল! এত সরল, এমন সোন্দর, একদিনেই যেন কত সে আপনার—আহা—আমার এমনি দুঃখ হচ্ছে। কোথা থেকে যে কি মানুষের হয়! আমি তা ভাবুতেই পারি নি। হাতে কাজ ছিল না, মনে হয়েছিল, সব কাজই ভগবান্ ফুরিয়ে দিয়েছে—একটা কাজ পেলুম। দিন কাটাবার একটা উপায় হ'ল। কত কেঁদে আর দিন গুণে ফুরব বল। তাই বুঝি বিধি একে মিলিয়ে দিলে। তার পর আবার বল্‌লে—'দেখ্ দিদি, বাগানটা ছেড়ে আস্‌তে বড় মায়া হচ্ছিল, ওই সব ফুলগাছগুলো, সেই মাধবী লতার গাছ—সেই বড় বড় গাছের ডালগুলো—ওই সে ঘাসের ফুলগুলো—তারা যেন আমায় বারণ কর্‌ছিল—তাদের ছেড়ে আস্‌তে। নদীর জলের ধারে সেই বটতলায় যেখানে ওই বটগাছের শেকড় মোটা মোটা ঝুরিগুলোর ওপর নদীর জল উছলে উছলে পড়ে, সেই গাছে দুটো চকাচকী আছে, তারা আমায় কত বারণ কর্‌ছিল—সন্ধ্যের সময় যখন সূয্যি নদীর জলে লাল থালার মত সেই দূরে পাহাড়ের পেছনে চ'লে যাচ্ছিল, সে যেন বল্‌লে, যাস্‌নি জবা যাস্‌নি! আমি তবু থাক্‌তে পার্‌লুম না, কেমন যেন বুকের ভেতর ক'রে উঠ্‌ল। বাবা মরে যাবার পর আর আমি তুলসীতলায় আলো দিতে যেতে পারি নি। তা আমি তোমার কাছে থাক্‌ব দিদি!' যেন আমি কত দিনের জানাশোনা, সত্যিই যেন এ আমার বোন্। আবার মনে হয়, এ পাগল নয় ত এ সব কি কথা!

তুমি এখনি আবার বেড়াতে যাবে কেন? অমরের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয়, তবে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। তুমি কি একবার আস্‌বে না, একবার এস। আর সংসারে সবই বদল হয়ে যাচ্ছে, সবারই ভার আবার হয় ত তোমারই ওপর পড়্‌বে। যেমন এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছ, তেমনি সবাইকে নিয়ে জড়িয়ে পড়্‌তে হবে। দেখো!

উনি যেন কি রকম হয়ে গেছেন। বাইরে বাইরে থাকেন, দেখা হ'লে উন্মনা হয়ে আকাশ পানে তাকান, আবার তখনি চ'লে যান; আফিস আদালত বন্ধ করেছেন, বল্লাম, উত্তর দিলেন, 'হুঁ—বিশেষ দরকার ত নেই।' রোজই বাগানে চলে যান, কোন দিন ফেরেন, কোন দিন ফেরেন না। সে দিন অনেক রাত্রে ফির্‌লেন—জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। কি ভেবে অনেকক্ষণ পরে বল্লেন, 'এমনি—গান-বাজনা হচ্ছিল।' ক'দিন থেকে আসেন নি। মনটা সে জন্যে ভাল নেই। কোথাও বাইরে বেড়াতে গেলে হয় না? তুমি যদি যাও আমায় ভরসা হয়, তা হলে ওঁকে নিয়ে যাই। ভাই! আমার কপাল ভেঙেছে, আবার কি কপালে কি হবে। প্রাণে যেন সদাই নূতন বিপদের

ভয় হচ্ছে। কে জানে, তাঁর মনে কি আছে। কখন আমার ভাবনা ছিল না। আজ সব গিয়ে ভাবনাই আমার বড় হয়েছে। এক দিন মনে করতুম সার্থক আমার জীবন, আজ মনে হচ্ছে, সকলের চেয়ে আমার জীবনই ব্যর্থ। এক দিন মনে করতুম, আমি সবার চেয়ে সুখী, আজ মনে করছি, আমি সবার চেয়ে দুঃখী; আমার মত হতভাগিনী আর কে? তুমি মার পেটের ভাই না হয়েও—ভাইয়ের মত ভাই। তাই তোমার কাছে দুটো কথা খুলে বলতে পারি। মনের এ খেলা কত রকমেই হয়। তাই ভাবনা হয়, তাই ভাবছি—আবার উনি কেন এমন হ'য়ে বেড়াচ্ছেন—বুঝতে পাচ্ছিনি কি যে হবে। তুমি কি একবার খোঁজ নিতে পারবে? আর ত কার সাহস হবে না—আর কারও কথাও ত তিনি কাণে দেবেন না। যে মানুষ!

তুমি সে দিন যে এসেছিলে কখন তা আমি জানতেও পারি নি। ভিতরে আস নি কেন? না, কেন আসবে! না—না, ঠিক কাজ করেছ, তবে আমার সঙ্গে দেখা করতে কি দোষ হয়েছিল। না, ভালই করেছ, তুমি বুদ্ধিমান্ তোমার বলবার কি আছে? তিনি ত কি অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ছেন, তা বুঝতে পারছি নি, একবার খবর নিয়ো। আর কাকেই বা বলব? আশীর্ব্বাদ করি, কিন্তু কি ব'লে যে আর আশীর্ব্বাদ করব, তা বুঝতে পারি না। তবু বলি, চিরজীবী হও ভাই!

তোমার—ইন্দু দিদি

(মায়া—কমল)

হে প্রাণাধিক প্রাণেশ,

জীবনের এ পরিবর্ত্তন কত রকমে কত দিক্ হ'তে আর আমায় অনুভব করাবে নাথ! হে ঈপ্সিত! তোমাকে পাবার জন্যে আমার এ ধ্যান, তোমার ওই মধুর অরূপ রূপকে সম্ভোগ করবার জন্যে আমার এ চিরতরে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কি, তুমি বিনা আর কেউ নির্ব্বাণ করতে পারে? যতক্ষণ তুমি আছ ততক্ষণ আমি আছি। জীবনের দীপ যে দিন নিভে যাবে, এখান থেকে সেখানে গিয়ে কোথায় কোন দূরে—আবার যে দিন দীপ জ্বেলে ব'সে থাকব, সেখানেও কি তোমায় পাব না? কেন পাব না—আমি যে তোমায় চাই। আমি যে তোমায় ভালবাসি। আমি তোমায় পাবই। দীপ জ্বেলে বসে আছি, কবে আসবে নাথ!

দুঃখের জীবন দুঃখ দিয়েই ঘোরাল হয়ে ওঠে। চঞ্চল আলোকে যেমন আঁধার গাঢ় হয়ে আসে, দুঃখের জীবনে ক্ষণিক সুখের তপ্ত উচ্ছ্বাস জীবনের আঁধার ছায়ায় আরো ছায়া ঢেলে দেয়। হায়, মিহিরকে বুকে করে জীবনে যেন এক স্বপ্নের মত জাগরণ আসছিল। নিষ্ঠুর! তাও আমায় বুক থেকে কেড়ে নিলে। ভুল করেছিলাম, তাই শোধ নিচ্ছ। এত ভালবাসা সমস্ত সেই রক্তময় চোখের জলে ধুয়ে ফেলেছ বন্ধু—

শুধু রেখেছ বজ্রের নিশ্বাস। আমি নারী দুর্ব্বলা—হে সুন্দর! আমার এত শাস্তি কেন? এক ফোঁটা,—বেশী চাই নে এক ফোঁটা—এ শুষ্ক তৃষিত কণ্ঠে এক ফোঁটা বারি দান কর। সাহারার মরুভূমিতে পড়ে প্রাণ কণ্ঠাগত বঁধু, পিপাসা মিটাও, একটু মধু ছিটাও!

বহুদিন অদর্শনের আঁধারের পর তোমায় যখন দেখ্‌লাম; দেখলাম রুদ্রমূর্ত্তি—কোল থেকে জীবনের জীবন, প্রাণের রতন—জগৎভোলানমুখ ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলে। হায়! এত ভালবাসার এই কি পরিণাম—এই শাস্তি, কিন্তু অপরাধ? শুকনো ফুল এখনও আমার কাছে—তাই আমার জীবন। যে টাট্‌কা ফুলের মালা গলায় ফাঁসির মত লেগেছিল, সে ফাঁস ত আমি খুলে ফেলেছি। অজ্ঞানে না জেনে—ভুলে অর্দ্ধ জাগরণের অবস্থায় যদি ভুল ক'রে থাকি, তার কি ক্ষমা নেই নাথ—তার কি বিচার নেই? কত শাস্তি দেবে বল। আমি ত তোমারই, তুমি যদি রাখ বাঁচ্‌ব, মার,—মর্‌ব। এই ত আমার কাহিনী—এই ত আমার ছুটো কথা, যত কথার মধ্যে—তুমি। এমনটা যে কেন হ'ল, তারই খেই খুঁজে মরি। পাই না, আঁধারে কেঁদেই দিন যায়।

যে দিন প্রথম ও রূপ দেখেছিলাম, সে দিন মনে হয়েছিল, কি মধুর জগৎ। সেই দিন যেন নূতন জীবন। কিন্তু কে জান্‌ত যে, রূপের এত জ্বালা! সে জ্বলুনি থামে না—দহনে নিবৃত্তি নেই, তবু রূপ চাই। হে রূপ, তুমি ধরা দিয়ে কেন লুকালে—কেন আলো দেখিয়ে ফিরে অন্ধকার আন্‌লে—কেন মত্ততায় মত্ত করে অদৃশ্য হ'লে। আশা বাড়িয়ে নিরাশ কর্‌লে বল, এ জীবন নিয়ে কতকাল আর চেয়ে চেয়ে থাক্‌ব। শুধু চেয়ে থাকাই সার। তারা যেমন তারার পানে চেয়ে থাকে।

তোমার সেই জবা,—তোমারই জবা কেমন সুন্দর গায়, এমন মিষ্টি গান আর একজনের শুনেছিলুম। সে কে, তা নিশ্চয়ই তুমি জান। কে একে এ সব গান শেখালে। এমন সুন্দর মালা গাঁথে, দে'খে মানুষের চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু—বল বল, ব'লে দাও—আমার প্রাণ তাকে দে'খে অবধি এমন শিউরে উঠে কেন? বড় ভাল লাগে, আমাদের যেন কিসে ভুলিয়ে রেখেছে। তবু, গলায় গলায়, হাতে হাতে ধ'রে বেড়াই। তার মাঝে কেন, এ কিসের ছায়া পড়ে? গান শুনি, হঠাৎ চোখ জলে ভ'রে আসে—জবা অবাক্ হয়ে মুখের পানে তাকায়, বলে, 'কেন গান শুনে তোমরা কেঁদে ফেল, আমি আর গাইব-টাইব না বাপু হ্যাঁ—কেবলই তোমাদের কান্না। সোন্দরে বুঝি কাঁদে? তুমি ত সোন্দর, তুমি কেন কাঁদ্‌বে?' তার কথার ভাব পাইনে—বুঝ্‌তে পারি না—কি এ।

সুখ-দুঃখ অনেক দেখলাম, দুঃখ সুখের কথা অনেক শুন্‌লাম, কিন্তু আমার মত দুঃখী কে আছে কমল! এ দুঃখের মাঝে জবা কেন এল। আমার—আমার,

আবার যে প্রাণে কি জেগে ওঠে নাথ! মনে যা ভাবি, তা মুখে ফুটতে পারি নি। মনের এ কান্না ভাষায় বুঝি ফোটে না। শুধু জ্বালাই জ্বলে। হায়! নারীর মন—সে যে অতটুকুও সইতে পারে না। তবে যার দুঃখের সমুদ্র, তার আর দু একটা নদীর ধারে কি করবে—যেখানে মিশবে, সেইখানেই প্রথম কোলাহল, তার পর একই—সমুদ্রে সব মিশে এক। দুঃখে আর ডরাই নি নাথ, যদি তোমায় পাই—আঁধারে কে রাখে ভয়! সুখ-দুঃখ সবই এখন তুমি।

চিঠিতে জানাতে চাই পরের কথা, কিন্তু নিজের কথাই সব ভ'রে ওঠে। যতটা খালি থাকে, সবটাই নিজের নিশ্বাসে—আরশিতে মুখ দেখতে গিয়ে যদি নিশ্বাস পড়ে, আর মুখখানা দেখা যায় না—আমার চিঠিখানাও তেমনি নিশ্বাসে ভিজে উঠে—সব মুছে যায়। আরশিতে নিজের ছবি পড়লেই তখন যে আমার নিশ্বাস পড়ে, সে নিশ্বাসে সবই যে কেমন হয়ে যায়। একটী একটী ক'রে সুখের কুঁড়ি ফুটিয়ে তুলব মনে করেছিলাম, আজ দেখছি, একটী একটী ক'রে ঝরেই গেল—তারা ফুটতে আর পেলে না। এত সব সাধ, অকালে হেলায় বুঝি ম'রে গেল। আর তারা আমার সুখের সখী হ'ল না।

আজ কয়দিন ধ'রে মন যেন কি হয়ে রয়েছে—দুর্দ্দাম তৃষার জ্বালা আমায় যেন আগুনের মত সংহার করতে চায়। এ কি আর মিটবে না। আর একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বলতে হবে—বল, বাঁচব কি মরব—একটা কথার উত্তর দাও। আর তোমায় সে—এর উত্তর পেলে আর তোমায় বলব না—শুধু বল, বাঁচব কি মরব? জীবন ত তোমার হাতে অনেক দিন ফে'লে দিয়েছি। মৃত্যুও তোমার হাতে ফেলে দিলাম। বল, শুধু একবার তারই উত্তর দাও। হে জন্ম-মরণ-হরণকারী রূপ—আমায় সেই কথাটা ব'লে যাও—জীবনে আর তোমায় কোন কথা বলব না।

সকাল থেকে দেখতাম, গাছে মুকুল দুলছে, দুজনে সমুদ্রতীরে কত কথা কয়েছি—সে কথা ফুরুত না। যখন সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকারে ছেয়েছে, তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে ও সমুদ্রের হাওয়ায় হো হো হলহলা উঠেছে—তখন সেই মুকুল, ফুলের পাপড়ি খুলে নিজেকে যখন দুলতে দুলতে ফুটিয়ে তুলেছে, সন্ধ্যা-তারকায় আলো তার মুখখানির উপর পড়েছে, তখনও কথা ফুরুত না। শেষ চুম্বনেও সে ফুরুত না—ফুলটা তাই দে'খে কত হাসত! আমরাও হাসতাম, আবার চুমুতে এক হয়ে যেতাম—আর আজ একটা কথাও মেলে না। দেখি, ফুল ফুটলে ঝরে, আমি যে কবে ফুটলাম, আর কবে ঝরে গেলাম! ইতি

মায়া।

(মায়া—নগেন)

দেখ, ছোট ছেলে যেমন দিনে দিনে বড় হয়, তার প্রকৃতিকে জগতে জানায়, যেমন বিষাক্ত ফুল ফুটলে ধীরে ধীরে তার বিষে সর্ব্বলতাকে জর্জ্জরিত করবার জন্যে

বিষ ছড়ায়, আজ তোমার মুখো যে সয়তান দিন দিন পুষ্ট হয়ে আস্‌ছিল সে তার পূর্ণমূর্ত্তিতে প্রকাশ হয়েছে। কি ভয় দেখাও পুরুষ! সংহারের? তুমি কি মনে কর, নারী বড় দুর্ব্বলা, তুমি মনে কর নারী ধুলার কীট, তাকে অবাধে পায়ে দ'লে চ'লে যেতে পার্‌বে? তুমি কি মনে করেছ এ জগতে তুলাদণ্ড নেই, যে তোমার ওই সংহারের ওজন কর্‌বে না?—কর্‌বে,—কর্‌বে,—কর্‌বে! তখন বুঝ্‌বে—সত্য আছে কি না। ধর্ম্ম আছে কি না। অপরাধ তোমার কি আমার। অপরাধ ক'রে থাকি, তার শাস্তি বহন কর্‌তেও প্রস্তুত থাক্‌ব। বলেছি ত সম্পর্ক নেই, তবু কেন এ আহ্বান?

আমি প্রলাপ সৃষ্টি করেছি, আর তুমি প্রলয় কর্‌বে, পার কর। কিন্তু জেন, যে গড়্‌তে পারে সেই ভাঙ্‌তে পারে। সৃষ্টি যদি আমি ক'রে থাকি, আমি যদি গ'ড়ে থাকি, আমিই ভাঙ্‌তে পারি—এ বিশ্বকে রেণু কর্‌বার শক্তি তোমার নেই। আমার সহ্যের সীমা আছে জেন। জেন নারী আরো ভীষণ, যাতে উপরে আগুন দেখা যায় না তার ভিতরেই বেশী আগুন থাকে। যেখানে সমস্ত নিঃশব্দ, সেইখানেই সকলের চেয়ে আলোড়ন। বৃথা—বৃথা—আমায় তোমার সংহার-ছবি দেখাচ্ছ, সে ভয়ে নারী কখন ভয় মানে না। উত্তর দিতে ইচ্ছা ছিল না—তবু দিলাম, তোমাকে বোঝাবার জন্যে। বোঝ!

'ম'

কমল—মায়া।

মায়া!

রুদ্রদণ্ড সহ্য কর্‌বার শক্তি যদি তোমার থাকে, তবে এই চি আমার পড়ো—আর তা যদি না পার, তবে না পড়ে গোড়ায় সাম্‌লে যেয়ো, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ো। আজ আমার ব্যবহার, এত দিনের ব্যবহার,—শাস্তি কি শান্তির আশীর্ব্বাদ, তাই ভেবে দেখ। তুমি কি বুঝ্‌বে, এ অন্তরে কি বিশ্বদাহনকারী ব্যথা নিয়ে কাটিয়েছি। তুমি কি বুঝ্‌বে, এ বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মাঝে সমস্ত সুখ ত্যাগ কর্‌বার প্রাণ কত বিস্তৃত—উদার অনন্ত আকাশের মত—মেঘের রোল ও বজ্রের দাহন! অর্থ, যশ, মান, ভোগ কর্‌বার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পেয়ে যে সে সুখকে অবাধে হেলায় ফেলে দিয়ে স'রে রয়েছে—সে নিজে শাস্তি বহন কর্‌ছে, না শাস্তি দান কর্‌ছে? এই বোঝ। আজ তোমাকে কিছু বল্‌তে চাই। জানি না, এরপর আবার তোমায় বল্‌ব কি না। বহুদিন পূর্ব্বে তোমায় বলেছিলাম যে, বাতাসও তোমার কথা এখানে কানাকানি করে না। কেন তবে এ ঊর্ণনাভের মায়া-জাল রচনা ক'র্‌তে এত সাধ—এত আকাঙ্ক্ষা! তুমি চাও সুখ, তুমি চাও রূপ, তুমি চাও সম্ভোগ,—আমি চাই না রূপ, আমি চাই না সুখ, আমি চাই না সম্ভোগ। তুমি চাও সমস্ত সংসার হেজে

যাক্ পুড়ে যাক্, তোমার ওই প্রাণের সাধ, আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি লাভ হোক্, আমি চাই—আমার এ সুখের—দেহের—মনের সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের বিসর্জ্জন দিলে সংসার যদি বজায় থাকে, সংসারে শান্তিলাভ হোক্। তোমায় আমায় মিল্‌তে পারে না—মিল্‌তে পারবেও না। একই সূর্য্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে পৃথিবীর গতির একধারা, দক্ষিণায়ণে আর একধারা। তুমি তোমার সুখকে, শুধু আপনার উপভোগের মধ্যে গণ্ডী দিয়ে রেখেছ, যেখানে পথ পাচ্ছ সেইখানে আপনাকে নিয়ে গিয়ে সুখের আগ্রহ পূর্ণ করতে যাচ্ছ, আমি আমার সুখকে যেখানে পথ পাচ্ছি, সেইখান থেকে তাকে বা'র করে নিয়ে অন্যের জন্যে সে স্থান খালি ক'রে এগিয়ে দিচ্ছি। তবে কেন আর আমায় তোমার এ মায়া-ডোরের বাঁধন দিতে চাইছ বল?

তোমায় আমায় যখন প্রথম দেখা-শোনা—সে কথা আমি ভুলি নি। তুমি আমায় চাও, তা জানি, আমিও যে তোমায় চাই তাও তুমি জান। আমি ভুলি নি—কিন্তু সে এখন আলাদা জগতের কথা। তোমায় বল্‌তে নেই যে, আমি চাই। আমায়ও বল্‌তে নেই যে আমি চাই। যদি নিজের সুখ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে আমার তৃষ্ণা হ'ত, তা হ'লে তোমার বিয়ের দিন তার বদল করতে পারতাম কিন্তু তোমার পিতার ইচ্ছা তা ছিল না, আমার প্রাণের ভায়ের ইচ্ছা তোমায় লাভ করে, উভয়ের মনের আঘাতকে দেখে আমার সুখের ইচ্ছাকে আমি বলি দিয়েছি। যে দিন বুঝ্‌লাম,—ইন্দুদিদি, বৌদিদি, নগেনের সঙ্গে তোমার বিবাহের জন্য উৎসুক, আর তোমার, তা থেকে—তোমার দিক্ থেকে কোন প্রতিবাদ হয় নি—তখন আমি হাস্‌লাম, ভাবলাম—নারীর চঞ্চলমতি। চিলে যেমন তার খরনখে কপোতের হৃৎপিণ্ড ছেদন করে, তেমনি করে নিজে নিজের হৃদয়কে ছিন্ন ক'রে ফেল্‌লাম—সেই শুধু দু ফোঁটা জল পড়েছিল, সে শুধু, আমি মানুষ ব'লে। তার পর সমাজ আমার কাছে দেবতা, ভাই আমার কাছে আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ, তাদের রক্ষা আমার ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বস্বত্যাগে সেই ধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্য আজিও প্রাণপণ যত্নবান্। বল্‌তে পার সকলের পানে তাকালে, কেবল তাকাও নি আমার দিকে। সেটা তোমার ভুল, যখন বুঝ্‌লাম, এদের মঙ্গলে তোমার মঙ্গল; যখন বুঝ্‌লাম, নগেনের কল্যাণই তোমার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, তখন তোমার দিকে পূর্ণমাত্রাই তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম, যে আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব—তাকে এ দারুণ অবস্থায় কেমন ক'রে সুখী করব। আজিও তুমি হৃদয়সর্ব্বস্ব আমার, কিন্তু সে সম্পর্ক হৃদয়ের, দেহের নয়। সে সম্পর্ক অনুভবের, ভোগের নয়; সে সম্পর্ক রূপ-সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি, সম্ভোগের জ্বালা নয়; সে সম্পর্ক বিশ্বের আত্মার, গণ্ডীর 'আমি'র নয়; সে সম্পর্ক নরনারীর নয়, সে সম্পর্ক প্রাণের 'তুমি, তুমি।'

অনেক দিন অনেক কথা মনে হয়েছে, তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি

এ কথা আর তোমায় বল্‌তে নেই। তুমি আর আমার সেই কমলালেবু-গাছের তলার কুটস্থ মায়া নও, সংসারে রঙ বদ্‌লে গেছে—এখন তোমায় ভালবাসি বল্‌তে নেই—শুধু তোমায় ভালবাসি বল্‌তে নেই, বল্‌লে—আবার বাজ পড়বে, সব জ্ব'লে যাবে। ভালবাসি বল্‌লে সব গাছের পাতা নিশ্বাসে শুখিয়ে যাবে, শ্মশান হয়ে যাবে। কাউকে এ কথা জগতে বলতে নেই—কেবল লুকিয়ে রাখতে হয়, বললেই সব ধোঁয়া হয়ে উড়ে পুড়ে যায়। ছাতায় বাঁধলে মাটীর সঙ্গে আমি বাঁধা, এখন শুধু তোমায় ভালবাসি বল্‌লে হবে না। আমি গাছপালা, পাতা, ফুল, মানুষ, আকাশের সকলেরই ও সবাই আমায় ভালবাসে, আমি তাদের 'ভালবাসির'—তুমিও যেমন আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, জবাও তেমনি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, নগেনও তেমনি আমার প্রাণস্বরূপ, এই ফুলটাও তাই—কেননা, আমার হৃদয় আমার নয়—সে ওই মাটীর।

গভীর নিশীথে যখন মেঘ অন্ধকার ক'রে এসেছে, ঝিম্‌-ঝিম্‌ ক'রে ঝিল্লিকার কুহক-তালে, মন্ত্র যখন ঘুমের বুড়ি পড়্‌তে আরম্ভ করেছে, ভেকের ডাকে আর মেঘের আলোতে যখন গাছের তলায় বেড়াতে বেড়াতে তোমার নাম ক'রে ডেকেছি, সমস্ত প্রকৃতি চমকে উঠেছে, গাছগুলো নিশ্বাস ফেলেছে, বিদ্যুতের আলো যেমন গাছের একটি একটি পাতায় চমকে উঠেছে, তখন তারা বলেছে, ও কথা বলতে নেই, একা ভালবাসি বল্‌তে নেই, আমরা কি তোমার পর, আমরা যে তোমায় ভালবাসি। ও গাছ বলেছে আমি যে তোমায় ছায়া দি, মেঘ বলেছে আমি যে জল দি, ঘুমের বুড়ি বলেছে, আমি যে তোমার ক্লান্তি দূর ক'রে নিদ্রা ঢেলে দি, যখন ঘুমাও, তখন তোমার শিয়রে ব'সে মাথায় হাত বুলিয়ে দি, শুধু, শুধু তাকেই ভালবাস?'—আমি ত তোমার একলার নয় মায়া!

হে আমার প্রাণের অধিক প্রাণ, হে আমার নিভৃত হৃদয়ের শান্ত সুন্দর, হে আমার জগৎপ্রতিমার মাধুর্য্যে ভরা মানসী প্রতিমা, আমি শান্তি চাই! আমি বন্ধন চাই না, মুক্তি চাই! আমি গৃহকোণে আঁখির ভিতরে বিশ্ব দেখতে চাই না, বিশ্বের মধ্যে তোমার আঁখি দেখ্‌তে চাই। বিশ্বের মাঝে তোমায় ভালবাস্‌তে চাই! বিশ্ব থেকে ছিঁড়ে এনে চাই না। সমুদ্রে বারিবিন্দু উপভোগ করতে চাই, ও বিন্দুতে পিপাসা আমার মিটাতে চাই না, সুখ চাই না, সুখের সাগরে মিশ্‌তে চাই। মধু পান কর্‌তে চাই না, মধু হ'তে চাই। প্রেমিক হ'তে চাই না, প্রেম হ'তে চাই। সত্য উপলব্ধি কর্‌তে চাই না, সত্য হ'তে চাই! পূজো আর কর্‌তে চাই নে, পূজোর ফুল হ'তে চাই। ঘাসের ফুল থেকে আকাশের তারার সঙ্গে এক হয়ে থাক্‌তেই চাই। আর সেব্য-সেবক হয়ে প্রতিমা আঁক্‌বার শক্তি চাই না।

আর দুটো কথা ব'লে শেষ করব। বাঁচা ও মরা—জন্মমৃত্যুর দায়িত্ব যার যার নিজের, আমি তোমার জীবন অধিকার করি নি—মৃত্যুর কথা ত ছেড়েই দাও। যা তোমার

অধিকারে নেই, তা আবার অন্তে অধিকার করবে কি ক'রে? কেউ কাকেও অধিকার করতে পারে না। অধিকার নিজের উপর নিজেরই নয়—নেই। ও বিষয়ে উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই।

দেখ, কেউ কেউ সংসারে আসে, তাদের সুখ সয় না—দুঃখ সয়। একটুখানি সুখও তারা সইতে পারে না, আর দুঃখের বোঝা তার শিরে চাপিয়ে দাও—বহন করবে। যারা কেবলই সুখ চায়, তারা পায় না; যারা সুখ চায় না, তারাই সুখ পায়। তুমি যে সুখের জন্য ভগবান্ ত্যাগ করলে, যে সুখের জন্য অগ্নিসাক্ষী স্বামী ত্যাগ করলে, সে সুখ কতটুকু পেয়েছ, তার চেয়ে দুঃখ কতখানি বেশী। সংসারে যেমন আলো অন্ধকার, এ পিঠ আর ও পিঠ,—তেমনি সুখ আর দুঃখ দুই পাশাপাশি। যতই তুমি জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে—ততই সে তোমার উপর জোর ক'রে আসবে। তুমি সমস্ত জগতের মাঝে থেকে তোমার সুখকে আলাদা করে নিতে গিয়েছ, জগৎ দিয়েছে সেই সঙ্গে তার অনন্ত দুঃখের ভার। তার সুখ নিলে দুঃখ দেয়—তার দুঃখের ভার নিলে সুখ দেয়। এই রীতি—এই নিয়ম। বিচ্ছিন্ন করাই দুঃখ, বিচ্ছিন্ন করাই পাপ। এ পাপে মগ্ন আর হয়ো না।

যত দিন আমি এ ধরায় আছি, তত দিন আমি শুধু তোমার নয় জগতের। এ আমি একা কিছুই নয়। জগতের মধ্যে আছি, তাই আমি। যদি কখন মনের অবস্থা তোমার পরিবর্ত্তন হয়, যদি কখন বুঝতে না পার, অনুভব করতে পার, যে সংসার তোমা ছাড়া নয়—তবে যেন আমার কোন বিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করতে সাহস ক'র না। আমি এ ধরায় কার উপর কোন অধিকার নিয়ে আসি নি—তবে আসি। ভগবান্ তোমায় শান্তি দিন। আমি অনন্তগতি।…ইতি

কমল।

কপটী

[অনুবাদ]

ওগো সুন্দর! ওগো মনোরম!
লুকায়ে রয়েছ মন্দিরে মম
ধরিয়া গোপন ফাঁসী;
পলাইতে চাই, পথ নাহি পাই,
সবলে চরণে টানিছ সদাই,
মুখে মৃদু মৃদু হাসি!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সারেঙী

(১)

অসময়ে জরা তাহার শুক্‌না হাতের পরশ আমার সর্ব্ব অঙ্গে বুলাইতেছিল; কিন্তু লোকে তখনও আমায় সুন্দরী বলিত। আমিও আর্‌শির ভিতর নিজের রূপ অহরহঃ দেখিতাম। হাঁ, সুন্দরী বৈ কি! দেখিতাম, কাল মেঘের মত আঁধার কেশজাল তেমনি ঘোর করিয়া আমার রূপকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া ছাইয়া আছে, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে যেন সমস্ত রস শুকাইয়া লইয়া, শুধু মাদকতার অগ্নি-রেখাটুকু ক্ষীণ জিহ্বার মত লক্‌লক্‌ করিতেছে, সে মেঘে বরিষার বর্ষণের কোন আভাস নাই। তবু রূপ নিভিবার পূর্ব্বে তৈলহীন দীপের মত থাকিয়া থাকিয়া জলিয়া উঠিতেছিল। সুন্দরী ত বটেই। যদি সুন্দরীই না হইব, তবে এ রূপের কি এত দর হয়?

ছিল—সমস্তই ছিল। এই রূপ—এই ঐশ্বর্য্য—বিলাস-ব্যসনার লক্ষ বাহু-ফাঁস তখনও এই শ্লথচর্ম্ম শিথিল পেশীর বিজড়িত শিরার বাসনাসিক্ত প্রবাহের মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া ছিল। এত ভোগ করিয়া ও ত নিবৃত্তি হইতেছিল না। তাই এই রূপের বিপণিতে রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা সমস্তই বিক্রয় করিতে বসিয়াছিলাম। আমি ক্রেতা বুঝিয়া দর করিতাম। উচ্চমূল্যে—হাজার হাজার আস্‌রফির বিনিময়ে নিশায় নিশায় আত্মবিক্রয় করিতাম। সে বেচায়-কেনায় সুখ ছিল না। ছিল জ্বালা—কিন্তু তবু লালসার বহ্নি নিভিত না।

দিল্লীর বড় বড় ওমরাহ—বড় বড় রাজা মহারাজা—আমার দ্বারে দ্বারী। বোধ হয়, তাহারা আমার সুকোমল হস্ত হইতে এক পেয়ালা সিরাজীর পরিবর্ত্তে আপনার তৃষাতুর বক্ষের এক পেয়ালা উত্তপ্ত রক্ত মাপিয়া দিতে কোনই কুণ্ঠা তাহাদের ছিল না, দ্বিধাও করিত না। এমন কি, আমার বহ্নিজ্বালা-দীপ্ত বিলোল কটাক্ষের তীক্ষ্ণ সায়কে বিদ্ধ ও আত্মহারা হইয়া তাহাদের গৌরবান্বিত উষ্ণীষ আমার পদতলে লুটাইয়া দিতে পারিলে পরম কৃতকৃতার্থ মানিত।

কিন্তু এত করিয়াও আপনাকে ভুলিতে পারি নাই। বাসনার ভরপুর পরিবেশন করিতাম, বুভুক্ষু হৃদয়ের ক্ষুধা মিটিত না। প্রাণের ভিতর প্রত্যহই কি যেন কিসের অভাব গুমরিয়া মরিত। এত বিলাস-সম্ভোগের মধ্যেও যেন সময়ে সময়ে হৃদয়ের কোন অজানা তারের মধ্যে সহসা কে আসিয়া ঝনাৎ করিয়া তারের ভিতর হইতে একটা ঘা দিয়া ঝনন্‌ করিয়া আপনা আপনিই বাজিয়া উঠিত। সে ঝঙ্কার মর্ম্মের প্রত্যেক

রাগিণীর সহিত তীব্র মর্ম্মভেদী মূর্চ্ছনায় আলাপ করিতে করিতে আমাকে তন্দ্রাহত ও অবশ করিয়া ফেলিত ! গৃহভিত্তি হইতে অন্তর, বাহির, আকাশ ও বাতাস হাহা করিয়া কাটিয়া যাইত।

(২)

আমার স্বামী মোগল রাজদরবারের একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। পুরুষোচিত পৌরুষ ও রূপ এবং কণ্ঠভরা সুর ও মেঘগম্ভীর স্বর ছিল বলিয়া রাজ-দরবারে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। এই রূপ এবং সুরই তাঁহার কাল হইয়াছিল ! এই সুর আর রূপ উভয়ে মিলিয়া তাঁহার জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার এই অসামান্য রূপ ও সুরের প্রভাবে অনেকেই তাঁহাকে প্রাণমন পর্য্যন্ত সঁপিয়া দিতে পারিত, আবার কেহ বা নিতে পারিলেও ছাড়িত না ! কিন্তু জানি না—কেন—হতভাগিনী আমি—তাঁহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারি নাই। আমি চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাঁহার সেই ভালবাসায় কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতাম না, তৃষা মিটিত না। সহস্রমুখী তৃষা অন্তরে অন্তরে লোলরসনা লকলকি জ্বলিয়া মরিত। স্বামী অহর্নিশি আমার কর্ণে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় গ্রামে-গ্রামে সঙ্গীতের মদিরা ঢালিয়া দিতেন, আমি তন্ময় হইয়া শুনিতাম কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রামে যে অভাব অহরহঃ জ্বলিয়া মরিত তাহার তৃষা মিটিত না, তাহাকে আরও ক্ষুরধার করিয়া তুলিত।

আমরা তখন আগ্রায় থাকিতাম। অদূরে সুনীল গগন-চুম্বী শুভ্র তাজমহলের উন্নতশীর্ষ মিনারগুলি আমাদের বাতায়নপথ দিয়া বেশ পরিষ্কাররূপে দেখা যাইত। বসন্তের শ্যাম সন্ধ্যালোকে চন্দ্রচ্ছায়া-উদ্ভাসিত যমুনার অশ্রান্ত উৎফুল্ল তরঙ্গগুলি যখন আবেগভরে নাচিয়া নাচিয়া নিদ্রিতা তাজ-বিবির পদতল ধৌত করিয়া দিত, আমি তখন ছাদের আলিসায় ঠেসান দিয়া বসিয়া বসিয়া স্বামীর নিকট সারঙ্গ শিক্ষা করিতাম। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই সঙ্গীত লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি বড়ই নির্জ্জনপ্রিয় ছিলেন। বহির্জ্জগতের কোলাহল তাঁহাকে বড় একটা উত্যক্ত করিতে পারিত না। অশ্রু-টলটল উদাস আঁখি দূর আকাশ ও জলরেখার পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতেন, কখনও আমাকে কিছু বলিতেন না।

দিন গেল সহসা একদিন স্বামী বাড়ী ফিরিলেন না। রাত্রি গেল, প্রভাত হইল, ভাবনায় আকুল হইলাম। সখী গুলসানার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। গুল শুনিয়া আসিল, দিল্লীর তক্তের বিরুদ্ধে এক ভীষণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় সরকার তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন। তাঁহার মত মানুষ যে কখনও কোন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ও জড়িত থাকিতে পারে, এ কথা আমার প্রথম একেবারেই বিশ্বাস হইল না।

রাজাজ্ঞায় স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। পিতা আমাকে লইয়া দিল্লী আসিলেন। অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজাদেশ প্রত্যাহৃত হইল না।

তার পর বৎসরেক কেহই স্বামীর কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন নাই। একবার লোকমুখে জনরব শুনিয়াছিলাম যে, তিনি বন্দী নন; পলাইয়াছেন, পারস্যের শাহ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন; কিন্তু কিছু দিন পরে অকস্মাৎ খবর আসিল, জনরব মিথ্যা,—কাশ্মীরের রাজপথে তাঁহার বস্ত্রাহত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া পিতা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। দুঃখে, দারিদ্র্যে, অনাহারে দুশ্চিন্তায়, অপমানে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনিও আমায় কাঁদাইয়া ফেলিয়া পলাইলেন।

আমি তখন একা। আশ্রয়হীন, অর্থহীন, সহায়হীন। সব গেল—কেবল গুল যায় নাই। দিন যায়, মাথা রাখিবার আশ্রয়, আর পেটের ক্ষুধার খাদ্য—তাহাও রহিল না। তাহার উপর সরকারের তাড়না। গুল আশ্বাস দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি স্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতাম,—মনে করিলাম, সঙ্গীত অনুশীলন করিয়া নিজের দিন গুজরাণ করিব। কিন্তু পারিলাম না। লূতার ন্যায় আপনার লালায় জড়িত জালে আপনি জড়াইয়া মরিলাম! ভিতরের,—প্রাণের ভিতরের জ্বালাময়ী সঙ্গীতের সুর আমাকে বাহিরে টানিয়া আনিল!

(৩)

রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া সারেঙ্গী গাইতেছিল—

"চল চল রে ভঁবরা কঁবল পাস।
তেরা কঁবল গাবৈ অতি উদাস॥
খোজ করত বহ বার বার।
তন বন ফুল্যো ডার ডার॥"

শুভ্র জ্যোৎস্না। তাহার করুণ-সঙ্গীত দখিণা হাওয়ায় বাতায়নপথে আসিতেছিল। সে দিন বাদ্‌শাহের প্রধান অমাত্য আমার অতিথি। আমি কি তখন জানিতাম যে, তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় আমার স্বামী ষড়্‌যন্ত্র অপরাধে অপরাধী স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন—তিনিই আমার স্বামীকে সরাইয়া নিজে তাঁহারি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর আমি তাঁহারই মুখে সিরাজী তুলিয়া ধরিয়া দিলাম! প্রাণে কি যেন একটা অস্বাভাবিক আনন্দ বোধ হইতেছিল! রমণীর সমস্ত কঠিনতম রাক্ষসী প্রবৃত্তিগুলা সে দিন উত্তমরূপেই আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল। অজ্ঞাতে প্রাণের ভিতরে তীব্র জ্বালাময়ী সাপিনীর গরল ঢালিবার জন্য প্রাণ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতে আমিও যেন তার বশীভূত হইয়া পড়িতেছিলাম। অমাত্য আমায় জানিতেন কি না, আমি তাহা জানিতাম না। আমি দিল্লীতে ছদ্মনামেই পরিচিতা ছিলাম।

সারঙ্গী পুনরায় গাহিল—

"খোজ করত বহ বার বার
তনবন ফুল্যো ডার ডার"

অকস্মাৎ কেন যে আমার হস্তস্থিত পানপাত্র কাঁপিয়া উঠিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না! ডাকিলাম,—"গুল্! গুল্!"

আমার পরিচারিকা আসিল। আমি তাহার হাতে একটি 'আঠ্-আন্নী' দিয়া বলিলাম,—"যা, সারেঙীকে দিয়ে আয়।"

সারেঙী তখনও তন্ময় হইয়া বাজাইতেছিল। কি সুরের দোল—কি ঝঞ্ঝনা—রুদ্ধ-যাতনার রুদ্ধ-নিশ্বাস হা হা করিয়া যেন কাটিয়া পড়িতেছিল। একবার মনে হইল—ডাকি। পরক্ষণেই ভাবিলাম, অমাত্য কি মনে করিবেন। আত্মহারা হইয়া তাহার তন্ত্রীর প্রত্যেক মীড়্ শুনিতে লাগিলাম। আমার প্রাণের ভিতরও একটা অব্যক্ত সুর খেলা করিতেছিল! সেও যেন,—বহুদিন ধরিয়া সেই কাহাকে

"খোজ করত বহ বার বার"

কিন্তু তন্নুবনে এখন আর সে ফুলের সৌরভ ত নাই। আমি অমাত্যের মুখে পানপাত্র তুলিতে ভুলিয়া গেলাম।

তিনি গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন—"রুমিয়া!"

পরিচারিকা সারেঙীর হস্তে 'আঠ্-আন্নীটি' দিল। সারেঙী খোদাতাল্লার নামে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। আমি দূর হইতে তখনও তাহার রাগিণী শুনিতে পাইতেছিলাম। নির্নিমেষ-নেত্রে জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সুর শূন্যে মিলাইয়া গেল।

গুল্ ফিরিয়া আসিল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—গুল্ আমার বাল্য-সঙ্গিনী। স্বামী তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। কিন্তু সে আজও আমায় ছাড়িতে পারে নাই। বোধ হয়, এই পাপিষ্ঠার জীবন-ইতিহাসের পূর্ব্বপৃষ্ঠার সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য বিধাতা কেবল এই গুল্‌কে এখনও কালের ঝঞ্ঝায় ঝরিয়া পড়িতে দেন নাই।

(৪)

সমস্ত কৃষ্ণপক্ষ চলিয়া গিয়াছে—সারেঙী আসিল না। কেন জানি না, অহর্নিশি প্রাণের ভিতর কেন সেই রাগিণী আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া উঠিত! একদিন সন্ধ্যায় জানালার পাশে একাকিনী বসিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম।—কত কথাই না মনে হইতেছিল! বোধ হয় জীবনের পরিণাম ভাবিতেছিলাম!—সব অন্ধকার!

নাঃ—চিন্তা মোটেই ভাল লাগে না। চিন্তা অসহ্য! চিন্তা করিয়া করিব কি? সারঙ্গ লইয়া গাহিতে বসিলাম। ভাল লাগিল না। গলাটা কাঁপিয়া উঠিল। কি এক অজানা আকর্ষণ কণ্ঠ চাপিয়া বসিল। সারঙ্ বেসুরা বলিতে লাগিল, গাহিতে পারিলাম না। আমার মনের অলক্ষ্যে কেবল অস্ফুটস্বরে গাহিলাম—

"খোজ্ করত বহ বার বার
তনবন ফুল্যো ডার্ ডার"

বার বার সেই কলিটা গাহিতেছিলাম। এমন সময় হাসিতে হাসিতে গুল্ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমার মুখে তখনও সেই কলিটা লাগিয়া রহিয়াছিল।

গুল্ বলিল,—"কই—সে সারেঙ্গী ত আর আসে না?"

আমি বলিলাম,—"না, সে ত অনেক দিন হয়ে গেল। কেন—তার কি হয়েছে বল্ দেখি?"

"ভিখিরী মানুষ, হয় ত বা কোথায়ও গিয়ে থাক্‌বে।" পাঁচ বাড়ী ঘুরে বেড়াতে হয় ত!"

আর পর আবার সেই শুভ্র জ্যোৎস্না—নক্ষত্রখচিত বিভাবরী! আমার পাশে অমাত্য বসিয়াছিলেন। একদিকে প্রাণের ক্ষুধা, অন্যদিকে সেই সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া প্রতিহিংসা অহরহঃ আমায় জ্বালাইয়া পোড়াইতে লাগিল।

সহসা দূরে রাজপথ ধ্বনিত করিয়া সারেঙ্গী গাহিল :—

"তুঝ্‌সে হাম্‌নে দেল্‌কো লাগায়া
যো কুছ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
এক্ তুঝ্‌কো আপনা পায়া
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়॥"

আমি স্তব্ধ হইয়া গানটি শুনিলাম। তাহার সমগ্র প্রাণের বেদনাপ্লুত মুকভাষা যেন সঙ্গীতের প্রত্যেক রাগ ভঙ্গে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া দিতেছিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম—"গুল্! গুল্!"

গুল্ আসিল। আমি সেদিনকার মত আজও তাহার হাতে একটি 'আঠ্‌-আন্‌নী' দিয়া বলিলাম,—"যা, সারেঙ্গীকে দিয়ে আয়।"

গুল্ চলিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিলাম,—"তা'কে বল্‌বি, সে এতদিন আসে নি কেন? আমি তা'র গান শুন্‌তে বড় ভালবাসি—সে যেন আসে।"

গুল্ চলিয়া গেল। আমি উৎকর্ণ হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ পুনরায় তাহার মনোরম সঙ্গীত শুনিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দূর হইতে শুনিলাম, সারেঙ্গী বলিতেছে,—"তুমার দাতা মনিবকে বলিও, আমি অসুস্থ ছিলাম, তাই আসিতে পারি নাই—এবার আসিব।"

এই বলিয়া পুনরায় গান করিতে করিতে সে চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া জানালার পার্শ্বে গেলাম, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। শুধু দূর হইতে শুনিতে পাইলাম,—

"তুম্‌সে হাম্‌নে দেল্‌কো লাগায়া,
যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।"

(৫)

আর এক কৃষ্ণপক্ষ চলিয়া গেল—সে আসিল না। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, আমি কান পাতিয়া বসিয়া থাকিতাম, তবু সে আসিল না। আমার প্রাণের সমস্ত রুদ্ধ সুর যেন জমাট বাঁধিয়া আর্তনাদ করিতেছিল—তবু সে আসিল না!

আমি পীড়িতা হইয়া পড়িলাম। দুর্ব্বল—বেদনাপ্লুত দেহভার লইয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। তবু কেবল তাহারই কথা মনে হইত—কই সে ত আসিল না!

এই বিশ্ব-সংসারে একাকিনী আমি—আমার আপনার বলিতে ত কেহ ছিল না। একাকিনী শুইয়া শুইয়া কত কথাই মনে পড়িত, কিছুই ভাল লাগিত না। কিন্তু কেন জানি না, সর্ব্বদাই সারেঙ্গীর কথা মনে পড়িত! সন্ধ্যা আগত হইলেই প্রাণটা যেন কেমন সাড়া দিয়া উঠিত! বুঝিতে পারি নাই কেন—কেমন করিয়া—কোথা হইতে এই দরিদ্র ভিখারী উদ্‌ভ্রান্ত গায়ক আমার নিভৃত চিত্তের অন্তরালে গিয়া কিসের যবনিকা সরাইয়া দিতেছিল। অথচ আমি তখন ভাবিতেছিলাম, কেমন করিয়া এ জ্বালা আমার মিটিবে।

দেখিতে দেখিতে আবার শুক্লপক্ষের আবির্ভাব হইল—আবার চন্দ্রোদ্ভাসিত রজনী পৃথিবীর বিশুষ্ক বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। আমি উন্মুক্ত বাতায়নের পাশে গালিচা পাতিয়া বসিয়া ছিলাম।

গুল্‌ ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বাহিনী! সেই সারেঙ্গী এয়েছে।"

আমি শুনিলাম—

"ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা,
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা—"

গুল্‌ সারেঙ্গীর হাতে তাহার যথারীতি প্রাপ্য দিয়া বলিল,—"আবার এসো। মনিবের বড় অসুখ করেছিল,—তিনি সর্ব্বদাই তোমার গান শুনতে চাইতেন।"

"তিনি এখন কেমন আছেন?"

"একটু ভাল।"

"খোদা তাঁকে আরোগ্য করুন। আমি আবার আসিয়া গান শুনাইব।"

আমি অতিকষ্টে জানালার শিক্‌ ধরিয়া দাঁড়াইলাম। দূর হইতে গৌরবর্ণ অতি দীর্ঘকায় শ্মশ্রু-বিলম্বিত বৃদ্ধ সারেঙ্গীকে দেখিতে পাইলাম। সে তখনও গাহিতেছিল:—

"ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা,
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা—"

(৬)

বৈশাখী পূর্ণিমা। দূরে পশ্চিমাকাশে মেঘ দেখা যাইতেছিল। আমি তখন সারিয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু তবু যেন আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। দুরন্ত হাওয়া চারিদিকে হা-হুতাশ করিতেছিল। সে দিনও অমাত্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন। আমি মেঘমল্লার গাহিতেছিলাম—

"এ মেঘে, বরিখন্ আওয়ে দে রে পানি—
পৃথিবীয়ান্ অব্ বাদেরা হো।
চন্দ্রসুধাংশু মেরা, রস রঙ্গিলা
অব্ বাদেয়া হো॥"

নীলাঞ্জন পিঙ্গলবরণ নভে আরও ঘোর করিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল। অমাত্য স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। এমন সময় গুল্ আসিয়া আমার কানের কাছে কহিল,—"সারেঙ্গী।"

নিমেষে আমার সমগ্র চিন্তা জানালার পথ দিয়া রাজপথের দিকে ধাবিত হইল। আমি শুনিতে লাগিলাম। সারেঙ্গী শুধু বাজাইতেছিল—তাহার কণ্ঠে আজ গান নাই! তাহার যন্ত্র আমার গানের সহিত সুর মিলাইয়া বাজিতেছিল! আমি তখনও গাহিতেছিলাম—

"এ মেঘে, বরিখন্ আওয়ে দে রে পানি—
পৃথিবীয়ান্ অব্ বাদেয়া হো॥"

সঙ্গীত থামিল, কিন্তু তাহার সারঙ্গ থামিল না! অমাত্য নির্ব্বাক্ হইয়া ঐ দূরাগত তারধ্বনি শুনিতে লাগিলেন।

আমি উঠিয়া মন্ত্রমুগ্ধ পুত্তলিকাবৎ ঐ ধ্বনির অনুসরণ করিলাম। উন্মুক্ত জানালা দিয়া একবার দূরে ঐ রাজপথের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, রাস্তার আলোকস্তম্ভের নিম্নে বসিয়া নতমস্তকে বৃদ্ধ তন্ময় হইয়া সারঙ্গ বাজাইতেছে।

আমার পার্শ্বে গুল্ দাঁড়াইয়াছিল। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ডাকিয়া আনিব?"

আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম—"হুঁ"। গুল্ দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। সারেঙ্গী তখনও বাজাইতেছিল—

"এ মেঘে, বরিখন্ আওয়ে দে রে পানি—"

গুল্ সারেঙ্গীকে নীচের ঘরে উপবেশন করিতে বলিয়া আমায় আসিয়া সংবাদ দিল।

আমি নীচে গেলাম। আমার পদশব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। আমাকে কুর্ণিস করিয়া অতি বিনীতস্বরে কহিল—"বিবিসাহেবা! আপনি আমায় দেখিতে চাহিয়াছেন, ইহা আপনার বিশেষ মেহেরবাণী! আমি আশা করি, আপনি ভাল—"

কি কণ্ঠস্বর! তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আমি তাহার চক্ষের দিকে চাহিলাম। কি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চক্ষু! সে চাহনি যেন আমার চোখের ভিতর দিয়া আমার প্রাণের শেষ রেখার লেখা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল।

আবার সারেঙ্গী আমার দিকে চাহিল। সহসা তাহার দৃষ্টি আরও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! সে বিস্ফারিত নয়নে আবার আমার প্রতি চাহিল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! সে চাহনি, সে কম্পন দেখিয়া আমি ভীত ও বিস্মিত হইলাম!

এমন সময় অমাত্য আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের চারিচক্ষুতে মিলন হইল। অমনি সারেঙ্গীর, চক্ষু যেন আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল! অমাত্য সে রক্তবর্ণ আঁখি দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। সারেঙ্গী অকস্মাৎ হিংস্র ব্যাঘ্রের মত অমাত্যের স্কন্ধদেশে লাফাইয়া পড়িল।

নিমেষে অমাত্যের ছিন্নবক্ষ প্রাণহীন দেহ ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। আমি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! শুধু অস্ফুটস্বরে একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। সারেঙ্গী গম্ভীরস্বরে ডাকিল—"রোশেনা!"

আমার চমক ভাঙ্গিল! সেই ত সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর! কিন্তু আমি কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। অনেক কষ্টে শুধু বলিলাম,—"তু—মি!"

তিনি আর কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার হস্তস্থিত সারঙ্গ ভূতলে খসিয়া পড়িল। তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

আমি ছুটিয়া গিয়া আমার ক্রোড়দেশে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিলাম। আমার হস্ত লাগিয়া তাঁহার কৃত্রিম পক্ক গুম্ফ-শ্মশ্রু খসিয়া পড়িল!

আমি বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—"গুল্!"

গুল্ ছুটিয়া আসিল, কিন্তু তার বহুপূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অজ্ঞাত আকাশে উড়িয়া গিয়াছিল!

আমার কিছু মনে ছিল না। ঘোর কাটিলে দেখি, আকাশ ঘন ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন; ঝর ঝর ধারা অবিরাম বর্ষণে ঘননিশার আঁধারকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। বিজলীর তীব্র কশাঘাতে দীর্ণ আকাশের চকিত-চঞ্চল আলোকে হেরিলাম, দুই মৃতদেহের মাঝে ছিন্নতন্ত্রী রক্তাক্ত সারঙ্গটি ধূলায় পড়িয়া আছে। :সে তখন মৌন, কিন্তু বিশ্বব্যাপিয়া সেই জলধারার সঙ্গে সঙ্গে মেঘমল্লারের সুরধারায় "অব বাদেরা হো! অব্ বাদেরা হো!"

আমি সেই অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলাম।

শ্রীঅবনীকুমার দে

নিবেদন

(বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠায় দেশজননীকে নিবেদন উপলক্ষে)

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, সে দিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সে দিন যে মানস করিয়াছিলাম, এত দিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলোটো চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল, এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহা সত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না, যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ্-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাসরাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য-সম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব, তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবান্‌চন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনিই শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব-বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন-শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। তিনি জনহিতকর নানাকার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহুদেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান-কার্য্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র-নির্ম্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অন্ধকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথ-প্রদর্শক কেহ ছিল না। বিশ বৎসরেরও অধিক একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এত দিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অন্ধকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জার্ম্মাণীতে

আচার্য্য হর্টস বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোন প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়া-সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্ত্তমানকালের সর্ব্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার উত্তর পাইলাম; তাহাতে অবগত হইলাম যে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই সকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল! আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সে দিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাতকারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখা-ভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তাহার সাড়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মতবিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই এক জন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয় গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরো দুই একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল।

যাঁরা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন, তাঁহারই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে

নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, দ্বাদশ বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোন দিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী-পর্য্যটন

ভাগ্য ও কার্য্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম,—উত্থান, পতন আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দ্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সেই দুর্য্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলাত হইতে আগত জনৈক ইংরেজ একদিন আমার পরীক্ষাগার দেখিতে আইসেন ; উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং যে সকল কর্ম্মকার আমার শিক্ষা-অনুসারে এই সকল কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশবক !" জানিতে পারিলাম, সেই দিনের আগন্তুক আজ আমাদের ভারতসচিব মণ্টেগু। ইহার পর ভারত-গবর্ণমেণ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য আমাকে পৃথিবী-পর্য্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ফিলাডেল্‌ফিয়া, সিকাগো, কালিফর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী, অদৃষ্টে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্ত্তমান উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্ম্মাণ অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।

সেখানে প্রেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল, এ সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল, তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, "সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের।"

পৃথিবী পর্য্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবনপণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়! আমার কার্য্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের পথ যেন কোন দিন অবরুদ্ধ না হয়।

বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের স্থান

বিজ্ঞান ত সার্ব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্ত তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণীর আর এই চিরমৌন নিস্তব্ধ অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে, তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল, তাহা দৃষ্টিগোচর

করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক-সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্ম্মাণ-কৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুত-ঊর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্ব্বাণ জীবনের বেদনা-চাঞ্চল্য মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। স্থির বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধির মাত্রাপরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষপ্রয়োগ দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর উত্তেজনা উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান এই স্থানে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এমন কি মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যদি কোন বিশেষ তীর্থ বিধাতা ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহুশাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার-নির্ম্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানবিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, এ কথা বিজ্ঞজন-মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে, কেবলমাত্র বিশ্বাস-বলেই চিরজীবন চলিয়াছি, ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। হইতে পারে না বলিয়া

কোন দিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত হস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পর-পারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপর এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল, বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বোম্বাই হইতে দুইজন প্রধান শ্রেষ্ঠী সর্ব্বপ্রথমে মুক্তহস্তে মন্দিরের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত ছিলাম। গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয় ত, দেখিতে পাইব যে এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক্ আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার, ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর জগতে সেই নূতন তত্ত্বপ্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এ স্থানে কোন বহুচর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই সকল নূতন সত্য এ স্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব্বজাতি—সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকার দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এই স্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার এইরূপে জগতের সম্পত্তি হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোন পেটেন্ট লওয়া হইবে না; কারণ, আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থলাভের উপায় নহে।

আমার আরো অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎ দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুই দিক্ আছে, আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবন, আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে—যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে, তাহা আর উঠিবে না, অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন আমরা। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই আমরা এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্তনাদবিহীন উদ্ভিদ্জগতে এই তূষ্ণীভূত, অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতি-শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্টা অজর? কোন্টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিকদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সে সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বজয়ী নহে; জড়-

সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব চিন্তা-প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশবিজয়ে কোন দিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান-প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল—যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমলকমাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, "এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।"

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব-অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্ম্মিত হয়, যাহার জলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্দ্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবেই করিবে, এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম। কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

"THE BRAHMUNICAL MAGAZINE" (1821-23)

এবং (NO. I—IV)

"VAIDANTIC DOCTRINES VINDICATED" (1845)

(NO. I—IV)

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এ পর্য্যন্তও আমাদিগকে প্রকাশ্যে জানাই-লেন না যে, V. D. V. গ্রন্থের রচনায় রাজনারাণ বাবুর নাম তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এত বড় একটা প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক ভুলের উৎপত্তি সম্বন্ধে, সংস্কারযুগের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তনের ইতিহাস লেখককে প্রশ্ন করিবার অধিকার আমাদের আছে। তিনি যদি নীরব থাকেন, তবে তাহাতে কলরব কিঞ্চিৎ বাড়িবে মাত্র, কেন না—ইহা সম্ভবতঃ রাত্রি-প্রভাতের সময়। আর সত্য, অন্ধকার হইতে আলোতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই। শাস্ত্রী মহাশয় তাহা জানেন।

আমি V. D. V. গ্রন্থের আলোচনায় বলিয়াছিলাম যে, রাজা রামমোহন রায় ১৮২১—২৩ খৃঃ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সহিত বেদান্ত লইয়া যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, The Br. Magazine (I—IV) যাহার সাক্ষ্য ও সাহিত্য, ১৮৪৫ খৃঃ ডফের সহিত তত্ত্ববোধিনীর যে বেদান্ত-যুদ্ধ হয়, তাহা সেই রামমোহনের প্রথম বেদান্ত-যুদ্ধেরই দ্বিতীয় সংস্করণ বা অনুকরণ। আর আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, V. D. V. প্রবন্ধ-চতুষ্টয়ে তত্ত্ববোধিনী ডফকে যে জবাব দিয়াছিলেন, তাহাতে রামমোহনের The Br. Magazine চতুষ্টয়কে "অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়া" ছিলেন।

ভারতী শ্রাবণ, ১৩২৪ বলেন যে, (১) "লেখকের (অর্থাৎ আমার) এই সমস্ত কথাগুলিরই কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।" (২) "V. D. V. রামমোহনের Br, Magazine কে অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরে নাই।"

আমি সবিনয়ে এই কথা নিবেদন করিতে চাই (যাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি) যে, V. D. V. বস্তুতঃই Br. Magazineকে "অক্ষরে অক্ষরে" তুলিয়া ধরিয়াছে, এবং আমার এই কথার যে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, তাহাও যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ আমি প্রদর্শন করিব।

১০

(ক) আমাদের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নির্গুণ ব্রহ্মের উপরেই গত শতাব্দীর সংস্কার-যুগের খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম পাদ্রীদের চোট ও ঝাল একটু বেশী মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা এবং তদনুকরণে ডফ্ সাহেবও এই নির্গুণ ব্রহ্মকেই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের কোন ধারণাই সম্ভব নয়,—ইহা নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র, ইহার উপাসনা চলে না, যে হেতু, এই ব্রহ্ম উন্নতিশীল (progressive ?) নহেন, কাজেই ইঁহার উপাসনার কোন সামাজিক উন্নতি বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়, ইহাতে কোনরূপ উন্নত নীতিবোধের অবসর নাই, পরন্তু ইহার উপাসনায় সমাজে বহুতর দুর্নীতিই প্রশ্রয় পাইতে পারে—ইত্যাদি, এবং—ইত্যাদি।

নির্গুণ ব্রহ্ম, সম্ভবতঃ অনেক দিনের প্রাচীন, এবং স্মরণাতীত কাল হইতে বহুশতাব্দীর এবংবিধ বহুপ্রকার উৎপাতের মধ্যে পতিত হইয়াও তিনি বোধ করি নিজ সত্তা অব্যাহত রাখিয়াছেন। আর তা যদি রাখিয়া থাকেন, তবে গত একশবছরের কতিপয় বিদেশী খৃষ্টান আর স্বদেশী ব্রাহ্ম মিলিয়া তাঁহার পঞ্চত্ব ঘটাইয়াছেন, এমন কথা, আমি ত বিশ্বাস করি না।

তা যাই হউক, শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের আক্রমণের উত্তরে রাজা রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের গুণবিচার লইয়া এক গবেষণা করেন। তিনি বলেন, মনুষ্যের যেরূপ রাগ, দ্বেষ, জ্ঞান, অনুকম্পা প্রভৃতি গুণ আছে, ব্রহ্মে সেরূপ সম্ভব নয়, এবং তাহা নয় বলিয়াই মনুষ্যভাবে ও ভাষায় বলিতে গেলে ব্রহ্মকে নির্গুণই বলিতে হয়। Br. Magazine IV—তে এই সমস্ত লিপিবদ্ধ আছে, এবং সে গ্রন্থ যাহার আছে, তিনি তাহা খুলিলেই দেখিতে পাইবেন।

ইহার প্রায় ২৫ বৎসর পরে মহাত্মা ডফ্‌ও শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের কথাগুলিই খোঁচাইয়া তুলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মকে আক্রমণ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী V. D. V. প্রথম প্রবন্ধেই আবার তাহার জবাব দিলেন। সে কি প্রকার? একেবারে—Br, Magazine IVএর যুক্তি ও উক্তিগুলি "হুবহু নকল" (যে কেহ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন) করিয়া। যখন তাহাতেও কুলাইল না, তখন V. D. V. No I (page 4) বলিতেছেন—"In corroboration of the above truths, we subjoin the following extracts *from the Br. Magazine No IV*" যথা—

"The Vaidanta does not ascribe to God any power or attribute according to the human notion of properties * * * etc. world."

অর্থাৎ—V. D. V. প্রবন্ধের পহেলা নম্বর তুলিয়া ধরিলেন The Br. Magazine চারের নম্বরকে এবং "অক্ষরে অক্ষরে"। কি, না?

(খ) সেকালে পাদ্রী ডফ্ স্বয়ং এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, তত্ত্ববোধিনী কেবল

রাজা রামমোহন রায়ের একপেশে বেদান্ত-দর্শনের মীমাংসা তুলিয়া ধরিয়া তর্ক করিতেছেন। * তদুত্তরে—V. D. V. প্রবন্ধের দোসরা নম্বরের রচয়িতা, কোন লজ্জা ত অনুভব করিলেনই না, অস্বীকার করা ত দূরের কথা—পক্ষান্তরে, অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিয়া বলিলেন যে, পাদ্রীবন্ধুকে ধন্যবাদ ; যেহেতু, রাজা রামমোহনের লুপ্তপ্রায় পবিত্র স্মৃতিকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তাহাদিগকে (তত্ত্ববোধিনীকে) এক সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। † তার পর, রামমোহনের বেদান্ত-মীমাংসা যে একপেশে নয়, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য V. D. V. No IIর রচয়িতা কি করিলেন? তিনি বলিলেন যে, "আমরা রাজা রামমোহন রায়ের নিজের কথাই তুলিয়া ধরিয়া আমাদের পাদ্রী বন্ধুর কথার জবাব দিব।" ‡ এবং অনন্তর এই কথা বলিয়া V. D. V. রচয়িতা—ঠিক তার আড়াই ছত্র পরে রাজা রামমোহন রায়ের Br. Magazine No IV হইতে ২৮ ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং নিতান্তই "অক্ষরে অক্ষরে।" যথা—"These as well as several other texts etc * * love etc." পাদ্রীরা বলিয়াছিলেন যে, বেদের মধ্যে যে সূর্য্য, অগ্নি এবং এমন কি, চতুষ্পদ জানোয়ার প্রভৃতির পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়, রামমোহন শাস্ত্রবাদী হইয়া সে সকলের উত্তরে কিছুই বলেন না কেন? তজ্জন্য তাঁর বেদান্ত-মীমাংসা একপেশে মীমাংসা। বস্তুতঃ রাজা রামমোহন নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নাধিকারীর জন্য শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অন্যান্যরূপ উপাসনার সম্বন্ধেও একটা মীমাংসায় আসিয়াছিবেন। V. D. V. রচয়িতাও রামমোহনের মীমাংসাকেই শিরোধার্য্য করিয়া Br. Magazine No IV হইতে ২৮শ ছত্র উদ্ধার করিয়া পাদ্রী ডফের জবাব দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, রামমোহনের বেদান্ত-মীমাংসাকে একপেশে বলা পাদ্রীদের পক্ষে নিতান্তই ভ্রম। ¶ এখন V. D. V. এর দোসরা নম্বরের প্রবন্ধও যে Br. Magazineএর চারের নম্বরের প্রবন্ধকে তুলিয়া ধরিল, এবং ইহাও "অক্ষরে-অক্ষরে" কি, না?

---

* "Advocating Rammohon Roy's one sided view of the Vaidant system of Hindu Philosophy" V. D. V. No II, page 16-17.

† "We thank our friend for the opportunity thus afforded us of redeeming the sacred memory of the deceased Philosopher (Raja Rammohon Roy) from the obloquy which has thus been cast upon it"

‡ "We shall meet our friend with Rammohon Roy's own words" V. D. V. No II page 17

¶ It is totally, gratuitous, therefore to maintain that he (Rammohon) has taken an one-sided view of the Vaidantic doctrines" V. D. V. No;II page 18

(গ) V. D. V. No III, প্রবন্ধের তেসরা নম্বর দেখা যাক্। এই তেসরা নম্বরও সেকালের সিডিসন (sedition) হইতে গলা বাঁচাইবার জন্য, আর কেহকে নয়, সেই Br. Magazine এর গলাই জড়াইয়া ধরিয়াছিল। পাদ্রীরা চার্জ্জ দিয়াছিলেন, এই যে রামমোহন এবং তত্ত্ববোধিনী উভয়েই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের শক্তি-বৃদ্ধির জন্য যে বাহ্যতঃ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে—ইহা কপটতা-পূর্ণ, এবং ইহা তাহাদের ভণ্ডামী মাত্র। তখন—V. D. V. No III page 24-25 অতি স্পষ্টাক্ষরেই Br. Magazine কে অনুসরণ ও তাহার 'অক্ষর' উদ্ধার করিয়া রাজদ্রোহিতার—অভিযোগ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। V. D. V. এর তেসরা নম্বরের প্রবন্ধের ২৪ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা অবলোকন করিলেই আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কেননা, ঐ সমস্ত পৃষ্ঠায় আমার বক্তব্য ওই সমস্ত কথাই ছাপার অক্ষরে লেখা আছে।

আমি আর ঘাঁটাইব না। যাহা উপরে উদ্ধার করিয়া দেখান হইল, আমার বিশ্বাস, তাহার দ্বারা সুধী পাঠকবর্গকে বুঝিবার জন্য যথেষ্ট অবসর দেওয়া হইল যে—

(১) "V. D. V. রামমোহনের—Br. Magazine কে অক্ষরে অক্ষরে (ই) তুলিয়া ধরিয়াছে।" এবং—

(২) "লেখকের (অর্থাৎ আমার) কথাগুলির ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।" এবং—

(৩) ভারতীর সমালোচক, যাহা সত্য নয়, তাহাই বলিয়াছেন।

ভারতীর সমালোচক বলেন যে, "V. D. V. রামমোহনের Br. Magazine এর ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-দর্শনাদির বিচার ইহাতে আদৌ নাই।"

সত্য কথা। স্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেন নাই?

শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা হিন্দুর ষড়্দর্শন হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, হিন্দু দর্শন বা শাস্ত্রাদির অভিপ্রায়ানুসারে এক নিরাকার পরব্রহ্মই উপাস্য নহে। রাজা রামমোহনকে কাজেই তাহার উত্তরে ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কেননা, শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা শুধু বেদান্তকে ত আক্রমণ করেন নাই। ডফ্ আক্রমণ করিয়াছিলেন, শুধু বেদান্ত-দর্শনকে। কাজেই তত্ত্ব-বোধিনী বেদান্তমত-সমর্থনের জন্যই কোমর বাঁধিয়াছিলেন। কাজেই প্রবন্ধগুলির নামও হইয়াছিল "Vaidantic Doctrines Vindicated।" এবং সেই জন্যই ন্যায় সাংখ্যের গবেষণা ইহাতে আসে নাই, এবং তত্ত্ববোধিনী বেদান্তমত-সমর্থনে রাম-মোহনের Br. Magazine এর বেদান্তমত-সমর্থিত যুক্তি ও উক্তিগুলিই 'হুবহু নকল' বা "অক্ষরে অক্ষরে" তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। যদি ডফ্ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের মত,

ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনগুলিকেও আক্রমণ করিতেন, তবে আশা করা যায়, তত্ত্ববোধিনী তাহার উত্তরে—Br. Magazineএর ন্যায়, সাংখ্যের গবেষণাই তুলিয়া ধরিতেন, যেমন বেদান্তমত তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, এত তলাইয়া পড়ে কে? যদি না পড়িয়া এবং আলোচ্য গ্রন্থ না দেখিয়াও ৭৪০ পৃষ্ঠার জীবন-চরিত লেখা চলে, এই দ্রুত উন্নতিশীল বঙ্গ-সাহিত্যে—? এবং এই আজিকার দিনে?

ভারতীর সত্যব্রতধারী সমালোচক যে কে, তা পাঠকবর্গও জানেন না এবং আমিও জানি না। কেননা, তিনি বেনামী। তিনি, দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত-লেখক অজিতবাবুর পক্ষ হইয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, অজিতবাবু V. D. V. গ্রন্থখানি দেখেন নাই। উত্তম কথা, কেহ ত কথনো বলে নাই যে, অজিতবাবু এ গ্রন্থ দেখিয়াছেন। কিন্তু সমালোচক আবার সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ "আমরা দেখিয়াছি এবং আমাদের কাছেই আছে।" এও ভাল কথা। তবে Br. Magazine এর দেখা বা না দেখা সম্বন্ধে তিনি এ পর্য্যন্ত কিছু বলেন নাই। আশা করা যায়, হয় ত পরে দেখিয়া বলিবেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই হয় যে, আলোচ্য গ্রন্থগুলি দেখিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ক্ষতি কি? একটা প্রথা যখন আছে, মানিয়া চলাই ভাল।

ভারতীর বেনামী সমালোচক আমাকে "বালক" "জ্যাঠা" প্রভৃতি আরো গুরুতর কৌতূহলোদ্দীপক সম্ভাষণে সম্মানিত করিয়াছেন। ইহা আমার অতিশয় মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছে, যে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সত্য উদ্ঘাটনে সে সত্য দোষই হউক আর গুণই হউক, তিনি একটু অধিক মাত্রায় গাত্রদাহ অনুভব করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ এবং সেই প্রসঙ্গে রামমোহনের আলোচনায় আমার অধিকার সম্বন্ধেও তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন ও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

উত্তরে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নিবেদন করি, এবং খুব স্পষ্ট করিয়া, যে অযোগ্য অনধিকারী দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহন, বঙ্গসাহিত্যে আলোচনার সূত্রপাত দেখিয়াই মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিও এ বিষয়ে দুঃসাহসী হইয়াছে। আর ইহাও বিবেচনায় আইসে যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথের পুত্র বা তথাকথিত ধর্ম্মপুত্রগণ থাকিলেও এই সমস্ত শক্তিশালী মহাপুরুষগণ কেহর পিতার জমিদারী নহেন, বা কেহ ইহাঁদিগকে ইজারা লইয়াছেন, এমত সংবাদও এতাবৎ প্রাপ্ত হই নাই। পক্ষান্তরে, ইহাঁরা বে-ওয়ারীশ মালও নহেন। ইহাঁরা জাতীয় সম্পদ্ ও সম্পত্তি। সেই হিসাবে ইহাঁরা আমাদের প্রত্যেকের পূজ্য, অথচ সম্পূর্ণ বিচারাধীন।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম

রবীন্দ্রনাথ সবুজ পত্রে "আমার ধর্ম্ম" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা আমাদেরই "ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধটির জবাবস্বরূপ লেখা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে ভাবে বুঝিয়াছি, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কি অভিমত, তাহা জানিবার জন্য আমরা স্বতঃই উৎসুক ছিলাম, তাই বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তবুও দেখিতেছি, আমাদের ধারণা কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। এমন কি, বর্ত্তমানে তিনি যে রাষ্ট্রনীতির সঙ্কুল যুদ্ধে আবার ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, তাহা দেখিয়াও আমাদের ভুলটি ধরিতে পারিতেছি না। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমাদের মনে হইল, রবীন্দ্রনাথ যেন ক্ষুব্ধ হইয়া একটু অভিমান করিয়াই লিখিয়াছেন। তিনি যেন বলিতে চাহেন, "আমি ত শক্তিকে কোনদিন অবহেলা করি নাই, আমি ত কত শক্তিমন্ত্র গাহিয়াছি, রুদ্রের বন্দনা আমার সাধনায় যে কিছু কম, এমন নয়, তবুও কেন লোকে বিপরীত কথা বলে? আমার ধর্ম্ম শান্তির ধর্ম্ম স্বীকার করিলাম; কিন্তু সে শান্তি আমি চাহিয়াছি শক্তিরই পরিণতিরূপে, ক্লীবের জড়ের যে শান্তি, জগতের জীবনের দ্বন্দ্বকে কোনরূপে, ফাঁকি দিয়া যে শান্তি, সে শান্তির ত আমার ধর্ম্মে কোন স্থানই নাই, তবুও কেন এ অখ্যাতি?" "তবুও কেন," এই কথাটিই আজ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বলিতেছেন, তাঁহার ধর্ম্মটা কি, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আমরা তাঁহার প্রেতাত্মাটিই বাহির করিয়া ফেলিয়াছি। কারণ, কোন মানুষের কি ঠিক ধর্ম্ম, তা তার শেষ অভিব্যক্তিটি না দেখিলে আগে হইতেই কি করিয়া বলা যায়? জীবনের সাধনার অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত যে সত্য পাইয়াছি, সেখানে আসিয়াই থামিয়া যাই নাই, তাহাই ত আমার শেষ কথা নয়। খাঁটি ধর্ম্মটি জানিতে হইলে শেষ উপলব্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই ন্যায়সঙ্গত—নতুবা মানুষের উপর অবিচারই করা হইবে। এ আপত্তির উত্তর দেওয়া আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। রবীন্দ্রনাথ এ আপত্তি তুলিয়াছেন, শুধু আপত্তি তুলিবার জন্য—এ কথা একটু পরে তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, মানুষের শেষ অভিব্যক্তি—শেষ উপলব্ধি কবে কোথায়? ঠিক মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে? কিন্তু মরণের সঙ্গে সঙ্গেই ত অভিব্যক্তির অবসান হয় নাই। এ জীবনের পরে আরও কত জীবন ধরিয়া তাহার নূতন নূতন উপলব্ধি ফুটিয়া উঠিতেছে—তবে শেষ কথা পাইব কবে? তবে ত মানুষকে চিনিবার ধরিবার কোন উপায়ই কোন কালে নাই।

সে যাহা হউক, তবুও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের একটা বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—এই তাঁহার শেষ কথা কি না জানি না, কিন্তু শেষ কথা হউক আর না হউক, আমরা তাঁহার যে ধর্ম্মটি নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলাম, তাহা এ রকম কিছু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, এ রকম শেষ কথার উপর নির্ভর করে না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ দেখিতেছেন, তিনি কি হইতে চাহেন, তাঁহার নিজের সাধনার লক্ষ্য কি, আমরা কিন্তু দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথ কি হইয়াছেন, জগৎকে তাঁহার কি দেওয়ার আছে। রবীন্দ্রনাথ খুঁজিতেছেন, তাঁহার বুদ্ধির ধর্ম্ম, আমরা দেখাইয়াছি তাঁহার প্রাণের ধর্ম্ম। বুদ্ধির ধর্ম্মটি তাঁহার অন্তর-জীবনের জন্য, তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার জন্য তাঁহার কাছে বেশী মূল্যবান্ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে যে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত,তাঁহার যে ভাগটির সহিত জগৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছে, যেটুকু স্থায়ী সত্য সম্পদ তাহা হইতেছে তাঁহার এই প্রাণের ধন—সেই সত্যটি যাহার সত্যতা কেবল বুদ্ধি দিয়াই উপলব্ধি করেন নাই, কিন্তু যাহা তাঁহার অন্তরাত্মা হইতেই উৎসারিত হইতেছে। আমরা দেখাইতে চাহিয়াছি, তাঁহার অধিগত তাঁহার লব্ধ বস্তুটি, তাঁহার প্রাণের উপলব্ধি আর তাহা হইতে কোন্ তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িতেছে, শুধু তাঁহার কথায় নয়, তাঁহার কার্য্যেও নয়, কিন্তু কথার কার্য্যের ভাবে, তাঁহার দৃষ্টির মৌলিক ভঙ্গিমায় কোন্ তত্ত্ব, কোন্ ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে।

তাই আমরা আবার বলি, শক্তি জিনিষটি রবীন্দ্রনাথের বাঞ্ছনীয় বস্তু হইতে পারে, উহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিতে পারে, তিনি শক্তির সাধক হইলেও হইতে পারেন—কিন্তু শান্তি কোমলতা জিনিষটি রবীন্দ্রনাথের লব্ধ অধিগত সহজাত বস্তু, এখানে তিনি একেবারে সিদ্ধ। তাই প্রেম-প্রীতির কথা, সুষমা-সামঞ্জস্যের কথা তাঁহার মুখ হইতে যেমন একটা সহজ সত্যে ভরিয়া বাহির হয়, দ্বন্দ্বের কথায়, বিক্রমের কথায় তেমনি একটা কৃত্রিমতা অথবা অবাস্তবতার আভাস রহিয়াই যায়। একটির মধ্যে পাই অযত্নসুলভ সারল্য ঋজুতা, আর একটির মধ্যে পাই চেষ্টা, কষ্টকল্পনা। একটি আপনা হইতেই তাঁহার ভিতর হইতেই অবাধে বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছে, আর একটিকে কেমন জোর-জবরদস্তি করিয়া তবে আনিতে হয়। বুদ্ধির ধর্ম্মের উপর প্রাণের ধর্ম্ম সর্ব্বদাই টেক্কা দিয়া চলে, ইহার আর ব্যতিক্রম নাই। তাই কখন দেখি, রবীন্দ্রনাথ যেখানে শক্তির কথা বলিয়াছেন, সেখানে রহিয়াছে কেমন একটা বাগাড়ম্বর, একটা আতিশয্য—ভিতরে যাহার অসদ্ভাব, তাহাকে সম্মুখে বিরাট্ বিপুল করিয়া না ধরিতে পারিলে যেন তাহার সত্তা সত্যতা সম্বন্ধে স্থির আশ্বস্ত হইতে পারি না। আবার কখন দেখি, শক্তির কথা তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু এমন মোলায়েম করিয়া, মনোলোভা করিয়া যে শক্তির শক্তিত্ব সেখানে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেন রুদ্রের বিকট বীভৎস

মূর্ত্তির সম্মুখে পড়িয়া অজানিতেই তাঁহার প্রাণের নিগূঢ় তন্ত্রীটা কাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাই সে যেন ডাকিতেছে—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্", হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, সেইটিই দেখাও, সেইটি দিয়াই আমাদিগকে সতত রক্ষা করিও। এতগুলি কথায় সে ভাব তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথায় না বলিয়া থাকিলেও ভঙ্গিমায় তাহা আমরা স্পষ্টই যেন ধরিতে পাই। বস্তুতঃ শক্ত কথা বলাতেই শাক্তের পরিচয় নয়, নরম কথাও শক্তভাবে বলিতে পারাতেই শাক্ত ধর্ম্মটি আরও স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের সকল শক্তি বীর্য্য যুদ্ধ বন্দনার পশ্চাতে কেমন একটি ভাব রহিয়াছে যে, এ সকলকে কোনরূপে কাটাইয়া উঠিতে হইবে—সংঘর্ষের মধ্যে দিয়াই শান্তিতে পৌঁছিতে হইবে, মৃত্যুর করাল বক্ষের ভিতর দিয়াই অমৃতত্বের রাস্তাটি প্রসারিত—ইহার অন্যথা হইবার নয়। কিন্তু তাঁহার প্রাণটি চাহিতেছে যত শীঘ্র এ রাস্তাটি পার হওয়া যায়, এক চুমুকেই যদি সকল বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হওয়া যায়! রুদ্রের দক্ষিণ মুখটি তিনি কখন ভুলিতে পারিতেছেন না, উহাকে সম্মুখে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াই তিনি সে ক্ষুরধার দুর্গম পথে চলিয়াছেন। রুদ্রের যে বাম মুখটি, তাহার প্রতি তিনি যেন বাম হইয়াই চলিয়াছেন। তিনি যতই বলুন না, "ওগো মরণ, হে মোর মরণ"—তাহার মধ্যে আমরা অনুভব করি, মরণের সে সুখালিঙ্গন, কি একটা অজানা তৃপ্তি শান্তি। কিন্তু কই, পাই না ত মৃত্যুর মর্ম্মন্তুদ বেদনার তাহার মধ্যে একটা ঘোর কিছুর কোন আভাস! আমরা জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুর কি ঠিক ততটুকুই সার্থকতা—যতটুকু সে আমাদিগকে অমৃতের আস্বাদন দিতেছে, দ্বন্দ্বের ততখানি মর্য্যাদা—যতখানি আমাদিগকে শান্তির মধ্যে লইয়া চলিয়াছে? ইহাই কি ঠিক? ইহাই কি সব? আমরা ত মনে করি, দ্বন্দ্বের পরিণতি শান্তি, মৃত্যুর লক্ষ্য অমৃত হইতে পারে, কিন্তু রুদ্র যিনি, শাক্ত যিনি, বীরকর্ম্মী যিনি দ্বন্দ্বকে দ্বন্দ্বরূপে ধরিয়াই একটা অপরূপ রসভোগ করেন, তাঁহার মধ্যে এ রকম কোন arriere pensée নাই যে, দ্বন্দ্বটা অতি প্রয়োজনীয় হইলেও সাময়িক, অনিত্য, ইহার মধ্যে গুরুতর সজীব কিছু নাই, মূলতঃ ইহা এক রকম ভুল বা মিথ্যা, ইহার পরে যে শান্তি, যে মিলন, যে সুষমা, তাহাই শাশ্বত সত্য সুন্দর মঙ্গল! এই arriere pensée টুকু নাই বলিয়া তিনি যে দ্বন্দ্বকেই, যুদ্ধকেই চরম বলিয়া ধরিয়া থাকিবেন, এমন কোন কথা নাই। তবে উহার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার কোন চাঞ্চল্য, কোন অসন্তোষ নাই, উহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার অধীরতা নাই, তাঁহার প্রকৃতি ঐখানেই যেন কি একটা চরম সার্থকতা লাভ করিতেছে; চরম শান্তি পাইলেও সে সার্থকতাটুকু কিছু ক্ষুণ্ণ হইবে না, 'মায়া মু মতিভ্রমো নু' বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। প্রেমের, সৌন্দর্য্যের ভগবান্‌ই সর্ব্বদা রহিয়াছেন, রুদ্র যাহা,

কুৎসিত যাহা তাহার পশ্চাতে—এই চিন্তাটুকু রবীন্দ্রনাথ কখনও দূর করিতে পারেন নাই। রুদ্রের মধ্যে, কুৎসিতের মধ্যে যে প্রেমময় সৌন্দর্য্যময় আত্মা রহিয়াছে, তাহাই খুঁজিয়াছেন, রুদ্রের রুদ্রত্ব, কুৎসিতের কুৎসিতত্বও যে সে আত্মারই অপূর্ব্ব প্রতিভা, তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। তাই রবীন্দ্রনাথে পাই না বীরসাধকের সে তপ্ততেজ। বীর কর্ম্মে তাঁহার মধ্যে পাই তিতিক্ষা, পাই একটা অনুমতি, কিন্তু পাই না জাগ্রত উল্লাস, পাই না কালীর অট্টহাস।

কালীর অট্টহাসে যে কি চরম সত্য, কি চরম রস, আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই তিনি আভাষে ইঙ্গিতে হাবে ভাবে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন কৃষ্ণের মোহন মুরলী। কৃষ্ণের মোহন মুরলীই চরম সত্য, সেটি যাহাতে পূর্ণতররূপে উপভোগ করিতে পারি, তার জন্য আগে শুনা প্রয়োজন কালীর অট্টহাস, কৃষ্ণকে পাইবার জন্য কালী পন্থামাত্র অথবা কৃষ্ণই আপনার মধ্যে কালীকে আত্মসাৎ করিয়া রহিয়াছেন—এ কথা আমরা মানি না। আমরা বলি, কৃষ্ণ কালী একই বস্তু, দুই নয়! কৃষ্ণকে ঘিরিয়া কালী, কালীকে ঘিরিয়া কৃষ্ণ।

শ্রী:—

গান

তাই মেতেছি রাসে,
রসে ভিজেছে মন, এ রূপ-বাসে
তোরই পিয়াসে রাধে, তোরি পিয়াসে।
রাধে রাধে ফুকারি এ বাঁশরী,
প্রাণ রন্ধ্র মাঝে পিরীতি মন্ত্র ভরি,
পিয়া পিয়া, পিয়া পিয়া, পিয়ারি আসে।
লাজ মান ভয়
সহজে না গেলে নয়,
সহজে জেনেছে সে, সহজে যে ভাল বাসে,
আমি অত ভাল বাসি,
রাধা কত ভাল বাসে।

শ্রী :—

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ গুপ্ত

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা,

পৌষ, ১৩২৪ সাল

সূচী

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা] [পৌষ, ১৩২৪ সাল।

সাড়ে-তিন-হাত !

মা গো মা, বাঙলার মাটী
তুই বাঙালীর মা যে গো !
সেই বাঙালীর মা কি গো তুই
এই কাঙালীর মা গো !
চরণ-তলে, সাগর দোলে,
মাথার কেশে তুষার গলে,
গঙ্গা পদ্মা গর্জ্জে চলে,
বুকের আজ' কি দোল গো,
তবু তিমির 'পরে তিমির ঘিরে—
বাজের আগুন উড়্‌ছে গো !
গর্ভকোষে ধরেছিলি মা গো
তেঁই সে গর্ব্ব করি গো,
দিছিস্ নয়ন, অতুল রতন
প্রাণ ভ'রে রূপ হেরি গো !

চোখের আলোক নিভে গেছে আজ
রঙিন কাচের আলোয় দেখি,
তুই আজ আমার ছোট হলি মা গো।
'বিশ্ব' আমার বড় গো—,
তোর মায়ের দুধে বিষ হয়েছে
হাড়িনীর দুধ মিষ্টি বেশী,
দুধ খেয়ে খেয়ে কালসাপ হয়ে
হয়েছি 'বিশ্ব-বেশী' গো।
সাড়ে-তিন-হাত জমি মেপে দিয়ে
দিছিস্ জন্ম দেশে গো।
কেউ, সাড়ে-তিন-হাত কেড়ে নিতে পারে,
জন্মে নি বিশ্ব-দেশে গো।
জন্ম-মরণ দোলায় আসি
গোলামের মত যাই গো।
তবু, সাড়ে-তিন-হাত কেড়ে নিতে পারে
কোন ভগবান্ আজি নাই গো।
সকল তীর্থময়ি মা আমার,
তুই মা কল্পবৃক্ষ গো।
আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
চতুর্ব্বর্গ ফল মা গো।
থাক্ সে 'বিশ্ব' বিশ্বের হাটে
মরণের নাট তুই মা গো।
এই সাড়ে-তিন-হাত ভিটায় যেন মা
জন্ম জন্ম জনমি গো।

শ্রীঃ—

দুর্ব্বাসার শাপ

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক দুর্ব্বাসার শাপেই উজ্জ্বল। মহাভারতে রাজা দুষ্যন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না। তিনি গান্ধর্ব্ববিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া গিয়া সে কথা আর তুলেন নাই। মনে বেশ ছিল, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই, পাছে লোকে কিছু বলে। শকুন্তলা যখন সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সঙ্গে বার বছরের ছেলে, তখন মনে সব ঠিক আছে, তবু রাজা বিবাহটা একেবারে অস্বীকার করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নয়, শকুন্তলাকে তিনি যাহা ইচ্ছা তাই বলিয়া নিন্দা করিলেন। আর ছেলেটাকে "হোঁৎকা" বলিয়া, "হাতী" বলিয়া গালি দিলেন। শেষ শকুন্তলা যখন রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন দৈববাণী হইল যে, 'তুমি উহাকে সত্যই বিবাহ করিয়াছ।' লোকে দৈববাণী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল; তখন তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন এবং বলিলেন, মনে থাকিলেও লোকলজ্জার ভয়ে বলিতে সাহস করি নাই।

কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপ আনিয়া এই মহাপুরুষকে রাজার মতন রাজা, এমন কি, দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন। যখন কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, তখন তিনি শকুন্তলাকে লইতে স্বীকার কেমন করিয়া করেন? যাহারা দেখিতেছে, তাহারা রাজার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রতীহারী বলিলেন, 'আহা, আমাদের রাজার কি ধর্ম্মজ্ঞান! এমন রূপ! স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! মুখের কথায় আপনার হইয়া যায়। শুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধিতে ইহাকে লইতেছেন না।' শকুন্তলা যখন কপট শঠ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন, বলিতেছেন, 'তুমি ঘাসে ঢাকা কূয়া, ধর্ম্মের কাচ করিয়া বসিয়া আছ,' তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, 'দুষ্যন্তের চরিত্র'ত' আমরা সবাই জানি, তবুও তাঁহার ভিতর যে শঠতা আছে, কখন দেখি নাই।' যাঁহারা থিয়েটার দেখিতেছেন, তাঁহারা শাপের কথা জানেন। তাঁহারাও রাজার কোন দোষই দেখিতে পাইতেছেন না, বরং তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন। এইরূপে দুষ্যন্তকে "কাপুরুষতার" দায় হইতে বাঁচাইবার জন্য কালিদাস শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটি খুব খুলিয়াছে। অঙ্গুরী পাইয়াই রাজার যেমন সব কথা মনে পড়িল, অমনি তাঁহার ঘোরতর অনুতাপ হইল। প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, আর তাঁহাকে যেন সহস্র

বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল ?' তিনি অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই অনুতাপ, এই যন্ত্রণা, এই অধীরতায় রাজার চরিত্র বেশ খুলিতে লাগিল। বোকা বিদূষক নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দিতে লাগিল। যে সকল কথা এ সময়ে চাপা দেওয়া উচিত, বোকাটা সেই সব কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজার স্বভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিল কে? সানুমতী আর নাটকের প্রেক্ষককুল! এই সময়ে আবার সদাগরের মরার খবর আসিল। সে আঁটকুড়া ছিল, বিদূষক যে কথাটা মনে করাইয়া দেয় নাই, সেটাও মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, "আমি অপুত্রক" অথচ আমার পুত্র হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল। আমি ছেলেটি হেলায় হারাইয়াছি! তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন; এতটা অধীর হইলেন যে, মাতলি তাঁহার কাছে পৌঁছিতেই ভয় পাইলেন, ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় গেলে কোন কাজই পাওয়া যাইবে না। তাই বিদূষককে মারিয়া, রাজাকে উত্তেজিত করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কণ্বের আশ্রমে প্রথম দেখার সময় সকলে রাজার ভাব দেখিয়াছেন। লতাকুঞ্জে গান্ধর্ব বিবাহের সময়ও রাজার ভাব দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না। বিশেষ নিন্দা করারও কিছু ছিল না। শকুন্তলাকে তাড়াইবার সময়ও তাঁহার আর এক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন; তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা আছে। রাজা চেষ্টা করিতেছেন, মনে পড়িতেছে না। শকুন্তলার কথায়-বার্ত্তায় আকার-প্রকারে শকুন্তলা যে তাঁহাকে ঠকাইতে আসিয়াছে, এ কথাও বলিতে পারিতেছেন না; ঠিক তাহার সব কথা বিশ্বাসও করিতে পারিতেছেন না। কারণ, নিজের সে সকল কথা একেবারেই মনে নাই। সন্দেহ পূরাই হইতেছে অথচ সন্দেহ করিলে চলিতেছে না। এখনি মীমাংসা করিয়া হয় শকুন্তলাকে ও শকুন্তলার ছেলেকে আপনার বলিয়া লও, না হয় উহাকে যাইতে বল। ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। রাজা তখন কি করিবেন? যাইতে বলাই ঠিক মনে করিলেন। করিলেনও তাই। ইহাতে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারেন না। নইলে বরং দোষ দিত, কলঙ্ক হইত।

যে অবস্থায় রাজা পড়িয়াছিলেন, তাহা যে একটা বিষম সমস্যা, কে অস্বীকার করিবে? ঋষিরা বলিতে লাগিলেন, "তুমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছ"। ঋষিদের রাজাকে ঠকাইবার কি কারণ আছে? কেন তাঁহারা একটা মিছা হাঙ্গাম লইয়া হিমালয় পর্ব্বত হইতে হস্তিনায় আসিবেন? সুতরাং বিশ্বাস করিবার বেশ কারণ রহিল। আর এক দিকে আবার শকুন্তলার আকার-প্রকার কথাবার্ত্তায় এমন কিছুই ছিল না—যাহাতে বোধ হয়, সে দুষ্ট, শঠ বা কপট বা ঠকাইবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু রাজা কিছুই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিজের কথা তাঁহার একেবারে মনে নাই। যদি

কাহারও মনে থাকিবার কথা হয়, তবে শকুন্তলার ও তাঁহার নিজের। রাজা মনে মনে বলিলেন, ইঁহারা মনে করাইয়া দিক্, আমি লইতেছি। শকুন্তলা আঙটী খুঁজিলেন, নাই। একটা উপায় ছিল, সেটা নাই। কত কথা মনে করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে কিছুই হইল না। সে কথা মনে পড়িল না। কেমন করিয়া পড়িবে? শাপ হইয়াছে যে, পাগল যেমন আগের কথা পরে মনে করিতে পারে না, তেমনি বুঝাইয়া দিলেও, মনে করাইয়া দিলেও তোমার কথা রাজার মনে পড়িবে না। সুতরাং পাহাড়ে মাথা কুটিলেও যেমন পাহাড়ের কিছুই হয় না, ব্রহ্মশাপের বিরুদ্ধে শকুন্তলার এত চেষ্টা, এত বলাকহা, সব বৃথা হইয়া গেল। ব্রহ্মশাপও নড়িল না, রাজারও মনে পড়িল না। রাজা কি করিবেন? শকুন্তলাকে বিদায় দিলেন।

আঙটী হাতে পড়িবামাত্র শাপের অবসান হইল, সব কথা রাজার মনে পড়িয়া গেল। তখন তাঁহার মনে বড়ই যন্ত্রণা হইতে লাগিল। অগ্নিশরণে শকুন্তলার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ব্যবহার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল ও তাঁহার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। তিনি, যে আঙটী আনিয়াছে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন, বসন্তের উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন। অগ্নিশরণে শকুন্তলার তরফ যত কথা বলা হইয়াছিল, সব সত্য বলিয়া ধারণা হইল। যে মাছ ধরিয়া আনিয়াছে, সে ইন্দ্রঘাটের জেলে। আর গোতমী বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রঘাটে শচীকুণ্ডের জলস্পর্শের সময় আঙটী পড়িয়া গিয়াছে। বুড়ীর কথা ত ঠিকই হইল। আর তিনি কি করিয়া সেই সত্যবাদী বুড়ীকে বৃদ্ধ তাপসী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাই তাহাকে সামান্য স্ত্রীলোক বিবেচনা করিয়া গালি পাড়িয়াছেন। শকুন্তলা হরিণের কথা মনে করাইয়াছিলেন, তাঁহার মনে পড়ে নাই। তিনি শকুন্তলাকে কাকের বাসায় কোকিলের মত ডিম ফুটাইতে আসিয়াছ বলিয়া গালি দিয়াছেন। তিনি এখন বিদূষককে নির্জ্জনে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। এ কথা বলায় রাজার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কিন্তু রাজা যে তপোবনে শকুন্তলা নামে এক তপস্বীর মেয়েতে আসক্ত হইয়াছিলেন, সে কথা ত বিদূষকও জানিত, সে কেন বলে নাই? তাহার কারণ, রাজা একটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তপস্বীর মেয়ের কথাটা পরিহাস মাত্র, সত্য কথা নয়। মিথ্যা কথার ফল ফলিবেই ফলিবে। নহিলে বিদূষক যদি রাজা আসিতেই জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমিও এলে, তোমার সে শকুন্তলার কি ক'রে এলে? তাহা হইলে 'ত' এত বিভ্রাট না হইলেও না হইতে পারিত।

রাজা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। শকুন্তলা অতিথি-সেবায় অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। নইলে শুদ্ধ শকুন্তলার দোষে রাজার শাস্তি কেন হইবে?

প্রমোদবনে রাজার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা হইয়াছে, লোক তাঁহার দুঃখে দুঃখীই হইয়াছে! তাঁহার কষ্টে, অনুতাপে, করুণ রোদনে লোকের হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পর যখন শকুন্তলাকে মারীচের আশ্রয়ে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন, তখন সে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। শকুন্তলার তাঁহাকে চিনিতে যতটুকু দেরি হইয়াছিল, তাঁহার ততটুকুও হয় নাই। শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র না? নহিলে রক্ষা-মঙ্গল-শুদ্ধ আমার ছেলেকে কে আর অপবিত্র করিতে পারিবে!" ইহাতে চিনিতে যে একটু দেরী হইয়াছিল, বেশ বুঝা যায়। রাজার কিন্তু কিছুই হয় নাই। দেখিবামাত্র বলিলেন, এই সেই শকুন্তলা। যদিও তখন কঠোর নিয়ম করিয়া শকুন্তলার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; একটি চুলের বিননী পিছন দিকে ঝুলিতেছে; আর একখানি আধময়লা বাকল পরিয়া আছেন; তথাপি রাজা দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি যে আমায় দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলে, তাহাতে বুঝিলাম, তোমার প্রতি আমি পূর্ব্বে যে কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার ফল ভালই হইয়াছে।" শকুন্তলার তখনও ভয় ভাঙ্গে নাই, তিনি মনে মনে বলিলেন, 'এখন আমার আশার সঞ্চার হইল। রাজার বোধ হয় রাগ গিয়াছে। দৈব বোধ হয় আমার অনুকূল। ইনি সেই আর্য্যপুত্রই বটেন।' রাজা বলিলেন, "রাহু গ্রাস করিলে চাঁদের কিছুই থাকে না, রাহুর হাত হইতে মুক্ত হইলে চন্দ্র যেমন রোহিণীর সঙ্গে মিলিত হন, তেমনি কোন রাহু আমার স্মৃতিশক্তিকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন সে রাহুও মরিয়া গিয়াছে, আর তুমিও আমার সম্মুখে উপস্থিত।" এখন শকুন্তলার ভয় পুরা ভাঙ্গিল। 'আর্য্য-পুত্রের জয়' বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাজা বলিলেন, "জয় বলিতে গিয়া তোমার যদিও কথা বাহির হইল না, আমার কিন্তু খুব জয় হইল। কারণ, আমি তোমার মুখ দেখিতে পাইলাম।" বলিতে বলিতে রাজা শকুন্তলার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "সুন্দরি, আমি তোমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, সে জন্য আমার উপর আর রাগ করিও না। আমার তখন কি যে একটা ভ্রম হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে আপনার মঙ্গল আপনি বুঝিতে পারে না। যে কাণা, তাহার মাথায় ফুলের মালা দিলেও, সে সাপ মনে করিয়া, মালা দূরে ফেলিয়া দেয়।"

শকুন্তলা বলিলেন, "আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য শেষে সুফল দিলেও তখন বোধ হয় দুরদৃষ্ট দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। নহিলে আপনি আমার প্রতি এত সদয়, তবুও তখন এত বিরূপ হইলেন কেন?" এতক্ষণ রাজা পায়ে পড়িয়া ছিলেন, এখন উঠিলেন। শকুন্তলা—"আমার কথা আপনার মনে পড়িল কিরূপে?" রাজা—"আমার দুঃখ একেবারে

ঘুচিলে সে কথা বলিব। তুমি যখন কাঁদিয়া আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে, যখন তোমার চক্ষের জল তোমার অধরের উপর পড়িয়া অধরকে ক্লেশ দিতে লাগিল, তখন আমি তাহার দিকে চাই নাই, উপেক্ষাই করিয়াছিলাম, আজ আবার তোমার চোখের পালকে জল দেখিতেছি। আমি উহা মুছিয়া দিয়া নিজের দুঃখ দূর করি" বলিয়া উহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। তখন রাজার হাতে সেই আঙটী দেখিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "মহারাজ, এই সেই আঙটী।" রাজা বলিলেন, "এই আঙটী পেয়েই আমার সব কথা মনে পড়িল।" সে সময় দুর্লভ হইয়া এই আঙটীটাই অনর্থ বাধাইয়াছিল। "তবে এ আঙটী তোমার আঙুলেই থাকুক।" "না, আমি উহাকে একেবারেই বিশ্বাস করি না" বলিতে বলিতে মাতলি আসিল ও সকলকে কশ্যপের নিকট লইয়া গেল। কশ্যপের নিকট রাজা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শকুন্তলাকে সম্মুখে পাইয়াও মনে হয় নাই, পরে আঙটী দেখিয়া মনে হইল, এ কি রকম? দুর্বাসার শাপের কথা রাজাও জানিতেন না, শকুন্তলাও জানিতেন না। মুনি সে কথা বলিয়া দিলে দুজনে সব খবর বুঝিতে পারিলেন। আগাগোড়া সব ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল, আবার দুজনের যেমন ছিল, তেমনি হইল।

এ ব্যাপারে রাজার উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে ছাড়া কমে না। রাজার যখন ধারণা ছিল, বিবাহ করি নাই, মনে করিয়া উঠিতে পারেন নাই, বীরের ন্যায় সেই ধারণামত কার্য্য করিয়াছিলেন। আবার যখন মনে হইল, বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আবার বীরের মত কার্য্য করিলেন। পায়ে পড়িয়া শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন, বিবাহ স্বীকার করিলেন। ছেলে ও স্ত্রী গ্রহণ করিলেন। দুর্বাসার শাপে রাজার চরিত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

শকুন্তলাও দুর্বাসার শাপে যথেষ্ট বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। কালিদাস শকুন্তলাকে এত কোমল, এত নরম, এবং সব ব্যাপারে এত কাঁচা করিয়া গড়িয়াছেন যে, তিনি দুই তিনটি সঙ্গী ভিন্ন শকুন্তলাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। প্রথম প্রথম দুটি সখী ছিলেন, তার পর দুটি ঋষির শিষ্য ও গৌতমী। একা শকুন্তলাকে ষ্টেজে আনিতেই পারেন নাই। শকুন্তলা পাপ কাহাকে বলে, জানেন না। আদরের মেয়ে আদরেই আছেন, সংসারের কঠোরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কঠোর শাপ তাঁহাকে কঠোর দুঃখ জানাইয়া দিল। সংসার যে বড় নিদারুণ, সংসারে যে পান থেকে চুণ খসিবার যো নাই, তাহা তিনি হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন। একটি আঙটী—তাও আবার যত্ন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। সেই আঙটী না দেখাইতে পারিলে, যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বস্ব দিবেন বলিয়া বিবাহ করিয়াছেন— তিনিও যে এই সামান্য জিনিসটা না থাকায় চিনিতে পারিবেন না, গরীব শকুন্তলার এতটা

জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? সে আঙটীটাকে যত্ন করিয়া রাখিল না। বড়ই কষ্ট পাইল। শেষ রাজা যখন আবার সেই আঙটী তাহার আঙুলে পরাইতে গেলেন, সে বলিল, "আর না, ও আঙটীটাকে আমি বিশ্বাসই করি না।" দোষটা আঙটীর হইল। দুঃখের দায়ে পড়িয়া শকুন্তলা এখন একটু শক্ত হইয়াছেন, এখন আর সে আদরের মেয়ে নাই। সে একাই রাজার সঙ্গে দেখা করিল। রাজা ক্ষমা চাহিলে যথোচিত উত্তর দিল। কিন্তু রাজা পায়ে পড়িলে, তাঁহাকে যে উঠাইয়া দিতে হয়, সে বোধ তাহার এখনও হয় নাই, তাই রাজা আপনিই ঝাড়িয়া উঠিলেন। রাজা চোখের জল মুছাইতে আসিলে, কত কি বলিয়া বাধা দিলেন না, আর সে আঙটীটাকে বিশ্বাস করিলেন না। এইরূপে শাপে দুজনেরই চরিত্র উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া দিয়াছে।

যাঁহারা শাপ মানেন না, তাঁহারা বলিবেন, শাপ আবার একটা কি? গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তি। যে, যে কোন ঝোঁকে পড়িয়া আপনার ধর্ম্ম পালন করিতে না পারে, তাহাকে শাস্তি পাইতেই হয়। এই যে পাপের শাস্তি, ইহাকে আমাদের সে কালের লোকে শাপ বলিত। ব্রহ্মশাপ ভিন্ন লোকের সর্ব্বনাশ হয় না। আমার এ দুর্দ্দশা কেন হইল, জিজ্ঞাসা করিলেই সেকালের কর্ত্তারা ব্রহ্মশাপ বলিয়া দিতেন। পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যের ফলভোগ ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ বিপদ্ হইলে সেটা ব্রহ্মশাপের উপরই পড়িত। বল্লালসেন মরিলেন, ব্রহ্মশাপে—কত রাজা উৎসন্ন গেলেন, ব্রহ্মশাপে—এমন যে রামচন্দ্র, তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন, ব্রহ্মশাপে—এত বড় বামনী মুসলমান রাজবংশ উৎসন্ন গেল, ব্রহ্মশাপে। পুরাণে পড়, কাব্যে পড়, আখ্যায়িকায় পড়, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মশাপ। সেকালের লোক বিশ্বাস করিত, ব্রহ্মশাপে—কালিদাস সে কালের লোক, তিনিও বিশ্বাস করিতেন, ব্রহ্মশাপে; তাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলে ব্রহ্মশাপ লাগাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মশাপ কাজে অবহেলা করার শাস্তি।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কমলের দুঃখ

(ইন্দু—কমল)

স্নেহাস্পদেষু—

ভাই কমল, তুমি মায়াকে যে চিঠি লিখেছিলে, তার ফলে যে শুধু বাতাসের উপর ভর ক'রে ছিল, তাকে এত বড় আঘাত পেতে হয়েছে। আমি ত জানি না—জবা এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি, তোমার ওই চিঠিখানা হাতে ক'রে মুখ থুবড়ে মাটীতে প'ড়ে রয়েছে। মাথার পাশে কপাল ফেটে রক্ত ঝর্‌ছে। তার জীবনের সমস্ত সুখ হরণ ক'রে—আজ আবার তার উপর এ রুদ্রদণ্ড কর্‌বার তোমার অধিকার? আমি তোমার দিদি, আমি আজ তোমার বিচার কর্‌ব! আমি এর উত্তর চাই।

তোমার বোঝ্‌বার ভুল, নারী বিন্দুতেই সাগররূপে মিশে—সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চায় না। এক ফোঁটা স্বাতি নক্ষত্রের জলে চাতকী তৃপ্তি লাভ করে; সে জানে, তার পদতলে সমুদ্র প'ড়ে আছে,—সে ওই এক ফোঁটা জলেই সমুদ্রের আস্বাদ পায়। ভাই, সাগর থেকে ফোঁটাটি বিচ্ছিন্ন নয়, ওই ফোঁটা ফোঁটা জলেই সাগরের রচনা। যাক্, তোমার সঙ্গে তর্ক আমার সাজে না, তুমি বিদ্বান্; কিন্তু বিদ্বান্‌ই হও আর যাই হও—মানুষ—মানুষ। মানুষ আকাশ নয়, জল নয়, মাটী নয়, ফুল নয়; যতই তার সঙ্গে তুলনা কর, মিশাতে পার্‌বে না। যদি মিশাতে পার্‌তে, তা হ'লে এ তফাৎ জগতে থাক্‌ত না। তারা আপনিই মিশে থাক্‌ত। যাক্—আমি তোমার বিচার কর্‌ব, আমার রুদ্র দণ্ডও তোমায় গ্রহণ কর্‌তে হবে; নইলে জান্‌ব, তুমি মানুষ নয়,—যে সংসারের কথা কইছ সে তোমার কাছে ছেলে-খেলা; কিন্তু জেন, সংসার শুধু ছেলে-খেলা নয়।

তুমি কি বল্‌তে চাও যে, যে তোমার জন্যে নারীধর্ম্মে সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করেছে সে তোমার চেয়ে কম ত্যাগ করেছে। তুমি বল্‌তে চাও, এই হৃদমর্ম্মদাহন তার হয় নি। যদি না হয়ে থাকে, তবে এসে একবার দেখে যেয়ো; যে সোনার লতিকা কি ক'রে ভূমে ধরা-শয্যায় দিন কাটায়; দেখে যেয়ো যে, সমস্ত পৃথিবীর তাচ্ছিল্য কলঙ্কের আঘাত সে কেমন ক'রে সয়ে রয়েছে। যার নেই, সে আবার ত্যাগ কর্‌বে কি? যার আছে, তারই যা ত্যাগে বাহাদুরী কি? মুখে বল্‌ছ অধিকার নেই। কিন্তু কাজে তার প্রকাশ অন্য রকমে কেন? ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও, আর যেন সে এমন স্নেহে স্নেহে

আঘাত না পায়। আমায় জানিয়ো, কোন্ শাস্তি নিতে তুমি প্রস্তুত; কোন্ প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে পার্‌বে? তুমিও যে অন্যায় করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছ কি?

তোমার সঙ্গে দেখার পর উনি এসেছিলেন; বিদেশে যাবার কথা তুল্‌লাম, ভাল ক'রে উত্তর দিলেন না—চ'লে গেলেন। জানি না, আমি কি কর্‌ব, বুঝ্‌তেও পারি নে। সব যে কি হয়ে যাচ্ছে—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—কি একেবারে ভেসেই যাবে, তা কিছুই বুঝতে পারি নি।

যাক, মনে ক'র না যে তোমার মন আমি বুঝিনি, কিন্তু যদি সকলের সুখই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য, তবে তুমি কেন সে দুঃখ নিজে তুলে নাও না। তুমি বিয়ে কর—সেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত; এই আমার বিচার, এই আমার অমোঘ দণ্ড। আমি তোমার দিদি, তোমার উপর তোমার অন্যায়ের জন্যে এই শাস্তি বিধান কর্‌লাম। যদি মনুষ্যত্ব থাকে, তবে আজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হও। এই আমার আদেশ—এই আমার স্নেহের আশীষ; আর বেশী তোমায় কি আর বল্‌ব বল।

(শৈল—ইন্দু)

চিরায়ুষ্মতীষু—

চিরায়ুষ্মতী ব'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—অথচ দেখ্‌ছি, জগতে কেউ চিরদিন থাকে না; তাই যখন আমার ইচ্ছা ব'লে কোন জিনিস নেই, তখন আর আমার আশীর্ব্বাদ করা কেন; ভুল অভ্যাসের দোষ, মেয়েলি খেয়াল। তবু আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে অক্ষয় সিন্দূর মাথায় প'রে, অন্তে যেন হৈমবতীর কোলে স্থান পাও!

সংসারের কোন কথায় আর—আর আমি নেই—তবু সংসার ত আমায় ছাড়ে না। তোর চিঠি যা কমলকে লিখেছিলি সেই চিঠিখানা প'ড়ে আছে, তার টেবিলের উপর খোলা। আর সে আজ দুদিন হয়ে গেল কোথায় যে গেছে, কেউ জানে না। দাওয়ানজী এত উদ্‌ব্যস্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোন খবর কোন খোঁজই তার পায় নি। কি জানি, শেষ কি সংসার একেবারে ত্যাগ কর্‌লে—হবে! পাথর করেছে সু-বউ! পাথর করেছে—পাথরে আর হাসে না, আর কাঁদে না—পাথরের মতই অসাড় অচেতন হয়ে রয়েছে। কি হ'ল, কোথায় গেল! আর ভাব্‌তে পারি নি। নগেনকে জিজ্ঞাসা কল্লাম,—বল্লাম, "কি হবে, তার কোন খোঁজ পেলে?"—নগেন যেন কেমন চম্‌কে উঠ্‌ল, কেল্‌কামুখো হয়ে যেন শাকপানা হয়ে গেল—আহা আহা! হাজার হোক্—সে দরদের টান কোথায় যাবে। বল্‌লে, 'তা আমি ত জানিনে'—ব'লে যেন কেমন হয়ে গেল—দাঁড়াল না, তখনই পালিয়ে গেল। দুঃখ, কষ্ট, লজ্জা, শোক—সবই তাকে ঘিরেছে, সেই বা আর কি কর্‌বে? কিন্তু আমি খাবার নিয়ে ডাক্‌লাম, বল্‌লে 'এসে খাব, আমি সুধীরকে একবার আবার দেখি গে', সেই সময় দেখ্‌লাম তোর ভাই

চিঠিখানা টেবিলের পর রেখে বেরিয়ে গেল; আমি বসে আছি—এই আসে, এই আসে, তার পর মনটা কেমন হ'ল বলতে পারিনে। অন্য দিন গাড়ীতে বেরোয়, আজ হেঁটে বেরিয়েছিল। কি যে হ'ল, কিছুই বুঝতে পারছি নি। যদি অন্যই কিছু হয়, তা হ'লে সে আমি বুঝতে পারতাম, সুধীরকে খুঁজতে যাচ্ছি ব'লে যাবে কেন? সে ত জীবনে কখন ভুলে মিথ্যা বলে নি। কি করব, তা জানি নি, নগাও কদিন যেন কি রকম হয়ে গেছে, যেন পাগলের মত চায়, পাগলের মত চলতে চলতে—থমকে চমকে ওঠে; আমি কিছু বুঝতে পারি না।

ভেবেছিলুম, আর তোদের কথায় থাক্‌ব না, আর সংসারকে সার করব না, এ যে দেখছি মায়ার জালা—সব ছেড়ে দিয়ে সব এক এক ক'রে চলে যায়; আমি কেন তাদের টেনে টেনে মরি। কি জানি কি হ'ল। হবে বা, ওই পোড়ারমুখী বুঝি কি লিখেছে, চিঠি ত দেখ্‌তে পেলেম না—খামখানা প'ড়ে রয়েছে। শেষ কমল যে আমার একেবারে এমন ক'রে ফেলে দিয়ে যাবে, এ আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নি। প্রাণের ভেতর যে কি করছে, তা কি ক'রে জানাব। তবু নিজের ছেলে নয়—দেওর, মা-মরা ছেলে মানুষ করেছিলাম। তার এত জালা যে! তোর চিঠিও ত আমার ভাল লাগ্‌ল না—কি জানি, যদি সত্যিই সে অন্য রকম মনে ক'রে থাকে, যদি সত্যই সে প্রায়শ্চিত্ত করবার মতি অন্য রকমে লয়ে যায়। হয়ত ভাব্‌বে, হয়ত ভেবেছে, সে থাকতে পোড়ারমুখীর জালা, তাই নিজেকে অমন ক'রে শুধু সরিয়ে রাখ্‌ছিল না, একেবারে জনমের মত সবার সম্পর্ক ত্যাগ করলে, সবাইকে জানিয়ে গেল বুঝি তাই। সুখ সাধ, আরাম বিরাম, সখ সবই—সমস্ত ঐশ্বর্য্য থেকেও সে ত্যাগ করেছিল। বুঝি এবার জন্মের মত জীবনটাকেও কোথায় টেনে ফেলে দিলে। কি হ'ল, তা জানিনে। নগার মুখের দিকে চাই আর যেন বুক শুকিয়ে ওঠে। সারা দিন-রাত যে আজ পূজো ভুলে যাই, কেবল পাথরের কাছে কাঁদি, কই পাথর ত আর সাড়াও দেয় না। সে হাসেও না, কাঁদেও না—কেন যে বেঁচে আছি, তা জানিনে। আহা! আমার হাতে তারা সঁপে দিয়ে গিছল, আমি তার খুব পারলুম। একটা এই হ'ল—আর একটা কোথায় গেল, আমারও কপাল; যার কপাল ভাঙে তার পাথরের দেবতাও বুঝি ভেঙে যায়।

(ইন্দু—শৈল)

সে কি, কি হ'ল ভাই, আমি মরতে কেন অমন চিঠি লিখলুম। কে জানে, আমার কি মতি-গতি হ'ল। মায়ার ওই অবস্থা দেখে বড় রাগ হ'ল, দুঃখও হল, তাই তাকে অমন জোর ক'রে বলেছিলাম, আমি তোমার বিচার করব। তাই কি এমন হ'ল, কেন আমার এমন মরণ-কুবুদ্ধি হ'ল ভাই,—আমিই তার এই কারণ হলুম। হায়! কি

করি। উনি ত কোথায় থাকেন, কখন্ যে কি করেন, তা ধারণাই নেই। অমর এসেছিল, বল্‌লে,—'খোঁজ ত অনেক করেছি, কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।' আমি মেয়েমানুষ, সব বুঝে সকল দিক্ ভেবে বল্‌তে হয় ত পারিনি, তা সে কেন আমার কথা ধরালে, সে কেন সব উড়িয়ে দিলে না। কি করব, তা বুঝ্‌তে পারছি না। সত্যি কি সে সবাইকে ফেলে পালিয়ে গেল?

পরশু রাত্তিরে আবার এখানেও এক কাণ্ড হয়েছে, আমি ত হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। রাত তখন বারোটা হ'য়ে গেছে চোখে যেন ঘুম আর আসে না। জবা আমার কাছে ব'সে রামায়ণ পড়্‌ছিল। বনবাসে সীতা—চারিদিকে গভীর বন, অন্ধকার, নিস্তব্ধ অন্ধকার—হঠাৎ সীতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌ল, সমস্ত বনও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস ফেল্‌লে, প্রকৃতি কেঁদে উঠ্‌ল, মাটী যেন টলে টলে উঠ্‌ল, মনে হ'ল—সীতার মনে হ'ল—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সব কি তোলপাড় ক'রে দিলে। লক্ষ্মণকে বল্‌লেন,—ব'ল তাঁরে—যদিও তিনি আমাকে লোকলজ্জা লোকনিন্দা ভয়ে প্রজার মুখের পানে চেয়ে ত্যাগ করলেন, তবুও—

তিনি সখা, তিনি গুরু দেবতা আমার।
অনন্তগতি এ প্রাণ তাঁরি পদ সার॥
প্রাণ দিলে যদি হয় সুমঙ্গল তাঁর।
তা হ'তে অধিক ধর্ম্ম কি আছে আমার॥

মায়া ব'সে থেকে থেকে বল্‌লে, 'দিদি, আমার ঘুম পাচ্ছে, শুই গে', শুনে তার মনটা যে কি হয়ে এসেছে, তা আমি বুঝ্‌তে কতকটা পেরেছিলুম। জবা বল্‌লে, 'তা তুমি শোও গে, আমি এইটে শেষ করি। তুমি মায়াদি দুঃখের কথা শুনলেই কেঁদে পালাতে চাও—আমার বাপু কিন্তু বড় ভাল লাগে।' মায়া উঠে এসে আমার কাছে শুয়ে পড়্‌ল, জবা তখন পড়্‌তে লাগ্‌ল—

কহিয়ো কহিয়ো তাঁরে দেবরসত্তম।
ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যসন্ধ রঘুকুলোত্তম॥
মাথা পাতি লইনু সে দেবের আদেশ।
বুক পাতি সহিব এ বনবাস-ক্লেশ॥

হঠাৎ পড়্‌তে পড়্‌তে 'উঃ মা গো' বলে মুখ থুব্‌ড়ে পড়্‌ল। আমি ত শশব্যস্ত হয়ে উঠে কি হ'ল কি হ'ল ব'লে কাছে গিয়ে তুলে ধ'রে দেখি, একেবারে সাড়া নেই, মুখখানা একেবারে সাদাপানা হ'য়ে গেছে, কখনও এমন দেখি নি। তার পর জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে বাতাস ক'রে কতক্ষণ পরে জ্ঞান হ'ল। মায়া ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে; জবাকে কোলে ক'রে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। তখন জ্ঞান হয়েছে—

বল্লে, 'দিদি, পড়্‌তে পড়্‌তে হঠাৎ মনটা কি হ'ল—চোখের পাতা বুজে এল, মনে হ'ল, রাত্ হয়েছে, ঘুম পেয়েছে, তার পর কি হ'ল, যেন আমি অন্ধকার পথে গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছি—আর কে যেন আমার পিঠে ছোয়া মাল্লে না কি কল্লে—আমার ভয়ানক লাগলো। পিঠে হাত দিয়ে দেখি—এক জায়গায় যেন একটু লাল হয়ে উঠেছে। হাত দিতেই বল্‌লে, 'উঃ! ঠিক ওইখানটায় যেন কি হ'ল।' ভাবলুম, কার বাছা আমার কাছে তার সমস্ত ভার ফেলে দিয়ে নির্ভয়ে নির্ভর করে রয়েছে, আমি না দেখ্‌লে কে তাকে—কে তাকে বুকে ক'রে রাখ্‌বে। আমি নিজে যে কমলের কাছ থেকে তাকে চেয়ে নিয়েছি। জবাও আজ ক দিন যেন তার পর থেকে কি হয়ে রয়েছে। ডাক্তার এসেছিল, কি ওষুধ দিয়ে গেছে, আজ একটু ভাল আছে।

কিন্তু এ খবর শুনে অবধি আমার যেন কি হয়ে গেছে। আমি দেখছি, এ সবই আমার দোষ, আমারই ভুল, না হ'লে হয় ত এত গোলমাল—এত অনর্থ হ'ত না। সবই দেখছি ওই মায়ার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম, সুখে থাকবে, দেখছি, এখন দুঃখের সমুদ্র। সেও যা হবার তা ত হয়ে গেছে—কিন্তু এ আবার আমি কি করলাম? কেন তাকে বিচারের 'প্রায়শ্চিত্ত' করতে বল্লাম? তাই বুঝি সে চ'লে গেল। এমনি আমাদের কপাল। যার উপর নির্ভর করতে যাই, সেই আমাদের ফেলে দিয়ে চ'লে যায়। কি হবে ভাই, যদি সে না ফেরে! তবে কি হবে—আমি তার এই পরিণাম এনে দিলাম? আমার ত মাথায় কিছুই আসছে না, কি হবে ঠাকুরঝি, কি হ'ল!

(হেনা—যুঁই)

ওই পুকুরের কাল জলে পদ্ম ফুটে টল্-টল্ করছে—আমার মনেও অমনি পদ্ম ফুটে টল্ টল্ করছে। কিন্তু আবার হিম পড়্‌বে, পদ্ম ম'রে যাবে আবার ঘাসের পাতার লাল আভা হবে—শুকিয়ে পুকুরের পাড়ের পোড়া মাটী দেখা দেবে, আবার গাছের পাতা হ'লদে হবে, ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝ'রে যাবে। শুধু ওই অনন্ত আকাশের তলায়—ফল-পুষ্প-পত্র-হীন তরুর মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। শুধু দেখব, দিক্ দিক্ দিক্ দিক্—মহাশূন্য—আর বসন্ত আসবে না—আর তরু নূতন মুঞ্জরায় মুঞ্জরিত হবে না—শুধু স্তব্ধ হয়ে গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকব। যুঁই! আর কথা কইতে সাধ নেই—আর কাউকে কিছুই বলতে সাধ নেই, আজ নিজের প্রাণের মধ্যেও যে অপরূপ কমলের বিকাশ হয়েছে, তাকেও কিছু বল্‌বার নেই। আমার জীবনের সুখ-বসন্ত ফুরিয়ে গেছে, আর সে সরলতা নেই, তাকে আর কি উপহার দেব। আপনার লোককে আঁখি-জল দেওয়া যায় না, হাসি দেওয়া যায়; আমার হাসিও ফুরিয়ে গেছে, আছে চোখের জল, তা আর তাকে কি ক'রে দেব, তাই ভাব্‌ছি। আজ ত সে আমার ঘরে,—আমারই ঘরে, আজ ত তারে ফুলের ঝারার ফুলের পাপড়িতে ঘুম পাড়িয়েছি, কিন্তু কই, হাসি

আর নেই—হাসি নিভে গেছে। আজ তাকে পেয়েছি,—পেয়েছি কি?—বুকে বুকে মুখে মুখে পেয়েছি কি—না, শুধু পেয়েছি। বুক ভরে, মনে মনে শুধু নয়। আমার ঘরে ঘরে আজ সব পাখীরা গাইছে, ফুল ফুটেছে, পদ্ম দুলে দুলে উঠেছে; কিন্তু হাসি নেই—হাসি নেই। শিশির পড়ার মত—চোখের পাতায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু জমা হচ্ছে—অনেক দুঃখে তাকে চেপে রেখেছি। পাছে তার পায়ে টপ্ ক'রে পড়ে, পাছে তার ঘুম ভাঙে। ভাব্ছি যদি ঘুম ভাঙে, তবে ত আর তাকে ধ'রে রাখতে পার্‌ব না। যতক্ষণ ঘুমায়, ততক্ষণ দেখি,—নয়ন-মন ভ'রে দেখি,—দেখি,—দেখি, আমার সেই নূতন, নূতন, প্রেমাস্পদ, প্রেমের স্বরূপ, মনের মতন, হৃদয়ের ফুটন্ত পদ্ম—সেই কমল, সেই রূপ!

সে দিন গিয়েছিলাম, সেই বাগানে। সেই মাণিকযোড় ফুলের জন্যে! যার সাদা ফুল আর টুক্‌টুকে বুক, যার গন্ধে মানুষ পাগল হয়, যার হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে আঘাত হ'লে মানুষ মনের মতন হয়; মনের মানুষ হয়, লুটিয়ে পড়ে পায়। সন্ধ্যে থেকে আলো নিয়ে, প্রদীপ হাতে ক'রে খুঁজে খুঁজে বেড়িয়ে—সারা বাগানের সেই ভাঙা বাড়ীর বালির স্তূপ, সেই তেকাঁটা মনসার বন, সেই কাঁটানটের জঙ্গল, সেই আলুইয়ের ঝোপে পাগলের মত খুঁজ্‌লাম। চারিদিকে বিছুটি-বন, আলুইয়ের কাঁটা গায়ে লেগে গা ছড়ে যাচ্ছে, পায়ের উপর দিয়ে ঠাণ্ডা হিম বরফের মত—লতার মত সড়্ সড়্ ক'রে, কি চ'লে গেল, গা যেন কেঁপে উঠ্‌ল, ভাঙা বাড়ীর পড়ো জানালার বাজুর ধারে দীপের আলো প'ড়ে যেন ভূতের মত কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব'লে মনে হ'ল। হাতের দীপ কেঁপে উঠ্‌ল; আরো খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম, বড় বড় ঘাসের উপর থেকে উচ্চিংড়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে, আর কট্ কট্ কীরর্ কীরর্ ক'রে ডাক্‌ছে। দেখ্‌লাম, সামনে ওই যে—ওই—ওই—সেই সাদা ফুল টুক্‌টুকে বুক! মন্ত্রমুগ্ধের মত খানিক স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালাম—পেয়েছি, হাত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যেন কেমন ক'রে উঠ্‌ছে। ফুল ছিঁড়ে তুল্‌লাম, মাথার উপর একটা কাক অন্ধকারে দুবার কা কা ক'রে উড়ে গেল। হাত থেকে দীপ কেঁপে প'ড়ে গেল। মনে হ'ল, শুন্‌তে পেলেম,—ভাঙা বাড়ীর ভেতর থেকে যেন হা হা হা হা ক'রে কে হেসে উঠ্‌ল। অন্ধকারে যেন অন্ধকারের ভাষা বুক-কাটা হাহাকারে ভেঙে পড়্‌ল। দীপ নিভে গেছে—চারিদিকেই অন্ধকার, উপরে চেয়ে দেখি, তারাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে; বনের ভেতর পথ খুঁজে পাই না, কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত পা; কাপড়ের আঁচোল ছিঁড়ে তেকাঁটা গাছে আটকে রইল; ফুল—আমার সেই মনের মানুষ গড়্‌বার ফুল, হাতে করে দৌড়ে আসতে লাগ্‌লাম। পায়ে হোঁচট লাগ্‌তে লাগ্‌ল। একবার প'ড়ে গেলাম, আবার উঠ্‌লাম, উঠে সেই জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম। বেরিয়ে একটু এগিয়েই আবার থম্‌কে দাঁড়ালাম; মনে হ'ল যেন চারিদিকে আগুন—আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। কে

যেন মশালের মত আলো জ্বেলে, হাতে ধ'রে চ'লে গেল। বড় ভয় হ'ল—তবু এগিয়ে গেলাম—এগিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। চারিদিকে ভাঙা দেয়াল প'ড়ে গেছে—ইঁটের রাশ, তার পাশে ভাঙা খিলানটা যেন হাঁ ক'রে খেতে এল, পাশে জঙ্গল; যেমনি একজায়গায় পা দিয়েছি, অমনি সেখানটা ভেঙে হুড়মুড় ক'রে পড়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে খিলানটাও প'ড়ে গেল; ভয়ানক শব্দ হ'ল। সামনেই দেখি, সেই ভাঙা বাড়ীর ধারে মশাল হাতে ক'রে একজন—দুজন—তিনজন যেন সেই শব্দ শুনে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই তারা 'বাবা রে' ব'লে মশাল ফেলে দৌড়ুল। কাছে গিয়ে দেখি, একজন দীর্ঘকায় মানুষ প'ড়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, চারিদিকে রক্ত ছড়ান। কাছে যেতে প্রাণ যেন উড়ে গেল; কি জানি কেন, আরো কাছে গিয়ে মশালটা হাতে ক'রে তুলে ধ'রে দেখি,—আমার আকাঙ্ক্ষার—কামনার সার,—পাপ-পুণ্যের বিধাতা,—সুখ-দুঃখের মণি,—জীবন-মরণের স্বপ্ন—প্রেমের স্বরূপ এ হৃদয়ের সার রত্ন ধূলায় মৃত। বুকে তখনও ছোরাখানা বসান। আমার চক্ষে তখন সে সমস্ত আকাশের তারা নিভে গেল, চোখ বুজ্‌লাম; মশালটা আমার হাত থেকে কেঁপে প'ড়ে গেল—হাঁটু গেড়ে তার সেই মৃতের রক্তাক্ত দেহের পাশে বস্‌লাম। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম, নিশ্বাস নেই; গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, তখনও উত্তপ্ত তখনও তাপ রয়েছে। একবার ঊর্দ্ধপানে চেয়ে ডাকলাম—যাঁকে জীবনে কখন ডাকি নি, যাঁকে ডাক্‌তে হয় এ কখন জান্‌তাম না—তাঁকে ডাক্‌লাম। বল্লাম, "ভগবান্, বল দাও, এ নারী হৃদয়ে—না হয় আমার প্রাণ নিয়ে এর জীবন দাও। শুনেছি তুমি দয়াময়! হে অনাথের নাথ—পতিতার বুকে বল দাও।" প্রাণপণ শক্তিতে সেই ছোরাখানা তুল্‌লাম। রক্ত—ঝরণার উৎক্ষিপ্ত ধারার মত রক্ত উথ্‌লে আমার মুখ-চোখ সব ভেসে গেল। বুকের উপর রক্ত এসে পড়্‌তে লাগ্‌ল। গরম আগুনের মত, আমার সব যেন ঝল্‌সে গেল, তখন দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে তাকে বুকে ক'রে তুল্‌লাম। সে দীর্ঘবাহু মহাপুরুষের দেহভার, আর আমি ক্ষীণা দুর্ব্বলা নারী, বহন করতে পারি কি ক'রে—যদি না মহাশক্তিমান তাঁর অভাগিনী দাসীর বুকে সেই বল না দিতেন। বুকে ক'রে অন্ধকারে তুল্‌লাম। তখন এগিয়ে যেতে মনে হ'তে লাগ্‌ল—মাটী যেন পা দুটো আমার টেনে তার বুকের ভিতর ধরে রাখতে চায়। বাগানে থেকে বেরুতে পার্‌লেই রাস্তা—পথ একটু ছাড়িয়ে গেলেই আমি একটা কিনারা পাব; তাই এগিয়ে আস্‌ব, অমনি দেখি, আবার যেন কিসের আলো—পিছন থেকে যেন কে আমার সেই ভিজে খোলা চুল ধর্‌ছে; আরো জোরে পিছনের দিকে না তাকিয়ে জোরে ছুটে যেতে গেলাম, মাথার চুল ছিঁড়ে গেল। একবার ফিরে দেখলাম, মশাল হাতে হাক মাষ্টার আর একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘাকার লোক আমাকে ধর্‌বার জন্তে আবার ছুটে আস্‌ছে। তখন কেন জানি না, মুখ থেকে হঠাৎ যেন তাঁরই নাম উচ্চারণ

হ'ল ; ভগবান্! ভগবান্ ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্লাম। মাষ্টার মশাল ফেলে ছুটে পালিয়ে গেল। সেই লোকটা সে কিন্তু ছুটে এল ; এসে বল্লে, দোহাই ভগবানের, এখন মরেনি, চল মা চল, আমি নিয়ে যাই ; দোহাই ভগবানের! আমি বল্লাম, 'সাবধান, আমায় কাছে এস না, আমি তা হ'লে ছিঁড়ে ফেলব, তোমরা এ দিকে এস না।' আমার তখন হাঁফ ধর্‌চে, আর একটু—আর একটু গেলেই পথে পড়্ব, আর পারিনে, আপাদমস্তক ঘেমে আর তার রক্তে সব ভিজে উঠল, আর পারিনে। তখন সেই লোকটা বল্লে, 'মা, আমায় বিশ্বাস কর, দোহাই ভগবানের, আমায় বিশ্বাস কর, আমিই মেরেছি, টাকার লোভে, টাকার লোভে, তখন জান্তাম না, তখন দেখিনে যে এত সৌন্দর্য্য, তখন দেখিনে মশালের আলোয় যখন গর্ত্তে পুঁতে ফেলতে যাচ্ছি, তখন দেখিনে যে, এর মুখখানা আমারই ছেলের মত, তখন জান্তাম না, ভগবান্ আছে, ভগবান্! ভগবান্! মা আমায় বিশ্বাস কর, আমি ওকে এখন বাঁচাতে পারি, ও এখন মরেনি, তুই বয়ে নিয়ে যেতে পার্‌বি নি, আমায় দে, আমায় দে!' আমি তখনও তাকে বিশ্বাস করতে পার্‌লাম না, বল্লাম—না, তুমি আগে যাও, পথ দেখাও আর খানিক গেলেই আমার গাড়ী আছে, তাতে আমি এখনি তুলতে পার্‌ব। লোকটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'ভগবান্! ভগবান্! আছে—চল্।' রাস্তায় এসে পড়্লাম, পথে দূরে আমার মোটর ছিল সেই অবস্থায় গাড়ীতে নিয়ে তুল্‌লাম, গাড়ী বিদ্যুতের গতিতে আমার বাড়ীতে নিয়ে এল। সেই লোকটাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম না, সাহস করেই নিয়ে এলাম না, তখন মন আমার কোথায়, সে আর কি বল্‌ব। তবু সে যখন মা মা ব'লে ডাক্‌ছিল, কি যেন প্রাণের ভিতর জেগে উঠ্‌ছিল।

ডাক্তার এল, রাত তখন একটা বেজে গেছে। ক্ষত বেশ ক'রে ধুয়ে বেঁধে দিয়ে গেল ; বল্লে, ভয় নেই, এখনও বাঁচ্‌বার আশা আছে। আমি তার পা দুটো জড়িয়ে ধর্‌লাম ; বল্লাম, যেমন ক'রে হোক্, আমার একে বাঁচিয়ে দিন, আমি আপনাকে লক্ষ টাকা দেব। ডাক্তার ব'লে গেছে, ভয় নেই, সেরে উঠ্‌বেন। আজ সাতদিন জ্বর—ঘোর বিকারে আমার এই ঘরে!!

এখানে নিয়ে আস্‌বার দুদিন পরে জ্ঞান হয়, তার পর ঘোর বিকারে আচ্ছন্ন। উঃ! কি গায়ের তাপ! আর কি যাতনা! থেকে থেকে কখন যেন একবার মা, কি মায়া, ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি, এমনি একটা কথা, আর কোন শব্দ নেই। এই নিয়ে আমার দিন কাটছে, আর রাত কাটছে। এঁর পায়ের তলায় বসেই আমি তোকে এই চিঠি লিখছি। সেই লোকটা ছাড়া আর কেউ জানে না, কি ঘটনা, কেন এঁকে মেরেছে, সে এও জানে না। হাফ মাষ্টারকে দেখে আমার নানা সন্দেহ হয়েছিল—এখন তা বেশ ভাল করেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি। যে এ সেই নগেনের কায। শুধুই

শুনেছি এর কাছে, এ লোকটা এসে এসে খবর নিয়ে যায়, কেমন আছে। তার কাছে শুন্‌লাম, সে বল্‌লে যে, তোমায় মা বলেছি, তোর কাছে আর মা কিছু লুকোব না; আমি মা একটা মহাপাপী, সে অনেক কথা মা, তোরই মত মুখ আমার একটা মেয়ে ছিল—ঠিক তোর মত মুখ, তোর মত চোখ, তোরই মত অমনি হাসি, তোর মত তার দাড়িতে একটা কাল তিল ছিল। একটা ছেলে ছিল - ঠিক নয়, কতকটা ওরই মত মুখের ভাব, অমনি সোন্দর। যখন মারি, তখন দেখি নি, দেখলে বোধ হয় মার্‌তে পারতুম না মা! আমার এক খুব সুন্দরী স্ত্রী ছিল, ঘরে আমার বুড় মা ছিল। বেশ সুখে দিন কাট্‌ত, গতর খাটিয়ে খেতাম, পাড়াগাঁয়ে চাষবাস ছিল, খেত-খামার ছিল, গোলাভরা ধান ছিল, ঘরে গাই ছিল, গায়ে জোর ছিল। চাষ কর্‌তাম, ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘরকন্না কর্‌তাম। হঠাৎ আমার মা ম'রে গেল, সে দিন লক্ষ্মীপুজো, পুজো আর হ'ল না। যখন পুড়িয়ে শ্মশান থেকে ফিরে আস্‌ছি, নিজের কুঁড়ের দরজায় এসে দেখি, তখন একটু রাত হয়েছে, ঘরে কেউ আলো জ্বালে নি। স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাক্‌লুম, কোন উত্তর পেলুম না; এগিয়ে দেখি, মেয়েটা দাওয়ায় ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে; ছেলেটা প'ড়ে চেঁচাচ্ছে; ঘরটা যেন খাঁ খাঁ ক'রে উঠ্‌ল। আবার আমার স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাক্‌লুম, উত্তর পেলুম না, গাছপালা সবই যেন আমার মত খাঁ খাঁ কোর্‌ছে। একটু পরে ফিরে চেয়ে দেখি, আমার ঘরের বেড়ায় আগুন লেগেছে। পড়্‌শীরা বল্‌লে,—তারা সব দূরে দূরে থাকে—বল্‌লে, জমিদারের লোক আমার স্ত্রীকে ধ'রে নিয়ে গেছে, আর যাবার সময় আগুন লাগিয়ে গেছে। উন্মত্তের মত সেই কাছা গলায় ছুটলাম, সেই জমিদার-বাড়ী, হাতে একখানা কাস্তে; আমি ভাল মানুষের বেটা, গতর খাটিয়ে খাই, আমার মাগের ওপর তার লোভ—এই জমিদার! সেখানে গিয়ে দেখি, বাবুর মজলিসে নাচ চলেছে আর চারিদিকে ইয়ার-মোশায়েবে ভরা। আমাকে পাগলের মত সেইখানে যেতে দেখে অনেকে বাধা দিলে, তবু আমি তার সাম্‌নে গিয়ে কাস্তের বাড়ী মেরেছিলাম; তার পর যে কি হ'ল, তা আমার আর জ্ঞান ছিল না। ওই ঘরের সাম্‌নে আমি তাকে দেবতা ব'লে গড় ক'রে আমার খামারের সেরা ফসল আর খাজনা দিয়ে এসেছিলুম। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন যেন সব ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌চে, মাথা থেকে পা অবধি ফোড়ার মত ব্যথা; কষ্টে উঠে ব'সে চেয়ে দেখলাম, চারিদিকে লোহার গরাদে আর আমার হাতে লোহার হাতকড়ি। তখন সব বুঝ্‌তে পার্‌লাম; মেয়েটার মুখ আর ছেলেটার মুখ মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার পর একদিন বিচার হ'ল, বড় বড় সাহেব দাঁড়াল। আমার ত কেউ নেই, আমার চোদ্দ বৎসর জেল হয়ে গেল। একবার মেয়েটার নাম ধ'রে রাণী রাণী ব'লে কেঁদে ফেললুম। জেলে প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হ'ত, হাঁ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাক্‌তাম। তারা আমার মাথায় চাঁটী মার্‌ত। তার পর সয়ে গেল,

জেলে বেশ—হাঁ বেশ ছিলাম ; এখানকার চেয়ে সেখানে অনেক কম পাজী। তার পর জেল থেকে ফিরে যে দিন খালাস পেলাম, সেই গাঁয়ে গেলাম ; দেখলাম, সেখানে গাঁই নেই, সেখান দিয়ে কোম্পানী নূতন খাল কেটেছে, কোন চিহ্নই রাখে নি। অন্ত জায়গায় লোকের কাছে কাজ চাইলুম, কেউ দিলে না। শেষ এই সহরে এলুম, গায়ে খুব জোর ছিল, এখানে এই গুণ্ডা-খুনেদের দলে মিশ্‌লুম ; তারা আমায় খেতে দিলে। সেদিন আমি পাঁচ দিন খাই নি। তখন বুঝ্‌লুম, তারাই আমার দরদী ; তারা যা বল্‌ত তাই কর্‌তাম ; যাদের নেই, তারাই ভাগ ক'রে খায় ; যাদের আছে, তারা কখন দেয় না মা। এমনি ক'রে বছর তিন কেটে যায়। ওই যে বাবুটা আমার সঙ্গে ছিল, ও একদিন আমায় বল্‌লে ডেকে, দশ হাজার টাকা দেব, যদি এ কাজ কর্‌তে পারিস্। আমায় আগাম পাঁচ হাজার টাকা দেয়, পরে আর অর্দ্ধেক দেব বলে। টাকার লোভে এ কাজ করেছি। মেরে ধ'রে এমন ঢের কেড়ে নিয়ে ভাগাভাগি করেছি কিন্তু একেবারে খুন কর্‌ব ব'লে এই প্রথম, আর কখনো করি নি। যখন মা তুই ভগবান্ ব'লে ডাক্‌লি, অমনি মনে হ'ল, আমার ভিতরে কে যেন ভগবান্ ভগবান্ ব'লে ডাক্‌ছে—কে যেন মা বল্‌লে, আমি সব দেখতে পাচ্ছি, সব দেখতে পাচ্ছি, জানিনে মা এর কি প্রাশ্চিত্তি হবে। কেন সব এমন কাজ কর্‌লুম, কার জন্তে কর্‌লুম, পেটের দায়ে খুন কর্‌লুম, টাকার লোভে অন্ধকারে মানুষের পিছনে ছুরি মার্‌লুম, কেন মা এমন কর্‌লুম ; কিন্তু তোকে দেখে অবধি মনে হচ্ছে, তুই যেন আমার সেই মেয়ে—সেই—সেই মা সেই রাণী! উন্মাদের মত লোকটা কেঁদে উঠ্‌ল। তার পর চ'লে গেল। আমি তার কান্না শুনে অবধি কেমন হয়ে গেছি—স্বপ্নের মত যেন কি মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। একখানি কুঁড়ে ঘর, কেমন সুন্দর, একখানি মুখ, কেমন খোলা সবুজ মাঠ, কেমন চাঁদের আলোয় মায় সেই চুমু—সেই একটি গাই। চোক ফেটে জল এল, আমিও ত কেনা মেয়ে, তবে কি সত্যই এই লোকটা আমার বাপ? এই ভয়ানক চেহারা খুনীটা—কি ঘৃণা—কি ঘৃণা আমার বাপ খুনী! এঁ্যা! আমার বাপ খুনী! মাথাটা যেন কেমন তোলপাড় হয়ে গেল, এঁ্যা! এই আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন অভাগীর সূর্য্যকে উপড়ে অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে—এ আমার বাপ—হবে! না না, তা কেন হবে? যদি এ না বাঁচে—ওঃ! তা হ'লে ও বাপ মান্‌বো না, কাউকে মান্‌ব না, অমনি ক'রে ছোরা তাদের বুকে বসাব। ভাবছি, এমন সময় 'মায়া মায়া' ক'রে উঠলেন; সব ফেলে উঠে গিয়ে দেখি, তখন চোখ তাকিয়েছেন। কি সুন্দর অরুণ আঁখি, যেন কাকে খুঁজ্‌ছে ; যেন কি বল্‌বে ব'লে তাকাচ্ছেন। তখনই ঔষধ দিলাম, একবার যেন কি ভেবে উঠ্‌তে গেলেন। তখনই আবার ধর্‌তে না ধর্‌তে প'ড়ে আবার অঘোর হয়ে পড়্‌লেন। কি হবে? আমি ত এঁকে বুকে নিয়ে এলাম ; কিন্তু যদি না বাঁচাতে পারি, তবে কি হবে? দিনরাত কাটছে কাটুক, কিন্তু

যদি—উঃ! আর সে কথা ভাবতেও পারছি নি। ব'সে আছি আর দেখছি, ভাবছি, এ পাখী পোষবার মত খাঁচা যে আমার নেই, এ ত উড়ে যাবে, যে দিন এর ঘুম ভাঙ্গবে, সেই দিনই উড়ে যাবে; সারা দিন সারা রাত আমার এমনি ক'রে কাটছে। এখন এত বেশ কেটে যাচ্ছে, এর পর কি ক'রে কাটাব? একবার—একবার সাধ হয়, ওই পদ্মের পাপড়ির মত পা দুখানি বুকে ধরি; ভয় হয়, আমার নেবার অধিকার কি? ভয় হয়, এ অপবিত্র দেহের সুখসাধের স্পর্শ তাঁর পায়ে কি ক'রে স্পর্শ করাব? তা ত পারিনে, কেমন ক'রে এঁকে বাঁচাতে পারব। আমি যে বুকে ক'রে নিয়ে এলাম, যেন সে এর স্পর্শে কাতর না হয়। সে যেন আবার হাসে, আর একবার যাবার সময় তেমনি ক'রে তাকিয়ে যায়, শুধু মুখ তুলে জানি পাব না, তবু একবার যদি মুখ তুলে তাকিয়ে যায়।

(শৈল—ইন্দু)

সু-বউ,

নগেন নাকি তোর বাড়ীতে গিয়ে অনেক হাঙ্গাম আর উৎপাত করেছে, মায়াকে নিয়ে আস্‌বার জন্তে? শুনলুম দরোয়ানদের সব মারধর ক'রে ভেতরে বদমায়েস নিয়ে ঢুক্‌তে গিছল—পারে নি, শেষ ওর এমন মাথা বিগ্‌ড়ে গেল? আমি যে কি করি, তা জানি নি। আমায় সেদিন বল্‌লে, 'বৌদিদি, তোমরাই আমার সর্ব্বনাশ করেছ, আমার ভাই-ই আমার পরমশত্রু—তার জন্তই আমার এই দুর্দ্দশা, নইলে আমি ত মানুষ ছিলাম, এখনও ত আছি, তোমরাই আমার সর্ব্বনাশের পথ ক'রে দিয়ে নিজেরা বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছ। আমি তখনই বুঝ্‌লাম, এ কথা বল্‌বার কারণ কি! পাছে কথা বাড়ে, আমি আর তাকে কোন উত্তর দিলাম না। মনটা ভার, মুখখানা লাল ক'রে চ'লে গেল। কিন্তু আমি তার একটা ভয়ানক বদল দেখছি, সে যেন কথা কইতে কইতে কেমন ক'রে ওঠে—চল্‌তে চল্‌তে চমকে ওঠে—শূন্তে হাত মুঠো ক'রে ছোড়ে; আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না; শেষ এও কি পাগল হবে! আমার কেবলই সেই ভয় হ'চ্ছে। হায় রে মানুষের মায়া—এখনও ভয়! কমল ছেলেবেলায় আমায় মা ব'লে ডাক্‌ত, এখনও হঠাৎ এক একদিন তার মুখে সেই মা বেরিয়ে যেত; আমি আনন্দে আহ্লাদে সমস্ত দেহ মন দিয়ে সেই তার মা বলা শুন্‌তাম; সেও আমার ফুরিয়ে গেল। পাথর হয়েও মানুষ পাথর হ'তে পারে না—যতক্ষণ এই প্রাণ থাকে। আগে পাথর কথা কইত, এখন প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে আর পাথর এখন নির্ব্বাক্‌। বলেছিল একদিন হেসে—আর বেশী দেরী নেই; আজ দেখছি, কই দিন ত আর ফুরোয় না, হায় মানুষের মায়ার টান, ছিঁড়েও ছেঁড়া যায় না—এমনি ছল তায়।

কমলের কিছুই খবর পেলাম না, কোথায় গেল, কেউ বল্‌তেও পার্‌লে না। আমার মনে হচ্ছে, কোন বিপদ্ ঘটে নি ত। আমার মনে তাই কেবল হচ্ছে।

খবার খবরটা আমায় দিস্। মায়া কেমন আছে—আহা, এ সবই তার আরো বেশী লাগ্‌ছে। কি থেকে কোথায় কি দাঁড়াল, তাই এখন ভাবি। তাই কেবল ভাবছি, আমি যদি গোড়ায়, সব বুঝে, খুলে ব'লে এ কাজ করতুম, তা হ'লে হয় ত এ ঘটনা এমন হয়ে দাঁড়াত না। কে জানে, মানুষের কর্ম্মফল—হাত বুঝি নেই। কার কর্ম্মফল কে ভোগ করে, নিজে—নিজেরই বুঝি। কিন্তু একজনের জন্যে অন্যে দুঃখ পায় কেন? একজনের পাপে অন্যে শাস্তি পায় কেন? কে বলবে কার কর্ম্মফল। পাথর প'ড়ে আছে, তার কাছে কাঁদি; এখন আর সে হাসে না, মুখখানা ঘোর ক'রে ব'সে থাকে। দেখি বেশ, যখন সবাইকে ফেলে দিয়ে পাথরের কাছে আসি, তখন পাথর কত কথা কয়; আর যে দিন আবার সবাইকে বুকে ক'রে জড়িয়ে তুল্‌তে যাই, পাথর আর আমার সঙ্গে কথা কয় না, আর সে ফিরে চায় না। এ জগতের বুঝি এমনি মজা—কেউ পর করতে চায় না—ঠাকুরও নয়। সবাইকে কেন একসঙ্গে আপনার করতে পারি নি? তাই ত দুঃখ। সবাইকে যদি আপনার করতে পারতাম—তা হ'লে ত বেশ হ'ত। তা কেন হয় না? সবার দুঃখ যদি নিজে নিতে পারি, তবে ত বেশ হয়। একবার এর জন্যে—আবার তাকে ফেলে—অন্যের জন্যে। পাথরের কাছে সবারই জন্যে মাথা খুঁড়ি, তবু সবার ত ভাল হয় না। তাই বুঝতে পারি নে, কার কর্ম্মফল কে ভোগ করে—একের পাপ অন্যে কেন ভোগ করে। একের জ্বলুনি অন্যের কেন হয়?

এদিকে আর এক কাণ্ড—ছোটবৌয়ের গয়নার বাক্স নগেনের কাছে আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। নগেনও সব নিয়ে গিয়ে তার নিজের কাছে রেখেছিল। কি জানি কেন, আশ্চর্য্য, তার একখানিও নষ্ট করে নি, নিজের ছাড়া সে আর কার জিনিষে কখন হাত দেয় নি। তুই শুনেছিস্—জানিস্ ত, ওই একটা মাষ্টার ব'লে ওর ইয়ার আছে—চিম্‌ড়ে মড়ুইপোড়া বামুন একটা—সেই হ'ল এখন দোসর। সে দিন ছুটোতে খুব মদ খেয়েছে; ওদিকে মাষ্টার করেছে কি—কখন নাবার সময় সেই গয়নার বাক্সটা নিয়ে স'রে পড়েছে—তখন অল্প রাত; দাওয়ানজী কোথা থেকে ফিরছিল, কমলের খোঁজে গিছল। দেখে, ওই মাষ্টারটা বাক্সটা নিয়ে; তাকে দেখেই একটু পাশ কাটাতে যায়, বুড়া তাকে ধ'রে ফেলে। সে তখন নানা ওজর ক'রে বলে, ও বাবু দিয়েছেন, টাকার জন্যে। এর মধ্যে খান কতক গয়না আছে! দাওয়ানজী তখন তাকে ধ'রে বাড়ী নিয়ে আসে। দারোয়ানেরা তাকে আট্‌কে রাখে। নগেনের কাছে দাওয়ানজী এসে দেখে, মাতালের অবস্থায় ব'সে আছে, সাম্‌নে মদের গেলাস আর বোতল। আপনার মনে বলছে—'হ'ল না, হ'ল না, ঠিক্, কোথায় পালাল, ছোরা বসিয়েও পারলুম না, ও হোঃ, তবু হ'ল না, কোথায় লুকোল—ভয়ে—ভয়ে—না না—পেত্নী, পেত্নীতে তাকে নিয়ে গেছে—জাহান্নামে—জাহান্নামে—প্রেম প্রেম—জাহান্নামে, দাঁড়াও, তাকেও পাঠাচ্ছি—সব শেষ করব, সব শেষ করব,

হ'লেই টলতে টলতে উঠেছে। দাওয়ানজী বলছিল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ওই সব শুনে মনে করলুম, এই নগাই কি করেছে, যাতে কমলের বিপদ্ হয়েছে—নিশ্চয়। তখন এগিয়ে তার কাছে যায়, গিয়ে বলে, 'নগা, কমল কোথা?' বলতেই সে কেমন হয়ে যায়—তার পর বলে—'তা আমি কি জানি, কে কোথায় যায়, আমি তার খবর রাখি? আমি কি নরকের দাওয়ান যে, সবার খাতা ঠিক ক'রে রেখেছি।' ওদিকে সেই মাষ্টারকে নিয়ে তখন দরোয়ানেরা আসে, মাষ্টারকে দেখেই যেন নগেনের নেশা কতকটা কেটে যায় - ব্যাপারটা শোনে—শুনে তখন বলে—'মাষ্টার, আমি তোমায় বন্ধু মনে করতেম, তাই ত তুমি!' মাষ্টার বলে—'সে কি, এই যে তুমি আমায় টাকা ধারের জন্তে নিয়ে যেতে বললে।' নগেন বললে—'ও তা হবে, ভুলে গিছলুম নেশার ঝোঁকে, ছেড়ে দাও।'—দাওয়ানজী তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসে বললে—'বড়মা! আমার খুব মনে নিচ্ছে যে, এই মাষ্টার আর নগেনে মিলে কি একটা কাণ্ড করেছে। আমি বুঝতে পারছি নি। আমার মনে হচ্ছে, আমি এদের গ্রেরেপ্তার করিয়ে দিই।' দাওয়ানজীর কাছে এই সব শুনে অবধি—আমার হাত পা যেন অসাড় হয়ে এসেছে। আমি আর ভাবতে পারছি নি। তাকে বল্লুম, না, গেরেপ্তার করিয়ে কি হবে, যদি ভাল মন্দ কিছু হয়ে থাকে সে আমারই। আবার কেন ভাল মন্দের জন্ত অন্তকে দায়ী করি। দাওয়ানজী বলে 'না, দুর্জ্জনের শাস্তি চাই—নইলে ধর্ম্ম থাকে না।' আমি বলি—তুমি আমি শাস্তি দেবার কে? ধর্ম্মের বিচার ধর্ম্মই করবেন। দাওয়ানজী কেঁদে চলে গেল। শেষ এও হল—এমন হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি। তাই ভাবছি কার কর্ম্মফল কে ভোগ করছে, কার পাপে কার সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে। কমলেরই কি দোষ সব—হবে! আমিত বিচারকর্ত্তা নই। নিজের কর্ম্মফলে এদের সংসারে এসেছি, এদের সঙ্গে সঙ্গে সব ভোগ করছি। নইলে আমার আর সংসার কিসের। আমার কেন এত টান; কেন কেবল মনে পড়ে ছোট বেলা থেকে যে এদের মানুষ করে তুলেছি—সে যে আমায় মা বলত। দুঃখ করেই বা কি করব, তাও জানিনে, সে যদি গিয়ে থাকে, সেত গেছে—যারা আছে তাদের কেন সুমতি হোক্ না। তারা কেন শাস্তি পাক্ না। তাদের কেন নূতন ক'রে জ্বালার সৃষ্টি। বুঝতে পারি নি, ভাবি কাঁদি, কাঁদলেও ত ফল হবে না। ভোগ করতেই হবে।

হায়! কে উত্তর দেবে, কার পাপে আমার মিহির গেল? কে উত্তর দেবে—কার পাপে সুধীর আজ এমন হ'ল? কে উত্তর দেবে—কেন এ মায়ার টান—কেন পরের কষ্টে না কেঁদে থাকতে পারি নি। কেন হাসি দেখলে হাসি, কান্না দেখলে কাঁদি। এর উত্তর দেবে কে? জন্মালাম কোথায়, হলাম কাদের বাড়ীর বউ—যৌবনের

আশা আকাঙ্ক্ষা না পূরতেই সে বাতি নিভে গেল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সংসারকে টেনে বুকে তুললাম, সংসার আমার কত আপনার হল। তার ভুল ভেঙ্গে চলে গেল, তবু আমার ভুল ভাঙে না। সংসারে থেকে সংসারের বাইরের কথা বুঝেও বুঝতে দিলে না। চোখে একবার হাসি দেখালে, আবার সেই চোখে জল ভরে দিলে। কে জানে—পাথরের এ কি রকম! সবই সেই করে, যা তাঁর ইচ্ছে তাই হবে।

হেনা—যূঁই।

আমার এই পাঁচিল ঘেরা বাড়ী তার ভিতরে বাগান, আর ওই পুকুর, পদ্মে পদ্মে পুকুরের কাল জল আর দেখা যাচ্ছে না। ভোর না হতে, কমল আঁখি মেল্‌বার আগে আমি—আমি পুকুরে নামি পদ্ম তুল্‌তে, কেমন সব মুখটা তুলে রবির আলোর আশায় আঁখি কচালে ফুটতে চায়; সারা রাত্তির সোণার—সোণারই স্বপন দেখে, শেষে ওই, শেষে ওই সোণার, সত্যি সোণার আলোয় জেগে ওঠে! দেখি কেমন ভোমরাগুলো তার কানের কাছে গুণ গুন করে বলে বেড়ায়—'ঘুম এখনও ভাঙলো না তোর, এত কি তোর স্বপনের ঘোর। ওই যে রবির আসা উষার পায়ের আলোয় ফুটে উঠেছে, ওই শোন্ সারা ধরা সজাগ হয়েছে, ওই শোন্ ওই হাঁসের শ্রেণী মালা গেঁথে ডেকে ডেকে উড়ে গেল, ওই শোন্ ভোরের বাঁশী ঘুম ভেঙে চম্‌কে উঠেছে। ওই দেখ বেতস কুঞ্জতলে জলের হিল্লোল উঠেছে, এখনও ঘুম ভাঙল না তোর।' গুণ গুণ গুণ গুণ ভোঁ ভোঁ। পদ্ম বলে 'না না—তার মুখ না দেখলে ফুটব না—আমার সে মোহন ছবি প্রেমের রবি না এলে আমি ফুটব না'—বলে ঘাড় নেড়ে দুলে দুলে ওঠে। সত্যি, প্রেমের রবি না পেলে কেন ফুটব। কিন্তু যে ফুটেছে কার জন্যে তা জানে নি, যখন জান্‌লে তখন তার সব গন্ধ বাতাসে উড়ে গেছে। তার কি আর ফিরে ফোটা চলে, ঝরাই তার সার্থক। ঝরে গেছি, ঝরে গেছি, আর উপহার দেবার কিছু নেই। যে অন্ধকারে ফোটে, সে আলোয় ঝরে যায়। আমি ফুটেছিলুম কোন অন্ধকারে, তাই আলো পাবার আগে উষার সোণার নিকষে টানা দেখেই ঝর-ঝর হয়ে এসেছি। যূঁই! ঝরব, ঝরেই যাব,—কোথায়, তার পায়ে। তবু তারই পায়ে যেন ঝরি—তবু যেন তারি পায়ে ঝরি। ফুটবার সময়ও বিচার চলে না—ঝর্‌বার সময়ও বিচার নেই।

ওই বেশ ভোর হয়ে এসেছে, কমল বোধ হয় এখন যেন কেমন অঘোর হয়ে রয়েছে, মাঝে একটু শুধু জ্ঞানের মত হয়, আবার তেমনি অঘোরে। ডাক্তার ত রোজ কত বার আস্‌ছে, বলছে ভয় নেই—আর কটা দিন বইত নয়; কটা দিন কাটলেই বিকারের ওয়াদা কেটে যাবে, তখন সেরে উঠবেন। কত ত অনেক সুস্থ দেখি, কি জানি, যতদিন যতক্ষণ না উঠবেন ততক্ষণ আর আমার ভরসা নেই। দাঁড়িয়ে আছি; কত কি ভাবছি। পদ্মগুলো সব তারি পায়ের কাছে ফুট্‌তে চাইছে, তার স্পর্শেই ফুটবে,

তার মুখ চেয়েই ত আমি ফুটেছি—ঝরব ব'লে ; কে জানে কি ভাবি, কি বলি ; তোকে সকল কথা বল্‌তে পারি, তাই বল্‌তে চাই, ব'লে বুঝি আরাম পাই। কি জানি কেন বলি,—কেবল মনে হচ্ছে, এখন এঁকে সারিয়ে তাঁর বাড়ীতে রেখে আস্‌তে পারি। আমি এ কলুষিত জর্জ্জরিত তাপিত দেহে, এ পোড়া কলঙ্কের কালীর ছেপ, কেন তাকে দেব, আমি যে তাকে ভালবাস্‌তে পেরেছি—আর আমি তাকে ভোগ কর্‌তে চাই নে। সে যদি চায়, সে যদি দয়া ক'রে তুলে নেয়, যদি তার ভোগের সাধ হয়, সে তুলে নিক্ ; এ উচ্ছিষ্ট দেহে তাকে কেমন ক'রে গ্রহণ কর্‌ব। সে যে আমার ঠাকুর, সে যে আমার দেবতা, সে যে আমার ইষ্ট, সে যে আমার নিষ্ঠা। অনেক দিন পরে ইষ্টকে জান্‌লাম। যখন প্রথম-যৌবনের ভাবে ফুট্‌তে ফুট্‌তে সলাজ-লোচন মেলে ইষ্টকে অন্তরাত্মা খুঁজেছে, তখন সে পায় নি ; তখন সে অর্থরূপে—সুখরূপে দেখা দিয়েছিল, রূপের রূপকে ইষ্টকে তখন সে জানে নি, আজ ইষ্টের মূর্ত্তিতে ওই আমার জন্মজন্মান্তরের স্বপ্ন, জাগরণে মূর্ত্তি ধ'রে এসেছে। আজ ইষ্টের দেখা পেয়েছি, সবই হয়েছে, কেবল প্রাণ এখনও তৃপ্তি পায় নি। ইষ্টকে চোখের সামনে দেখে তাকে এ দেহ দিয়ে বহন ক'রে নিয়ে এসে—প্রাণ তৃপ্তি পায় নি ; কেবল মনে হচ্ছে, কেন এ অপবিত্র দেহ দিয়ে তাঁকে বহন ক'রে নিয়ে এসেছি ? সে যে আমার প্রেমের রবি—তাঁকে কেন কলুষ মাখালাম ? আবার মনে হয়, তা কেন, সূর্য্য সর্ব্বত্রই আলো দান করে, সূর্য্যের আলো শ্মশানের মড়ার উপরেও পড়ে, নলিনীর বুকের মাঝেও পড়ে, তায় রবির কি ? তার রবিতে ছায়া পড়ে না—যে কেবল আলো, তার আবার ছায়া কিসের ? আলোর ছায়া পড়ে না। যাতে আলো পড়ে, সে ধন্য হয়—এ দেহ তাকে স্পর্শ করেছে, তার রক্তে মুখ চোখ বুক ভেসে গেছে, দেহ ধন্য হয়েছে। আহা ! প্রেমাস্পদ আমার জন্যে তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত সহ্য কর্‌লে, আমার জন্যে এমন জীবন-মরণে যুদ্ধ কর্‌লে, আমার জন্যে ঝলকে ঝলকে বুকের রক্ত দিলে ; প্রেমাস্পদ আমার এই চাওয়ার পাপের ফল তোমায় ভোগ করালুম ... । থুঁই ! পাপ-পুণ্য বুঝি নি, এখন কেবল এক মনে হয়, এত যে তাকে পায়ের তলায় লুটিয়ে নেব মনে কর্‌লুম—সে সব তেজ আমার কোথায় গেল ? এখন কেবল নিজে সেই পা যেখান দিয়ে গিয়েছে, সেখানে লুটতে, তাকে তীর্থ মনে ক'রে—সেই ধূলা বুকে ধারণ কর্‌ছি, সেই এখন আমার কত সাধের মণিহার ! সে আকাঙ্ক্ষার—সে বাসনার জ্বালায় গাঁথা মণিমালার চেয়ে, আজ ধূলা কত গৌরবের—কত আনন্দের।

ভাবতে ভাবতে সেই লোকটার কথা মনে হ'ল, যে মেরেছে তার কাছে শুনেছিলুম, পিঠে ছোরা মেরেছিল সে, তার পর—পড়ে যাবার পর—বুকে আঘাত করে—নগেন। উঃ ! যে ভাই তার শির কেটে রক্ত ঢেলে দিয়েছিল—তার বুকের রক্ত দেখবে না, তবে বীর কি ? যে রক্তে জীবন, সেই রক্তপান কি চমৎকার ! থুঁই ! মানুষ এত দুরন্ত

পারে! আজ আমার এই খুনে' লোকটাকে বাপের আভাসে তাকে স্নেহ করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আর আপনার ভায়ের মত তাকে জন্ম থেকে জেনে, তার বুকে কি করে আগুন জ্বলে! আশ্চর্য্য! আমরা কি খুঁই যে, দেবতাকে তার দেবত্বর আসন থেকে টেনে পিশাচে পরিণত করি! নগেনও ত এত খারাপ ছিল না,—এত আমারই জন্যে। সংসারে জন্মালুম কোন ঘরে, সে ত কুয়াশা ঢাকা, মনে পড়েও পড়ে না। বাপ কেমন তা জানলাম না, মা কেমন তা বুঝলুম না। ভাই যে কত আপনার, সে ভাববার অবসরও কেউ দেয় নি। যে পালন করলে, যে একশ' টাকায় কিনে নিয়ে এসে, দশলক্ষ টাকা দেখালে, সে আমার মা নয়, সে রাক্ষুসী। আমায় খেলে, যখন প্রথম কৈশোর আর যৌবনের মাঝে পড়েছি, তখন কেউ এলে কেঁদে ভয়ে পালিয়ে গেছি। মার খেয়েছি, বেতের দাগ এখনও যায় নি। পূর্ব্বজন্মের, জন্মান্তরের কত পাপ, তাই চিরজীবন উপরে আগুন, নীচে আগুন, তার মাঝে থেকে এসেছি—সেই কেলা মা-ই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। আজ তাই কাঁদছি, আজ তাই বুঝি এ খুনে, যে আমায় পাপের পথে নিয়ে যায় নি—নিজে অত বড় পাপী, তাকে বাবা ব'লে ডাকতে দ্বিধা হয়েও স্নেহ করতে সাধ হচ্ছে। জানি না, সত্যি আমার এ বাপ কি না। যদি সত্যি হয় হবে, হাঁ এই খুনীটা আমার বাপ—হবে!···ওই সে লোকটা আবার আসছে। মনে করি দেখা কর্ব্বো না, আবার কেমন মায়া হয়, দেখে ফেরাতে পারি নি। কেমন মনে হয়—আহা, এ যে আমার বাপ! সে এসে বলছে, 'মা, তোকে দেখে অবধি প্রাণ যেন কেমন করছে, আমার প্রাণ বলেছে, তুই আমার সেই রাণী।' সেই সময় একটা ভিখিরী ফটকের ধারে এসে গান গাইছিল, লোকটা অবাক্ হয়ে শুনতে লাগ্‌ল,—

ও মা রাণী, বল দেখি শুনি,
আমার, পাষাণ-গড়া এ বুক ভেঙ্গে কোথায় ছিলি পাষাণী।
যেন জন্ম জন্ম ধ'রে আছি উমা স্বপ্ন ঘোরে
তুই আসিস্ আসিস্ মনে ক'রে, ওই আকাশে দিন গণি॥"

গান শুনতে শুনতে লোকটা যেন পাগলের মত তাকাতে লাগ্‌ল। তার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল,—আমিও যেন কেমন হয়ে গেলুম। ভিখিরী তখন গাইছিল,—আজ আগমনী—তাই ভিখিরীও গান গাইছিল—

ভেবে ভেবে পাথর হয়ে, হেরি আসে কুয়াশা ছেয়ে
বুক ফেটে এ ধারা বয়ে ঝরণা ঝরে দিন-যামিনী।
আয় মা আমার বুকে আয়, মুছে দে মা আঁখি-ধারায়
(ওরে) মেয়েরে কি ভোলা যায়, সে যে বুকের চিন্তামণি॥"

লোকটা যেন কেমন হয়ে গেল; ব'লে উঠ্‌ল 'রাণি! রাণি! তুই মা আমার সেই

সত্যি রাণী!'—বলে, ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে বল্‌লে, চোখ মুছলে, বল্‌লে, মাগো না কেঁদে থাকতে পারলুম না। কিছু মনে করিস্ নি মা,—ওই ছেলে আমার ভাল হলে একবার তার কাছে মাপ চাইব, একবার সব কথা ব'লে কেঁদে—না না—কেঁদে নয়, বল্‌ব আমায় মাপ কর। তাই আসি—নইলে, একি—একি—একি মা, আমার মেয়ে—আমারি মেয়ে এমন এমন, এ কি হয়েছিস্? এর চেয়ে যে তোর মরা ভাল ছিল, এর চেয়ে যে আমার তোর জন্ম জেলে থাকা ভাল ছিল, এর চেয়ে কি বল্‌ব তুই ভিখিরি হলি নি কেন? হায়! মাগো, তোকে যদি এমন রূপে না দেখতাম, না চিন্‌তে পার্‌তেম,—ষোল বছর পরে যদি না চিন্‌তে পার্‌তাম,—ব'লে কেঁদে লোকটা চ'লে গেল। হঠাৎ যেমন সাপে কামড়ালে, বাপ রে ব'লে লোকে সভয়ে ছুটে পালায়, তেমনিতর আমার মুখের পানে চেয়ে চ'লে গেল। পাথরের মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, দেখলাম, লোকটা তেমনি সজল-চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে চ'লে গেল। আমার মনের ভেতর যেন একটা ঘূর্ণীর হাওয়া গর্জ্জে গেল। ভাবলুম, আমি আজ বেশ্যা ব'লে বাপ আমার এমন দিনে ত্যাগ করলে? ওই খুনে সে আমার বাপ, কেন আমার বাপ খুনে হ'ল। হুঁই! মানুষ নিজে খারাপ হলেও আপনার কাকেও খারাপ দেখতে চায় না। বড় তার লাগে। আমি বেশ্যা, আমিও চাইনে যে, আমার বাপ মিথ্যাবাদী হোক্—এমনি মজা। জগতে মন্দ কেউ যাচে না; যাচাই করতে মন্দ বেরিয়ে পড়ে। ওই! ওই! বুঝি তিনি কাকে ডাকলেন—যাই!···

না, তেমনি অঘোরে আছেন। ডাক্তার বলেছে, কোন রকমে যেন কোন বিষয়ে উত্তেজনা না পান, জ্ঞান আপনা আপনি আস্‌বে। আমি তাই চুপ ক'রে চেয়েই আছি। দিন কাটে, রাত কাটে, তাই চুপ ক'রে শুধু নিশ্বাস ফেলি। মুখখানা যেন কেমন ফিকে হয়ে গেছে; এক একবার মনে করি, ওই পাপড়ির মত ঠোঁট দুখানিতে—যে দিন ঘুম ভাঙবে, সে দিন ত আর দেবেন না। তখনই—আবার মনে হয়, না, সেটুকুর অধিকারও ত আমার নেই; সে দয়া তাঁর। আবার একবার ভাবি, না, যদি এ ঠোঁট মিলে, কে জানে, হয় ত আমার কি বিষ আছে, যদি আর না জাগে, যদি আর না আঁখি মেলে—তবে? তাই চুপ ক'রে নিশ্বাস ফেলি, চুপ ক'রে চেয়ে থাকি। তার পর আর একটা—এ অপরূপ আমার জন্ত নয়, যার জন্তে তাকেই বুঝি স্বপ্ন দেখেন, তাই ডাকেন। তখন আর আমার ভাববার পথও ঘুচে এয়েছে লো, আর ভাবি কেন? আর চাই বা কেন? এখন শুধু সেরে উঠলেই বাঁচি। আমার, আমার পথ বোধ হয় এক রকম ঠিক হয়ে রয়েছে। তিনি জাগলেই আমার কাজ ফুরুবে। আর বোধ হয় কোন কাজ রইল না, থাক্‌বেও না।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

বৈষ্ণব-কবিতা *

(সমালোচনা)

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাব্য-সমূহের সমালোচনাত্মক "রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যিনি বাংলার সাহিত্যসেবীদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, সেই অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ মহাশয় বর্ত্তমান শ্রাবণের "প্রবাসী" পত্রিকায় "বৈষ্ণব-কবিতা" নাম দিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। অজিত বাবু এই প্রবন্ধে বৈষ্ণব-কবিতার সম্বন্ধে যে কতকগুলি অসঙ্গত ও অমূলক দোষারোপ ও সত্যের অপলাপ করিয়াছেন—তাহার ফলে আমাদিগের দেশে বৈষ্ণব-কবিতার সমাদরের বিশেষ কোন হানি হইবে—এরূপ আমরা বোধ করি না; তবে অজিত বাবুর মত সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তিও যে এরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করিতে পারেন—ইহা দেখিয়া আমরা নিতান্তই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমাদিগের মোটামুটী যাহা বলিবার আছে—তাহা শুনিলে অজিত বাবু বা তাঁহার সমধর্ম্মা ব্যক্তিগণের মত পরিবর্ত্তিত হইবে কি না, জানি না—তথাপি কর্ত্তব্য বোধে এ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা আমরা আজ শিক্ষিত সাহিত্য-সেবীদিগের নিকট নিবেদন করিতে উপস্থিত হইয়াছি।

প্রথমেই বলা উচিত যে, অজিত বাবুর প্রবন্ধটি এরূপ এলো-মেলো ভাবে রচিত যে, ঐ প্রবন্ধ হইতে শ্রেণী-বদ্ধ-ভাবে তাঁহার আপত্তিগুলি এক স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পরে ক্রমান্বয়ে উহাদিগের উত্তর দেওয়া চলে না; সুতরাং আমরা অগত্যা অজিত বাবুর এক একটি আপত্তি—তাঁহার কথায় উদ্ধৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগের বক্তব্য বলিয়া যাইব। ইহাতে আর যাহা হউক—সমালোচনায় অজিত বাবুর আপত্তিগুলি ঠিক-ঠিক বলা হয় নাই, এই অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

অজিত বাবু প্রথমেই লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, আমাদের দেশের কোন কোন সাহিত্যিক বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যেই গীতি-কবিতার শ্রেষ্ঠ রূপ ফুটিয়াছে এবং বৈষ্ণব-কবিতার তত্ত্বের মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের চরম বিকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করেন। তাঁদের বিবেচনায় 'বাংলা-কবিতার প্রাণ ও বাংলা সাহিত্যের আদর্শ' সমস্তই ঐ বৈষ্ণব-কবিতার

* বগুড়ায় উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে দশম অধিবেশনে পঠিত।

মধ্যেই মেলে, কোন কোন বৈষ্ণব-কবিতার মত 'কোন দেশের সাহিত্যেই' আজ পর্য্যন্তও সৃষ্ট হয় নাই' এবং 'বাঙ্গালায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাঙ্গালার দীপ নিভিয়া গেল।' অর্থাৎ প্রতীচ্যের সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক কালে বাংলা দেশে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁদের মতে সেটা কিছুই নয়—'বাংলা'কবিতার প্রাণ' তার মধ্যে আদপেই নাই।"

আমরা যতদূর জানি—অন্যান্য সাধারণ ও বিশেষ ভাবে বৈষ্ণব-কবিতার উৎকর্ষের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া থাকিলেও বাঁকীপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে দাশ মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন—উহাতে বৈষ্ণব-কবিতার এই অসাধারণ বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের সেই অভিভাষণের প্রদর্শিত বিশ্লেষণ বা বিচার-পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছুমাত্র আলোচনা না করিয়া অজিত বাবু সেই সুদীর্ঘ অভিভাষণের কয়েকটা বিচ্ছিন্ন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দুই-তিন ছত্রের মধ্যে সেই অভিভাষণটির যে তাৎপর্য্য নিষ্কাশিত করিয়াছেন, উহাতে সাহসিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাইলেও সহৃদয়তা বা সত্যপ্রিয়তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। "প্রতীচ্যের সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক কালে বাংলা দেশে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—সেটা কিছুই নয়—'বাংলা কবিতার' প্রাণ তার মধ্যে আদপেই নাই"—ঠিক এরূপ কথা অভিভাষণে আছে কি? দাশ মহাশয়ের রচিত কাব্যগুলি কি সম্পূর্ণ প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাব-বর্জ্জিত? প্রতীচ্য-সাহিত্য আমাদের দেশে প্রচারিত হওয়ার পর উহাতে সুশিক্ষিত কোন ব্যক্তির পক্ষে সেই সাহিত্যের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ-ভাবে বিমুক্ত থাকিয়া কাব্য রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে কি?—যদি তাহা না হইয়া থাকে—তবে ত সভাপতি মহাশয়ের বাংলা কাব্যেও "বাংলা কবিতার প্রাণ" আদপেই নাই এবং সেটা বাংলা কাব্যের হিসাবে কিছুই নয়! আমরা মনে করি, নিরপেক্ষ-ভাবে উক্ত অভিভাষণের উক্তিগুলির পর্য্যালোচনা করিলে অল্পবুদ্ধি লোকেও বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক কালে বাংলা দেশে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাকে কিছু নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করা কিংবা বাংলা কবিতার প্রাণ তার মধ্যে আদপেই নাই বলিয়া উহাকে উক্ত অভিভাষণে তুচ্ছ করা হয় নাই;—সেরূপ করাও সম্ভবপর নহে। অভিভাষণের এ অংশের প্রতিপাদ্য এই যে, প্রকৃত "বাংলা কবিতার প্রাণ ও বাংলা সাহিত্যের আদর্শ" বৈষ্ণব-কবিতায় যেমন মিলে, আধুনিক বাংলা কবিতায় তেমন মিলে না। বৈষ্ণব-কবিতার তুলনায় এ হিসাবে আধুনিক বাংলা কবিতা নগণ্য—উহাতে খাঁটি বাংলার প্রাণের কথা সম্পূর্ণ দূরে থাকুক, আংশিক খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন। সভাপতি মহাশয়ের এই উক্তি কি অমূলক? বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্য-কবি ও অদ্বিতীয়

সমালোচক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বযুগের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য সমালোচনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন, অজিত বাবু কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? ঈশ্বর গুপ্তকে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি বলার তাৎপর্য্য কি ইহাই নহে যে,— ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় 'বাংলা কবিতার প্রাণ' যতটুকু ফুটিয়াছে, পরবর্ত্তী যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের কাব্যেও ততটুকু ফোটে নাই। অথচ আবার হেমচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্ত্তী যুগের কবিদিগকে সেই বঙ্কিম বাবু অন্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ—ঈশ্বর গুপ্তের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর এই সমালোচনার যথার্থতা সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্তও ত কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই! তবে প্রকারান্তরে প্রায় সেইরূপ কথা বলায়, অজিত বাবু আজ সভাপতি মহাশয়ের সে উক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন কেন?

সে যাহা হউক, অজিত বাবু উক্ত অভিভাষণের এই গভীর সত্যমূলক উক্তিটির সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা না করিয়া—বৈষ্ণব-কবিতার মত রস-রচনা 'কোন দেশের সাহিত্যেই আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই'—এই উক্তিটি যে সর্ব্বথা অমূলক, তাহাই সপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সমালোচনার ২য় দফায় লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বের বিচার পরে হইবে, আগে সাহিত্য-হিসাবে বৈষ্ণব-কবিতার আলোচনা করা যাক। কেন না, এটা সত্য যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কবিতার অধিকাংশই গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের ভণিতার অনেক আগেই তৈরি। তার পর বৈষ্ণব-তত্ত্ব বলিলে ত কোন এক জন তত্ত্ব-কারের রচনা বুঝায় না—তার মধ্যেও নানা সম্প্রদায় ও শাখা-সম্প্রদায় আছে। যথা, রামানুজী, বল্লভী, জীব গোস্বামী সম্প্রদায় এবং এদের আবার নানা শাখা-সম্প্রদায়।—এই নানা দলের নানা জটিল মতামতের ঋজু-কুটিল পন্থার ভিতর দিয়া গেলে তবে বৈষ্ণব-তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তার পর বৈষ্ণব-সাধনারও বিস্তর ভেদ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দেখি; সহজে সাধনাকে মহাজন সাধকেরা নিন্দাই করিয়া থাকেন। অথচ মহাজন সাধনার অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে সহজেরা দিব্য প্রাকৃত ও সহজ করিয়া লওয়ার চেষ্টায় আছে এবং এ ক্ষেত্রে অপ্রাকৃতের চেয়ে প্রাকৃতের পরেই প্রাকৃত জনের মনের টানটা যে বেশী, তা বাংলা গ্রামের ভিতরকার খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাই জানেন। এ সব তত্ত্ব ও সাধনার পর আবার এখনকার ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীদের হাল-ফ্যাসানের বৈষ্ণব-তত্ত্ব ও সাধনা আছে। পুরানো সাধনা ও তত্ত্বের সঙ্গে তার মিল নাই, কারণ, তাতে এ কালের শিক্ষিত লোকের দিল খোলে না। তাঁরা বৈষ্ণব-সাধনাকে যতটা জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়ান, জীবনের সঙ্গে বাস্তবিক সে সাধনা ততটা জড়িত নয়। কিন্তু এ সব তত্ত্ব সময়ক্রমে আলোচনা করা যাইবে; উপস্থিত মত বৈষ্ণব-কবিতাকে শুধু সাহিত্য হিসাবে আলোচনা করিলে কাহারও আপত্তির কোন কারণ দেখি না।"

আমরা জানিতাম যে, এইরূপ একটি জটিল বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত করিতে হইলে আগে সেই বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তিরা কে কি বলিয়াছেন, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। স্ব-মতের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিগুলির বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করা আবশ্যক;—কেন না, এইরূপ বিষয়ে কোন যুক্তি-তর্কের ভিতর না যাইয়া সহজ জ্ঞানে (intuitively) একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, এরূপ শক্তি প্লেটো, এরিষ্টটল, ব্যাস বা শঙ্করাচার্য্যের মধ্যেও দেখা যায় নাই। অজিত বাবু অবশ্য প্লেটো বা শঙ্করাচার্য্য হওয়ার দাবি করেন না—সুতরাং এ ক্ষেত্রে তিনি বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের সম্বন্ধে এক নিশ্বাসে এতগুলি গুরুতর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করার পূর্ব্বে তিনি যে তাঁহার যুক্তিগুলি প্রদর্শিত না করিয়া—উহা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখিয়াছেন—ইহা কিরূপ হইল? যে সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন যুক্তি-তর্ক নাই—উহার খণ্ডন জন্যও কোন যুক্তি-তর্ক-প্রদর্শন অনাবশ্যক। তবে এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে অজিত বাবুর পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি নিতান্ত অমূলক। বৈষ্ণব-কবিতার অধিকাংশই 'গৌড়ীয় রসতত্ত্বের ভণিতার (?) অনেক আগে তৈরি' হওয়া দূরে থাকুক—কেবল মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদাবলি ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রচলিত সমস্ত বৈষ্ণব কবিতাই শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ্‌রূপ গোস্বামীর রচিত "ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু" ও "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব রসগ্রন্থদ্বয়ের পরবর্ত্তী রচনা। চণ্ডিদাস যদিও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় এক শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক—কিন্তু তাঁহার প্রচলিত পদাবলি যে তত প্রাচীন নহে, উহা যে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে—তাহা সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডিদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক উৎকৃষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থের ভূমিকায় অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের সহিত চণ্ডিদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ও ভাবের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তাহা অজিত বাবুও বোধ হয় অনুভব করিয়াছেন;—কেননা, তিনি সমস্ত বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে চণ্ডিদাসের পদাবলিই আধ্যাত্মিকতা হিসাবে উৎকৃষ্ট এবং উহার মধ্যে দশ কি পনেরটি পদ অতি চমৎকার ও বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া, চণ্ডিদাসের নবপ্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এ শুধুই দৈহিক বিকারের বর্ণনা। এরূপ বর্ণনা সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডিদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' গ্রন্থে যেমন আছে, Havelock Ellis এর Sex-psychology ছয় ভলিউম বা কাম-শাস্ত্র পুস্তকেও তেমন পাওয়া যাইবে না।" আমরা অজিত বাবুর এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে পরে বিচার করিব; এই স্থলে কেবল ইহাই

বলিতে চাই যে, চণ্ডিদাসের এই "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন"ই তাঁহার খাঁটি রচনা ; তাঁহার প্রচলিত পদাবলি সমস্তই অল্লাধিক পরিমাণে পরবর্ত্তী রূপান্তর মাত্র। সুতরাং সত্যকথা বলিতে গেলে—বাঙ্গালী বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদিগের প্রচলিত কোন পদই বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের গণ্ডীর বাহিরের নহে। তার পর বক্তব্য, এই বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের কথা আরম্ভ করিয়া অজিত বাবু 'রামানুজী, বল্লভী, জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব তত্ত্বকারের (?) প্রসঙ্গ তুলিলেন কেন? শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রণীত বৈষ্ণব-'রসতত্ত্ব' ও "রামানুজী, বল্লভী, জীবগোস্বামী সম্প্রদায়" কর্ত্তৃক প্রচারিত "বৈষ্ণব তত্ত্ব" কি এক জিনিষ? সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বৈষ্ণব-কবিতা, বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব ও কিছু কিছু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও বৈষ্ণব-সাধনা-পদ্ধতির আলোচনা করিয়া, এতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে," বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্বে—জগতের প্রাচীন ও নব্য সমস্ত ধর্ম্ম-তত্ত্বের ন্যায় "নানা জটিল মতামত" ও "ঋজু-কুটিল পন্থা" থাকিলেও 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বে' সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায় বা মতভেদ নাই। বৈষ্ণব-কবিতার সহিত সাক্ষাৎভাবে বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বেরই সম্বন্ধ—বৈষ্ণব ধর্ম্ম-তত্ত্বের সেইরূপ সম্বন্ধ নাই ; কেন না, দার্শনিক হিসাবে ধর্ম্ম-তত্ত্ব যে কবিতার প্রতিপাদ্য নহে—এই আলঙ্কারিক তত্ত্বটি প্রায় দুই হাজার বৎসর হইতে,—নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনির সময় হইতে ভারতীয় সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, জয়দেব, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব-দাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক বৈষ্ণব কবিরা পর্য্যন্ত কেহই পদাবলি রচনা করিতে যাইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যার অবতারণা করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া—বৈষ্ণব-কবিতা কিংবা বৈষ্ণব-সাধনার সহিত বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বের যে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—তাহা ত অস্বীকার করা যায় না। অজিত বাবু "মহাজন সাধনার অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-লীলা" বাক্যের দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন, ঠিক বলিতে পারি না। "অপ্রাকৃত" শব্দের প্রকৃত অর্থ "অলৌকিক" ; বৈষ্ণব-সাহিত্যেও এই অর্থেই "অপ্রাকৃত" শব্দের ব্যবহার হয় ;—যেমন "শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত মদন" এই বাক্যের অর্থ এই যে, শ্রীবৃন্দাবনে মদনের কর্ত্তব্য চিত্তবিমোহন কার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আলৌকিকভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন—সেখানে কামোদ্দীপক প্রাকৃত কন্দর্পের অধিকার নাই। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের লীলার অর্থ—দেহধারী শ্রীভগবান্ ও তাঁহার দেহ-ধারিণী পরাশক্তির লীলা ; ইহাতে অব্যক্ত ও ব্যক্ত—কিংবা অন্য কথায় অলৌকিক ও লৌকিক ভাব অবশ্যই আছে। অলৌকিক বা অপ্রাকৃত ভাবটিকে আশ্রয় করিয়াই লৌকিক বা প্রাকৃত ভাবটি টিকিয়া আছে। অন্যান্য স্থলের ন্যায় এ স্থলেও যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা প্রধানতঃ অপ্রাকৃত ভাবের উপাসক হইলেও এরূপ ক্ষেত্রে প্রাকৃত ভাবকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না ; যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা নিগূঢ় অপ্রাকৃত ভাবটিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া—

কেহ বা তৎপ্রতি অন্ধ বিশ্বাসে শ্রদ্ধাবান্, কেহ বা তৎপ্রতি সন্দিহান হইয়া প্রবৃত্তি-বশে অভীষ্ট প্রাকৃত সাধনা-মার্গেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সকল ধর্ম্মে—সকল প্রকার সাধনায়ই এরূপ তত্ত্বদর্শী ও স্থূলদর্শী উভয় শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অজিত বাবু এ জন্য বৈষ্ণব-সাধনার প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন কেন ? তিনি কি করিয়া জানিলেন যে, ইংরেজী-শিক্ষিত হাল ফ্যাসানের বৈষ্ণব বাঙ্গালীরা "বৈষ্ণব-রস-সাধনাকে যতটা জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়ান, জীবনের সঙ্গে বাস্তবিক সে সাধনা ততটা জড়িত নয়।" শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের চরিত্র সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে—তিনি কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহাদিগের সেই রস-সাধনার সহিত তাঁহাদের জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ যোগ বা সামঞ্জস্য ছিল না ? যদি ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কি ইহাই মনে করিতে হইবে যে, শ্রীচৈতন্য-দেব ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর পক্ষে প্রাচীনকালে যাহা সত্য ছিল—এখন উহাই অসত্য হইয়া পড়িয়াছে ? কোন ধর্ম্ম বা সাধনার বাহ্যিক আচরণ সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ; কিন্তু উহার যাহা অপ্রাকৃত অংশ বা সার-ভাগ, তাহা ত চিরকালের জন্যই সত্য ও অবিনশ্বর থাকিবে ! বর্ত্তমান যুগের যুক্তিবাদী বহু মনীষী সমালোচকও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্বের ও বৈষ্ণব-রস-সাধনার ভূয়সী প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—অজিত বাবু কি তাহা জানেন না ? অজিত বাবু সাহিত্যিক হিসাবে বৈষ্ণব-কবিতার আলোচনা করিতে যাইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্বের, এমন কি, বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বের আলোচনা করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন ; আমরাও বলি "তথাস্তু"। তবে 'ধান ভানিতে শিবের গীত' কেন ? অজিত বাবু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্ব, রস-তত্ত্ব ও রস-সাধনা সম্বন্ধে এই সকল খামখেয়ালি কথা লিখিয়া বিদ্বেষ-ভাব ও অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

অতঃপর অজিত বাবু "চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির রচনাগুলি নাড়াচাড়া" করিয়া "সাহিত্য হিসাবে তাদের কতটুকু মূল্য যাচাই করিয়া পাওয়া যায়"—সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আগেই প্রতীচ্য কবিতার সহিত তুলনার বিরোধী এক শ্রেণীর কল্পিত সমালোচকের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন—"তবে যাঁরা মনে করেন যে, বাংলা দেশটা বিশ্বের চেয়ে বড়, যা নাই ব্রহ্মাণ্ডে তা এই দেশের ভাণ্ডের মধ্যে খাতির-জমা হইয়া আছে, সুতরাং এখানে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সহিত তুলনা না করিয়াই সে সব সাহিত্যের চেয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কলরব করিলেই সে কলরবটা ক্রমশঃ জনরবে পরিণত হইয়া অকাট্য সত্য হইয়া বসিবে—তাঁদের সঙ্গে আমার কোন তর্ক নাই। তাঁরা বিশ্বকে ছাড়িয়া স্ব স্ব দেশের বিবরের মধ্যে চোক-কান বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকুন, বিশ্বের কোন খবর সেথায় যেন না পৌঁছায়।"

কেবল বাংলা কবিতার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—এমন কোন অলঙ্কার-শাস্ত্রের যে এ দেশে সৃষ্টি হইয়াছে,—কিংবা কোন সমালোচক বাংলা কবিতাকে বিশ্ব-সাহিত্যের যাচাইয়ের হাটে লইয়া যাইতে অসম্মত হইয়াছেন—এরূপ খবর অজিত বাবু কোথায় পাইলেন? না পাইয়া থাকিলে—এরূপ অমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক কথায় প্রবন্ধ পূর্ণ করাই কি অজিত বাবুর সমালোচনার আদর্শ? সে যাহা হউক—এবার তিনি সত্য সত্যই বৈষ্ণব-কবিতার দর যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভূমিকা করিতেছেন—"বৈষ্ণব-কবিতা কিছু সখ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে বাৎসল্য ও মধুর রসের কবিতা।" * * * *

"প্রথমে সখ্য-রসই দেখা যাক।" "সখ্যরসের কবিতা বৈষ্ণব-কবিতায় নাই বলিলেই হয়, যাহা আছে, তাহা এত অল্প যে, তাহা পড়িয়া কোন তৃপ্তিই হয় না। বলরাম দাসের কতক কতক কবিতায় একটুখানি সখ্যরসের আস্বাদন হয় মাত্র। যেমন—

'ভোজন সমাপি সবহুঁ ব্রজ-বালক
বৈঠল নীপক ছায়।' ইত্যাদি

কিংবা শ্যামের—

'প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ॥' ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণ সুদামের কোলে শুইয়া আছেন আর শ্রীদাম তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের মুখ রৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্রীদামের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, এর চেয়ে বড় সখ্য-রসের কল্পনা বৈষ্ণব-কবির নাই।"

অজিত বাবু পদকল্পতরুর ৩য় শাখার একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি পল্লবের সখ্য-রসের পদগুলি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন কি? পড়িয়া থাকিলে তিনি সখ্য-রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা বলরাম দাসের অপূর্ব্ব পদাবলী কিংবা বলরাম, প্রেমদাস, যাদবেন্দ্র, শিবাই প্রভৃতি পদকর্ত্তার উৎকৃষ্ট পদগুলির উল্লেখ না করিয়া অতি সাধারণ ও চল-সই দুইটি পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন কেন? বৈষ্ণব-কবিদিগের সখ্যরসেরও সুন্দর সুন্দর এত পদ ও পদাংশ আছে যে, তাহা উদ্ধৃত করিলে উহা দ্বারাই একটি প্রবন্ধ পূর্ণ করা যায়। যদি অজিত বাবুর এই সকল খুঁজিয়া লওয়ার সুবিধা না হয়—তাহা হইলে তিনি গত ১৩২১ সালের "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকার পৌষ ও মাঘের সংখ্যায় "বৈষ্ণব-পদাবলির রস-বৈচিত্র্য" (বাৎসল্য ও সখ্য-রস) প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিলে তাঁহার ভ্রান্তি দূর হইবে। অজিত বাবুর ন্যায় যাঁহাদিগের পদাবলি—সমুদ্রমন্থন করিয়া রত্ন-সংগ্রহ করার উপযোগী ধৈর্য্য বা চেষ্টা নাই—তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-কবির অতুলনীয় বাৎসল্য ও সখ্য-রসের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমরা ঐ প্রবন্ধ দুটি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম।

অজিত বাবু অতঃপর লিখিয়াছেন—"সখ্য-রসের কবিতা পড়িতে হইলে পারস্ত কবিতা, বিশেষতঃ হাফেজের কবিতায় যাইতে হয়। * * * হাফেজের কবিতায় জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধ দুই সখার সম্বন্ধ—পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ নয়। জড়-জগতের ও অধ্যাত্ম-জগতের সকল সৌন্দর্য্য সেই সখার মুখজ্যোতির ছটা।" অজিত বাবু উদাহরণস্বরূপ হাফেজের কয়েকটি কবিতাংশের বাংলা তরজমা দিয়াছেন। হাফেজের কবিতার উপাদেয়তা সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই। তবে এ স্থলে আমরা এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, হাফেজের স্তায় একজন জ্ঞানী ও প্রেমিক ভক্ত যে ভাবে তাঁহার প্রিয়তমের নিকট নিজের প্রাণের কথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন—অজিত বাবু কি ব্রজ-বালকদিগের মুখে সেইরূপ প্রবীণের উক্তি শুনিবার আশা করেন? যদি হাফেজের বা হুইট্‌ম্যানের সহিত বৈষ্ণব-কবিতার সাদৃশ্য দেখিতে চাহেন—তাহা হইলে পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ৩৬শ পল্লবে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তার, বিশেষতঃ নরোত্তম দাসের 'প্রার্থনা-নির্ব্বেদ,' 'দৈন্য-বোধিকা প্রার্থনা,' 'সাধন-লালসাময়ী প্রার্থনা' বিষয়ক পদগুলি পাঠ করুন। এ সকল বিষয়েও বৈষ্ণব-কবির এত সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে যে, উহার সহিত ঐ ভাবের যে কোন বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ কবিতার তুলনা করা যাইতে পারে।

তার পর বাৎসল্য রস। অজিত বাবু প্রথমে লিখিয়াছেন—"এ রসে অবশ্য বাঙ্গালীর জিৎ, তাহা মানিতেই হইবে।" কিন্তু সেই দফারই মধ্যভাগে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, "বালক কৃষ্ণের বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখানো প্রভৃতি কতকগুলি রহস্যের অবতারণা বৈষ্ণব-কবিতায় শেষাশেষি দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ—বৈষ্ণব-কবিদিগের কেবলি ননী-ছানা চুরি এবং যশোদার তাতে প্রশ্রয় (?) এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিচিত্র বেশে সাজানো ইত্যাদি ঘোরো বাল্যলীলার কথাই পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহার যত বড় মূল্যই থাকুক, কাব্য-হিসাবে ইহার মূল্য অত্যন্ত কম।" দৃষ্টান্তস্থলে অজিত বাবু কতকগুলি ইংরেজী কবিতার অপূর্ব্ব বাৎসল্য-রসের উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন যে, "রবীন্দ্রনাথের নাম করিবার জো নাই—কারণ, তিনি প্রতীচ্য কবিতার নকল করিয়া নাকি প্রতীচ্যদেশে যশস্বী হইয়াছেন, কেননা, প্রতীচ্য দেশের লোকেরা তাঁহাদের কাব্যের নকলটা ধরিতে পারে নাই,—নহিলে বলিতাম যে, 'শিশু' কাব্যে যে বাৎসল্য-রস আছে—শুধু একটি কবিতা 'জন্ম-কথায়' শিশুর আবির্ভাবের অনির্ব্বচনীয় রহস্যের যে সংবাদ আছে—সমস্ত বৈষ্ণব-পদাবলীতে তাহা কোথাও নাই।

'ছিলি আমার পুতুল খেলায়
ভোরে শিব-পূজায় বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।

তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে
তারি পূজায় তোমার পূজা করেছি' ।" ইত্যাদি

অজিত বাবুর এই সৃষ্টি-ছাড়া সিদ্ধান্ত শুনিয়া আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। অজিত বাবুর উল্লিখিত ইংরেজী কবিতাগুলির কিংবা ঐ সকল কবিতার সাদৃশ্যযুক্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত কবিতায় "শিশু-জন্মের অনির্ব্বচনীয় রহস্য" আছে কি না, সে কথা লইয়া তর্ক উঠাইব না। স্বীকার করিয়া লইলাম যে, এই সকল কবিতায় আধুনিক শিক্ষিতা মাতার মাতৃত্বের রহস্যময় কল্পনাটি কবিত্বের ভাষায় বেশ ফুটিয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণব-কবির বর্ণিত যশোদার বাৎসল্য এরূপ কাল্পনিক বস্তু নহে; উহা সনাতন মাতৃহৃদয়ের সহজ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল কালে ও সকল সমাজে কবিতার বিকাশ একরকমে হয় না এবং কবিতার ভাব এক রকমে ফোটে না। বিভিন্ন দেশের কথা দূরে থাকুক—এক ইংরেজী সাহিত্যেই চসার, মিল্টন, শেলী, কীটস্, টেনিসন্ এবং ব্রাউনিং প্রভৃতির মধুর-রসের বর্ণনা এক প্রকার কি ?

বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশের ন্যায় কবিতারও একটা দিক্ ক্রম-বিকাশের নিয়মাধীন; ইহাকে কবিতার জ্ঞানের দিক্ (intellect) বলা যাইতে পারে। কবিতার আর একটা দিক্ আছে, উহাকে কল্পনার (imagination) এর দিক্ বলা যায়। জগতের বিজ্ঞান ও সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতি ক্রমশঃ স্থূল (concrete) হইতে সূক্ষ্ম (abstract) বিষয়ের ধারণায় অধিক অভ্যস্ত হইতে থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম; অসাধারণ মনীষীদিগের পক্ষে সময়ে সময়ে এই নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেলেও—সকল দেশের সাহিত্যের সাধারণ নিয়মটি যে সত্য, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু Imagination বা কবিত্বের মূলীভূত মনন-শক্তিটি যে সভ্যতার বিকাশের সহিত সর্ব্বদাই অধিক বিকাশপ্রাপ্ত হয়—ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেহ কুতর্ক ধরিয়া অসভ্য সমাজের দৃষ্টান্ত তুলিবেন না। আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টেনিসন্, মিল্টন ও সেক্‌স্‌পীয়ার হইতে, কিংবা সেইরূপ হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস হইতে সাধারণ সভ্যতায় ও অনেক বিষয়ের জ্ঞানে অনেক শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা যে সে জন্যই তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী উক্ত কবিগণ হইতে কবিত্বের মূলীভূত মনন-শক্তিতেও শ্রেষ্ঠ হইবেন, এমন কোন কথা নাই। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবিগণ অপেক্ষা আধুনিক সাধারণ কবিরাও অনেক বিষয়ে সূক্ষ্ম বা abstract ভাবের ধারণা ও প্রকাশে অধিক পটুতার পরিচয় দিয়া থাকেন। মনীষী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কবিতা ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি নব্য কবিদিগের কবিতার প্রকৃতিগত

পার্থক্য সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন কবিদিগের কবিতায় বর্ণনীয় বিষয় অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ; কিন্তু তাঁহাদিগের রসানুভূতি অত্যন্ত তীব্র। নব্য কবিদিগের বর্ণনীয় বিষয় খুব ব্যাপক—কিন্তু রসানুভূতি সেরূপ তীব্র নহে। প্রাচীন কবিতায় সঙ্কীর্ণ জল-প্রবাহ নব্য কবিতায় বহু-বিস্তৃত হইয়া পড়ায় উহার গভীরতা ও বেগশালিতার পরিবর্ত্তে যেন ব্যাপকতা ও প্রশান্ততা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ যাঁহারা প্রাচীন ও নব্য কবিতার এই প্রকৃতিগত পার্থক্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া উভয়বিধ কবিতার রসাস্বাদনে অভ্যস্ত হন নাই—তাঁহাদিগের নিকট এরূপ একতরফা আলোচনা ব্যতীত—নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

অতঃপর অজিত বাবু বৈষ্ণব কবিতার মধুর-রসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া—"বৈষ্ণব কবিদিগের ব্যক্তিত্বের আভাস টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে পাওয়া যায় মাত্র; ব্যক্তিত্বের পূরা চেহারা দেখিবার কোন উপায় নাই। বৈষ্ণব-কবিতা ব্যক্তিত্বের কবিতা হয় নাই" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের সম্পূর্ণ অভাবই যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতার বিশেষত্ব—জগতে দুই চারি জন মহাকবি—যেমন হোমর, সেকস্‌পীয়র, বাল্মীকি, কালিদাস ব্যতীত আর কেহ যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই—অজিত বাবু ব্যক্তিত্ব-প্রধান গীতি কবিতার প্রতি পক্ষপাত হেতু—তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন! কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি গীতি-কবিদিগকে এই হিসাবে সেকস্‌পীয়র, কালিদাস প্রভৃতির সমকক্ষ বলিতেছি। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি হইয়াও অতুলনীয় নাট্যকার সেকস্‌পীয়র ও কালিদাসের ন্যায় যে গীতি-কাব্যেও ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে অব্যক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন—আমাদিগের বিবেচনায় কেবল ইহাই তাঁহাদিগের কবিতার অসাধারণ উৎকর্ষের প্রকৃষ্ট পরিচয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এবার অজিত বাবু বৈষ্ণব কবিতার ত্রিদোষ-ক্ষেত্র বা plague-spotএ আসিয়া পড়িয়াছেন আর সকল যেমন হউক,—বৈষ্ণব-কবিতা যে ভয়ানক অশ্লীল এবং সে জন্য ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য—সে কথার উত্তর কি? এ সম্বন্ধে অজিত বাবুর উক্তি মোটামুটি এই—

"রাধা-কৃষ্ণের গোপন প্রণয়ের ঐ কাহিনীটা এমনি ঘোরতর যৌন-সম্বন্ধের কাহিনী যে, তাহার বর্ণনায় কাম-শাস্ত্রের মাল-মসলা জোগানো ছাড়া উচ্চ মানব-প্রেমের বিশেষ কোন মালমসলা জোগানো যায় না।" শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাঁর নব প্রকাশিত Love in Hindu Literature নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"The Padavalis are the songs of delight in flesh."

পুনশ্চ স্থানান্তরে—

"আমি বিনয় বাবুর সঙ্গে একমত হইয়া বলি যে, বিদ্যাপতির এই সব কবি-

তার মধ্যে কোন কালেই কোন রূপক ছিল না বা নাই—এ সব কবিতা নিছক কামের কবিতা, আর কিছুই নয়। বিনয় বাবু ঠিকই লিখিয়াছেন—'Vidyapati is a professor of Kam-shastra."

কাব্যের শ্লীলতা বা অশ্লীলতা বিচার করিতে হইলে সনাতন আদর্শ (Standard) কি হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে কাব্য-কলার সৌন্দর্য্যে ও ধর্ম্মনীতির মঙ্গলের মধ্যে কোন চিরন্তন বিরোধ আছে কি না, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা এ হিসাবে নিন্দনীয় কি না—আমরা "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ" গ্রন্থের ভূমিকায় সে সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং এ স্থলে ঐ সকল বিষয়ে পুনরায় দার্শনিক তর্ক (Academical discussion) উঠাইব না। অজিত বাবু যেমন বিনয় বাবুর সাক্ষ্য দ্বারা স্ব-মতের পোষকতা করিয়াছেন—আমরাও সেই নজীরের আপাততঃ তাঁহাদিগের গুরুস্থানীয় একজন প্রতীচ্য মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতের অসারতা প্রদর্শন করিব।

বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে জগতে যিনি শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ, সেই মনীষী স্যর গ্রিয়ারসন্ মহোদয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "Maithil Chrestomathy" নামক গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"It now remains to consider the matter of Bidyapati's poems. They are nearly all Vaishnava hymns or Bhajans, and as such belong to a class well known to students of modern Indian Literature. They cannot be judged by European rules of taste, and must not be condemned too hastily as using the language of the brothel to describe the soul's yearnings after God. Now that the Aphorisms of Sandilya have been given in an English dress by Mr. Cowell, no one need plead ignorance of the mysteries of the Indian doctrine of faith. "God is Love" is alike the motto of the Eastern and the Western worlds, while the form of love proposed is essentially different. The people of a colder western clime have contented themselvs with comparing the ineffable love of God to that of a father to his children, while the warmer climes of the tropics have led the seekers after truth to compare the love of the worshipper for the worshipped to that of the Supreme Mistress Radha for her Supreme Lord Krisna. It is true that it is hard for a western mind to grasp this idea, but let us not therefore hastily condemn it : the glowing stanzas of Bidyapati are read by the devout Hindu with as little of the baser part of human sensuousness as the Song of Solomon is by the Christian priest.

অজিত বাবু কেবল বিদ্যাপতিকে গালি দিয়া ক্ষান্ত হন নাই,—সর্ব্বজন-সমাদৃত Songs of Solomon সম্বন্ধেও তিনি লিখিয়াছেন—"এ সব কবিতার সঙ্গে Songs of Solomon অথবা 'শৃঙ্গারশতক' অথবা কালিদাসের 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি লালসা-মূলক কবিতার তুলনা চলে; কিন্তু তাও ঠিক চলে না। কারণ, ঐ সব কবিতার মধ্যে কল্পনার দিক্‌টা বেশ আছে, তা ছাড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-রস প্রচুর-পরিমাণেই আছে। বৈষ্ণব-কবিতায় তা নাই; এ শুধুই দৈহিক বিকারের বর্ণনা।" ইত্যাদি—

যে বৈষ্ণব-কবির কবিতা নানা বিচিত্র কল্পনা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রসের প্রাচুর্য্যের জন্যই সুবিখ্যাত—উহাই আজ অজিত বাবুর ও বিনয় বাবুর নিকট শুধু অশ্লীল ও কামোদ্দীপক বর্ণনা বলিয়া গণ্য হইল! অজিত বাবু অতঃপর লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতি এইরূপ একান্ত ইন্দ্রিয়ভোগের কবি হইলেও তাঁহার কবিতার মধ্যে খাঁটি সাহিত্য-রস আছে। জয়দেব ছাড়া এমন পদ-লালিত্য, ছন্দের এমন ঝঙ্কার আর কোন বৈষ্ণব-কবিরই নাই। অবশ্য, সে ঝঙ্কার ও শব্দ-লালিত্যও কেবল কানেরই জিনিষ—কানকেই সুখ দেয়, প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।"

অজিত বাবুর এই উক্তির তাৎপর্য্য কি? তিনি বিদ্যাপতির কবিতার মধ্যে "খাঁটি সাহিত্য-রস আছে" বলিয়া স্বীকার করিয়া আবার তখনি বলিতেছেন যে, উহাতে পদলালিত্য ও শব্দের ঝঙ্কার ছাড়া প্রাণের জিনিষ কিছুই নাই। অজিত বাবুর অলঙ্কার-শাস্ত্রে কি কেবল পদলালিত্য ও শব্দের ঝঙ্কারেই খাঁটি সাহিত্য রস-সৃষ্ট হয়? বোধ হয় সেইরূপই হইবে; নতুবা প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে না পারিলেও বিদ্যাপতির কবিতা যে কিরূপে খাঁটি সাহিত্য-রসের আধার হইতে পারে, তাহা প্রতীচ্য বা প্রাচ্য কোন মনস্তত্ত্ব বা অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্রের সাহায্যে বুঝা যায় না।

অজিত বাবু সমস্ত বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে চণ্ডিদাসের যে "বড় জোর দশটি কি পনেরটি" কবিতায় প্রকৃত কাব্য-রসের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥"

"পিরীতি বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলি পর॥"

"পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥"

উদ্ধৃত পদাংশগুলির দ্বারা অজিত বাবু শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিতে কি বুঝেন, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতীচ্য কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের গোঁড়া শিষ্যগণ তাঁহার যে তথাকথিত ' আধ্যাত্মিক কবিতার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মনীষী সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ডের মতে যাহা প্রকৃত-পক্ষে কাব্য-রস-বর্জ্জিত—চণ্ডিদাসের উদ্ধৃত কবিতাগুলির দুই একটি বাদে বাকি কবিতাগুলিকে আমরাও প্রায় সেই শ্রেণীরই মনে করি। দার্শনিক তত্ত্বের হিসাবে উহাতে প্রাণের কথা—প্রেমের কথা আছে বটে, কিন্তু কাব্যের সারভূত ব্যঞ্জনা বা Poetic imagination এর হিসাবে উহার মূল্য নাই বলিলেই হয়; যাহা একটু আছে, প্রতীচ্য সমালোচনার ভাষায় উহাকে উচ্চ অঙ্গের imagination না বলিয়া poetical conceit বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। অজিত বাবু যদি তাঁহার প্রীতিকর এই তথাকথিত আধ্যাত্মিক শ্রেণীর কবিতার প্রতি একান্ত পক্ষপাতী না হইয়া নিরপেক্ষভাবে ব্যঞ্জনা-প্রধান উৎকৃষ্ট কবিতার রসাস্বাদন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে চণ্ডিদাসের—সখা হে ও ধনী কে কহ বটে' ইত্যাদি যে পদটির তিনটি কলি ছাড়া তিনি বাকি অংশ সুরুচির খাতিরে উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই, সেই পদের—

"চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জরে ভোর॥"

কলিটিতে প্রেমোচ্ছ্বাস ও কাব্যকলার অতুলনীয় মণিকাঞ্চনযোগ দেখিতে পাইতেন। কিন্তু কথা হইতেছে যে, এখানে হৃদয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষা ও উচ্ছ্বাস ত তথা-কথিত আধ্যাত্মিক ভাষায় ব্যক্ত করা হয় নাই—এখানে যে উচ্ছ্বাস ও কাব্যকলা কল্পনার প্রভাবে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে! এবংবিধ কবিতার প্রকৃত রসাস্বাদনের অধিকার

অতি অল্প লোকেরই আছে। প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য সমালোচক Theodore Watts Encyclopædia Britanica গ্রন্থে কবিতার বিচার-প্রসঙ্গে গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ কবি স্যাফোর কবিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

The most truly passionate poet in Greece was no doubt in a deep sense the most artistic poet; but in her case art and passion were one and that is why she has been so cruelly misunderstood."

স্বীকার করি যে, এই তথা-কথিত আধ্যাত্মিকতার কবিতা বৈষ্ণব-পদাবলিতে বড় বেশী নাই—কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা ইহাকে প্রকৃতপক্ষে উচ্চ অঙ্গের রসরচনা বলিয়াই গণ্য করেন নাই—ইহা মধুর-রস-বিষয়ক কবিতা হইলেও বিভাব-অনুভাবাদির সাহায্যে এখানে মধুর-রসের ব্যঞ্জনা না হইয়া বরং 'স্ব-শব্দ বাচ্যতা'-নামক অলঙ্কার-দোষই ঘটিয়াছে। বৈষ্ণবকবির কবিতার শ্রেষ্ঠ বিষয় প্রেমানুভূতি ও প্রেম-তন্ময়তা। উহা প্রকাশ করিতে যাইয়া বৈষ্ণব-কবি কোথায়ও কবিতার স্বাভাবিক ভাষা ছাড়িয়া—দার্শনিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। অজিত বাবু চণ্ডিদাসের যে কয়েকটি কবিতায় এই দার্শনিকতার গন্ধ পাইয়াছেন—তাহা যে চণ্ডিদাসের নহে, কিন্তু পরবর্ত্তী সহজিয়া বা রাগাত্মিক-পন্থীদিগের কৃত প্রক্ষেপ, তাহা "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থ আবিষ্কারের পরে প্রমাণিত করা তেমন কঠিন নহে। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আলোচনা-প্রসঙ্গে সময়ান্তরে সে সম্বন্ধে বিচার করিব। এ স্থলে কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবিতার পরিচয় দিতে হইলে সমালোচক মহাশয়ের দৃষ্টিকে আর একটু উদার করিতে হইবে! Havelock Ellisএর Sex Psychology ছয় ভলুম বা কামশাস্ত্র পাঠ করিতেও যখন তাঁহার বিরক্তির কারণ হয় নাই—তখন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া তিনি পুনরায় বৈষ্ণব-কবিতা অধ্যয়ন করুন। কোন স্থানে সন্দেহ হইলে বরং উহা স্তর রবীন্দ্রনাথের নিকট বুঝিয়া লইবেন। অজিত বাবুর অবগতির জন্য আমরা বলিয়া দিতেছি—বহুদিন পূর্ব্বে স্তর (তখনকার বাবু) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রিয় বন্ধু স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সাহচর্য্যে বৈষ্ণব-কবিতা পাঠের সুবিধার জন্য "পদরত্নাবলী" নাম দিয়া পনের কি কুড়ি জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবির শতাধিক পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশ্য, যেখানে দীনেশ বাবুর মত সাহিত্য-সমালোচক প্রায় তিন হাজার পদ-পরিপূর্ণ পদ-কল্পতরুর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়াছেন,—"পদকল্পতরুর প্রতি পত্রেই এমন দুই একটি ছত্র বা পদ আছে—যাহা পড়িলে বোধ হয়, কবি বাগ্দেবীর লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়াছেন"—সেখানে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের সেই সংগ্রহটিকে খুব সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বলিয়া অভিহিত

করি, তাহা হইলে বোধ হয়, উহা আমাদিগের ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে শতাধিক রত্ন দেখিয়াছেন—সেখানে রবীন্দ্র শিষ্য উহার এক-চতুর্থাংশও দেখিতে পান নাই। এ জন্যই বোধ হয়, প্রবাদ আছে যে—"শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী।"

অতঃপর অজিত বাবু—"অতএব বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে একা চণ্ডিদাসের কতক কতক কবিতারই বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান হইতে পারে এবং বিদ্যাপতির দু একটা পদেরও হইতে পারে দেখা গেল। তার পর জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রভৃতি পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসেরই ছায়া। তবু তাঁদেরও দু একটা পদ খুবই চমৎকার এবং চিরকাল আদরের যোগ্য।"—এইরূপ চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া—এই বলিয়া একটু শান্তি পাইয়াছেন যে—"যিনি যাই বলুন, এটা ঠিক জানি যে, ভাবী বাংলা কবিতার ধারা আর রাধিকার নব নব 'রূপান্তর' ঘটানতে নিযুক্ত থাকিবে না।" মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরা কি রাধিকার "রূপান্তর" ঘটানতেই নিযুক্ত ছিলেন?—না থাকিলে ভবিষ্যতের জন্য অজিত বাবুর এ সন্দেহ হইল কেন? উক্ত কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়—মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ রাধিকার "নব নব রূপান্তর" ঘটাইতে একবার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার ফলে যে ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও ভানুসিংহের পদাবলীর উদ্ভব হইয়াছে, খাঁটি বৈষ্ণব-কবিতার তুলনায় উহার মূল্য কি, তাহা সাহিত্য-সেবিমাত্রেই অবগত আছেন। অজিত বাবু সে প্রসঙ্গ না তুলিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন; নতুবা কি জন্য যে নব্য বাংলার দুই জন শ্রেষ্ঠ কবি উক্ত কাব্য গ্রন্থে খাঁটি বৈষ্ণব-কবিতার অনুপম আন্তরিকতা ও কাব্য-সৌন্দর্য্যের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন নাই—সেই কথা বুঝিতে যাইলে বৈষ্ণব-কবিতার অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইত! কেহ মনে করিবেন না যে, রবীন্দ্রনাথের অনেক গীতি-কবিতার সহিত বৈষ্ণব-কবিতার যে চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা অস্বীকার করিতেছি! আমাদিগের বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলীতে বৈষ্ণব-কবিতার অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন—কিন্তু সমাজ ও শিক্ষা-দীক্ষার পার্থক্যে সেই অনুকরণ কাব্য-হিসাবে সফল হয় নাই—হইবেও না। কিন্তু যেখানে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুকরণ করিতে চাহেন নাই—কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণব-কবির কাব্য তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যেও অনির্ব্বচনীয়ভাবে রূপান্তরিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেখানে বৈষ্ণব-কবিতার সাদৃশ্য বস্তুতই বিস্ময়জনক। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সহৃদয়তা ও কবিত্বের উৎকর্ষই প্রমাণিত হইতেছে। আমরা অজিত বাবুর আলোচনাটিকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিলাম,—সকল কথা যে সকলের মনঃপূত হইবে, এমন আশা করি না।

কেননা, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—এই কথাটি কবিতার বিচারে যেমন প্রযোজ্য—তেমন অন্যত্র নহে। তথাপি রস ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের সর্ব্ববাদিসম্মত এমন কতকগুলি সূত্র আছে—যাহার বিরুদ্ধে কোন তর্ক করা চলে না। অজিত বাবু নব্য কবিতার (Romantic poetry) একান্ত পক্ষপাতী বলিয়া প্রাচীন কবিতার (classical poetry) সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করিতে পারেন নাই,—পারিলে বৈষ্ণব-কবির অতুলনীয় কাব্যের সম্বন্ধে তিনি এরূপ একদেশদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন না। অজিত বাবুর সমালোচনায় এরূপ আরও অনেক কথা আছে—যাহার যথার্থতা স্বীকার করা যায় না; কিন্তু আমরা সেই সকল অবান্তরকথার আলোচনা করিয়া আর কথা বাড়াইতে চাহি না। ইহা সত্য যে, এখন কেহ শত চেষ্টা করিয়াও প্রাচীন বৈষ্ণব-কবির ন্যায় কবিতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না,—সেরূপ চেষ্টা করারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদিগকে ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা বাংলা সমাজ ও সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝি—উহার প্রাণে আজ পর্য্যন্তও নব সভ্যতার আত্ম-প্রতিষ্ঠা (individualism) অপেক্ষা আমাদিগের প্রাচীন সভ্যতার আত্ম-ত্যাগের ভাবই জাগিয়া আছে,—সুতরাং যাঁহারা প্রতীচ্য নব সভ্যতার মোহে আত্মত্যাগের শ্রেষ্ঠ সাধন প্রেমানুভূতি ও প্রেমতন্ময়তাকে বর্জ্জন করিয়া—উহার পরিবর্ত্তে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মখ্যাপনকে বরণ করিয়া লইয়াছেন—তাঁহাদিগের সমাজ-সংস্কার বা সাহিত্যসৃষ্টি যে বাংলার প্রাণকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করিতে পারে নাই—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যদি বাংলার সমাজ ও সাহিত্য কোন সময়ে উহার সেই প্রাচীন শিক্ষা ও দীক্ষা বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে উহাকে বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে ঘোরতর দুর্দ্দিন মনে করিব। বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের এই প্রাণের ভাবগুলি বুঝিয়া, আমরা যাহাতে চিরকাল সেগুলিকে সমাদর করিতে পারি—ও সেগুলিকে জীবনের ধ্রুবতারা ভাবিয়া সময়োপযোগী সমাজসংস্কার ও সাহিত্য-সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারি, প্রত্যেক সামাজিক ও সাহিত্যসেবীরই উহা একমাত্র লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। যে প্রতীচ্য মনীষীরা তাঁহাদিগের অসাধারণ চেষ্টা, পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তার গুণে জগতের সর্ব্ববিধ সমাজ ও সাহিত্যের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করিয়া সমুন্নত সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্য-সমালোচনার সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহাদিগের নিকট এতদিন শিক্ষা লাভ করিয়া যদি আজ পর্য্যন্তও আমাদিগের বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের রত্নগুলি বাছিয়া লইবার শক্তি আমরা লাভ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগের উচ্চশিক্ষার অভিমান যে অত্যন্ত অসার—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্, এ।

বিন্দীর সাঙ্গা

(১)

দুলের মেয়ে বিন্দী আঠার বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া বছরখানেক পরে যখন ঘোষপুরের রামু ঘোড়ুইকে সাঙ্গা করিল, তখন সে একবারও ভাবে নাই যে, তাহাকে শেষে মাছ ধরিয়া, মাছ বেচিয়া দিন চালাইতে হইবে। বাপ বেচু যাহার জাতিতে দুলে হইলেও মাছ ধরা তাহার ব্যবসায় ছিল না। তাহার চাষবাস ছিল, ঘরে সংবৎসরের খোরাকী ধান মরাই বাঁধা থাকিত। তা ছাড়া পাল্কীর সর্দ্দারীও ছিল, সুতরাং পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীতকে উপেক্ষা করিয়া, পুকুরের জলে নামিয়া বিন্দীকে কখনও মাছ ধরিতে হয় নাই। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে, শ্রাবণের অবিরল বারিধারার মধ্যে হাটে বাজারে বা পাড়ায় পাড়ায় মাছ বেচিবার প্রয়োজনও তাহার ছিল না। বিবাহও হইয়াছিল সমান ঘরে; সেখানেও বিন্দীকে ভাত-কাপড়ের জন্য কখনও ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু বাপ্-খুড়ার অমতে সাঙ্গা করিয়া, নূতন স্বামীর ঘরে আসিয়া যখন তাহাকে এ সকলই করিতে হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল, গুরুজনের কথা না শুনিয়া কাজটা ভাল করে নাই।

জাতীয় সমাজে সাঙ্গা প্রচলিত থাকিলেও বাপের ইচ্ছা ছিল না যে, মেয়ের সাঙ্গা দেয়। মায়েরও তেমন মত ছিল না। বিন্দী কিন্তু বারুণীর মেলা দেখিতে গিয়া রামুর মুখের মিষ্ট কথায় যে একটা ভালবাসার স্বপ্ন লইয়া ঘরে ফিরিয়াছিল, সে স্বপ্নের ঘোরটা সে কিছুতেই কাটাইতে পারিল না। সুতরাং মা-বাপের অমতেও সে রামুকে সাঙ্গা করিতে উদ্যত হইল। কন্যার একান্ত আগ্রহ দেখিয়া বেচু বলিল, "যদি সাঙ্গা কত্তেই হয়, তবে গাংপুরের নিমু ঘোড়ুইকেই সাঙ্গা কর্। রেমো ছোঁড়ার চাল নাই, চুলো নাই, ওকে সাঙ্গা ক'রে শেষে কি এক মুঠো ভাতের তরে কেঁদে বেড়াবি?"

বিন্দীর মনে কিন্তু তখন ভাত-কাপড়ের ভাবনাটা একবারও আসিল না। সে সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া রামু ঘোড়ুইকেই সাঙ্গা করিল। বাপ প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর মেয়ের মুখ দেখিবে না। বিন্দীও আর বাপকে মুখ দেখাইল না, রামুর হাত ধরিয়া তাহার ঘর করিতে আসিল। রামুর কুঁড়ে-ঘর, তালপাতার ছাউনী; দরজায় কবাট নাই, চেঁচা বাঁশের আগড়। বিন্দী সেই আগড় দেওয়া, তালপাতার ছাওয়া কুঁড়েটিকেই স্বর্গ বলিয়া মানিয়া লইল।

কিন্তু দিন কতক পরে বিন্দীকে যখন ছেঁড়া ন্যাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিয়া, জাল ঘাড়ে পুকুরে পুকুরে ঘুরিতে হইল এবং মাছ বেচার পয়সায় চাল কিনিয়া আনিয়া দিন চালাইতে হইল, সেই দিন তাহার সাধের স্বর্গটা সহসা যেন কঠোর মর্ত্ত্যে পরিণত হইয়া আসিল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিন্দী সেই ভাঙ্গা কুঁড়েটুকুর মধ্যে স্বর্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিল'না। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। স্বর্গই হউক বা মর্ত্ত্যই হউক, সেই ক্ষুদ্র কুঁড়েটুকুকেই আপনার সুখের কেন্দ্র করিয়া লইয়া বিন্দী দিন কাটাইতে লাগিল।

তা রামুও যে অক্ষম ছিল, পয়সা উপায় করিতে পারিত না, এমন নয়। সে পাল্কী বহিত, পাল্কীর ভাড়া না জুটিলে মজুর খাটিত। কিন্তু তাহার উপার্জ্জনের একটি পয়সাও ঘরে আসিত না। যে দিন যাহা পাইত, তাহা বাজারের সিদ্ধেশ্বর শাহার মদের দোকানে, অথবা করিমদ্দি চাচার তাড়ির আড্ডায় দিয়া টলিতে টলিতে ঘরে ফিরিত। ঘরে আসিয়া বিন্দীকে গালাগালি দিত, তাহার মা-বাপের উদ্দেশে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিত। বিন্দী কোন দিন মুখ বুজিয়া থাকিত, কোন দিন গালাগালির উত্তরে দুই একটা গালাগালি দিত। যে দিন উত্তর করিত, সে দিন বিন্দী স্বামীর নিকট দুই চারি ঘা মার খাইত। মার খাইয়া বিন্দী কাঁদিতে বসিত, আর রামু টলিতে টলিতে গিয়া দাবার উপর চাটাই পাতিয়া শুইয়া পড়িত।

তার পর বমিতে যখন চাটাই ভাসিতে থাকিত, সংজ্ঞাহীন রামুর মুখের ভিতর মাছি ঢুকিত, তখন বিন্দী আসিয়া সে সকল পরিষ্কার করিয়া দিত, ঘটী করিয়া জল আনিয়া রামুর চোখে মুখে মাথায় দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে বসিত। নেশা ছুটিয়া গেলে রামু উঠিয়া বসিত। বিন্দী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া ভাতের কাছে বসাইয়া দিত। রামু আহার শেষ করিয়া উঠিলে বিন্দী তাহাকে আঁচাইবার জল দিয়া তামাক সাজিয়া আনিত। রামু দাবায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিত—

"সে কি আমার অযতোনের ধোন।
মনো প্রাণো যারি করে করি সমোর্প্পোণ।
সে কি আমার—"

বিন্দী ভাতের গ্রাস মুখের কাছে রাখিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিত, রামু গাহিতেছে—

"তবে যে অপ্রিয়ো বোলি, যখনো জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তারি সকোলিই, প্রেমেরি কারোণ।
সে কি আমার—"

একটা অব্যক্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিন্দীর সকল নির্য্যাতন—সকল কষ্ট মুহূর্ত্তে মুছিয়া যাইত।

আধ ক্রোশ দূরে বাপের বাড়ী। সুতরাং বিন্দীর কষ্টের কথা মা বাপের অগোচর ছিল না। বাপ রাগিয়া বলিত, "চুলোয় যাক্ বিন্দী।" মা কিন্তু রাগ করিয়া থাকিতে পারিত না। সে সময়ে সময়ে আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া যাইত, এবং মেয়ের কষ্ট দেখিয়া কাঁদিতে থাকিত। বলিত, "আমার ভাত কে খায় বিন্দি, আর তুই এক মুঠো ভাতের তরে হা হা ক'রে বেড়াস্?"

বিন্দী উত্তর করিত, "কি কর্‌বো মা, কপাল।"

মা আক্ষেপ করিয়া বলিত, "তোর কপাল নয় বিন্দি, আমারই পোড়া কপাল। থাক্ তুই আমার ঘরে; পেটে ঠাঁই দিয়েছি, হাঁড়ীতে কি ঠাঁই দিতে পার্‌বো না?"

মুখ নীচু করিয়া বিন্দী বলিত, "তোমার জামাই যে রাগ কর্‌বে মা?"

মা রাগিয়া বলিত, "আরে মোর জামাই! বলে—'ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাট্‌বার গোঁসাই।' মুখে আগুন অমন জামাইয়ের।"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত বিন্দী বলিত, "ছিঃ মা!"

মা হাত-মুখ নাড়িয়া উত্তর করিত, "আ লো, এত দরদ! তবু যদি দু'বেলা উত্তম-মধ্যম না দিত।"

বিন্দী ধীরে ধীরে বলিত, "তা মার্‌লেই বা মা, আপনার মানুষ বটে তো।"

মা গর্জ্জন করিয়া বলিত, "খাওড়া মারি অমন আপনার মানুষের মুখে; মার-ধর কত্তে তো আছে, কিন্তু এই হাড়ভাঙ্গা শীতে তোকে জলে নেমে যে মাছ ধর্‌তে হয়, তার কি?"

মৃদু হাসিয়া বিন্দী উত্তর করিত, "তা ধর্‌লেই বা মাছ, দুলের মেয়ে তো বটি।"

মা রাগে মেয়েকে কতকগুলো তিরস্কার করিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু মায়ের প্রাণ, থাকিতে পারিত না। মাঝে মাঝে দু'সের চাল, এক সের মুড়ি, দু'পোয়া মুসুর কলায়, ক্ষেতের পাঁচটা বেগুন, বাড়ীর সকলকে লুকাইয়া মেয়েকে দিয়া আসিত।

(২)

"বিন্দি!"

"কেনে?"

"হাঁড়ী তুল্‌ছিস্ যে?"

স্বামীকে ভাত দিয়া বিন্দী হাঁড়ী তুলিতেছিল। উনানের পাশে বেদীর উপর হাঁড়ীটা রাখিয়া তাহার মুখে সরা চাপা দিতে দিতে বিন্দী বলিল, "হাঁড়ী তুল্‌বো না তো প'ড়ে থাক্‌বে?"

রামু ভাতে নুন মাখিতে মাখিতে বলিল, "তুই খাবি না?"

বিন্দী মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "না।"

রা। কেনে?

বি। খিদে নেই।

রা। খিদে নেই, না ভাত নেই?

বি। রাঁধ্‌লে তো ভাত থাক্‌বে?

রা। চাল থাক্‌লে তো রাঁধ্‌বি?

বিন্দী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "তোকে বলেছে চাল নেই, চাল থাক্ না থাক্, রাঁধি না রাঁধি, সে আমার খুসী। তোর মরদ মানুষের এত খোঁজে দরকার কি রে?"

ঈষৎ হাসিয়া রামু বলিল, "দূর মাগী, আমি তোর খোঁজ-খবর নেব না তো নেবে কে?"

বিন্দী মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে উত্তর করিল, "যম।"

রামু নীরবে কয়েক গ্রাস ভাত উদরস্থ করিয়া বলিল, "তোর গোসা হয়েছে বিন্দি?"

বিন্দী একটু রাগতভাবে বলিল, "হাঁ, তোকে বলেচে গোসা হয়েচে।"

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রামু দৃঢ়স্বরে বলিল, "আলবোৎ গোসা হয়েচে। কৈ, তুই আমার মাথার কিরে ক'রে বল্ দেখি?"

বিন্দী ভ্রূকুটী করিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দেখ্ মিন্‌ষে, খেতে বসেছিস্, খেয়ে উঠে যা।"

রামু মুখ নীচু করিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল, "আমি তো খেতে বসেছি, খেয়ে উঠ্‌বো, কিন্তু তুই না খেয়ে থাক্‌বি বিন্দি?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বিন্দী বলিল, "ভাল রে মিন্‌ষে, এই যে আমার ওপর দরদ দেখাতে শিখেচিস্?"

রামু গম্ভীরস্বরে বলিল, "কেনে বিন্দি, আমি কি তোকে দরদ করি না?"

শ্লেষের তীব্রস্বরে বিন্দী বলিল, "খুব করিস্। এই দুকুর বেলা কত দরদ দেখালি? চোখের কোলটা এখনো ফুলে আছে।"

লজ্জিতকণ্ঠে রামু বলিল, "বড্ড লেগেচে, না বিন্দি?"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দী বলিল, "না, মারলে কি লাগে?"

রামু নতমস্তকে কোলের ভাতগুলাকে চটকাইতে লাগিল। বিন্দী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "লাগেনি তেমন, তবে আর একটু হলেই চোখটা যেতো। তা যেতো যেতোই, তুই ব'সে রইলি যে? খেয়ে নে।"

রামু ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া, বাঁ হাতে ধরিয়া ঘটীর জলটা গলায় ঢালিয়া দিল। বিন্দী বলিল, "ও কি, ভাত ফেলে উঠ্‌ছিস্ যে?"

রামু বলিল, "ফেলে উঠ্‌ছি না, খেয়েই উঠ্‌ছি।"

ঝি। তবে ওগুলা প'ড়ে রইলো কেনে?

রামু। থাক্, তুই খাবি।

রামু উঠিতে গেল। বিন্দী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল; ব্যগ্রস্বরে বলিল, "আমার মাথা খাস্, খেয়ে ফেল্, কা'ল আবার তোকে ভাড়া বইতে যেতে হবে।"

রামু বলিল, "আর তুই উপোস থাক্‌বি?"

বিন্দী বলিল, "আমার খিদে নেই, মাইরি বল্‌ছি, আমার খিদে নেই।"

রামু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "আমাকে ছুঁয়ে বল্‌চিস্?"

বিন্দী তাহার হাতটা ছুঁড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খেতে হয় খা, নয় তো চুলোয় যা। আমি কেনে কথায় কথায় তোর কিরে কণ্ডে যাব রে মিন্‌ষে?"

রামু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল। বিন্দী তাহাকে তামাক সাজিয়া দিয়া খাইতে বসিল। রামু তামাক টানিতে টানিতে ডাকিল, "বিন্দি!"

বিন্দী মুখের ভাত চিবাইতে চিবাইতে উত্তর দিল, "হুঁ।"

রামু জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি কি ঘরে চাল ছিল না?"

বিন্দী মুখের ভাতগুলা গিলিতে গিলিতে উত্তর করিল, "আধসেরটাক প'ড়ে আছে।"

রামু বলিল, "তবে রাঁধ্‌লি না কেন?"

বিন্দী ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "আজ রাঁধ্‌লে কা'ল কি খাবি!"

রামু রাগিয়া বলিল, "ছাই খাব। কা'ল খাব ব'লে আজ তুই উপাস দিবি?"

দুঃখিত স্বরে বিন্দী বলিল, "কাজেই, কা'ল আর মাছ ধর্‌তে যেতে পারবো না। কোমরে একটা দরদ লেগেছে।"

রামু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হুঁকা হাতে বসিয়া রহিল।

বিন্দী আহার শেষ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছিস্ ঘোড়ুই?"

রামু মাথা না তুলিয়াই বলিল, "ভাব্‌চি, মদ ছাড়্‌বো, না তোকে ছাড়্‌বো?"

বিন্দী বলিল, "মদ কি ছাড়্‌তে পার্‌বি? ছাড়িস্ তো আমাকেই ছাড়্‌বি।"

রামু মুখ তুলিল; অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তোকে ছাড়্‌বো বিন্দি?"

বিন্দী ঘরে গিয়া বিছানা পাতিয়া রামুকে শুইবার জন্ত ডাকিল। রামু কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দুই তিনবার ডাকিয়া স্বামীর সাড়া না পাইয়া বিন্দী বাহিরে আসিল, এবং বাঁহাতে কেরোসিনের ডিবা, ডান হাতে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "তা আমাকে ছাড়িস্ ছাড়্বি, এখন শুবি আয়। কা'ল সকালে উঠেই আবার তোকে ভাড়ায় যেতে হবে।"

রামু উঠিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল।

(৩)

"তোর পায়ে পড়ি ভূতো, আজ আর খাব না।"

ভূতো ওরফে ভূতনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেনে বল্ দেখি, আজ তুই তপিস্বি হয়েছিস্ না কি ?"

রামু বলিল, "না, আমি দিলেসা করেছি।"

ভূতো বলিল, "বিন্দীর কাছে বুঝি ?"

ভূতো শ্লেষের হাসি হাসিল। রামু বলিল, "আমি নিজের মনে মনে দিলেসা করেছি, ও সব আর ছোঁব না।"

ভূ। বিন্দী বুঝি বারণ করেছে!

রা। বারণ কর্‌বার মেয়ে বিন্দী নয়।

ভূ। তবে?

রা। তবে আবার কি ? সে পেটে না খেয়ে আমাকে খাওয়াবে আর আমি নেশা ক'রে সব উড়িয়ে দেব!

তিরস্কারের পরে ভূতো বলিল, "এই রে, শালা মরেচে, ওরে মুখ্যু, এই যে তিন তিন কোশ পাল্কী ঘাড়ে ঘুরে এলি, এক পাত্তর পেটে না দিলে গা-গতরের বেদনা যাবে কেন ? বৌ আগে, না নিজের জানটা আগে ? বলে—আপনি বাঁচ্লে বাপের নাম ?"

রামু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ভূতো তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "বেশী না হয়, দুপাত্তর টেনে যাবি আয়, পয়সা তোকে দিতে হবে না।"

রামু সঙ্গীর কথা ঠেলিতে পারিল না, তাহার সহিত গিয়া সিদ্ধেশ্বর শাহার দোকানে ঢুকিল। সেখানে দুই পাত্রের স্থলে চারি পাত্র উজাড় হইয়া গেল; তথাপি রামু উঠিল না। শুধু একবার বলিল, "ঘরে আজ চাল নাই ভূতো, মাগীটার খাওয়া হবে না।"

ভূতো আর একপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে বলিল, "তোকে বলেছে খাওয়া হবে না। তুই দেখছি, বিন্দীর ভাবনা ভেবে ভেবেই মারা যাবি। তুই যদি কা'ল ম'রে যাস্ ?"

ভীত-কম্পিত-কণ্ঠে রামু বলিল, "না ভূতো, তা হ'লে মাগী আছাড়ি-বিছাড়ি ক'রে ম'রে যাবে।"

ভূতো হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, ম'রে যাবে না চেয়ে থাক্‌বে। তুই দেখিস্, তিন দিন না যেতে যেতে আবার একটা সাঙ্গা ক'রে বস্‌বে।"

রামু পাত্রটা গলায় ঢালিয়া দিয়া সক্রোধে বলিল, "মুখ সাম্‌লে কথা কইবি ভূতো; বিন্দী তেমন নয়।"

ভূতো ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "রেখে দে তোর বিন্দী, অমন কত ইন্দির চন্দর দেখা গেছে। নফরা মাজির বৌটা কি কর্‌লে দেখলি না; তোর ছাঁচায় ধারে পেলা কাহারের বৌটা বার বার চার বার—"

ভূতো নিজের জন্ত একপাত্র ঢালিতে যাইতেছিল। রামু তাহার হাত হইতে বোতলটা কাড়িয়া লইয়া এক নিশ্বাসে সবটা গলায় ঢালিয়া দিল; তার পর বোতলটা মেঝেয় আছড়াইয়া দিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "লেয়াও দোসরা বোতল।"

ভূতো বলিল, "আমার ট্যাঁক খালি।"

রামু আপনার কোঁচার খুঁট হইতে টাকাটা খুলিয়া ছুড়িয়া দিল।

(৪)

সন্ধ্যা হয় হয়, বিন্দী উনানে ঘুঁটে দিয়া রান্নার উদ্যোগ করিতেছিল আর রামুর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে চাহিতেছিল। এমন সময় রামু টলিতে টলিতে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল; উচ্চ স্খলিত-কণ্ঠে ডাকিল, "বিন্দি!"

বিন্দী ডালের হাঁড়ীটা উনানে বসাইয়া বাঁশের চোঙ্গা দিয়া উনানে ফুঁ দিতেছিল, চোঙ্গাটা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "এসেছিস্?"

রামু বলিল, "আলবোৎ আস্‌বো। তোর বাবার ঘর যে আস্‌বো না?"

বিন্দী থমকাইয়া দাঁড়াইয়া ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কথা শোন একবার, আজ আবার খেয়ে এয়েছিস্!"

রামু চীৎকার করিয়া বলিল, "চুপ রাও, তোর বাবার খাই!"

রামু কথা কহিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার পা দুইটা এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। বিন্দী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "তা খেয়েছিস্ খেয়েছিস্,— এখন শুয়ে পড়্‌বি আয়!

রামু হাতটা টানিতে টানিতে বলিল, "তোর বাবার হুকুমে শোব?"

বিন্দীর পিতার উদ্দেশে রামু একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিল। বিন্দী তাহার হাতটা ছুড়িয়া দিয়া সরোষে বলিল, "তবে এইখানে প'ড়ে মর্।"

বিন্দী চলিয়া যাইতেছিল, রামু তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "আমি মর্‌বো! আমি ম'লে তুই কাকে সাঙ্গা কর্‌বি?"

বিন্দী রাগিয়া উত্তর করিল, "যমকে।"

রামু উচ্চকণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কর্‌বি?"

বিন্দীও উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "কর্‌বো না ত কি তোকে ভয় ক'রে থাক্‌বো?"

রামু বিন্দীর হাতটা ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে লাথি মারিতে গেল; কিন্তু পাটা বিন্দীর অঙ্গ স্পর্শ করিল না, তৎপূর্ব্বে রামু নিজেই উঠানের উপর হুম করিয়া পড়িয়া গেল। বিন্দী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া তুলিল। রামু উঠিয়া টলিতে টলিতে বিন্দীকে তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিল। বিন্দী বলিল, "আচ্ছা, কা'ল সকালে যাব।"

রামু বলিল, "না, এখুনি যেতে হবে।"

বিন্দী বলিল, "আমি যাব না।"

রামু চীৎকার করিয়া বলিল, "তোর বাবাকে যেতে হবে। তুই যদি না যাস্—"

রামু একটা ভয়ানক কটু কথা বলিল। উত্তরে বিন্দী তাহাকে গালাগালি করিল। রামু তখন বিন্দীর উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। বিন্দীর চীৎকারে পাড়ার মেয়ে পুরুষ অনেকে ছুটিয়া আসিল। ভুতো বহু কষ্টে রামুকে টানিয়া আনিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে দিতে শোয়াইয়া দিল। বিন্দী প্রহারে হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিল; সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া শোয়াইল এবং মুখে হাতে জল দিয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদন করিল।

বিন্দীর ছয় মাসের গর্ভ ছিল। সেই রাত্রিতে তাহার গর্ভস্রাব হইয়া গেল। সে ঘরে পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ভুতো চার পয়সার কুইনাইন কিনিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল।

রামুর নেশার ঘোরটা যখন একটু কাটিয়া আসিল, তখন সে বিন্দীর যন্ত্রণা-সূচক কাতর স্বর শুনিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, "কেমন, আর সাঙ্গা কর্‌বি?"

বিন্দী কাতরস্বরে বলিল, "ওরে—একটু জল—একটু জল।"

গর্জ্জন করিয়া রামু বলিল, "কভি নেহি, যাকে সাঙ্গা কর্‌বি, সেই জল দেবে।"

বিন্দী বলিল, "না খোড়্ই, আর সাঙ্গা কর্‌বো না, তোর পায়ে পড়ি, একটু জল দে।"

রামু উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না; মাথাটা তুলিতেই তাহা ঘুরিয়া চাটায়ের উপর পড়িয়া গেল।

ভূতো ঘরে যায় নাই, কাপড় মুড়ি দিয়া রোয়াকের এক পাশে পড়িয়াছিল, সে উঠিয়া জল লইয়া বিন্দীর মুখের কাছে ধরিল; বলিল, "জল খা বিন্দি।"

চমকিত হইয়া বিন্দী বলিল, "তুই ?"

ভূতো বলিল, "হাঁ আমি, জল খা।"

ভূতো মুখে জল ঢালিয়া দিল। বিন্দী জল খাইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিন্দী ভূতোকে শত্রু বলিয়াই মনে করিত। ভূতো যে বাস্তবিক তাহার সহিত শত্রুতা আচরণ করিত, তাহা নহে, বরং সে বিন্দীর অনুরাগ-দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। তাহার এই চেষ্টাটুকুই কিন্তু বিন্দীর নিকট শত্রুতা বলিয়া বোধ হইত।

বিন্দী মাছ ধরিতে যাইত, কিন্তু অভ্যাস না থাকায় বেশী মাছ ধরিতে পারিত না। ভূতোও মাছ ধরিত, সে বিন্দীর অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিত, এবং কিরূপে জাল টানিতে বা তুলিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিত। বিন্দী কিন্তু তাঁহার এ উপদেশ গ্রহণ করিত না, সে যাহা করিতে বলিত, বিন্দী তাহার বিপরীত আচরণ করিত। ইহার ফলে তিন চারি ঘণ্টা পরিশ্রমের পর বিন্দী যখন দুই গণ্ডা পয়সার মাছও ধরিতে পারিত না, তখন ভূতো নিজের হাঁড়ী হইতে এক অঁাজলা মাছ লইয়া বিন্দীর হাঁড়ীতে ঢালিয়া দিতে যাইত। বিন্দী তাহার এই দান লইতে চাহিত না। এক এক দিন সে হাঁড়ী হইতে ভূতোর মাছ-ভরা অঁাজলাটা ঠেলিয়া দিয়া রাগে গর-গর করিয়া চলিয়া যাইত। ভূতো হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত; তাহার হাতের মাছগুলা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যাইত।

আজি সেই ভূতোকে নিজের রোগশয্যার পাশে দেখিয়া বিন্দী শুধু চমকিত হইল না, বিরক্তও হইল। ভূতো বিন্দীকে জল খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছিস্‌ বিন্দি ?"

বিন্দী রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, "তুই এখানে কেন ? ঘরে যাস্‌নি যে ?"

ভূতো বলিল, "তোকে এমনতর দে'খে কি ঘরে যেতে পারি ? তোকে দেখবে কে ?"

বিন্দী রাগিয়া বলিল, "যম। কেন, তুই ছাড়া কি আর দেখবার লোক নাই ?"

সহাস্যে ভূতো বলিল, "যে দেখবার, সে তো মেরে ধ'রে বেহুঁস হয়ে প'ড়ে আছে। তুই একটু জল চাইলে কি জবাব দিলে, তা শুন্‌লি তো ?"

বিরক্তির সহিত বিন্দী বলিল, "খুব শুনেছি। তুই এখন যাবি কি না বল্‌ ?"

"যাচ্চি" বলিয়া ভূতো বাহিরে আসিয়া দরজার আগড়টা ভেজাইয়া দিল।

সকালে ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইয়া, বিন্দীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে বাপও আসিল। তাহারা আসিয়া রামুকে কতকগুলা গলাগালি দিল। তার পর ভৃত্যের পরামর্শমতে বিন্দীকে ডুলিতে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। রামু রোয়াকের এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর কথার একটিও উত্তর দিল না।

অনেকটা বেলা হইলে রামু উঠিয়া পুকুরে একটা ডুব দিয়া আসিল। তার পর রান্না করিতে গিয়া দেখিল, উনানের উপর ডালের হাঁড়ীটা বসান রহিয়াছে। পাশে সরায় কাঁচা মসুর ডাল। রামু মসুর ডাল ভালবাসিত, এ জন্য বিন্দী মাছ বেচিয়া যে দিন দুই পয়সা বেশী পাইত, সে দিন সে মসুর ডাল কিনিয়া আনিত। মাছের চুপড়ীর ঢাকা খুলিয়া রামু দেখিল, তাহাতে বড় বড় চারিটা চিংড়ী-মাছ মুন-হলুদ মাখা অবস্থায় পড়িয়া আছে। চিংড়ী-মাছ রামুর বড় প্রিয়, এ জন্য বিন্দী চিংড়ী-মাছ পাইলে প্রাণান্তেও তাহা বেচিত না, ঘরে আনিয়া স্বামীকে ঝোল রাঁধিয়া দিত। মাছের চুপড়ীর পাশেই কর্ত্তিত আলু-বেগুন রহিয়াছে। রামু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সাম্‌নের কুলুঙ্গীতে একমুটা চিঁড়া-মুড়কী, আর একখানা তিলে পাটালী ছিল। ইহা যে রামুর জলযোগের জন্যই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে রামুর বিলম্ব হইল না। রামু আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সাম্‌নের দেওয়ালের কুলুঙ্গীর উপর একটা শূন্য মদের বোতল ছিল। রামু সেটাকে উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বোতলটা ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রামু ঘরের আগড় বন্ধ করিয়া বিন্দীর পরিত্যক্ত বিছানার উপর শুইয়া পড়িল; শুইয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(৫)

বিন্দী চলিয়া যাইবার পর তিন চার দিন কাটিয়া গেল। রামুর এই দিন কয়টা বড় কষ্টেই কাটিল। এখনও সে মদ খাইত, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী খাইত। মদ খাইয়া টলিতে টলিতে আসিয়া, দাবার উপর শুইয়া পড়িত। রাত্রিটা যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা সে জানিতে পারিত না। যখন নেশার ঘোর কাটিত, জ্ঞান হইত, তখন চোখ মেলিয়া দেখিত, সকালের রোদ আসিয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, আর সে ধুলা ও শুষ্কবমির উপর গড়াগড়ি দিতেছে। তখন রামুর বিন্দীকে মনে পড়িত, তাহার সেবা যত্ন মনে পড়িত, অনুতাপে—আত্মগ্লানিতে তাহার বুকটা যেন ফাটিয়া যাইত। এদিকে উপবাসে শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিত, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে থাকিত। রামু ঘরে ঢকিয়া জল গড়াইয়া, খানিকটা জল ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া গলায় ঢালিয়া দিত।

একদিন রামু জল খাইতে গিয়া দেখিল, কলসী শুষ্ক, কা'ল জল তুলিতে ভুল হই য়াছে। সে রাগে কলসীটা লইয়া আছাড় দিল। মাটীর কলসী শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। ভাঙ্গিবার সময় কলসীটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে যেন একটা বিকট হাসি হাসিয়া তৃষ্ণার্ত্ত রামুকে কঠোর উপহাস করিতে লাগিল। রামু দাঁতে দাঁতে চাপিয়া চূর্ণ খণ্ডগুলাকে কুড়াইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

দুই দিন অনাহারের পর রামু রাঁধিতে গেল। কিন্তু রাঁধিবার উপকরণ কোথায় কি আছে, তাহা সে জানিত না। বহু কষ্টে ভাতে ভাত রাঁধিবার মত যোগাড় করিয়া লইয়া সে উনানে হাঁড়ী চাপাইল। কিন্তু উনান জ্বালিবার কিছু পাইল না। বিন্দী এখান সেখান হইতে ঘুঁটে কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাঁধিত। রামু বহু কষ্টে কয়েকখান ঘুঁটে আর আগশুক্‌না গাছের ডাল সংগ্রহ করিয়া উনান জ্বালিতে গেল, উনান কিন্তু জ্বলিল না। কেরোসীনের ডিবার তেল ফুরাইয়া গেল, ধোঁয়ায় রামুর চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল, তথাপি উনান জ্বলিল না। রামু রাগে একটা লাঠি আনিয়া হাঁড়ীর উপর বসাইয়া দিল। হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া জল চালে উনান ভরিয়া উঠিল। রামু আপন মনে গর্জ্জন করিতে করিতে ঘরে গিয়া চাটায়ের উপর শুইয়া পড়িল; শুইয়া 'বিন্দী বিন্দী' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় বাজার হইতে দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিয়া, রামু পিত্তরক্ষা করিল।

সেই দিন রাত্রে রামু স্বপ্নে দেখিল, যেন বিন্দী আসিয়া তাহার মাথার শিয়রে বসিয়াছে, এবং আস্তে আস্তে তাহার মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকিতেছে, "ওঠ্ না ঘোড়ুই, দু'দিন তোর খাওয়া হয় নি, খাবি আয়।"

রামু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বিন্দি, বিন্দি!"

শূন্য গৃহে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতর হইতে প্রতিধ্বনি হাসিয়া উত্তর দিল,—"হি হি হি হি!" রামু অবসন্নভাবে আবার শুইয়া পড়িল।

স্বপ্নে বিন্দীকে দেখিয়া রামুর মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। সে আর ঘুমাইতে পারিল না, পড়িয়া পড়িয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। দরজার আগড়ের ফাঁক দিয়া ভোরের আলো ঘরে ঢুকিলে রামু উঠিয়া মুখ হাত ধুইল, এবং গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া, খেটে লাঠিটা লইয়া বিন্দীকে দেখিতে চলিল।

পিছন হইতে ভূতো ডাকিয়া বলিল, "এত সকালে কোথায় চলেছিস্ রে?"

পাছু ডাকায় বিরক্ত হইয়া রামু উত্তর দিল, "যাচ্ছি।"

ভূতো বলিল, "কোথায় যাচ্চিস্? শ্বশুরবাড়ী নাকি?"

অপ্রসন্নভাবে রামু উত্তর করিল, "বিন্দীকে দেখতে।"

ভুতো বলিল, "আর দেখতে গিয়ে কি হবে, ফিরে আয়।"

অমঙ্গলাশঙ্কায় রামুর বুকটা দুড় দুড় করিয়া উঠিল। সে উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে ভুতোর মুখের দিকে চাহিল। ভুতো বলিল, "বিন্দী যে তোর নামে নালিশ করেছে।"

বিস্ময়াপ্লুতস্বরে রামু বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা!"

ভুতো তখন মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি তো তোকে তখনই ব'লে-ছিলাম, ও সব সাঙ্গালী মাগীকে বিশ্বাস নাই, ওরা সব কত্তে পারে।"

ভুতো চলিয়া গেল। রামু ফিরিয়া লাঠি গামছা ফেলিয়া দাবার উপর বসিয়া পড়িল।

সেই দিন মধ্যাহ্নে রামু যখন রন্ধনের উদ্যোগে ব্যাপৃত ছিল, তখন বিন্দীর ভাই পেয়াদা সঙ্গে আনিয়া রামুকে শমন ধরাইয়া গেল।

(৬)

রামু গিয়া শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরিল, পাড়ার পাঁচজনের কাছে গিয়া পড়িল। কিন্তু বেচারাম কাহারও কথা রাখিল না; সে বলিল, "আমার মরায়ে তিন আড়া ধান আছে, এই ধান বেচে বেটাকে জেলে দেব, তবে আমার নাম বেচারাম।"

গ্রামের করালী চক্রবর্ত্তী মোকদ্দমার পরামর্শদাতা ও তদ্বিরকারক হইয়াছিলেন। রামু গিয়া তাঁহাকে ধরিল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তাও কি হয় বাপু! আমার কথায় নির্ভর ক'রেই বেচারী মোকদ্দমায় হাত দিয়েছে, আমি কি কথার নড়চড় কত্তে পারি? এতে যে আমার অধর্ম্ম হবে।"

রামু কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না; কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। তাহার কাতরতা দর্শনে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রাণটা একটু নরম হইল। তিনি বলিলেন, "তা কি জান বাপু, পেটে খেলেই পিঠে সয়! গোটা দশেক টাকা দিতে পার তো চেষ্টা দেখি। পরন্তু মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হবে। এ তো আর তোমাদের ঘরের মেয়ে পাঠানো নয়, বিস্তর খরচ, বুঝ্‌লে?"

রামু ইহা বুঝিল বটে, কিন্তু দশটা টাকা যে কোথায় পাইবে, তাহাই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু যেরূপে হউক, টাকাটা সংগ্রহ করিতে হইবে, নতুবা জেলে যাইতে হয়। রামুর মনে পড়িল, বিন্দীর হাতে আটগাছা রূপার চুড়ী আছে, তাহা বেচিলে দশ টাকা হইতে পারে। বিন্দী কি চুড়ী দিয়া তাহাকে জেল হইতে রক্ষা করিবে না।

রামু তক্কে তক্কে থাকিয়া বিন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। ব্যস্তভাবে বলিল, "বিন্দি, তোর চুড়ী ক গাছা দে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিন্দী বলিল, "কেনে রে?"

রামু বলিল, "কয়ালী ঠাকুরকে দিতে হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দী বলিল, "ঘুষ নাকি?"

রামু বলিল, "নয় তো আমাকে জেলে যেতে হবে।"

বিন্দী বলিল, "তুই জেলে যাবি, তা আমি চুড়ী দিতে গেলাম কেন?"

রা। তুই যে আমার ইস্তিরী।

বি। মার্‌বার সময় সে কথাটা মনে থাকে না?

লজ্জিতভাবে রামু বলিল, "আর তোকে মার্‌বো না বিন্দি।"

বিন্দী বলিল, "আমি তোর ঘরে গেলে তো মার্‌বি?"

রামু জিজ্ঞাসা করিল, "যাবি না?"

মাথা নাড়িয়া বিন্দী বলিল, "উঁহু।"

রা। তবে কি আবার সাঙ্গা কর্‌বি?

বি। কর্‌বো।

রা। সত্যি?

বি। সত্যি।

রামু প্রস্থানোদ্যত হইল। বিন্দী জিজ্ঞাসা করিল, "চল্‌লি যে? চুড়ী নিবি না?"

মুখ ফিরাইয়া রামু বলিল, "আর দরকার নাই।"

রামু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিন্দী দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ভূতো জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে রামু, মামলার কিছু চেষ্টা-বেষ্টা দেখ্‌লি না?"

উদাসভাবে রামু উত্তর দিল, "কি আর দেখ্‌বো?"

ভূ। তবে জেলে যাবি?

রা। গেলুম বা।

ভূ। বলিস্ কি রে, জেল যে?

রামু হাসিয়া বলিল, "যার পাছু চাইতে নাই, তার জেলই কি, আর ঘরই বা কি?"

ভূতো একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি নাকি বিন্দী আবার সাঙ্গা কর্‌বে?"

রামু বলিল, "আমিও তাই শুন্‌চি। তুই চেষ্টা দেখ্ না।"

ভূতো সে কথায় কোন উত্তর দিল না।

মোকদ্দমার দিন রামু জনৈক প্রতিবেশীকে তাহার কুঁড়ে দেখিবার ভার দিয়া আদালতে হাজির হইল।

(৭)

আদালতে গিয়া রামু দেখিল, ভূতো ও পাড়ার আরও দুই এক জন বিন্দীর পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে। বিন্দীর বাপ উকীল দিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গাছতলায় বসিয়া সাক্ষীদের তালিম দিতেছেন। বিন্দী মাথায় কাপড় দিয়া এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রামুর উকীল দিবার ইচ্ছা ছিল না। সে একাই জেলে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

অসহায়ের সহায় ভগবান্। একজন নূতন উকীল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামুর মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন।

মোকদ্দমার ডাক পড়িলে রামু গিয়া আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইল। ফরিয়াদী বিন্দী দাসীর ডাক পড়িল। বিন্দী মাথায় ঘোমটা দিয়া আদালতের মধ্যে আসিল। রামুর উকীল তাহাকে জেরা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামু দুই হাতে কাঠগড়া চাপিয়া ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু আদালতের প্রশ্নের উত্তরে বিন্দী যাহা বলিল, তাহাতে শুধু উকীল কেন, রামু পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিন্দী বলিল, "হুজুর, আসামী আমার সোয়ামী। ও আমাকে বড্ড ভালবাসে। ও সে দিন বেশী মদ খেয়ে এসেছিল। আমি ধ'রে শোয়াতে যেতে ও টাল খেয়ে আমার উপর প'ড়ে যায়। তাতেই অমার গর্ভ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। ও কোন দিনই আমাকে একটি চড়া কথা বলে নি। আমার বাপের সঙ্গে ওর বনিবনাও নাই, তাতেই আমার বাপ পাঁচজনের মত লবে নালিস রুজু করেছে।"

রামু কাঠগড়ার ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। বিন্দীর প্রত্যেক কথায় তাহার বুকের ভিতর যেন মুগুরের ঘা পড়িতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে চীৎকার করিয়া বলে, "ওগো, সব মিছে, সব মিছে কথা। আমিই বিন্দীকে মেরে তার সর্ব্বনাশ করেছি।"

হাকিম মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন। রামু উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, "হুজুর!"

পাহারাওয়ালা তাহাকে ধমক দিয়া কাঠগড়া হইতে বাহির করিয়া দিল। বিন্দী হাত ধরিয়া তাহাকে আদালতের বাহিরে আনিল।

বাহিরে আসিয়া রামু জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুই কোথায় যাবি বিন্দি?"

বিন্দী উত্তর করিল, "চুলোয়।"

রা। সাঙ্গা কর্‌বি না?

বি। কর্‌বো বই কি।

রা। কা'কে ?

রামুর মুখের উপর একটা মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিন্দী সহাস্তে বলিল, "আপাততঃ তোকে।"

বেচারাম হতবুদ্ধির স্থায় হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ও ঠাকুর মশাই, এ কি হইলো ?"

চক্রবর্ত্তী সক্ষোভে বলিলেন, "আমার মাথা আর তোর মুণ্ডু হইল। বিন্দী বেটী সব নাট ক'রে দিলে। বেটী ছোটলোকের মেয়ে কি না, ওর কি একটুও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান আছে ?"

ভূতো ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যা ব'লেছ ঠাকুর মশাই, ভদ্দর নোক না হ'লে কি ধম্ম-কম্ম বুঝ্‌তে পারে ?"

চক্রবর্ত্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যাক, বেটীকে এর ফল ভুগ্‌তেই হবে। এখন উকীলের সাড়ে সাত টাকা পাওনা আছে, সেটা মিটিয়ে দাও হে বেচারাম।"

বেচারাম মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া কাপড়ের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিবার জন্ত গেরো খুলিতে লাগিল। ভূতো শুনিতে পাইল, রামু তখন গলা ছাড়িয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"সে কি আমার অযত্তোনের ধো-ও-ন্,
সে কি আমার—"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পাগলের গীত

আমায় কেন কল্লে এমন সৃষ্টি ছাড়া
যাঁরা জপে যোগে বসেন ধ্যানে তাঁরা নিত্য পান ত সাড়া ?
আমায় টিপি-সাড়ে রূপ দেখিয়ে
রাতারাতি নগর ছাড়া।
আমি কোথায় কোথায় করে বেড়াই
পাগল হয়ে পাড়া পাড়া।
ওগো বড় বড় ভারী ওস্তাদ
ঝুড়ি ঝুড়ি ঝাড়ি-ঝাড়া,
তাঁরা ঘামিয়ে মাথা খুঁটে খুঁটে
বার করেছেন গাছ-পাছাড়া।
অকার উকার মকার যোগে
নাকি অমৃত রস তুমি খাড়া।
ব্যাখ্যার চোটে গগন ফাটে
খালি মাথা খারাপ কর্‌বার গোড়া।
দেখতে পেলে হোন না যিনি
আমি দাড়ি ধরে দিতাম নাড়া,
সত্যি সত্যি হয় কি তৃপ্তি—
নয় কি জপের বুলি পাখী পড়া ?
যদি মরা জপে রাম পেয়েছে
কাজ কি আমার শ্রুতি পড়া।
এই পেলুম পেলুম আর পেলুম না।
এইটি তোমার সবার বাড়া।
কেউ কি তোমার আছে মা, বাপ
যে নাম দেবে সেই হতোচ্ছাড়া
বল্‌তে গেলে যায় না বলা
ওগো, এমনি তুমি টিজ বেয়াড়া।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

গানের কথা

সেইবারকার পূজার ছুটিতে এলাহাবাদে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। হঠাৎ মধ্যপথে কোন দুর্ঘটনার জন্য গাড়ী থামিয়া গেল। শুনিলাম সে দিন আর গাড়ী চলিবে না। ষ্টেশন নিকটেই। সুতরাং ব্যাগটি হাতে লইয়া তদুদ্দেশে ছুটিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, ইতিপূর্ব্বেই তথায় অনেক যাত্রী সমাগত। বিছানা, বাক্স ও মালে ক্ষুদ্র স্থানটি একেবারে স্তূপাকার।

ষ্টেশন-মাষ্টারটি অতিশয় ভদ্রলোক। যাত্রীদের যাহাতে বিশেষ কোন কষ্ট না হয়, তিনি তাহা দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমাকে একটু ভদ্র যাত্রী দেখিয়া তিনি নিকটে আসিলেন। আমার আগমন ও গন্তব্যস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, "এ দিকে আসুন।" পর্ব্বতপ্রমাণ জিনিষপত্রগুলি কোনক্রমে সরাইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। অপরিসর একখানি ঘর দেখাইয়া তিনি বিনয় সহকারে কহিলেন, "আজ রাত্রের মতন এইখানটাতেই বিশ্রাম করুন।"

আমি ত হাতে স্বর্গ পাইলাম। হিম জিনিষটাকে আমি ছেলেবয়স হইতেই অত্যন্ত ডরাই। সুতরাং ষ্টেশনে টিনের সেডের নীচে রাত্রি কাটাইতে হইবে না জানিয়া আমি যে বিলক্ষণ খুসী হইয়া গিয়াছিলাম, ইহা বলাই বাহুল্য। মাষ্টার মহাশয়কে বিধিমত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

কুলীদের নিকট হইতে খানকতক চট সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। ব্যাগটি মাথায় দিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এক দীর্ঘাকার পুরুষ ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। লোকটি লজ্জিতভাবে বলিলেন, "মাপ করবেন, আপনাকে কি বিরক্ত কর্‌লাম ?"

যদিও তাঁহার প্রতি আমার মনের অবস্থা নিতান্ত প্রীতিকর ছিল না, তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিলাম, "না, বিরক্ত হব কেন ?" ভাবিলাম, তিনিও বোধ হয় আমার মত বিপদ্‌গ্রস্ত এক যাত্রী; অন্যত্র স্থানাভাবে এখানে আসিয়াছেন। চটের কিয়দংশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বসিতে বলিলাম।

একেই ত যাত্রাপথে ও বিদেশে লোকের সহিত অতি সহজেই পরিচয় হইয়া থাকে, তাহার উপর অতি অল্পক্ষণেই বুঝিলাম, নবাগত ভদ্রলোকটি অত্যন্ত গল্পপ্রিয় ও বেশ অমায়িক। আমাদের সদ্যস্থাপিত সৌহার্দ্য ক্রমশ জমিয়া উঠিল।

কথায় কথায় জানিলাম, তিনি আমাদের স্বদেশীয়। ছেলেবয়সে পিতৃহীন হওয়ায় কার্য্যোপলক্ষে অনেক স্থানে ঘুরিয়াছেন। সম্প্রতি পশ্চিমে কোন রাজ-সরকারে চাকরী পাইয়া, আমাদের সঙ্গে এক ট্রেণে সেখানে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে এই দুর্ঘটনা।

সে দিন বেশ চাঁদনী রাত্রি। ক্ষীণ চন্দ্রালোকের একটুখানি, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে এই সময় কে গান ধরিয়াছে। সঙ্গীতের প্রতি কোন কালেই আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল না; উপরন্তু আজকাল কেহ গান গাহিলে অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করিতাম। কারণ, গান আদর করিবার ক্ষমতা আমার কোন কালেই ছিল না। স্কুল ও কলেজের পরীক্ষা দিতে দিতে আমার প্রাণ ত একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষান্তে যখন দেখিলাম, আমি মিউনিসিপ্যালিটীর বাট টাকা মাহিয়ানার এক কেরাণী, তখন হইতে কলা-বিদ্যার উপর মনের ভাব কিরূপ হইল, আর বলিতে হইবে না। কিন্তু কি জানি কেন, যদিও গানটির অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি নাই (কারণ, উহা উর্দ্দু ভাষায় রচিত এবং আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উক্ত ভাষায় আমার ব্যুৎপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর) সেইদিন গানটি বড় মিষ্ট শুনাইল। চতুর্দ্দিকের অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে কোমলকণ্ঠে সঙ্গীত। তখন প্রায় সমস্ত যাত্রিগণ গভীর নিদ্রামগ্ন। কেবল আমরা দুইটি প্রাণী অন্ধকারময় ষ্টেশন-কক্ষে গল্প করিতেছিলাম।

গানটি শুনিয়া আমার বন্ধুটি বলিলেন, "এই গানের সঙ্গে যে করুণ ইতিহাসটুকু আছে, আপনি সেটা জানেন কি? ইতিপূর্ব্বে পশ্চিমে এই গানটি আরও দুই তিন বার শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার সঙ্গে যে কোন বিশেষ ইতিহাস জড়িত থাকিতে পারে, তাহা আগে ধারণা ছিল না।"

"কৌতূহলপূর্ণস্বরে বলিলাম, "না, জানা নেই!"

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তবে শুনুন।" এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন।

মীর আলি তরুণ কবি। শিশুর মতন তাহার সরল হৃদয়, অতি সুন্দর ও কোমল। সে ছিল সৌন্দর্য্যের উপাসক। যেখানে সৌন্দর্য্যের তিলমাত্র প্রকাশ, সেইখানেই তাহার মন ছুটিয়া যাইত। কুৎসিত বা কদর্য্য তাহার নিকট একেবারে অসহ্য। বিশ্বের মলিনতা তাহার তরুণ হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই সে অর্দ্ধোন্মেষিত পুষ্পের মত কোমল, প্রভাতের শুভ্র শিশিরবিন্দুর ন্যায় উজ্জ্বল।

কিন্তু তাহার রচনা কেহ পড়িত না। কৃপণের ধনের মত সেইগুলি তাহার গৃহাভ্যন্তরে জমা থাকিত। সে দিকে লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না। সে সৌন্দর্য্যে পাগল, ভাবে বিভোর। সে কেবল রচনা করিয়াই ক্ষান্ত।

মীর আলির পিতৃব্য এতদিন তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। সহরে তাঁহার রেশমের মস্ত কারবার। কত ধনী সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। একদিন তিনি নিতান্ত বিষয়ী লোকের মত মীর আলিকে বলিয়া পাঠাইলেন, হয় তাহাকে কাব্যরচনা দ্বারা টাকা আনিতে হইবে, আর নয় তাহাকে রেশমের কারবারে যোগ দিতে হইবে। বৃথা, বাজে কাব্য লিখিলে আর চলিবে না। মীর আলি ভাবিল, তাহার কাব্য যে অর্থকরী নয়, সে জন্য কি করিবে? সে ত তাহার দোষ নয়। আর কারবার? সেও তাহার দুচক্ষের বিষ। কি করিবে, ঠিক করিতে না পারিয়া সে কিছু সময় ভিক্ষা চাহিল।

সে দিন তাহার মন ভাল ছিল না। পিতৃব্যের এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। সারাদিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত পৃথিবীর উপর ঘন বিষাদের কুঠিন ছায়া চাপিয়া বসিয়াছে। ঘরে বসিয়া থাকিতে তাহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিল। সে পথে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তার এক প্রান্তে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া এক কিশোরী বালিকা ভিজিতেছিল। অর্দ্ধস্ফুটন্ত গোলাপ-কুঁড়ির মতন সুন্দর, কেবল শীতের প্রারম্ভকালে, তুষার-কণার নিষ্ঠুর আঘাতে কিঞ্চিৎ মলিন। দারিদ্র্যের কঠোর সংঘাতে তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি ঈষৎ বিবর্ণ। যৌবনের আগমন-সংবাদ বোধ হয় তাহার নিকট সবে পৌঁছিয়াছিল, তাই বালিকাসুলভ সরলতার উপর একটু সলজ্জ আভা।

মীর আলি তাহার নিকটে গিয়া কবির মত বলিল, "তোমাকেই ত আমি এতদিন খুঁজছিলাম।"

লজ্জাবশতঃ বালিকা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমাকে?"

মীর আলির কথার অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। আলিরও বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে তাহার সৌন্দর্য্যের আদর্শ আজ পাইয়াছে। আজ তাহার আত্মা পরিতৃপ্ত।

আবেগপূর্ণ স্বরে সে বলিল, "হাঁ তোমাকে!"

সে কিছুই বুঝিল না। অবাক্ হইয়া মীর আলির দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, তাহাকে দরিদ্র দেখিয়া সে ব্যঙ্গ করিতেছে। মীর আলি কিছুই লক্ষ্য করিল না। তাহার প্রবল ক্ষুধা মিটিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

নতমুখে মধুরকণ্ঠে কিশোরী বলিল, "আমার নাম দলিয়া।" মীর আলি তাহা শুনিল কি বীণার ঝঙ্কার শুনিল, ঠিক করিতে পারিল না। কেবল তাহার কানের কাছে বাজিতে লাগিল, 'দলিয়া দলিয়া।'

উন্মত্তপ্রায় তরুণ কবি কহিল, "তুমি আমার সঙ্গে আস্‌বে?" দলিয়া দেখিল, অকূল সমুদ্রে একটু ঠাঁই মিলিল। পিতৃমাতৃহীন হইয়া সে যে বৃদ্ধার নিকট আশ্রয়

লইয়াছিল, সেও আজ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অপরাধের মধ্যে সে যথেষ্ট ভিক্ষা আনিতে পারিত না। এখন সে সংসারে একেবারে একলা, একেবারে আশ্রয়হীন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া 'হাঁ' কথাটা বলিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল। অথচ দারুণ অভাববোধ একটু একটু করিয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে অতি-কষ্টে মৃদুস্বরে সে বলিল, "হাঁ যাব।"

মীর আলি আনন্দে অধীর। না, সে আজ একেবারে পাগল। বাড়ী পৌঁছিয়াই পিতৃব্যকে লিখিয়া দিল, সে আর তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী নয়, আজ থেকে সে নিজে উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবে।

সন্ধ্যার সময় মীর আলি তাহার বন্ধু কাশিমকে লইয়া ফিরিল। কাশিম তাহারই মত নবীন, তাহারই মত সংসারানভিজ্ঞ। সে এক পুরান বইএর দোকানে কাজ করিত। আর অবসরসময়ে মাঝে মাঝে গানে সুর দিত। দুই বন্ধুতে দলিয়ার এখন নিত্য-সহচর। সহজ কথায় দুই জনে একসঙ্গে দলিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী! কিন্তু কাহাকে যে দলিয়া বিজয়মাল্য দিবে, তাহার স্থিরতা নাই।

কাশিম বলে, "আমি দলিয়াকে পূজা করি।"

মীর আলি কহে, "অনেক দিন পরে আমি আমার আদর্শ পাইয়াছি।"

এ দিকে তাহাদের হাতে যে কিছু টাকা ছিল, তাহা ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। কাশিম ইতিপূর্ব্বেই কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছে, মীর আলির মাসহারাও বন্ধ হইয়াছে।

সঙ্কটাবস্থা দেখিয়া একদিন দলিয়া বলিল, "আমাকে সহরে নিয়ে চল, সেখানে গান গেয়ে আমি পয়সা উপার্জ্জন করব।"

দুইবন্ধু স্থির করিল, তাহারা দলিয়ার জন্য কিছু একটা—বড় গোছের কিছু করিবে। তাহাকে যদি গানই গাহিতে হয় ত সে একেবারে নবাবের সম্মুখে গাহিবে। সকলকে একেবারে তাক্ লাগাইয়া দিবে।

দুই জনে কার্য্যে লাগিয়া গেল। মীর আলি এক অভূতপূর্ব্ব গান রচনা করিবে, আর কাশিম তাহাতে সবচেয়ে ভাল সুর দিবে। সেই গান দলিয়া নবাবের দরবারে গাহিবে। কিন্তু গান তৈয়ারী হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইতে লাগিল।

দলিয়া দুই একবার কেবল উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, "কই, গান কই?"

হৃদয়ে তাহার অপরিসীম আশা; সে ভাবে,—রূপে ও গীতে সে একদিন বিশ্ব জয় করিবে।

এখন মীর আলি ভাবে কেবল গান আর গান। দিবসে নিস্তব্ধ উদ্যানে বসিয়া ভাবে গান। রাত্রে সকলে নিদ্রামগ্ন হইলে সে নিজকক্ষে বসিয়া ভাবে কেবল গানের কথা।

অবশেষে সেই গান-রচনা শেষ হইল। হৃদয়ের সমস্ত রক্ত দিয়া, আত্মার সমস্ত করুণ-রস মিশাইয়া মীর আলি তাহা গড়িয়া তুলিয়াছে। ছন্দের ভিতর দিয়া যৌবনের উদ্দাম প্রাবল্য, প্রাণের মত ব্যাকুলতা, হৃদয়ের কারুণ্য প্রকাশিত।

কাশিমকে ডাকিয়া সে কহিল, "ভাই, ধৈর্য্য ধর, এবার আমি জিতিলাম!"

আর কাশিম? কয়েকদিন দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহার সুর ঠিক হইল।

আনন্দে অধীর হইয়া কাশিম বলিল, "এবার আমার জীৎ। এমনি করিয়া দুইজন সমস্ত প্রাণ দিয়া দলিয়ার জন্য গান প্রস্তুত করিল। লোকে এখন মীর আলির ও কাশিমের নাম ভুলিয়া গিয়াছে। আছে শুধু তাহাদের গান ও দলিয়ার বিলাস আর উচ্ছৃঙ্খলতার কলুষ-কাহিনী।

তার পর সকলে মিলিয়া সহরে আসিল। লোকারণ্য নগরীর সাজসজ্জা দেখিয়া দলিয়া আশ্চর্য্য, মুগ্ধ। সে ভাবিল, দরবারে গান গাইতে যাইলে সে একেবারে মূর্চ্ছা যাইবে। দুই বন্ধুতে তাহাকে অনেক প্রবোধ দিতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবাব-দরবারে প্রবেশলাভ চেষ্টায় মীর আলি তাহার পিতৃব্যের এক ধনী বন্ধুর নিকট গেল। বন্ধুটি ত তাহার প্রস্তাব শুনিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি মীর আলির কথায় রাজী হইলেন। দরবারে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার দলিয়াকে দেখিতে চাহিলেন; দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে, দলিয়া একদিন তাহার রূপে পৃথিবী বশ করিবে। তিনি অবিলম্বে সমস্ত কথা নবাবকে খুলিয়া বলিলেন।

অতিশীঘ্রই মীর আলি সদলে নবাবের খাস দরবারে যাইবার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইল। ইতিমধ্যে সারা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, কোথা হইতে দলিয়া নামে এক ওস্তাদ গায়িকা আসিয়াছে। কি তার রূপ আর কি তার গলা! শীঘ্রই সে নবাবের খাস দরবারে গাহিবে। সকলে তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু কোথায় আছে, কেহই জানে না।

আজ রাত্রে নবাবের প্রাসাদে খাস দরবার বসিল। সকলের মুখে কেবল দলিয়ার কথা। কাশিম ও মীর আলি কিছু অর্থ কর্জ্জ করিয়াছে। তাহাতে তিন জনের দরবারোপযোগী সাজসজ্জা তৈয়ারী হইল।

যাত্রার পূর্ব্বে মীর আলি বলিল, "দলিয়া, আজ বড় আনন্দের দিন, আমরা যেন দিগ্বিজয় করিতে চলিয়াছি। দেখো, সেখানে যেন ভয় পেও না।"

একটি ছোট 'না' বলিয়া দলিয়া চুপ করিল। অন্তরে তাহার আশা ও ভয় যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যাশেষে তিন জনে দরবারগৃহে প্রবেশ করিল।

কক্ষটি বিলাসের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। অসংখ্য কারুকার্য্যবিশিষ্ট স্তম্ভ সুদীর্ঘ

ছাদটিকে ধরিয়া রহিয়াছে, সুবৃহৎ স্বর্ণখচিত দীপাধারগুলি সুগন্ধি তৈলে প্রজ্বলিত আলোক বিকীর্ণ করিতেছে; হর্ম্ম্যতলে বহুমূল্য কোমল গালিচা বিস্তৃত। চারিদিকে নীল রঙের মখমলের পর্দ্দা ঘেরা। সম্মুখে ঈষদুচ্চ প্রস্তর-মঞ্চের উপর স্বর্ণ-সিংহাসনে নবাব আসীন। সুসজ্জিত পারিষদ্ ও সভাসদ্‌গণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। ফুলের সৌরভের সহিত হেনা ও গোলাপের সুগন্ধ মিশিয়া এক অপূর্ব্ব গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। কাশিম ও মীর আলি এক কোণে আশ্রয় লইয়াছে। আজ তাহাদের আনন্দ অপরিসীম। আজ যে তাহাদের প্রাণের দলিয়ার বিজয়যাত্রা।

নবাবের ইঙ্গিতে দলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। জরীর কারুকার্য্যখচিত ফিরোজা রঙের পেশোয়াজ ও ওড়নায় তাহাকে বেশ মানাইয়াছিল। ঠিক প্রস্ফুটিত চাঁপাফুলের মত, কিন্তু তাহাতে কেবল মাদকতা আছে, তীব্রতা নাই।

গায়িকার রূপ দেখিয়া সভাসদেরা চমক মানিল। যথারীতি অভিবাদন করিয়া দলিয়া কম্পিতকণ্ঠে গান আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ সঙ্গীত খাদ হইতে অন্তরায় উঠিল। তখন তাহার লজ্জাটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গানে সে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিল। প্রস্ফুট অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার সুললিত কণ্ঠস্বর উর্দ্ধগামী হইতে লাগিল। সুমধুর স্বর কক্ষের প্রত্যেক প্রস্তরখানি স্পর্শ করিল,—চুম্বন করিয়া তাহাদিগকে কাঁপাইয়া তুলিল। সমস্ত কক্ষখানি তাহা আলিঙ্গন করিয়া অবশেষে নবাবের পদতলে ব্যাকুলভাবে লুটাইতে লাগিল।

নবাব নিজ কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা খুলিয়া লইয়া দলিয়াকে পরাইয়া দিলেন।

সেই দিনকার মত দরবার ভঙ্গ হইল।

পরদিন মীর আলি ও কাশিম দলিয়াকে তাহার কক্ষে খুঁজিতে আসিল। কেহই নাই। কেবল শূন্যহর্ম্ম্য তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিল।

একখানি পত্রখণ্ডের উপর দলিয়া লিখিয়া গিয়াছে, "আমার আশা সফল, আজ হইতে নবাবের অন্তঃপুরে আমার স্থান। তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাইও।"

হায়!

দুইজনে কক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

গান ও গল্প কখন্ যে শেষ হইয়া গিয়াছে, বলিতে পারি না। আমার মানস-চক্ষুর সম্মুখে নবাবের অভ্রভেদী শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ ভাসিতেছিল। আর দলিয়ার বিজয়দৃপ্ত আরক্ত মুখখানি ও প্রেমিকদ্বয়ের নিরাশমূর্ত্তি।

সহসা ভোরের শীতল বায়ু স্পর্শে আমার কল্পনাস্রোত থামিয়া গেল। দেখিলাম, আমার নবপরিচিত বন্ধুটি কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। ভাবিলাম, লোকটা আমাকে একটা বাজে প্রেমের গল্প বলিয়া বোকা বানাইয়া গেল।

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাবাজি

দোল-পূর্ণিমার রাতে তখন খোট্টাদের গান, ভাঙের নেশার ধমকে একটা নিতান্ত বিকৃত বিকট বেসুরো চীৎকারে দাঁড়িয়েছে!

সমস্ত দিন মাদলের বাদ্যি, আর খঞ্জনির ঝনঝনানিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। মনে হয়, পাশতলার দিক্‌টা ধ'রে যেন খাটটা কে তুল্‌ছে।

অবশ্য, ভূতের ভয় ছিল না; কিন্তু ঘরেও আর আট্‌কা থাকতে মন চাইলে না। অগত্যা দরজায় কুলুপ দিয়ে সটান বেরিয়ে পড়্‌লাম।

বাঙ্গালিটোলার অন্ধকার—অথন্ত গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। রাজবাড়ীর ঘণ্টায় তখন ঢং ক'রে একটা বাজ্‌ল।

রাস্তায় লোকজন নেই; জ্যোৎস্না ফুট্‌ফুট্‌ কর্‌চে। ধবধবে পথের উপর জায়গায় জায়গায় ফাগ প'ড়ে আছে—হঠাৎ দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

মন উদ্‌ভ্রান্ত, কাজেই পায়ের মর্জ্জিমত যেদিকে-সেদিকে চল্‌লাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়াটা মানুষের কাছে কতখানি মধুর হ'তে পারে।

কয়েকটা সিঁড়ি নেমে একটা বড় চাতালে গিয়ে বস্‌লাম। দূরে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে পড়ে বিষম নাক ডাকাচ্চে। মনে হলো, বেটা নেশা করেছে।

চাঁদের আলোর নীচে গঙ্গার স্ফটিক-জল একখানা বিরাট শ্লেটের মত দেখাচ্ছিল। ও-পারে বালির চর ধূ ধূ কর্‌চে—তার পরে রাজবাড়ীর ফাটক হাঁ ক'রে আছে! যেন বুড়োর ফোক্‌লা-হাঁ!

বাঁ-দিকে মণিকর্ণিকার আগুন জ্যোৎস্নায় নেহাৎ চিমে দেখাচ্ছিল। সার সার তিনটে চুলী—জলের উপর আলো প'ড়ে ঝক্‌-ঝক্‌ কর্‌চে! যেন কষ্টি-পাথরে তিনটে আঁকা-বাঁকা সোনার আঁচড়।

চারিদিক্‌ স্তব্ধ। দে'খে যেন বুকের মধ্যে হাঁপ লাগ্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ বুকের ভিতর থেকে একটা দম্‌কা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে পড়্‌ল! কেন? কি জানি!

ঠাণ্ডা হাওয়াতে যেন দেহ জুড়িয়ে গেল; হাই উঠ্‌তে লাগ্‌ল। হাঁটু দুটোর মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়্‌বার মত হয়েছি—পিঠের উপর কার গরম হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম; সঙ্গে সঙ্গে শুন্‌তে পেলাম "বেটা, ঘর যাও।"

ফিরে দেখি, কখন্ লোচন বাবাজি এসে আমার কাছে বসেছেন। তাড়াতাড়ি বাবাজির পায়ের ধূলো নিতেই তিনি হেসে বল্লেন, "কি রে, এত রাত্রে যে এখানে? ঝগড়া করেছিস্ নাকি?"

বাবাজির অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। শীর্ণকায় লম্বাকৃতি পুরুষ। ইনি সর্ব্বস্ব-ত্যাগী কৌপীনধারী; কিন্তু বাবাজির যত বড় বড় রাজা-মহারাজ শিষ্য। কাশীর প্রায় সকলেই তাঁহাকে চেনে; দীর্ঘদিন কাশীবাস করাতে অনেকের সঙ্গে তাঁহারও পরিচয়। বাবাজি আমাকে একটু স্নেহই কর্তেন।

আমার পিঠ ঠুকে বাবাজি বল্লেন, "পাগ্‌লা—রাগ বড় পাজী জিনিষ—ফিরে যা।"

"আমি ত রাগ করি নি মহারাজ! ঘরে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ল না, তাই এসে এখানে ব'সে আছি।"

"তোর বৈরাগ্য হয় নাকি?" ব'লে বাবাজি হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

বাবাজির সঙ্গে অনেকবার আলাপ করেছি; কিন্তু আজ তাঁর মধ্যে এমন একটা আত্মীয়তার ভাব দেখলাম যে, হঠাৎ তাঁকে তাঁর জীবনের ইতিহাসটা জিজ্ঞাসা কর্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ কর্‌লাম না।

বাবাজি একটু হেসে বল্‌লেন,—"আচ্ছা, তোকেই বল্‌ব—এ পর্য্যন্ত কেউই জানে না, আমি কে—কোত্থেকে এসেছি।"

বাবাজি তাঁর জীবনকাহিনী সুরু কর্‌লেন,—

"আমি বিলাসপুরের জমিদারের ছেলে। লেখাপড়া একেবারে করি নি যে, তা নয়; তবে কোন পাশটাশ করি নি—কর্‌বার বড় একটা তোয়াক্কাও রাখ্‌তাম না। হাতে যখন বিষয়-সম্পত্তি এলো, তখন আমার বয়স বাইশ তেইশ। বিয়ে হয়েছে; কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তেমন বনি-বনাও হ'ল না। কেন, তা বুঝ্‌তেই পার।—ঘরের মেয়েরা আমোদটাকে তেমন ঝাঁঝাল ক'রে তুল্‌তে পারে না। আমার কিন্তু সে ধাতই নয়। পেন্-পেনানি ঘেন্-ঘেনানির মধ্যে আমি নেই। যা চালাব, তা পুরো দমেই দস্তুরমত। এই পথে নিয়ে যাবার লোকেরও অভাব হয় না। টাকা যখন থাকে, তখন কিছুরই অভাব হয় না।

কল্‌কাতায় ধাঁ ক'রে একখানা বাড়ী কিনে ফেলা গেল। সেখানে দিন-রাত আমোদ-আহ্লাদ। মদ এবং মেয়েমানুষের শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারীর শ্রাদ্ধও হয়ে এলো। বছর দুয়ের মধ্যে জান্‌তে পার্‌লাম, দেনা এত হয়েছে যে, তাকে ডিঙিয়ে উত্তীর্ণ হবার উপায় নেই।

হঠাৎ একদিন কল্‌কাতার বাড়ীতে আমার স্ত্রী এসে কাঁদাকাঁটি ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে পড়্‌ল—বলে—"কর্‌চ কি, শেষকালে কি পথে দাঁড় করাবে?"

এ সব বিষয়ে স্ত্রীলোকের হস্তক্ষেপ ধৃষ্টতা ব'লেই মনে হ'ল। রাগের মাথায় আর নেশার ঝোঁকে স্ত্রীকে পদাঘাত কর্‌লাম—কর্‌তেই—স্ত্রী তখন গর্ভিণী ছিলেন—গর্ভপাত হয়ে তাঁর মৃত্যু হ'ল। তাঁকে আর পথে দাঁড়াতে হ'ল না!

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার অভাবটা একটু একটু মনে হোত। মনে হ'ল, দিনরাত ঝড়ের মত মাতামাতি ক'রে এক আধবার মাথা রাখ্‌বার জন্ত ছোট-খাট একটু স্থান না থাক্‌লে কেমন ক'রে বাঁচি।

হঠাৎ সব বন্ধ ক'রে দিলাম। বেগতিক দে'খে বন্ধু-বান্ধবেরাও স'রে পড়্‌লেন। আমিও কল্‌কাতার বাড়ী বেচে বিলাসপুরে ফিরে এলাম।

এখানে সব যেন খালি মনে হোত। এত বড় বাড়ীখানির মধ্যে সে এমনি ক'রে আপনাকে জড়িত ক'রে রেখে গেছে, তার কথা মনে না ক'রে এক মিনিট কাটাবার উপায় নেই।

প্রথমে যা ভাল লাগ্‌ত, শেষে তা বিরক্তিকর হয়ে উঠল। এমন হ'ল যে, বিলাসপুর ছাড়াই স্থির কর্‌লাম।

যাই কোথা? এমন জায়গা কোথায় আছে—যেখানে মনের জ্বালা জুড়াতে পাই?

মনে হ'ল, তীর্থ ক'রে এলে মন শান্ত হবে। কত দেশ, বিদেশ ঘুরে কোথাও শান্তি পেলাম না। অবশেষে বৃন্দাবনে এলাম।

আহা, কি মধুর স্থান! একখানি ছোট বাড়ী নিয়ে বৃন্দাবনে বাস কর্‌তে লাগ্‌লাম। কিছুদিন বাস করার পর জান্‌তে পার্‌লাম যে, আমি আবার জড়িয়ে পড়্‌চি। কিন্তু তখন নিরুপায়! একটি মেয়ে হ'ল। প্রথম যে দিন মেয়েটিকে দেখলাম, সেই দিনই বৃন্দাবন ত্যাগ কর্‌লাম। মেয়েটির মুখ কেমন ক'রে কি জানি, ঠিক যেন আমার স্ত্রীর মতই হয়েছিল। হঠাৎ মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। বোষ্টমীটাকে বাড়ীখানা লিখে দিলাম। কিছু নগরও দিলাম। এ জন্মে আর বৃন্দাবন যাই নি।

বিলাসপুরে ফিরে এসে দেখলাম, জমীদারি নীলামে উঠেছে। তার পর বিক্রী হয়ে গেল! যাক্, বাঁধন গেল।

কল্‌কাতায় ফির্‌লাম। এইবার তার স্বরূপ দেখ্‌লাম। পুরাণ দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তারা চিন্‌তে পার্‌লে না। মানুষ মানুষকে চেনে না। মানুষ টাকা চেনে। যার টাকা নেই—তার কিছু নেই।

আজন্ম নবাবি ক'রে একদিন সকালে যে কাঙাল হয়ে পথে দাঁড়ায়, তার কি লজ্জা, তা বলা যায় না।

মনে করলাম, আত্মহত্যা করি; কিন্তু ভয় হলো। মরতে ভয় পেলাম। এত কষ্ট, তবুও বাঁচতে সাধ!

ভিক্ষা করতে লজ্জা হ'ল। তার চেয়ে চুরি করা ইজ্জতের কাজ মনে হ'ল। যে দিন চোরের জগতে নেমে পড়লাম, সে দিন দেখলাম, আর একলা নই। অনেক দোসর জুটলো।

গুরু দীক্ষা দিলেন—বললেন, চুরি কে না করচে?—কেউ বা চালাকি করে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে—আর কেউ বা সরলভাবে। অবশ্য, আমি সরল পথেই চললাম।

পুলিসের সঙ্গে বেশ আলাপ হলো; যেটা লাভ হ'ত, তার আট আনা অংশ তার হাতে তুলে দিলে কোন ভয় নেই।

কিন্তু শেষ রক্ষা হ'ল না। একদিন আমাদের দল ধরা প'ড়ে গেল। গুরুদেব যথা-সময়ে পালিয়ে বাঁচলেন। আমার চেহারা ছিল ভাল—পুলিস আমাকেই দলপতি ঠাউরে নিয়ে ঠেলে দিলে।

মামলার যখন শেষ হলো, তখন জানলাম যে, কলকাতা সহরে এতদিন যত কিছু চুরি-ডাকাতি হয়েছে, সে সব আমারই নেতৃত্বে! তাই আমার কিছু লম্বা রকম জেল হলো।

হলো ভাল। নিরাশ্রয় আশ্রয় পেলে। জেল জায়গাটা মন্দ নয়। একটু বনিয়ে চলতে পারলে সেখানেও বেশ চালিয়ে দেওয়া যায়।

কিছু দিন ঘানিতে কাজ করলাম। অসুখ হয়ে যেতে সহৃদয় ডাক্তার সাহেব বললেন, 'এ কাজ এ পারবে না।' হাঁসপাতালের অন্ন ধ্বংস ক'রে বা'র হয়ে—ছাপাখানার কাজে ভর্ত্তি হলাম। বেশ লাগল। উৎসাহের সঙ্গে কাজ করাতে—উন্নতি হলো—প্রুফ-রিডার হলাম। এমনি ক'রে কিছু দিন কাটাতেই শুনলাম, আমার নাকি কিছু ক'রে মাইনে বরাদ্দ হয়েছে—সেটা বা'র হবার সময় পাবো।

জেলে যখন ঢুকেছিলাম, তখন চুল ছিল কালো—যে দিন বেরুলাম, সে দিন সব সাদা।

জেলার সাহেব ডেকে বললেন, 'যদি তুমি জেলে কাজ করতে চাও ত তাও করতে পার; নহিলে তোমার ৪০০৲ টাকা আছে, তা নিয়ে ব্যবসা করেও দিন কাটাতে পার। আশা করি—আর পাপের পথে যাবে না।'

আর জেলে থাকতে ভাল লাগল না—বেরিয়ে পড়লাম। সটান্ এসে জগন্নাথ ঘাটে স্নান ক'রে উঠে এক বাবাজির ধুনীর পাশে জায়গা নিলাম।

বাবাজি গাঁজার কলিকায় দম দিয়ে তাঁহার প্রসাদ দিলেন। জেলে থাকতে গাঁজাটার অভ্যাস হয়েছিল। কয়েদীরা হরিভানন্দকেই বেশী পছন্দ করে।

গাঁজা টেনে ভম্ হয়ে বাবাজির পাশেই ব'সে রইলুম। দুপুরের সময় বাবাজি উঠ্‌লেন ; আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌লাম।

বাবাজি হেসে বল্‌লেন, 'কাঁহা যায়েগা ?'

'আপনার সঙ্গে।'

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বাবাজি 'আচ্ছা আও' ব'লে চল্‌লেন।

* * *

বাবাজি যেখানে থাক্‌তেন—তা আমার খুবই পরিচিত স্থান। যখন কাপ্তেনি কর্‌তাম, তখন এখানেই আমার ঘরবাড়ী ছিল।

একটা দোতালা বাড়ীর নীচের তালায় বাবাজির স্থান। হয় ত কিছু ক'রে ভাড়া দিতে হয়। বাবাজির ভৈরবী নাই ; কিন্তু তার অভাবে সন্ন্যাসধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হবার কোন আশঙ্কা ছিল না!

প্রথম দিন বাবাজির ফুটের কাজে ভর্ত্তি হলাম। দ্বিতীয় দিন পাচকের কাজ কর্‌লাম। তৃতীয় দিন বাবাজি অর্দ্ধচন্দ্র দান কর্‌লেন।

স্রোতে আবার গা ভাসালাম। সমস্ত দিন অনাহারে কাট্‌ল। সন্ধ্যার সময় ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে একটা ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু খেলাম। পেটে ভার পড়াতেই চোখে ঘুম এল ; কিন্তু শুই কোথায় ?

উদ্‌ভ্রান্ত-মনে পথে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে একটা গ্যাসের তলায় একখানা মুখ দে'খে হঠাৎ বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌তে লাগ্‌ল। আর এক পাও চল্‌তে পার্‌লাম না। একদৃষ্টে সেই পদ্মের মত সুন্দর মুখখানা দেখতে লাগ্‌লাম।

খানিকক্ষণ পরে শুন্‌তে পেলাম, কে বল্‌চে—'ওলো স'রে দাঁড়া—স'রে দাঁড়া—দেখচিস্ নে,—বুড়োর ধাঁধা লেগে গেছে। আ মরণ, বুড়োর রকম দেখ!'

নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ ভাবে সেখানে যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, জানিনে। বুকের মধ্যে আগুনের হল্‌কা চল্‌ছিল। শেষকালে সেই পরমা সুন্দরী মেয়েটি আমার হাত ধ'রে তার ঘরে নিয়ে গেল।

ছোট্ট খোলার ঘর। পরিপাটী বিছানা। মেজেতে মাদুরে বস্‌লাম। মেয়েটি তামাক সেজে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'বামুন ?' আমি ঘাড় নাড়তেই হাতে হুঁকো পেলাম। মনের আনন্দে তামাক টান্‌তে লাগ্‌লাম।

ঘরের দেওয়ালে অনেক রকমের ছবি। কালী তারা ত আছেই। ঘুরে ফুলুঙ্গীর মধ্যে একখানা ছবি দেখলাম—সেটাতে ফুলের মালা দেওয়া ; চন্দন ছেটানো। প্রত্যহ ধুনো দেওয়াতে ছবিখানা অন্ধকার হয়ে গেছে।

মেয়েটি আমার পায়ের কাছেই ব'সে ছিল। বল্‌লাম, 'মা, ওটা কি ?'

'কোথায় ?'

'ওই কুলুঙ্গীর মধ্যে ?'

'ও আমার বাবার ছবি।'

'নিয়ে এস ত দেখি।'

ছবিখানা নিয়ে এল। ছবিখানা দে'খে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। 'হাঁ, মা, এ ছবি কোথায় পেলে ?'

'আমার মা দিয়ে গেছেন। তিনি রোজ একে এমনি ক'রে মালা চন্দন দিয়ে পূজো কর্‌তেন। আমিও তাই করি।'

বুকের মধ্যে আমার যেন একটা ব্যথার সমুদ্র তোলপাড় ক'রে গেল। 'সর্ব্বনাশ! এ কে ?'

'অমন ক'চ্চেন কেন ?'

আমি কোন কথার উত্তর দিতে পার্‌লুম না। আমার মনে বোষ্টুমীর কথা জেগে উঠ্‌ল। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম, কি আকর্ষণে সে দিন সন্ধ্যায় মেয়েটা আমাকে টেনেছিল।

ছবিখানার দিকে চেয়ে হাসি এল—পাগল তোরা, কার পূজো কর্‌চিস্ ?

ঘর যেন চিতার জ্বলন্ত আগুন মনে হোল।

আমি উঠে কুলুঙ্গী থেকে ছবিখানা নিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লাম।

আর সেই মেয়েটার পায়ের কাছে জেলের কামান চার শ' টাকার চারখানা নোট ছুঁড়ে—ছুট—ছুট—একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে।

তার পর এই দেখচ আমাকে।"—বাবাজি দ্রুতপদে চ'লে গেলেন।

তখন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নহবতখানা থেকে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ললিতের সুর উষার ঈষদুজ্জ্বল আকাশের পানে উঠ্‌ছিল। দূরে একজন গঙ্গা-সলিলে স্নান কর্‌তে কর্‌তে গাইছিল,—

"আনন্দ-ভবন গিরিজাপতি-নগরী,
মন কাঁহে নহি বাস লাগাওত।"

শ্রীঃ—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি ও তত্ত্ব-বিচার

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম ছিল "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম।" কিন্তু বেদের প্রামাণ্য লইয়া যখন সন্দেহ ও কলহ উপস্থিত হইল, তখন হইতেই উক্ত নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া, তৎস্থানে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই নূতন নাম গৃহীত হইল। "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম"—এই নাম উঠাইয়া দিতে দেবেন্দ্রনাথ কোন আপত্তি করিলেন না। পরন্তু তাঁহার সঙ্কলিত ধর্ম্মগ্রন্থের নাম তিনি "ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ" রাখিলেন, এবং এই নামেই ব্রাহ্ম-সাধারণের মধ্যে ঐ গ্রন্থ তিনি প্রচার করিলেন। কিন্তু সমস্ত ব্রাহ্মগণ নির্ব্বিবাদে দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থকে "ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ" বলিয়া স্বীকার ত করিলেনই না, পক্ষান্তরে, অক্ষয়-কুমার, রাখালদাস প্রভৃতি দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, ঐ গ্রন্থ কিছুতেই ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ এইবার যোগ্য নহে। কেবল যে ঐ গ্রন্থে স্ববিরোধী শ্রুতিবাক্যের খামখেয়ালী সমাবেশ আছে, তাহাই নহে, ঐ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ। "ধর্ম্মোন্নতি-সংসাধন" এবং "ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান আন্তরিক অবস্থা-বিষয়ক পর্য্যালোচনা"—প্রভৃতি পাঠ করিলেই দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থ সম্বন্ধে তখনকার ব্রাহ্মদের মনের ভাব কিঞ্চিৎ জানা যায়।

সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম, বেদমান্যকারী হিন্দুদিগের ধর্ম্ম নহে। ইহা দেবেন্দ্রনাথের স্বেচ্ছাকৃত। বেদের প্রামাণ্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" এই নাম উঠাইয়া দিতে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, তার পর নিজের ধর্ম্মকে "ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ" স্বতন্ত্র নামে অভিহিত করিয়া, হিন্দুদিগের ধর্ম্মের সহিত তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের এমন এক ব্যবধান সৃষ্টি করিলেন, যাহার ইঙ্গিত এইরূপ যে, যাহা হিন্দু-দিগের ধর্ম্ম, তাহা ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম নয়। এমন কি, "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" হইতেও দেবেন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মধর্ম্ম" পৃথক্। যতদিন ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" এই নামে অভিহিত ছিল, ততদিন হিন্দুদিগের ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মের একটা মিলনের দৃঢ় সেতু বিদ্যমান ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়া, বা না বুঝিয়া যেরূপেই হউক, সেই সেতুকে ভগ্ন করিয়া দিলেন। ইহার ২৫ বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭২ খৃঃ অঃ তিন আইনের ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। শুনা যায়, ইহাতে নাকি

হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক মিলনের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে বেদের ধর্ম্মকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়া, তৎস্থানে ব্রাহ্ম-নামধেয় ধর্ম্মকে প্রচার করিয়া, ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মিলনের সর্ব্বপ্রকার পথ দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের ২৫ বৎসর পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়াছিলেন। কেননা, যাঁহারা বুদ্ধদেবের কথাতেও বেদ-পরিত্যাগে কুণ্ঠিত ছিলেন—তাঁহারা যে হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথের খাতিরে সেইরূপ কার্য্য করিবেন,—অন্ততঃ বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালী হিন্দুগণ এতদূর দুঃসাহসী,—ইহা ত কোনক্রমেই ভাবা যায় না। রাজা রামমোহন তাহা সবিশেষ বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংস্কার-প্রণালীই তাহার প্রমাণ। রামমোহনের শাস্ত্রাদিতে অগাধ পাণ্ডিত্য ও অমানুষিক প্রতিভা-বলে—যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তিনি হিন্দুদিগের সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন,—দেবেন্দ্রনাথ, আমার বিশ্বাস, তাহা কিছুমাত্র না বুঝিয়া, রামমোহনের ঠিক সোজা-উল্টা পথে চলিয়া এবং চালাইয়া, রামমোহনের নামাঙ্কিত সংস্কারসঙ্ঘকে জাতির বিশালতর প্রাণ ও শরীর হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্ভবতঃ অনর্থক বিপন্ন করিয়াছেন। হয় ত ইহা দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু হইলে কি হয়; দৈব প্রবল আর কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। রামমোহনের সংস্কারকে দেবেন্দ্রনাথ অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন,—এই বিশ্বাস বহুপরিমাণে অন্ধবিশ্বাস, এবং এই সংস্কার বহু পরিমাণে কু-সংস্কার। অন্ধবিশ্বাস ও কু-সংস্কার পরিহারের যুগে আমরা যেন ধীরভাবে ইহার বিচার ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। কেননা, 'অন্ধ' এবং 'কু' কোন কিছুরই ভাল নয়।

যাহা হউক, দেখা গেল, দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম হিন্দুদিগের ধর্ম্ম হইতে পারে না, এবং দেখা গেল, দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম—সকল ব্রাহ্মেরও ধর্ম্ম হইতে পারে না। কেননা, জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমারও একজন ব্রাহ্ম ছিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হইলেও,—তাঁহার ধর্ম্মমতও, কি ইতিহাস-বিচারের দিক্ দিয়া, কি মতের বিশেষত্ব ও গুরুত্বের দিক্ দিয়া, কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। অথচ দুঃখের সহিত আমি বলিতে বাধা বোধ করিতেছি না যে, সংস্কার-যুগের ইতিহাসলেখকগণ এতাবৎ দেবেন্দ্রনাথের তুল্য ও যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী—অক্ষয়কুমারকে বহু পরিমাণে কেবল ঠেস্ করিয়া, অকৃতজ্ঞতার অমার্জ্জনীয় অপরাধ অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম "ব্রাহ্মধর্ম্ম" হইলে,—অক্ষয়কুমারের ধর্ম্ম "ব্রাহ্মধর্ম্ম" হইবে না কেন? রামমোহনের দোহাই দেবেন্দ্রনাথ দিয়াছেন, আর অক্ষয়কুমার কি দেন নাই? দেবেন্দ্রনাথ যে রামমোহনকে ভুল বুঝিয়াছেন, তাহা এই অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিক কাল পর্য্যন্ত গড্ডলিকা-প্রবাহ বা আরও অন্যান্য প্রবাহে ভাসমান বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকসমাজের দৃষ্টিকে কোন ক্রমে এড়াইলেও তাহা যে অক্ষয়কুমারের চক্ষুকে এড়াইতে পারে নাই—

ইহার প্রমাণের ত অভাব নাই। কিন্তু নিজের ধর্ম্মমতকে দশের ধর্ম্মমত বলিয়া প্রচার করিবার অনুকূল (বা প্রতিকূল?) যে উগ্র প্রভুত্বাভিমান একের ছিল, অন্যের তাহা ছিল না। অক্ষয়কুমার যুক্তিপন্থী জ্ঞানযোগী ছিলেন; তিনি 'আদেশ' পাইয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ" সঙ্কলন করিয়াছেন, এমন কথা বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আর সেরূপ বলিলেও যে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহা শুনিবে, এরূপ বিশ্বাসও সম্ভবতঃ তাঁহার কম ছিল। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রামমোহন বা সমীপবর্ত্তী অক্ষয়কুমারের ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি, এবং ইহাঁদের পরস্পরের ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্য ও সাদৃশ্য হইতে একদিকে যেমন ইহাঁদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে—অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্ম সাধারণগণ, তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মিল বা গরমিল কাহার সহিত কতটা, তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের দিক্ দিয়াও বা অবনতির—ইহার একটা মূল্য আছে।

আমি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মকে সুতরাং ইতিহাস ও সত্যের খাতিরে সকল ব্রাহ্মের সাধারণ ধর্ম্ম—ইহা অস্বীকার করিতেছি। অথচ ইহাকে দেবেন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বলিয়া মানিয়া লইয়া, উক্ত ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমতের যে দার্শনিক ভিত্তি দেবেন্দ্রনাথ দিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

"হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পূজ্যপাদ কবি স্যর শ্রীরবীন্দ্রনাথ

আজকাল ভাবরাজ্যে ও ব্যবহাররাজ্যে, জ্ঞান, দর্শন, চারিত্রের, সাহিত্য, শাস্ত্র ও কলাকৌশলের যেরূপ চালনা ও আলোচনা হইতেছে, তাহার ঠাঠ-ঠমক, লক্ষণা-লক্ষণ ও গতিবিধি রাগবিরাগ-শূন্য হৃদয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, আমরা এক যুগ-পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে আসিয়াছি। ইহা আদর্শ-বাস্তবের প্রবীণ-নবীনের, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ। সন্ধ্যাই সন্ধিক্ষণ। দিবারাত্রি-সন্ধি দণ্ডস্বরূপই ইহার স্বরূপ। ইহাই সাধকের যোগ-সঙ্কটাবস্থা। এই যোগ-সঙ্কটা-বস্থায় অবিদ্যাস্বরূপিণী মায়া আসিয়া, আপনার মোহজাল বিস্তারপূর্ব্বক সাধককে বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পায়। সাধকের সিদ্ধি-সাধন-পথে এই মায়া অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়; নিত্য নব নব মোহনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধককে বিমোহিত, আদর্শ হইতে বিচ্যুত করে। অথবা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণানন্তর সাধনার আসন হইতে তাহাকে বিতাড়িত করে। যিনি আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও এক-নিষ্ঠ, যিনি আপনার আদর্শের ধ্যান-মহিমায় বিভোরস্থ নিবন্ধন, অবিদ্যাস্বরূপিণী কুহকিনী বিলাসিনী ললিতাঙ্গীর চরণ-নূপুর-মুখরিত ললিত ঝঙ্কারে বধির; লালসা-লোলুপ রূপের তরঙ্গে যিনি অন্ধ; চিত্ত-বিভ্রমকারী কুসুম-সুবাসিত মৃদুমলয়-হিল্লোলেও যিনি অবিচলিত; তিনিই কেবলমাত্র এই যোগসঙ্কটাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধির বিজয়মাল্য লাভ করিতে পারেন। জগৎপূজ্য তথাগত এই সাধন-সম্পত্তি-চতুষ্টয়ের বলেই সাধনায় মা-'র বিজয়ী হইয়া 'বহুজনহিতায় সুখায়' বুদ্ধরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। সয়তান কর্ত্তৃক কণ্টকাকীর্ণ সাধনার পথ অবলীলাক্রমে পার হইয়াছিলেন বলিয়াই খৃষ্ট আজ এই ধরাতলে ত্রাণকর্ত্তারূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

ব্যক্তির জীবন যে নিয়মাধীন, জাতীয় জীবনও ঠিক সেই নিয়মাধীন। ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধিসাধন-পথে যেমন যোগসঙ্কটাবস্থা আছে, জাতীয় জীবনের সিদ্ধি সাধনেও ঠিক্ সেইরূপ যোগ-সঙ্কটাবস্থা আছে। এই যোগসঙ্কটাবস্থাই জাতীয় জীবনের যুগ-পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণ। সন্ধিক্ষণই জাতীয় জীবনের সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যাবসানে জাতীয় জীবনে কোমল রবিকরোজ্জল, স্নিগ্ধ-মলয়-সুবাসিত সুপ্রভাত আসিবে, কিংবা ঘোর অমানিশার নিবিড়চ্ছায়া ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে, তাহা আমাদের জাতীয় সাধকদিগের উপর নির্ভর করিতেছে।

জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে সাধক যদি আপন আদর্শের প্রতি হীনশ্রদ্ধ হয়েন, আপনার সাধন-সম্পত্তি গণিয়া-গাঁথিয়া হিসাবমিল না করেন, পরবৈভব দেখিয়া বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া যদি আপন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয়েন, তাহা হইলে মায়াজাল-বিজড়ন নিবন্ধন আবার যে জাতীয় জীবনকে ঘোর অমানিশার নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

এই জন্য বলিতেছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের সিদ্ধি-সাধন-সম্পত্তি গণিয়া-গাঁথিয়া, হিসাব নিকাশ মিল করিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। আমাদের-শস্ত্র-শাস্ত্রের, অর্থ-সামর্থ্যের, হিসাব-নিকাশ করিবার জন্য, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘর্ষ-সমুদ্ভূত এই সঙ্কটা-বস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য, দুর্ব্বার জীবন-সংগ্রামে বিজয়মুকুট লাভ করিবার জন্য, জাতির অস্তিত্ব-ব্যক্তিত্ব অটুট রাখিবার জন্য, ঈপ্সিততমকে করতলগত করিবার জন্য, জাতীয় জীবন-সংগ্রামের এই সন্ধিক্ষণই প্রকৃত উপযুক্ত সময়।

ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রাণ। এই জন্য আমাদের পূজ্যপাদ ধর্ম্মাচার্য্যগণ ধর্ম্মের খতিয়ান করিয়া বিশ্বসমাজে আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জ্ঞানদর্শন সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ আপনাদের খতিয়ান করিয়া, বিশ্বে ভারতীয় জ্ঞান-দর্শনের আত্মগৌরব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও চিত্রকলাবিদ্ আপন আদর্শ অন্বেষণে, তাহার পথ বহিষ্করণে এখন বেশ ব্যস্তত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। জাতীয়-সাহিত্য তাহার পুঁজিপাতা বাহির করিয়া হিসাব মিল করিয়া লইতেছে। বাকী আছে কেবল জাতীয় জীবন-সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ,—সঙ্গীত।

জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে, আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সঙ্গীত-কলাকৌশলের হিসাব-মিল যদি না করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের আদর্শানুযায়ী ইহার সংস্কার ও প্রসার সুদূর-পরাহত হইবে, এবং যদি আমাদের সঙ্গীতের আদর্শানুযায়ী সংস্কার ও প্রসার না হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবন-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সংসাধিত হইবে না;—এ কথা বোধ হয়, প্রেক্ষাবান্‌মাত্রেই স্বীকার করিবেন; তাই বোধ হয়, আমাদের পূজ্যপাদ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, "সঙ্গীতের মুক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের সকলকেই আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

"আজ নূতন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁইয়াছে। কেবল ভোগে আমাদের আর তৃপ্তি নাই। আমাদের আত্মপ্রকাশ চাই। সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাইতেছি। আমাদের নূতন জাগরূক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ ছাড়াইয়া আত্ম-প্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। অর্থাৎ স্পষ্ট দেখিতেছি, আমরা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাহিরে আসিলাম, আমাদের সামনে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদ্‌ঘাটিত। নূতন নূতন উদ্ভাবনের মুখে আমরা চলিব। আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্রকলা

সবই আজ অচলতার বাঁধন হইতে ছাড় পাইয়াছে। এখন আমাদের সঙ্গীতও যদি এই বিশ্ব-যাত্রার তালে তাল রাখিয়া না চলে, তবে ওর আর উদ্ধার নাই।"

'সঙ্গীতের মুক্তি!' বিষয়টি গুরুতর। গুরুতর বলিয়াই মনে হয়, প্রবন্ধটিও দুরূহ। দুরূহ হইলেও প্রবন্ধটি যে মনোরম হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার বক্তব্য বিষয়টিও হিন্দু-সঙ্গীত। কিন্তু 'সঙ্গীতের মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটিও আমার প্রধান অবলম্বন। রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটি মনোরম হইয়াছে বলিয়াই যে আমি তাঁহার কথা সর্ব্বথা অনুমোদন করিবার জন্য বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা নহে। সঙ্গীত সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবার জন্য রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটি আমার অবলম্বন করিবার প্রধান কারণ এই যে, রবীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে এমন দুইচারিটি অবশ্য মীমাংসিতব্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, যদি সেগুলির শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে আজ না হয় কা'ল, প্রতীচ্য-কল্পনা-প্রসূত Romantic Movement এর প্রবল বন্যায় আমাদিগকে নিশ্চয় দেহ ভাসাইয়া দিতে হইবে। এরূপ ঘটিলে কিন্তু আমাদের নিজস্ব-ব্যক্তিত্ব আর আমাদের মুঠার মধ্যে থাকিবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলীই তখন আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া দাঁড়াইবে। তখন নিজেদের নিজস্ব-ব্যক্তিত্ব-বিশেষত্ব:হারাইয়া আমাদিগকে তাহাদের হস্তে মৃৎপিণ্ডের মত থাকিতে হইবে। তাহারা আমাদিগকে যখন যে ভাবে উপমর্দ্দন করিবে, বা যে ছাঁচে ঢালিবে, সেই ছাঁচেই সেই ভাবেই আমরা গঠিত ও ভাবিত হইয়া উঠিব। আরও এক কথা। ঘরের মধ্যে কোন কোন স্থানে স্থিত যদি একটি শক্ত বর্ত্তুলকে আমরা সকলে চারিদিক্ হইতে আনাড়ীর ন্যায় উপর্য্যুপরি লগুড়াঘাত করিতে থাকি, তাহা হইলে হয় বর্ত্তুলটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে, নচেৎ অচলের বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ঘরের বাহিরে পড়িয়া সংসারে আপনার ব্যক্তির বিশেষত্ব হারাইতে বসিবে। কুম্ভকর্ণের মহানিদ্রা-ভঙ্গের জন্য তাহাকে ন্যায়-অন্যায়রূপে যথেচ্ছ প্রহার করিয়া তাহার অচলায়তনকে সচল করিয়া তুলিলেও তুলিতে পার বটে, কিন্তু তাহার জাগরণের পর যদি তাহাকে আপন পাঁজিপুথি খুলিয়া তাহার অস্ত্র-শস্ত্রের হিসাব-নিকাশ মিল করিয়া লইবার অবসর না দাও, তাহার আদর্শ অনুযায়ী গন্তব্য পথ তাহাকে নির্ণয় করিবার অবসর না দাও, তাহা হইলে অচলতার বন্ধন ছিন্ন করিলেও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

তার পর Romantic Movement সর্ব্বথা প্রযোজ্য নয়। যে দেশের অতীত-কাহিনী নাই, যাহাদের কোন পৈতৃক সম্পত্তি নাই, যাহাদের বর্ণ-গোত্র-প্রবর নাই, যাহাদের দশবিধ সংস্কার নাই, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির কোন সামঞ্জস্য নাই; সর্ব্ব সাধারণ কর্ত্তৃক প্রমাণ-স্বরূপে গৃহীত ধর্ম্মের একটা ভিত্তি যাহাদের নাই; মোট কথায় যাহাদের

Tradition নাই, কেবল আছে মাত্র Convention, তাহাদের সমাজেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে Romantic Movementএর লীলা-খেলা হইতে পারে, অন্যত্র নহে। তুমি যে পথের পথিক হও না কেন, তুমি হিন্দু, তোমাকে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। যে সমুহমতাবলী বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ বা আত্মপ্রসার করিতে পারেন নাই। উন্নতি-বিধান করিতে গিয়া, যদি সমাজের বাহিরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলাম, তবে উন্নতি-বিধান কোথায় রহিল? পাণ্ডিত্যাভিমানী কেহ হয় ত বলিবেন,—বেদের প্রামাণ্য কেন স্বীকার করিব? আমি বলি,—তুমি না হয় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার নাই করিলে, কিন্তু এক জনের বাক্য ত প্রমাণস্বরূপে তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে? নচেৎ তোমার বিচার-বুদ্ধি অচলায়তনের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। কারণ, যুক্তি-বিচার, পরিণামে আপ্তপুরুষের বাক্যের উপর নির্ভর করে। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণও এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন যে, 'Reason ultimately rests on authority or verbal testimony'। তুমি প্রতীচ্য পণ্ডিত Helmholtz, Tyndal প্রভৃতিকে প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করিবে, আমি না হয় সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা ঋষিগণের বাক্য প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিলাম। আমার মনে হয়, পূজ্যপাদ রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সমাজবিশেষ যদি আজ তাহার বিধি-ব্যবস্থা বেদ-বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে আজ বিরাট্ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কোণ-ঠাসা হইয়া অবস্থান করিতে হইত না। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত আপনাদের পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ না করিয়া, বৈদিক সমাজ অগ্রাহ্য করিয়া Hamilton, Cousin. Hegel আদি উদ্ভাবিত প্রচারিত যুক্তি-দর্শনের উপর তাঁহাদের ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রোক্তসমাজের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ ভাল কাজ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সমবেত সুধীবর্গ ই এ কথার যাথার্থ্য বিচার করিবেন।

সে যাহা হউক, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ঋষি-ব্যাখ্যাত পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সঙ্গীতসম্পত্তির হিসাব পুঁজিপাতা খুলিয়া মিল করিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। সুতরাং অতঃপর দেখা যাউক, সঙ্গীত বলিতে ঋষিরা কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং তাহা কিং স্বরূপ?

কোন বিষয়ের স্বরূপাবধারণ করিতে হইলে তাহার জন্মাদি ষড়্‌বিধ ভাববিকার অধ্যয়ন করিতে হইবে; নচেৎ তাহার স্বরূপ আমাদের হৃদয়াকাশে সম্যক্ প্রতিভাত হইবে না, এবং স্বরূপের সম্যগবধারণ ব্যতীত তাহার সংস্কার বা উন্নতিবিধানও অসম্ভব।

'সঙ্গীত' শব্দে ঋষিগণ গীত-বাদ্য-নৃত্য এই ত্রিতয়কেই বুঝাইয়াছেন। 'গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ সঙ্গীতমুচ্যতে'। এই সঙ্গীত বেদচতুষ্টয় হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে।

গীত, বাদ্য ও নৃত্য, এই ত্রিতয়ের সাধারণ গুণ,—লোকানুরঞ্জন। যাহা এই সাধারণ গুণ-বিবর্জ্জিত, তাহা সঙ্গীত নামাভিধেয় হইতে পারে না। যথা—

"গীত-বাদিত্রনৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ।
অতো রক্তিবিহীনং যন্ন তৎ সঙ্গীতমুচ্যতে॥"

মার্গ ও দেশী ভেদে, এই সঙ্গীত দ্বিবিধ। অস্মদ্দেশে এই দ্বিবিধ সঙ্গীত স্মরণাতীত কাল হইতে প্রকাশ পাইয়াছে।

যে সঙ্গীতকলা ভরতমুনি স্বীয় গুরু ব্রহ্মার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করতঃ দেবাদিদেব মহাদেবের সম্মুখে অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বদুঃখোপশমকারী মুক্তিপ্রদায়ী সঙ্গীতই 'মার্গ' নামে অভিহিত এবং দেশে দেশে বা দেশান্তরক্রমে যে সঙ্গীত তত্তৎদেশীয় রীতিনীতি অনুসারে লোকরঞ্জনার্থ সাধিত হইয়া থাকে, তাহাই 'দেশী' পদবাচ্য।

যাহা হউক, যে শাস্ত্র পাঠে, গীত, বাদ্য, নৃত্য সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি জন্মে, ভোগ ও অপবর্গের পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই সঙ্গীতশাস্ত্র বলে। হিন্দুদিগের এই সঙ্গীতশাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—১। গীতাধ্যায়। ২। বাদ্যাধ্যায়। ৩। নৃত্যাধ্যায়। এই তিনটির একত্র সমাবেশকে শাস্ত্র, "তৌর্য্যত্রিক" নামে অভিহিত করিয়াছেন। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে, এই তৌর্য্যত্রিক নাদাত্মক, 'নাদ হইয়াছে আত্মা যাহার'। নাদই ইহাদের আত্মা বা প্রকৃত স্বরূপ, যথা,—

"গীতং নাদাত্মকং বাদ্যং নাদব্যক্ত্যা প্রশস্যতে।
তদ্দ্বয়ানুগতং নৃত্যং নাদাধীনমতস্ত্রয়ম্॥"

এখন দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুমতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য, তিনটিই নাদাত্মক, নাদ ইহাদের প্রকৃতি, নাদ হইতেই ইহারা উৎপন্ন, নাদেতেই ইহারা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নাদেই ইহারা বিলীন হইয়া ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা পরিগ্রহ করে। অতএব দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে,—নাদই এই তৌর্য্যত্রিকের ব্রহ্ম।

গীতাদি তৌর্য্যত্রিক যে নাদাধীন, যে নাদকে অবলম্বন করিয়া তৌর্য্যত্রিক আমাদের ভোগ ও মুক্তির বিধান করে, সেই নাদ কিংস্বরূপ?

নাদ অর্থে বাক্ বা শব্দ। বাক্ বা শব্দ নাদেরই পর্য্যায় মাত্র। নাদ বা শব্দ কোন্ পদার্থ? "গৌঃ"—এ স্থলে শব্দ কোন্‌টি?

যাহা গলকম্বল-লাঙ্গুল-ককুদ-খুর ও শৃঙ্গবিশিষ্ট, তাহাই কি শব্দ? না—তাহাকে দ্রব্য বলে। তবে যাহা তাহার ইঙ্গিত, নিমেষ, চেষ্টা প্রভৃতি, তাহাই কি শব্দ? না, তাহাকে ক্রিয়া বলে। তবে যাহা শুক্ল নীল কপিল কপোত প্রভৃতি বর্ণ, তাহা কি শব্দ? না;

তাহাকে গুণ কহে। তবে যাহা ভিন্ন বস্তুতে অভিন্ন থাকে, বস্তু ছিন্ন হইলেও যাহা ছিন্ন হয় না এবং সামান্যভূত, অর্থাৎ জাতির ন্যায়, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে আকৃতি কহে।

তবে শব্দ কোন্‌টি? যাহা উচ্চারণ করিলে গলকম্বল-ককুদ-শৃঙ্গ-খুর-বিশিষ্টের জ্ঞান হয়, তাহাকে শব্দ কহে। অথবা যে ধ্বনির দ্বারা জগতে পদার্থের প্রতীতি জন্মে, সেই ধ্বনিকে শব্দ কহে। বাক্, শব্দ-ধ্বনি বা নাদ ইহারা পরস্পর পরস্পরের সমান অর্থবাচী পর্য্যায় মাত্র।

ভগবান্ জৈমিনি বলিয়াছেন, শব্দের সহিত তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের যে শক্তিরূপ সম্বন্ধ, তাহা ঔপপত্তিক, তাহা স্বাভাবিক, অতএব তাহা নিত্য,—কল্পিত নহে। শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে। এই শব্দের এই অর্থ, লোকে এইরূপ সঙ্কেত দ্বারা শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী কেহ কেহ হয় ত এতচ্ছ্রবণে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন। তাঁহারা হয় ত বলিবেন,—"শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ সাময়িক, বা সাঙ্কেতিক Conventional না হইয়া, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়, পৃথিবীর গুরুত্বের ন্যায় তাহা যদি নিত্য হয়, তবে শব্দ নাদিত, উচ্চারিত হইলেই সকলেরই হৃদয়ে তাহার জ্ঞান হয় না কেন? (দাহিকা শক্তি অগ্নির ধর্ম্ম, তাহার সহিত শিশু সংস্রবে আসিবামাত্র অন্যের অপেক্ষা ব্যতিরেকে তাহা শিশুকে দগ্ধ করিতে থাকিবে।) এই শব্দের এই অর্থ, গুরুমুখে ইহা শ্রবণ করিবার পর তবে শব্দের অর্থ-বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দার্থগত যে সম্বন্ধ, তাহা যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে বিনা উপদেশে শব্দের অর্থ প্রতীতি হইত। সুতরাং ইহার এই অর্থ, পুরুষবিশেষের দ্বারা এইরূপ কথিত হইলে পর, যখন শব্দের অর্থ-বোধ হয়, তখন শব্দার্থগত সম্বন্ধকে পৌরুষেয় বলাই সঙ্গত।"

কিন্তু না। তাহা সঙ্গত নহে। অগ্নি শব্দ, দাহিকা শক্তি তাহার অর্থ। পৃথিবী শব্দ, গুরুত্ব তাহার অর্থ। অগ্নিকে মানুষ দাহকতাবিশিষ্ট করে নাই, পৃথিবীকেও মানুষ গুরুত্ব প্রদান করে নাই। দাহকতা যদি অগ্নির ধর্ম্ম হয়, তবে শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের বাচ্যবাচক, প্রকাশ্যপ্রকাশকের সম্বন্ধও নিত্য মানিতে হইবে। অগ্নি দগ্ধ করে সত্য; কিন্তু মধ্যে অন্তরায় থাকিলে অগ্নি কি দগ্ধ করিতে পারে? মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ধর্ম্ম। কিন্তু আমি শক্তিবিশেষের আশ্রয় পাইলে কি তাহা আমাকে ধরাতল-শায়ী করিতে পারে? শাস্ত্র বলিয়াছেন, শব্দ যথাযথ ভাবে অন্তরায়-বিহীন হইয়া উচ্চারিত হইলে, তাহার অর্থ আপনা হইতেই প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা আমরা সত্যের রূপ দর্শন করিয়া থাকি মাত্র। আমরা সত্যের সৃষ্টি বা জন্ম দান করিতে পারি না। যাহা সত্য, তাহাকে আমরা যে জানিতে পারি না, সত্ত্বাদি-গুণত্রয়স্বরূপ ইন্দ্রিয়দোষ, সংস্কার দোষাদি অন্তরায় কর্ম্মই তাহার প্রতিবন্ধক। দোষাদি-বিবর্জ্জিত অন্তরায়-মুক্ত হইয়া শিশু-মুখরিত অগ্নি শব্দ তদ্দণ্ডেই যে স্বরূপে প্রকটিত

হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'এই শব্দের এই অর্থ' ইহা সম্বন্ধকরণ নহে; পার্থসারথি বলিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধ সম্বন্ধের কথন মাত্র। কিরূপে তাহার নির্ণয় হইবে? যে শব্দের যাহা অর্থ, যদি কেহ তৎশব্দে তদর্থ না করিয়া স্বতন্ত্র অর্থ করে, তবে বহু ব্যক্তি তাহাকে নিবারণ করিয়া থাকে। অস্মকার সভাই তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিলেও করা যাইতে পারে। 'গো' শব্দে যদি কোন ধীমান্ 'অশ্ব' বা 'গবয়' অর্থ করেন, তাহা হইলে অনেকেই সেই অর্থমর্ম্ম-গ্রহণকারীকে 'অশ্ব বা গবয়, গো শব্দের অর্থ নয়', এইরূপে নিষেধ করিবেন। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ কাল্পনিক বা পুরুষকৃত হইলে, লোকে এইরূপ নিষেধ করিত না। শব্দের প্রকাশকত্ব যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে প্রথম শ্রবণেই যে উহার অর্থের প্রতীতি হইত, এবংবিধ আশঙ্কা চিন্তাশীলের নিকট উঠিতে পারে না। শব্দের স্বাভাবিক প্রত্যায়কত্ব অবগত হইলে, তবেই উহা অর্থ-প্রতিপত্তির নিমিত্ত হয়; স্বাভাবিক প্রত্যায়কত্বের প্রতিপত্তি বা অবগতি না হইলে, ব্যবহার-ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রথম শ্রবণে অর্থের প্রতীতি না হওয়াই স্বভাবিক।

যে শব্দের সহিত অর্থের এই নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই নাদ, বাক্ বা শব্দ হইতেই দেবতাদি নিখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে। বেদান্ত "শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভাবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' এই সূত্রের দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্যাকরণ, মীমাংসা প্রভৃতি এই শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন, "অতএব চ নিত্যম্" (১৷৩৷২৯)। এই জন্যই ভর্ত্তৃহরি, শব্দকেই পরমাণু, শব্দকেই ইন্দ্রিয় এবং শব্দকেই চিৎশক্তি বলিয়াছেন। সকল পদার্থই সূক্ষ্মরূপে শব্দে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে। বিশ্বনিবন্ধিনী শব্দাশ্রিতা। অধিষ্ঠানের পরিণামবশতঃ আত্মাভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া, অর্থ সকল বাচ্যবাচক-ভাবরূপ ভেদাত্মাতে প্রতীয়মান হয়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাবলী শব্দ-মূলক। শব্দ ব্যতিরেকে দর্শন ও সন্দর্শন বা পরীক্ষা হয় না। পুরুষ যে তর্ক করে, তাহা শব্দের প্রসাদে। শব্দাশ্রিত শক্তিই পুরুষাশ্রয় তর্ক। তর্ক শব্দসামর্থ্য ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। বিদ্যা, শিল্প ও কলাকৌশল দ্বারা লৌকিক ও বৈদিক অর্থে মনুষ্যগণের প্রায় সর্ব্ববিধ ব্যবহার প্রতিবদ্ধ হইয়া আছে। সেই বিদ্যাদি আবার বাক্‌রূপ বুদ্ধিতে নিবদ্ধ। সমানাকার অভিনিষ্পন্ন বস্তুসমূহের বিবিধ পরিচ্ছেদও বাক্-কৃত। প্রথমোৎপন্ন বালকের ইন্দ্রিয়বিন্যাসাদি শারীর যন্ত্র সকলের যথাযোগ্য ক্রিয়া-নিষ্পাদন শব্দ হইতে হইয়া থাকে। অতএব যে নিত্য শব্দের উপর প্রত্যক্ষাদি পরীক্ষা প্রতিষ্ঠিত, যে শব্দ বাক্‌ব্যবহারাদি কলাকৌশলের উপাদানভূত, সেই শব্দাখ্য-নাদই ঋষ্যুপদিষ্ট তৌর্য্যত্রিকের আত্মা বা ব্রহ্ম। এই জন্য শাস্ত্র সঙ্গীতবিদ্যাকে 'নাদবিদ্যা' বলিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণকিশোর ঘোষ।

গান।

রূপের নেশায় হয়েছি ভোর,
    ফেরি করি রূপের ডালি,
নেশা নয় এ ভালবাসা,
    রূপ-বাগানে আমিই মালি।
    আমায় ধরেছে নেশায়
আপনি মজি আপন রূপে,
        সে ভালবাসায়—
    ওগো সে আমায় রসায়,
বাজিয়ে বাঁশী আপনি হাসি
    আপনি ফাঁসী পরি গলায়;
রূপের বনে গাঁথি মালা,
    তাইতে আমি বনমালী।

চোখের জলে ধুলে এ চোখ,
তবে হয় সে রূপের পরখ,
এ রূপে সে রূপ ফোটে,
    প্রাণে ভাসে আপন ছবি,
এ রাস-মঞ্চে রূপের রসে
    নেচে দিই সে করতালি,
        তাই সে আমি বনমালী।

শ্রীঃ—

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা,

মাঘ, ১৩২৪ সাল

সূচী

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নারায়ণ

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা] [মাঘ, ১৩২৪ সাল।

শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী

প্রথমবয়সে বঙ্কিম বাবু যে সকল নভেল লিখিতেন, তাহাতে তিনি দেখিতেন, গল্পটি সাজান হইল কিরূপে। সে সাজানর কোন খুঁত আছে কি না? তাহার আগাগোড়ায় মিল আছে কি না? সকলের উপর দেখিতেন, জিনিসটা জমাট হইল কি না? পাত্রগুলি ঠিক হইল কি না? তাহাদের ব্যবহারে আগাগোড়া মিল হইল কি না? ছেলের মুখে বুড়ার কথা বাহির হইল কি না? বুড়ার মুখে ছেলেমী বাহির হইল কি না? চোরের মুখে সাধুর মত কথা বাহির হইল কি না? সাধুর মুখে চোরের কথা বাহির হইল কি না? তাহাদের ব্যবহারের সামঞ্জস্য রহিল কি না? এক কথায় তিনি "কাব্যাংশের" দিকেই দেখিতেন, আর কিছু দেখিতেন না। এইরূপে তিনি অনেকগুলি ভাল ভাল নভেল লেখার পর তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হইল। কাব্যাংশে অপরূপ, তুলনার অতীত। তাহার পর তাঁহার মাথায় ঢুকিল—কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের কথা বলিতে হইবে। ধর্ম্মের দিকে মানুষের মন লওয়াইতে হইবে। এক কথায় 'ধর্ম্মপ্রচার' করিতে হইবে। তাঁহার আনন্দ-মঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম এই সময়ের লেখা। সেইগুলিতে ধর্ম্মই অধিক লক্ষ্য, কাব্য তত নয়। সামাজিক, সমজদার লোক চটিয়া গেল। ধর্ম্মওয়ালারা খুসী হইল।

কালিদাসেরও সেইরূপ, তাঁহার প্রথম-বয়সের লেখায় ধর্ম্মের কথা বড় একটা থাকিত না। মালবিকাগ্নিমিত্রে, মেঘদূতে, এমন কি, বিক্রমোর্ব্বশীতেও ধর্ম্ম নাই, আছে কেবল কাব্য। আছে কেবল জমাট, আছে কেবল প্রেম। একটু একটু উপদেশ আছে, কিন্তু সেটা একেবারেই টের পাওয়া যায় না। না তলাইলে টেরই পাওয়া যায় না। তাঁহার শেষ বয়সের লেখাও ত তাই। তবে তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাঁহার উপদেশগুলিতে এখন হিন্দু-ধর্ম্মের ভাব বেশী বেশী, কুমারসম্ভবের কথা ছাড়িয়া দাও, হর-পার্ব্বতী লইয়া যে কাব্য, সে ত ধর্ম্ম ছাড়া হইতেই পারে না। তাঁহার শকুন্তলায় ও তাঁহার রঘুবংশে বেশী, হিন্দুয়ানী কথা আছে। সে সময় বৌদ্ধধর্ম্মে ভারত ছাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই। নিপুণ হইয়া পড়িয়াও তাঁহার কাব্যে বৌদ্ধভাব বা বৌদ্ধ-মত বা বৌদ্ধ-দ্বেষের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার হিন্দুয়ানীর তিনটি প্রধান অঙ্গ ;—একটি ব্রাহ্মণে ভক্তি, একটি গোরুতে ভক্তি, একটি দেবতার প্রতি ভক্তি ; বিশেষ হরি ও হরের প্রতি ভক্তি। শকুন্তলায় শুদ্ধ ব্রাহ্মণে ভক্তিই প্রকাশ হইয়াছে, কুমারসম্ভবে হরের প্রতি ভক্তি, রঘুবংশে গো-ব্রাহ্মণ ও নারায়ণে ভক্তি। ভক্তির অভাব কোথাও নাই। মালবিকাগ্নিমিত্রে বিদ্যাচার্য্য ব্রাহ্মণদের মাসিকের ব্যবস্থা, গণদাস ও হরদত্তের ব্যাপার, ব্রাহ্মণভক্তি নয় ত কি ? বিক্রমোর্ব্বশীতে চ্যবনের আশ্রম ও ভরতমুনির শাপও সেই ভক্তি। কিন্তু এ দুয়ে ব্রাহ্মণ-ভক্তির বিকাশ নাই। বিকাশ অন্ত জিনিসের। কুমারে হরপার্ব্বতীর প্রতি ভক্তিও তাহারই বিকাশ। রঘুবংশে বিষ্ণুভক্তি, ব্রাহ্মণভক্তি ও গো-ভক্তি তিনেরই বিকাশ ; কিন্তু সে যে বিকাশ, সেও কাব্যেরই অঙ্গ। তোমার মনে হইবে, কাব্যই পড়িতেছি ; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখিবে, ভক্তিটাই মূল। কাব্য কেবল বাহিরে। বঙ্কিম বাবুর এ চমৎকারিত্বটুকু নাই। তিনি নিজে দাঁড়াইয়া অনেক সময় ধর্ম্মপ্রচার করেন। কাব্যে সেটা কেমন কেমন দেখায়। অশ্বঘোষ যেমন মধু মিশাইয়া তিক্ত ঔষধ দেন, তিত ও মধু দুই দেখা যায়, বঙ্কিম বাবুরও তাই। কিন্তু কালিদাসের তাহা নহে। তাঁহার প্রচারটা না তলাইলে বুঝা যায় না। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের কথা যখন উঠিবে, তখন বলিব। এখন শকুন্তলার কথাই বলা যাক্।

শকুন্তলার প্রথম চার অঙ্ক কণ্বের আশ্রমে ; শেষ অঙ্ক মারীচের আশ্রমে। সুতরাং ঋষির আশ্রম লইয়াই শকুন্তলা। এখানে প্রেক্ষাগৃহ নাই, নাচ নাই, গান নাই, নাট্যাচার্য্য নাই, নাট্যাচার্য্যদের টক্কর দেওয়া নাই, সমুদ্রগৃহ নাই, বড় বড় ছবি নাই, বিবাহের সভা নাই। পঞ্চমে যদিও রাজবাটী আছে, কিন্তু আমরা রাজবাটীতে কি দেখিতেছি, দেখিতেছি শুদ্ধ অগ্নিশরণ ; বল, এক রকম যজ্ঞশালা। রোজ সেখানে অগ্নিহোত্র হয়। প্রমোদবন দেখিতেছি, কিন্তু সেখানে উৎসব বন্ধ অর্থাৎ সেও এক রকম তপোবন।

সমস্তটাই যেন ধর্ম্মের ভাবে মাখান। অলক্ষিতভাবে আছেন স্বর্গের রাজা ইন্দ্র এবং তাঁহার অপার করুণা আর অলক্ষিতভাবে আছেন মেনকা ও তাঁহার সহচরী অপ্সরারা; এই জন্মই এই ধর্ম্মভাব মাখান থাকার জন্যই হিন্দুরা মালবিকা ছাড়িয়া, উর্ব্বশী ছাড়িয়া, শকুন্তলাকে এত ভালবাসেন। তাই তাঁহারা বলেন,—

"কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপিচ চতুর্থোঽঙ্ক; যত্র যাতি শকুন্তলা॥"

বাস্তবিকও শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক, যেখানে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন, সেটা এতই পবিত্র, এতই করুণ, এতই সুন্দর যে, উহার উপমা মিলা দুষ্কর।

কালিদাসের আশ্রম ও মহাভারতের আশ্রমে একটু বেশ তফাৎ আছে। কালিদাসের আশ্রম পরম পবিত্র—পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠ, এখানে অধর্ম্মের লেশও থাকিতে পারে না। তাই একটা পাখী মারার জন্য আয়ুর তপোবন হইতে বিদায়, তাই শকুন্তলারও বিদায়। কিন্তু মহাভারতের আশ্রম আর একরূপ, সেখানে সর্ব্বদমন বার বৎসর ধরিয়া কত পশুই বধ করিয়াছে, তথাপি সে আশ্রমেই ছিল। শকুন্তলাও লুকাইয়া বিবাহ করার পরও বার বৎসর আশ্রমে ছিলেন। কালিদাসের আশ্রমে বিলাসের লেশমাত্র নাই। তপস্বীরা স্বয়ং সমিধ্ আহরণ করেন। কারণ, শাস্ত্রে লেখা আছে, "কুশপুষ্প-সমিধাদি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।" তাঁহারা সোমযজ্ঞ করেন, রোজ তিন বার সবন করেন। তাঁহারা উড়িধান খান ও পশুদিগকে বিতরণ করেন। মহুয়ার ফলের তেল ব্যবহার করেন। পশুপক্ষীর প্রতি তাঁহাদের অপার করুণা। তাঁহারা পরেন গাছের ছাল। তপোবনে আছে লতা, গাছ, ফল, ফুল, হরিণ ও ময়ূর। আর আছে শান্তি, ধর্ম্ম, তপ, ক্ষমা, করুণা আর নিষ্ঠা।

এমনই তপোবনে কালিদাস হিন্দুয়ানীর গোড়াপত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার একশেষ দেখাইয়াছেন। দুষ্যন্ত একজন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা। তিনি আসিতেছেন—মৃগয়ায় উন্মত্ত। তাঁহার রথ চলিতেছে ভয়ানক বেগে—এই যে জিনিসটা একটি দাগের মত ছোট্ট দেখাইতেছিল, দেখিতে দেখিতে সেটা প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল। যে দুটা জিনিসের মাঝে অনেকখানি জায়গা, সেটা হঠাৎ জুড়িয়া গেল—যেটা স্বভাবতঃ বাঁকা, সেটা ঠিক সোজা দেখাইতে লাগিল—কোন জিনিসই একক্ষণের জন্য পাশে দেখা যায় না—দূরেও দেখা যায় না। এই হরিণ যায়—ঐ যায়—এই মারলাম, রাজার মুখে এইমাত্র শব্দ—রাজা আর কিছু দেখিতেছেনও না, শুনিতেছেনও না। এমন সময়ে শব্দ হইল—'মৃগটি আশ্রমের, মারিও না, মারিও না।' রাজা শুনিতে পাইলেন না—কিন্তু সারথি শুনিল। সে বলিল, "ঐ হরিণটার ও

আপনার মাঝখানে তপস্বীরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" রাজার আর কথা নাই; সারথি সত্য বলিতেছে, কি মিথ্যা বলিতেছে, তাহার বিচার নাই। সারথির ভুল হইল, কি সে সত্যই বলিল, তাহার বিবেচনা নাই। একেবারে বলিয়া বসিলেন, "তবে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাও।" তাহার পর রাজা তপস্বীদের দেখিতে পাইলেন। তাহারাও আবার বলিল, "আশ্রমের মৃগ, মারিও না, মারিও না। আপনার বাণ তুলিয়া রাখ। রাজা দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন, "এই লইলাম।" তপস্বীরা বলিলেন, "তোমার পুত্রলাভ হউক্। সে রাজচক্রবর্ত্তী হউক্।" রাজা প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।" এই সব ঘটনা এত শীঘ্র হইয়া গেল যে, ইহার মধ্যে রাজা ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিবার অবসরও পান নাই। তপস্বীরা বলিলেন, কণ্বের আশ্রম—মালিনী-তীরে ঐ দেখা যায়। যদি কাজের তাড়া না থাকে, আতিথ্য স্বীকার করিয়া যান।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুলপতি আছেন কি?" উত্তর হইল, "না, তিনি নাই। তবে তাঁর কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথি-সৎকারের ভার দিয়া তিনি সোমতীর্থে গিয়াছেন।" "আচ্ছা, তাঁরি সঙ্গে দেখা করিয়া যাই। তিনিই আমার ভক্তি মহর্ষিকে নিবেদন করিবেন।" ঋষি ঘরে নাই, তবু তাঁহার আশ্রমের পূজা, যেটুকু প্রাপ্য, দিয়া যাইতে হইবে। সারথিকে রথ চালাইতে বলিলেন। যখন তপোবন নিকট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তখন বলিলেন, "ভিতরে রথ গেলে তপোবনের পীড়া হইতে পারে, রথ এইখানেই রাখ।" তাহাতেও সন্তুষ্ট নন;—বলিলেন, "রাজবেশে তপোবনে যাইতে নাই; আমার ধনুঃ ও পোষাক-পরিচ্ছদ এইখানে থাক্" বলিয়া, সব খুলিয়া ফেলিলেন। সামান্য বেশে, তীর্থযাত্রীর বেশে, আশ্রমের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপথ্যে শব্দ হইল—"ইদো ইদো সখীয়ো।"

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়াই তাহাকে ভালবাসিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা, মহর্ষির কন্যা, তাহাকে ত পাওয়া যাইবে না, ভাবিয়া আকুল হইলেন। শেষ কথা-বার্ত্তায় যখন জানিলেন, তিনি অপ্সরার মেয়ে, তখন রাজা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যখন তাহারই দলের লোক আসিয়া তপোবনের চারিদিকে গোলমাল করিতেছে শুনিলেন, আর একটা হাতী ক্ষেপিয়া ধর্ম্মারণ্যের দিকে ছুটিতেছে শুনিলেন, তিনি শকুন্তলাকেও ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। কেননা, গিয়াই তিনি সকলকে বারণ করিয়া দিবেন যে, কেহ যেন তপোবনের কোনরূপ বিঘ্ন না করে। যখন তিনি বিদূষকের সঙ্গে যুক্তি করিতেছেন, কিরূপে তপোবনে কিছু দিন থাকা যায়, সেই সময়ে খবর আসিল, দুইটি ঋষিবালক তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বিলম্ব করিতেছ কেন, শীঘ্র আন।" বালক দুইটী আসিলে তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি জানিতেন, গোখুরা সাপটিও যেমন, সলুইটিও তেমনি

তাহারা যখন যজ্ঞরক্ষার ভার তাঁহার উপর দিল, তিনি তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, "রথ আন" তখনই যাইতে প্রস্তুত। রাজা গেলে ঋষিদের কাজ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তখন সদস্তেরা অনুমতি করিলে রাজা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া যজ্ঞশালা হইতে বাহিরে আসিলেন। আবার সন্ধ্যার সময় যজ্ঞ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই রাক্ষসেরা যজ্ঞবিঘ্ন করিতে আসিল। আবার রাজার ডাক পড়িল। এইরূপে রাজা যজ্ঞরক্ষার জন্ত দিন-রাত খাটিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সব কাজ শেষ হইলে পর, তিনি নগরগমনের অনুমতি পাইলেন।

রাজধানীতে পঁহুছিবার কিছু দিন পরে একদিন রাজা বিচারের ও রাজ্যের সব কাজ সারিয়া একটু বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বুড়া কঞ্চুকী আসিয়া খবর দিল, কণ্বের কতকগুলি শিষ্য আসিয়াছেন; খবর দিতে বৃদ্ধের মন সরে না। অনেক খাটুনির পর একটু আরাম করেন, আজ আবার তাও হবে না। বৃদ্ধ একটু চঞ্চল হইল; তবে কাজ না করিলেও নয়। বিশেষ ঋষিদের কাজ, সকলের আগে। কঞ্চুকী খবর দিল। রাজার বিরক্তি নাই, অমনি বলিলেন, "কণ্বের শিষ্যেরা আসিয়াছেন, আচ্ছা, তাঁহাদের অভ্যর্থনা ত আমাদের দিয়া হইবে না। পুরোহিত ঠাকুরকে বল, তিনি যেন শ্রৌতসূত্রে যেরূপ বিধি আছে, সেইমত তাঁহাদের সৎকার করিয়া নিজেই তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। আর আমাকেও অগ্নিশরণে লইয়া চল।" ঋষি-তপস্বীদের সঙ্গে দেখা করার মত পবিত্র জায়গা—অগ্নিশরণই। সে জায়গাটি অতি পবিত্র। এইমাত্র ঝাড়ু দেওয়া হইয়াছে, নিকটেই হোমধেনু। রাজা বারান্দায় বসিলেন। পুরোহিত রাজাকে দেখাইয়া ঋষিদের বলিলেন, "এই দেখুন, যিনি পৃথিবীর অধীশ্বর, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিপালক, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া আপনাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।" শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতমী ও শকুন্তলার সঙ্গে রাজার যে কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শার্ঙ্গরব ত বড়ই কড়া কড়া কথা কহিতে লাগিলেন। রাজা কিন্তু বিরক্ত হইয়াও বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহাকে দস্যু বলা হইল, তাঁহাকে নিপাত দেওয়া হইল; কিন্তু রাজা অটল অচল। তিনি সব কথারই জবাব দিলেন, কিন্তু স্থিরভাবে—ধীরভাবে। তিনি কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না, শকুন্তলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। শকুন্তলা সব কথা মনে করাইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু শাপ হইতেছে "তুমি বুঝাইয়া দিলেও তিনি মনে করিয়া উঠিতে পারিবেন না," তখন শকুন্তলার সব চেষ্টা বিফল হইল। রাজা শাপের জন্ত মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল; তাহাতে তিনি শেষ মনে করিলেন, "হবেও বা।"

কণ্বের তপোবন ছাড়িয়া, ভারত ছাড়িয়া স্বর্গের পথে হেমকূট গিরি। তাহার

চূড়াগুলি সোনার। পর্ব্বতটি পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিম-সমুদ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমাদের সন্ধ্যার সময় যেমন সোণালি রঙের মেঘ দেখা যায়, পর্ব্বতটি আগাগোড়া তাই। যেন সোনার রস ঢালিয়া দিতেছে। ভারতবর্ষের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ, তাহারও উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষ, এটি তাহারই বর্ষ-পর্ব্বত; এখানটি তপস্যার সিদ্ধক্ষেত্র। এখানে তপস্যা করিলে সিদ্ধি হইবেই হইবে। এখানে মরীচির পুত্র কশ্যপের আশ্রম, মরীচি ব্রহ্মার মানস-পুত্র, তাঁহার পুত্র কশ্যপ। তিনি সুর, অসুর, গরুড়, নাগ প্রভৃতি প্রাণী সকলেরই পিতা। রাজা শুনিয়াই বলিলেন, "বটে, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে হইবে।" রথ থামিল, চাকার শব্দ হইল না; ধুলা উড়িল না, মাটী স্পর্শ করিল না। রথ নামিলেও নামিল বলিয়া বোধ হইল না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মারীচের আশ্রম কোন্ দিকে?" মাতলি হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া ঐ যে গাছের গুঁড়ির মত অচল মুনি তপস্যা করিতেছেন, ঐ দিকে—দেখ, মুনির দেহ অর্দ্ধেকটি উইয়ের ঢিপিতে ডুবিয়া আছে। কত সাপের খোলস উঁহার বুকে জড়াইয়া আছে, কত পুরাণ লতা উঁহার গলায় জড়াইয়া আঁটিয়া গিয়াছে। কাঁধের উপর জটা পড়িয়াছে। তাহাতে পাখীরা বাসা করিয়াছে।" রাজা দেখিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কি কঠোর তপস্যা!!! রাজা আবার বলিলেন, "এখানকার তপোবন দেখিতেছি আশ্চর্য্য! এখানে কত কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, যাহাই চায়, তাহাই পায়, তথাপি লোকে বায়ু ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। সোনার পদ্ম ফুটিয়া আছে, তাহার ফুলের ধূলায় জল হলুদ হইয়া গিয়াছে, সেই জলে ইঁহাদের পূজাপাঠ হয়। রত্ন-শিলাতলে বসিয়া ইঁহারা ধ্যান করিতেছেন। অপ্সরাদের সম্মুখে বসিয়া সংযম করিতেছেন। আমাদের মুনিরা যাহা পাইবার জন্ত তপস্যা করেন, সেই সব পাইয়াও ইঁহারা তপস্যা ছাড়িতেছেন না।" মাতলি বলিলেন, "লোকের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে উঁচার দিকেই উঠে। অহে বৃদ্ধ শাকল্য! মারীচ মুনি এখন কি করিতেছেন?" "দাক্ষায়ণী তাঁহাকে পতিব্রতা-ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর তিনি সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতেছেন।" রাজা বলিলেন, "তবে ত তাঁহার অবকাশের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।" আমাদের কর্ত্তাদের মত রাজা ব্যস্ত হইলেন না। বলিলেন না, "তবে আজ থাক, আর এক সময় দেখা পাইব।" মাতলি বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি তাঁহার ফুরসত দেখিয়া খবর দিই।"

ইতিমধ্যে রাজার সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আলাপ হইল, শকুন্তলার সঙ্গে আলাপ হইল। রাজা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন। ক্ষমা চাহিলেন। শকুন্তলার সঙ্গে তাঁহার মিলন হইল। তাহার পর মাতলি আসিয়া তাঁহাকে প্রজাপতির কাছে লইয়া গেলেন রাজাও, শকুন্তলা ও সর্ব্বদমনকে সঙ্গে লইলেন।

প্রজাপতি কশ্যপ দূর হইতে রাজাকে দেখিয়া দাক্ষায়ণীকে বলিলেন, "ঐ দেখ, রাজা দুষ্মন্ত পৃথিবীর রাজা, তোমার পুত্রের প্রধান সহায়, অসুর যুদ্ধে ইনি ইন্দ্রের আগে আগে গিয়া অসুর নাশ করেন। ইন্দ্রের শত্রু বধ ইহাঁর হাতেই হয়। তাঁহার বজ্র এখন আভরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার আকার তেজ দেখিয়া সেটি আমি বেশ বুঝিয়াছি।" মাতলি বলিলেন, "মহারাজ! ঐ দেখুন, দেবতাদের পিতা-মাতা আপনাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহচক্ষে দেখিতেছেন। উহাঁদের নিকট যাও।"

রাজা বলিলেন, "মুনিরা যাঁহাদের দ্বাদশ আদিত্যের জনক-জননী বলেন, যাঁহারা যজ্ঞভাগেশ্বর ইন্দ্রের পিতা ও মাতা; পরম পুরুষ যে দম্পতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাঁরাই কি তাঁহারা? দক্ষ ও মরীচি ইহাঁদের উৎপত্তিস্থান। ইহাঁরা ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে কেবল এক পুরুষ মাত্র অন্তর।" তিনি আগু বাড়াইয়া গিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রের দাস আপনাদিগকে নমস্কার করিতেছেন।" দুজনেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। শকুন্তলাও তাঁহাদের পাদবন্দনা করিলেন। মরীচি আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমার স্বামী ইন্দ্রের সমান, তোমার পুত্র জয়ন্তের সমান, তোমায় আর কি আশীর্ব্বাদ করিব, তুমি শচীর সমান হও।" দাক্ষায়ণীও শকুন্তলাকে "পতিসোহাগিনী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ছেলেটিকেও 'রাজচক্রবর্ত্তী হউক' বলিয়া দুজনেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করি; কিন্তু ইনি যখন আমার কাছে আসিলেন, আমি কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না যে, ইহাঁকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম; সুতরাং ইহাঁকে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কণ্বমুনির কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধী হইলাম। তাহার পর আংটী দেখিয়া আমার সব কথা মনে হইল। কেন এরূপ হইল, বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন মরীচি বলিয়া দিলেন, "আমি ধ্যানে জানিয়াছি, দুর্ব্বাসার শাপই ইহার কারণ।" তখন শকুন্তলা ভারী খুসী যে, রাজা তাঁহাকে অকারণে তাড়াইয়া দেন নাই। কিন্তু শাপের কথা তিনি ত জানিতেন না, কখনও শুনেনও নাই, তবে সখীরা তাঁহাকে আংটীটা রাজাকে দেখাইবার জন্য বড় জেদ করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি অনুমান করিলেন—শাপ হইয়াছিল। তখন মারীচ বলিলেন, "শোন মা, তোমার যে অদৃষ্টে দুঃখ হইয়াছে, তাহার কারণ শাপ, সেই শাপে রাজার স্মরণশক্তির লোপ করিয়া দিয়াছিল। এখন শাপের অবসান হইয়াছে। এখন স্বামীর উপর তোমার খুব প্রভুত্ব হইবে। দেখ, আরসীতে যতক্ষণ মলা থাকে, তখন ছায়া তাহাতে খেলিতে পারে না। পরিষ্কার আরসীতে খুব খেলে।"

শকুন্তলায় ব্রাহ্মণের প্রভাব অসীম। এক ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার শাপে অপ্সরার মেয়ে বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলার কত কষ্ট। তপোবন হইতে বিদায়, রাজার নিকট তাড়না, বিজনে অনাথিনীর মত থাকা। সবই ত সেই দুর্ব্বাসার শাপে। আবার অন্যদিকে

দেখ, প্রথমেই রাজা হরিণমায়া বন্ধ করিতেই তপস্বীরা আশীর্ব্বাদ করিল, তোমার পুত্র হউক, সে চক্রবর্ত্তী রাজা হউক। সেই আশীর্ব্বাদ সর্ব্বত্র—কণ্বমুনিও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন। পুরোহিত ঠাকুরও সেই কথাই বলিলেন। মারীচও সেই কথাই বলিলেন। চক্রবর্ত্তী ত যে সে লোক হইতে পারে না। রাজার ছেলেটির সংস্কার করিল কে? স্বয়ং মারীচ—ব্রহ্মার নাতি। সে ছেলে যে চক্রবর্ত্তী হইবে, তাহার আবার কথা! ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে নাটক আরম্ভ, আশীর্ব্বাদ ফলিল, নাটকও শেষ হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মেলার পথে

একদিন ছুটোছুটি চাই। বাড়ীতে মন কুলোয় না, ছেলেদের পরিব্রাজক চিত্ত বাইরের বাগানের লোভে চঞ্চল। একটা দিন ঠিক ক'রে, সাথী ও গাইড যাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের বাগান খুঁজ্‌তে বের হয়ে পড়্‌ল। বৈচিত্র্যের জন্ত প্রতিবেশী বন্ধুগৃহ থেকে তিন চারটি সম-অসমবয়সী বালকবালিকাকেও তুলে নিলে। অতঃপর কোচম্যানকে আদেশ হ'ল—"নহরের ধারে চল।"

ঠাণ্ডি সড়ক ছাড়িয়ে, গবর্ণমেণ্ট হাউস ছাড়িয়ে, চীফস্‌ কলেজ ছাড়িয়ে সহরের বাইরে অনে—ক দূরে নহর, অর্থাৎ র‍্যাবির খাল। পুলের দুই প্রান্ত বেয়ে দুটি ছবির মত পথ, মধ্যিখানে জল। পথ দুটির দুপাশে বন, জঙ্গল ও বাগান। বাঁ-হাতি পথে গাড়ী ঘুর্‌ল। এই দিকে একটা কৃত্রিম জলপ্রপাত আছে। ইটের একটা উচ্চ প্রাচীর থেকে জল একেবারে অনেকটা নিম্নভূমিতে ফেনায়িত হয়ে, কণিকা ছিটিয়ে সশব্দে লাফিয়ে পড়্‌ছে। সেই প্রপাতের ধারে আড্ডা পাতার মতলব ছিল। কিন্তু খানিকটা সেখানে ব'সে দেখা গেল, জায়গাটা অনাবৃত হওয়ায় মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তেজ সেখানে এত প্রচণ্ড যে, জলপ্রপাতের সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যে পেট ভরাবার ইচ্ছে থাক্‌লেও রৌদ্রতাপটা মাথাটি বরদাস্ত কর্‌বে না। তাই রূপগানের মোহ ছেড়ে উঠে কখনও এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে হঠাৎ একটা তুঁতবাগান নজরে প'ড়ে গেল। এতক্ষণে অনির্দ্দিষ্ট মধ্যাহ্নপ্রয়াণ সার্থক হ'ল। সবাই যেমনটি চেয়েছিল, তেমনটি পাওয়া গেল। তুঁততলার ছায়ায় বেছে বেছে পরিষ্কার জায়গা দে'খে সতরঞ্চি বিছান হ'ল।

বাগানটা আবিষ্কার ক'রে সেখানে থিতিয়ে ব'সে মনিবজাতির আনন্দ ত আছেই, তারা বাইরেকে ভালবাস্‌তেই আজ বাইরে বেড়িয়েছে—কিন্তু ভৃত্যকুলের জীবাত্মাও এই জায়গায় এসে মহাপ্রসন্নতা প্রাপ্ত হ'ল। রাস্তার উপর গাড়ী খুলে দিয়ে সইসরা তুঁতবাগানে আমাদের কাছাকাছিই লাগাম ধ'রে ঘোড়া চরাতে প্রবৃত্ত হ'ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা বিভিন্ন বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকারের তুঁত আস্বাদনে ব্যাপৃত রইল। অপর ভৃত্যটি টিফিনবাস্কেট থেকে খাদ্য-পেয়গুলি নামিয়ে গুছিয়ে পাছিয়ে যথাস্থানে রেখে ছেলেদের দলে খেলায় ভিড়ে গেল। তুঁত-লোফালুফি, ছুটাছুটি, ঢিবির আড়ালে লুকোচুরি চল্‌তে লাগ্‌ল।

একটি ছোট খোকার কিন্তু দৌড়াদৌড়ির চেয়ে অশ্বজাতির প্রতি বেশীরকম অনুরাগ ব্যক্ত হ'ল। যেখানে ঘোড়ারা, সেইখানে তিনি অতি আগ্রহ সহকারে তাদের নানাবিধ উদ্ভিজ্জচর্ব্বণ-কার্য্যে নিবদ্ধদৃষ্টি। একবার দৌড়ে এসে তিনি দিদিদের জ্ঞাপন ক'রে গেলেন—ঘোড়ারা পিক্‌নিক্ করছে।

দিদিরা কেউ গল্পের বই পড়্‌ছেন, কেউ চুপচাপ ব'সে আছেন। গাছের পিঠে ঠেসান দিয়ে, পা ছড়িয়ে, হাতে খাতা-পেন্‌সিল নিয়ে আমি আমাদের চৌহদ্দীটা একবার দেখ্‌তে লাগ্‌লুম।

ডাইনে পথ, পথের নীচে নহরের জল দৃষ্টির অন্তর্হিত। বাঁয়ে তুঁত-বাগানের ও পাশে সুদূর-বিস্তৃত মাঠ। সম্মুখদিকে মাঠের এক কোণে ছাউনি ষ্টেসনের ছুটো একটা নূতন বিল্‌ডিং। অখণ্ড আকাশ সেইখানটাতে টেলিগ্রাফের তার ও লম্বা লম্বা পোলে খণ্ডিত হয়ে রয়েছে। আর সেই দিক্‌পানেই একেবারে দিগন্তে নীচু জমির ভিতর ব'সে যাওয়া একটা বাদশাহী ইমারতের সাদা গম্বুজ তার গোলমাথাখানা বের ক'রে সমস্ত দৃশ্য ও কালকে লাহোরী বিশেষত্ব প্রদান করছে।

এ বাগানটা পড়েছে ছুটো রেল লাইনের মাঝে। দুধার দিয়ে কখনো সাম্‌নে, কখনো পিছনে ক্রমাগত ট্রেণ আনাগোনা করছে। রেলের বাঁশী বাজ্‌ছে, ধোঁয়া উড়্‌ছে, সারিবদ্ধ রেলগাড়ী যাত্রিসমেত এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, ছেলেরা তাই দেখ্‌তে ছুট্‌ছে। আমার মন কিন্তু ঐ গোলাকার বামন গম্বুজটার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে—কে যেন জোর ক'রে আমার চোখ সেই দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা আবার বসেছি আজ মেলার পথে। আজ পুরোণ শালেমারে, বাদশা শাজাহানের বাগানে চিরাগের মেলা। শালেমার এখান থেকে আর মিনিট দশেক দূরে। মেলা ব'লে আজ গাড়ীশুদ্ধ যাত্রী ক্রমাগত এই পথে আনাগোনা ক'রছে। গাড়ীও আজ নূতন রকমের,—বৈলী, অর্থাৎ টম্‌টমে ঘোড়ার জায়গায় বলদ জোড়া। এক এক গাড়ীতে প্রায় ১৫।২০ জন লোক। ছেলে বুড়ো সবাই নানা রঙের ও নানা কাজ-করা কোর্ট, ফতুই ও পাগ্‌ড়ীপরা। সাম্‌নের গম্বুজখানার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজ তারা চলেছে শাজাহান বাদশার বাগানে চিরাগের মেলার বাহার বাড়াতে।

রেলের বিল্ডিং ও তার পার্শ্ববর্ত্তী রেলওয়ে কারখানার চিম্‌নী যে নজরে পড়্‌ছে, সেগুলো জীবনের আধুনিকতা ও সাধারণত্বের সঙ্গে এমনি মিলে যাচ্ছে যে, তার বাস্তবত্ব বিষয়ে কোন কথাই মনে উঠ্‌ছে না। কিন্তু যখনই তার কিছু ব্যবধানে অবস্থিত, খাইয়ের ভিতর ডুব দেওয়া সাদা মোটা গম্বুজ পার্শ্ববর্ত্তী ছুটো সরু মিনার সমেত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, একটা কি রকম অবাস্তব ভুতুড়ে ভাব মনে নিয়ে আসছে। এর

সম্বন্ধে একটা কি রকম প্রতিবাদ মনে উঠ্‌ছে, এ গম্বুজ এখনও আছে, সেটা আশ্চর্য্য। এ ছিল, এ কথাটা সত্য ব'লে মান্‌তে তিলমাত্র আপত্তি হয় না, কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ সত্ত্বেও আছে এ যে, তা অবিশ্বাস্য ঠেকে। অন্ততঃ আছে যদি ত তার থাকা উচিত ছিল না—এই শালেমার বাগানেরই মত, এই মেলার যাত্রীদের মত, তাদের বাহনের মত, এই লাহোর সহরেরই মত। যারা আধুনিক নয়, তারা অধুনায় কেমন ক'রে থাকতে পারে? আর থাকে বা কেন?

ঐ গম্বুজের ভিতরটায় কতখানি ফাঁপা জায়গায় কত প্রতিধ্বনির গুঞ্জন রয়েছে, ওর নীচে কতগুলো কবরে না জানি কত শবদেহ।

(এন্‌-ডব্লিউ-আর এর মোটর-বাস্‌ মেলায় লোক নিয়ে গেল।)

কিয়ামতের জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে—কিংবা ছিল, কেননা, এখন আর সে সব দেহ নেই, মৃত্তিকাস্তূপ মাত্র রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রেতাত্মা ত সেইখানেই কয়েদী রয়েছে?

(একটা জঙ্গলে খরগোস দৌড়ে গেল, ছেলেরা পিছনে পিছনে ধাবমান। রেলের আওয়াজ, আবার একটা ট্রেণ আস্‌ছে। ছেলেদের এক পা খরগোসের দিকে, আর এক পা রেলের দিকে।)

অলজ্যান্ত বর্ত্তমান ছেড়ে গম্বুজটা আমায় ক্রমাগতই অতীতের দিকে টান্‌ছে!

(বাইসিক্ল রেস ক'রে কতিপয় ছাত্র চলেছে। কোন কোন মেলা-ফেরতার হাতে নতুন মাটীর ঘড়া ও হাঁড়ী।)

কিন্তু তাতে অশোয়াস্তি কিসের? ভূতের ভয় বোধ হয় এই যে, যদি সে ঘাড় মটকায়। কিন্তু ভূতকাল ত আর ঘাড়ে চাপে না, সে ত কিছু ভয় দেখায় না, তার নিদর্শনরূপী ঐ ভূতুড়ে গম্বুজেরা ত কিছু চায় না! চায় না কি? চায় যেন কিছু! কি যেন চাচ্ছে, কি যেন দাবী কর্‌ছে! সমস্ত অতীতের ইতিহাস জ্ঞান নয় ত? সুজা শাজাহান জাহাঙ্গীর ঔরঙ্গজেবের আদ্যোপান্ত ইতিহাস কণ্ঠস্থ করা নয় ত?

(একদল ভাব্‌ড়া ও ভাবড়ানী। একটা সাপুড়ে বাজনা বাজিয়ে আবীরে মুখ লাল ক'রে ফির্‌ছে।)

নুরজাহানের রূপ ও বুদ্ধির পায়ে প্রণতি, শাজাহানের পত্নীপ্রেমে বাহবা, মোগলরাজশ্রেণী বাবরের দুর্দ্দম্য নবদেশজয়ের অভিলাষে বিস্ময় প্রকাশ—এ সকলই এ গম্বুজটা চায় বুঝি! না:—শুধু তাই নয়, শুধু তাই নয়। ইতিহাস কণ্ঠস্থের দুরূহতা ছাড়া

আরও কিছু এই গম্বুজের গোল আকারে চক্রাঘিত রয়েছে মনে হয়,—তার অন্তর গোলা থেকে ফুটে বেরোতে চায় যেন কি জানি কেন একটা হাহাকার!

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

আমি গাছে পিঠ দিয়ে গম্বুজের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। হঠাৎ পিছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে মনে হ'ল। চম্‌কে ফিরে দেখি, কালো আলখাল্লা-পরা এক মুসলমান ফকির। তার চেহারায় ভীতিজনক কিছু ছিল না, তবু এদিক্ ওদিক্ দেখ্‌তে লাগ্‌লুম চাকররা কোথা? কেউ কোথাও নেই। ঘোড়াদ্বয়-সমেত সইস-কোচম্যান, ছেলেদের সহ ভৃত্য, খোকাসহ ঝিঝিয়া সকলেই অন্তর্ধান। দূর থেকে তাদের কলরব কানে আস্‌ছে, কিন্তু আমি ডাক্‌লে আমার গলার স্বর তাদের কানে পৌঁছিবে না বুঝ্‌লুম। এই সময় একদল পুরবিয়া পথ দিয়ে গাইতে গাইতে আকাশ কাটিয়ে গেল। সাহস ফিরে পেলুম, হাত্‌-ব্যাগ খুলে পয়সা বের ক'রে ফকিরকে দিতে গেলুম। সে মাথা নাড়্‌লে, তার মুখে একটি সৌম্য বিষাদের ছায়া, তার দৃষ্টি যেন কতদূর সুদূরে প্রসারিত! আঙুল দিয়ে গম্বুজের দিকে ইসারা কর্‌লে।

সে দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি, গম্বুজ আর ডোবার ভিতর বসা নয়, আকাশে মাথা তুলে রয়েছে। প্রকাণ্ড বড় মক্‌বরা, দুই পাশে দুই বড় বড় ফাটক। হঠাৎ খটাখট্ খটাখট্ খটাখট্ শব্দ হ'তে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের সাম্‌নে এক ঘোড়সোয়ার পল্টন দুই ফাটক ঘিরে দাঁড়ালে। কিন্তু এ রকমের পল্টন আগে কখন দেখিনি। তাদের পোষাক এ কালের নয়, বাদশাহী আমলের। আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম।

মক্‌বরার ভিতরে নজর চ'লে গেল। দেখি, রেশমী কাপড়ে ঢাকা কবরের সাম্‌নে ব'সে একজন যুবক হাফেজ কোরাণ আবৃত্তি কর্‌ছে। একটা কোণে একটু উস্‌খুস্ শব্দ হ'ল। বিনাপুস্তকে আস্ত কোরাণপারক চোখ তুলে দেখে, এক অন্ধকার কোণে ভয়ভীতা অশ্রুভারলোচনা একটি পরমাসুন্দরী হিন্দু বালিকা একখানি মাণিকের মত জল্‌ছে। বয়স তের চোদ্দের বেশী নয়। তার ইতিহাসটুকু বুঝ্‌তে বিলম্ব হ'ল না। নবাবের সিপাহীরা তাকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম থেকে নবাব-অন্তঃপুরে ভর্ত্তি করার জন্যে নিতে এসেছিল। সে কোন রকমে পালিয়ে এইখানে আশ্রয় নিয়েছে। একজন সিপাই তাকে এই দিকে পালাতে দেখেছিল। তার কথায় সিপাই-সলার পল্টন দিয়ে মক্‌বরা ঘিরেছে।

হাফেজ যখন তাকে দেখ্‌তে পেলে, বালিকা শ্বেতকমলের মত হাত দুটি জুড়ে নীরবে তার কাছে শরণ প্রার্থনা কর্‌লে। বিধর্ম্মীর বুকের ভিতর একটা লহরী বয়ে গেল।

বালিকাকে ইসারায় অভয়দান ক'রে সে উঠে দাঁড়াল। ভিতরে প্রবেশমান দুইজন সিপাহীর পায়ের শব্দ এসেছিল। কারুকার্য্য-খচিত দরজার ধারে এসে,একরকমে দরজা রুখে, হাফেজ আগন্তুক সিপাহীদের অভিবাদন করলেন—"সেলাম আলেকোম।"

তারা প্রত্যভিবাদন ক'রে জিজ্ঞেস করলে, "এখানে কোন হিন্দু-বালিকা ত আসে নি?

"না"।

"নবাবের শীকার, তাঁর হারেমের জন্ম অভিপ্রেত। রঘুবংশপুর গাঁয়ের ভাগামল ক্ষত্রিয়ের মেয়ে। ভারী রূপসী। তার বাপ ভাই কোতল হয়েছে। বাড়ীটাতে আগুন লাগিয়ে এসেছি। কিন্তু আসল শীকারই হাতছাড়া। এই দিক্‌টাতে পালিয়ে ছিল। গেল কোথায়? ভিতরে কোন রকমে ঘুঁসে লুকিয়ে নেই ত? না, তা হ'লে আপনার চোখ এড়াত না। চল্ চল্ ভাই, উত্তরে যাওয়া যাক্—দুকোশ আগে একটা মস্ত আমবাগান আছে, হয় ত তারি মধ্যে লুকিয়ে আছে। খোদা হাফেজ।" "খোদা হাফেজ।"

পল্টন ফিরে গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোড়াদের খুরের শব্দ সম্পূর্ণ রকম মিলিয়ে না গেল, দেখলুম, হাফেজ দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। শেষ প্রতিধ্বনিটুকুও লয় পেলে কবরের কাছে ফিরে এসে বালিকাকে ডাক্‌লে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বালিকা বেরিয়ে এল। "কে তুমি?" "চাঁদকৌর!" চন্দ্রকুমারীই বটে! চাঁদের দেশ থেকেই নেমে এসেছে।

"তোমার আপনার লোক কোথায় আছে? কার কাছে যাবে?"

সবে মাত্র এই কথাটি জিজ্ঞেস করেছে, এমন সময় কবরের পাশে একটা ছায়া পড়্‌ল; যুবক হাফেজ চম্‌কিয়ে উঠে দেখে, তার ওস্তাদ বৃদ্ধ মুল্লা। মকবরার পরিরক্ষক, তার কথা ভুলে গিয়েছিল। এই তার আসার সময়। বৃদ্ধের ভ্রূ বিষম কুঞ্চিত।

অতি ক্রুদ্ধ কর্কশস্বরে বল্‌লে—"নবাবের সিপাইদের মিথ্যে ব'লে ফিরিয়ে দিয়েছ? এই কাফের মেয়েকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ?"

যুবক মাথা নীচু ক'রে রৈল। মুল্লা বালিকার দিকে চেয়ে বল্‌লে—"চল্ আমার সঙ্গে।"

বালিকা তার শরণদাতার দিকে কাতরনয়নে চাইলে। হাফেজ বৃদ্ধকে বল্‌লে, "একে আমার ভিক্ষা দিন।"

"তুমি একে নিকা কর্‌বে?"

"না। এর আত্মীয়দের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌ব।"

"বেইমান্! বদ্‌খৎ!

রোষে হতজ্ঞান উন্মত্তবৎ বৃদ্ধ কোমর থেকে খঞ্জর উঠিয়ে হাফেজের দিকে লক্ষ্য করলে। বালিকা চীৎকার ক'রে শরণদাতাকে বাঁচাতে গেল। প্রথম কোপ তার কণ্ঠের শিরায় পড়্‌ল। দ্বিতীয় কোপ হাফেজের বুকে ব'সে গেল। খঞ্জরের ঝক্‌ঝকে মুখ পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

* * * * *

ছেলেরা সব আমায় ঘিরে রয়েছে, বাড়ী যাবার জন্যে ব্যস্ত, সারাদিন খে'লে শ্রান্ত।

সে ফকীর নেই। মকবরাও নেই। মাটীর ভিতর ডোবা সাদা বেঁটে গম্বুজ তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে যেন বল্লে—"খোদা হাফেজ"। আপনা হ'তে আমারও মুখ দিয়ে যেন কার উদ্দেশ্যে বেরোল—"খোদা হাফেজ" (ঈশ্বর তোমার সহায় হোন্)

ছেলেরা হেসে উঠ্‌ল।

"কি মা, কি বলছ ?"

"আল্লা আল্লা
খয়ের সল্লা ?"

হাস্‌তে হাস্‌তে গোলমাল কর্‌তে কর্‌তে সকলে গাড়ীতে উঠ্‌ল। তখন সূর্য্য গম্বুজের পিছনে অস্ত যাচ্ছে। গম্বুজের তলায় যে রক্তের ফোয়ারা ছোটা দেখেছিলুম, সেইটে যেন সূর্য্যের চারপাশে আকাশে ছড়িয়ে গেছে।

শ্রীসরলা দেবী।

মডেল নায়িকা

"চরিত্রহীনা,"* ।—

কি, না ?

ভাই সরোজিনি—

(১)

তোমাকে ত আমার সব কথা না বল্‌লেই নয়। বল্‌তেই হবে। একদিন যখন প্রথমবার বিধবা হয়েছিলুম, তখন 'লজ্জা-সরমের সমস্ত জঞ্জাল জলাঞ্জলি' দিয়ে, তাঁর পায়ে আমার সমস্ত মর্ম্মব্যথা জানিয়েছিলুম। তিনি কি ভাবে তা নিয়েছিলেন, জানি না। তুমিও আজ কি ভাবে নেবে, তা জানি না। কিন্তু বলে ত আমার অধিকার নাই, তাই শুধু আমার সব কথা আজ তোমায় জানিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চাই। তোমাকে জানাবার তিনটি কারণ আছে, বোন্। প্রথম কারণ, না জানালে হয় ত আবার আমি পাগল হয়ে যাব। দ্বিতীয় কারণ, সংসারে ত আমার কেউ নেই, অথচ তোমাকে সব কথা না ব'লে, কোন্ মুখে তোমাদের কাছে থেকে আমি এমনিতর হাত পেতে নেব ? তৃতীয় কারণ, তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কি, তা তোমার আমার কাছ থেকেই জেনে রাখা ভাল। কেননা, লোকের কথা, আগে যাই মনে করি না কেন, এখন আর কিসের জোরে ঠেল্‌বো ? আর লোকে জান ত ভাই, সত্যি মিথ্যে কত কথাই বলে। একদিন ছিল,—যাক্। আজ ত আর তা নাই। রূপের মধুচক্র ভেঙ্গে গেলে, মেয়েমানুষের কি থাকে, বল ? রাগ করো না, বোন্। যদি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মে থাক,—তুমিও একদিন বুঝ্‌বে। আজো পর্য্যন্ত কোন মেয়েমানুষ জন্মে,—তা না বুঝে মরে নি।

(২)

আমার বাপ মা কে ছিল, তা জানি না। পরের ঘরে মানুষ হয়েছি। তার পর হঠাৎ একদিন সানাই বেজে উঠ্‌ল, শাঁখা, সিঁদুর, চেলি প'রে, আমি শাশুড়ী আর স্বামীর ঘর

---

* এই ("—") চিহ্নিত উদ্ধৃত বাক্যগুলি লেখকের নহে, গ্রন্থকারের।

সম্পাদক।

কর্‌তে এলুম। শাশুড়ী আমায় কি রকম আদর কর্‌তো, জান? যদি পান থেকে চুণটি খস্‌তো,—তা হ'লে উনুন থেকে জলন্ত কাঠ তুলে এনে, আমার পিঠে ঠুকে দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন যে, এ গেরস্থালীতে এমনতর কাজের অনিয়ম চল্‌বে না। স্বামী? আহা, বেচারী! তিনি ছিলেন স্কুলপড়ুয়ে মাষ্টার গো। দিনে ঠেঙাতেন স্কুলের ছেলেদের, আর রাত্রে, পোড়া কপাল আমার,—আমায় নিয়ে বস্‌তেন যাজ্ঞবল্ক্য আর মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাতে।

রূপ? তা আমার ছিল। হ্যাঁ, বল্‌তে পারি, এমনি রূপই আমার ছিল। সতীশ ঠাকুরপো তা দেখেছে। না গো আর কিছু নয়। চম্‌কিও না যেন। তাই জন্তেই ত তোমায় সব কথা আজ খুলে বল্‌তে বসেছি। সেই রূপ নিয়ে তখন আমি ভরা যৌবনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আর স্বামী আমায় মৈত্রেয়ী ভেবে, যম—নচিকেতার উপাখ্যান বোঝাবার জন্ম কোমর বেঁধেছেন। উঃ—সেও এক দিন গেছে।

(৩)

তার পর আমার স্বামী রোগে পড়্‌লেন। সেই রোগই তাঁর কাল হলো। তিনি ম'রে বাঁচ্‌লেন। আর আমি বেঁচে মর্‌লুম, কি, কি হলুম—আজো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আমরা গরীব মানুষ ছিলুম গো, তাই ডাক্তার আর চিকিৎসার সব ভার ত বইতে পার্‌তুম না। ভাঙ্গা হ'লেও একটা বাড়ী আমাদের ছিল, তা ছিল! আর আমার গহনা? হ্যাঁ, তাও ছিল। তবু ঐ অনঙ্গ ডাক্তারই শেষাশেষি খালি চিকিৎসা নয়, আমাদের সংসার-খরচেরও প্রায় আর্দ্ধেকটা বহন কর্‌তো। কেন? তাও বল্‌ছি। বল্‌তে যখন বসেছি, তখন বল্‌বই। "ঢেকে ঢেকে, বুঝে সমঝে, সাজিয়ে বাঁচিয়ে" বল্‌বার যখন দরকার ছিল, তখনি বলি নাই, এখন ত আমি সব দরকারের বাহিরে। এখন আর কি আসে যায়!

বলেছি ত তোমায় বোন্‌, বিশ্বামিত্রের ধ্যানভাঙ্গা রূপ নিয়ে তখন আমার ভরা যৌবন। স্বামী ছিলেন বিশ্বামিত্রেরও বাড়া। বিদ্যাই ছিল তাঁর সব। স্ত্রীর রূপ-যৌবন—এ সবি ছিল তাঁর কাছে অ—বিদ্যা। একতিল ভালবাসাও তাঁর কাছে কোন দিন পাইনি। আর আমিও তাঁকে কোন দিন একতিল ভালবাসা দিইনি। পাইনি বলেই বোধ হয়, দিতে পারিনি। বিয়ে হয়েছিল, তার জন্ত স্বামি-স্ত্রী সম্পর্ক হয়েছিল! কিন্তু খালি বিয়ের ত ভালবাসা হয় না। তবে ভালবাসা না হ'লেই যে স্বামি-স্ত্রীতে ঘর করা চলে না, এমন ত নয়। আমি ত স্বামীর ঘর করেছি। করিনি তা ত নয়। আজকাল স্ত্রীতে স্বামীতে মাধুর্য্য হয় না, এমন কত দেখা যায়। তাই ব'লে কি তারা

গেরস্থালী ভাসিয়ে দেয়? তাই আমরা শাশুড়ী বৌ দোজনায় মিলে গেরস্থালী ঠিক রেখেছিলুম।

তবে, অনঙ্গ ডাক্তার—যা কিছু, সে ত পীড়িত স্বামীর মুখ চেয়েই। মাথার ওপর শাশুড়ী ছিলেন, তাঁর অজানাতে ত নয়। তাঁর সম্মতি নিয়েই। আর ভেবে দেখ বোন্, "কিসের তৃষ্ণায় মানুষ নর্দ্দমার গাঢ় কালো জলও অঞ্জলি ভরে মুখে দেয়, আমারও ছিল সেই পিপাসা। কিন্তু সে খবর পেলুম সেই * * গলায় ঢেলে দিয়ে। তার পর উঃ—সে কি গা বমি বমির দিন গুলিই কেটেছে। কিন্তু বমি ক'র্‌তেও পার্‌লুম না। শাশুড়ী আমার মুখ চেপে ধর্‌লেন। অনঙ্গ তখন সংসারের অর্দ্ধেক ভার নিয়েছিল।"

তাই ত বলি বোন, "হায় রে পোড়া কপাল, এ ঘরে স্বামী মর মর, আর ও ঘরে যেতুম ডাক্তারকে নিয়ে তার ভালবাসার সাধ মিটোতে।" কিন্তু বলেইছি ত, কি তৃষ্ণায় মানুষ নর্দ্দমার কালো জলও অঞ্জলি ভ'রে মুখে দেয়।

(৪)

তারপর এলেন উনি। ওঁর নাম ত আমি মুখে আন্‌তে পার্‌বো না, বোন্। কেননা বিবাহের স্বামী ছিলেন সমাজের দিক্ দিয়ে স্বামী। আর আমার অন্তর জেনেছে যে, উনিই আমার স্বামী। আমার অন্তর্যামী দেবতা যে এর সাক্ষী। সমাজ বাইরে থেকে দেখে, আর, বোন্, দেবতা যে অন্তরে থেকে দেখেন। কার দেখা বড়? কার সাক্ষী বড়? আমার ওপর আমার কোন্ স্বামীর অধিকার বড়? এ রহস্যের ব্যঞ্জনা ও বঞ্চনা থেকে আমায় বাঁচাবে কে?

পরের দিন অনঙ্গ ডাক্তার আবার এল। যেমন এসে এসে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সূর্য্য উদিত হ'লে কি অন্ধকার থাকে? ফিল্টারের জল পেলে কি আর নর্দ্দমার পচা জল মুখে রোচে? গঙ্গাজলের তুলনা দিলুম না, কেননা, তখন আমি গঙ্গাজলকে জল ব'লেই মানতুম, গঙ্গা ব'লে নয়। আমি ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠালুম;—যা বল্ গে যে, আজ আমার শরীর ভাল নাই,—আমি যেতে পার্‌বো না। তা কি সে শোনে, না যায়। আমি ও ঘর থেকে শুন্‌ছিলুম,—ঝি বল্‌ছিল, "ডাক্তার বাবু, আপনি বোঝ না কেন, আজ আপনি যাও।"

তার পর আর একদিন। ওঃ, সেই আমার অনঙ্গ ডাক্তারের হাত থেকে মুক্তির দিন। ডাক্তার কাঙালীপনা ছেড়ে জোর দেখাতে এসেছিল। কাকে? আমাকে? বলা বাহুল্য, যদিচ "আমি সতীত্ব-ধর্ম্মের সমস্ত মর্য্যাদা তখন সম্পূর্ণ বহন ক'রে চল্‌তুম না;" আর শাশুড়ীর একরকম সম্মতিতেই, তবুও বোন্, যদি সে রাত্রে আমার সতীত্ব-তেজ দেখ্‌তে। সন্দীপ ঠাকুরপো অথবা—বাবুকে বিমলা দিদি যে তেজে গহনা কিরিয়া

দিয়েছিল, আমার তেজ ও ঝাঁজ তার চেয়ে বেশী বই একরত্তিও কম ছিল না। আমি তেমনি তেজে,—চট্ ক'রে আর একটা ঘরে গিয়ে, গা থেকে সব গহনা খুলে, দু'পা দিয়ে ঠেলে ডাক্তারকে বল্লুম,—"যাও, নিয়ে যাও।" স্বামীর চিকিৎসা? কিন্তু সতীত্ব-তেজের কাছে স্বামীর চিকিৎসা কি? আর তখন ত উনি এসেছেন। শুনেছিলুম,—ওঁর কত টাকা!

(৫)

সমাজের দিক্ দিয়ে যে স্বামী, তিনি ত, কাজেই,—মারা গেলেন। যদিচ মরবার চার পাঁচ দিন আগে থেকেই, আমি তাঁকেও "ভালবাস্‌তে চেষ্টা করতে সুরু করে-ছিলাম।" কিন্তু তাতেও ত তাঁকে বাঁচিয়ে উঠাতে পারলুম না। আর অন্তর ও অন্তর্যামীর দিক্ দিয়ে যে উনি,—হায়, তাঁকেও আমি পেলুম কৈ? তাই ভাবি, ওগো, কেন দেখেছিলুম? যদি দেখেছিলুম, দেখা দিয়েছিল, তবে পেলুম না কেন? যদি পেলুম না, তবে মলুম না কেন? মিছে কেন আরাকানে গিয়ে দিবাকর ঠাকুরপোর লাথি খেয়ে,—পোড়া বদনামের ভাগী হলুম জনমের মত! কেন? কেন? কেন? আমি দর্শন-শাস্ত্র পড়েছিলাম,—তাই মনে হয়, ক্রম-উভিন্নশালী এই জীবনের গতি, কখন্ যে কোন্ দিকে ধাবিত হয়, তা কে বল্‌তে পারে? আর এর কোন অভিব্যক্তিই চরম নয়, যেহেতু, জীবন কোনখানে এসেই থামে না। কি যে আমার ধর্ম্ম, আর কি যে আমার অধর্ম্ম, তা কে গুণে ব'লে দিতে পারে?

(৬)

মুক্তি ত পেলুম ডাক্তারের হাত থেকে। কিন্তু মুক্তি ত নিরাবলম্ব নয়। আর কৈবল্যমুক্তি কিছু এ যুগের আদর্শও হ'তে পারে না। বন্ধনের পর বন্ধন, অর্থাৎ বহু—অসংখ্য—বন্ধন মাঝেই মুক্তির স্বাদকে লাভ করিতে হইবে।

সুতরাং এ মুক্তির পরে আবার আমি উন্নততর মুক্তির অপেক্ষায়, উন্নততর বন্ধনে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। সেই আমার উনি গো। তাঁরি কথাই ত বল্‌ছি।

শাশুড়ী? তিনি ত উপীন উপীন ব'লে পাগল। আমার হারাণও যে, উপীনও সে। বৌমা, তুমি ভিন্ন মনে করো না। চুল বাঁধ্‌তেও এত দেরী মানুষের হয় গা! চট্ ক'রে পাটা ধুয়ে এস না। এই উপীন এসে পড়্‌লো ব'লে। এস ত বৌমা, টিপ্‌টি পরিয়ে দিই। ও মা, ও কি গো, সেই জরিপেড়ে কাপড়খানা পর। আহা, উপীন, ওরা হ'লো কত বড় ঘরের ছেলে। এমনি ক'রে শাশুড়ী আর বৌ দোজনায় মিলে আমরা কত কষ্টে গেরস্থালী ঠিক রেখেছিলাম। আর পীড়িত স্বামীর মুখ চেয়েই। তা এত ক'রেও যখন স্বামীকে আমার বাঁচাতে পারলুম না, তখন এ ত্যাগের সার্থকতা কোথায়?

তখন ডাক্তার প্রেমিক আহত, মাষ্টার স্বামী সদ্যমৃত, আর উকীল উনি, যিনি আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা—আসন্ন বৈধব্যের সম্ভাবনাতেই যাহার প্রতি আমার চিত্ত,—এক অপূর্ব্ব নিষ্ঠার অঞ্জলি নিয়ে,—উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল;—সেই ঘোর বিপৎকালে আমাদের নিজের বাড়ীতে থেকেও, আমরা ওঁরি আশ্রয়েই বেঁচে গেলাম।

আমি জান্‌তুম, ওঁর সুরবালা আছে। জানি না, কেমন মন। তখন সবে কয়দিন মাত্র বিধবা হয়েছি। কিন্তু হ'লে কি হয়, হঠাৎ খেয়াল গেল একদিন সুরবালাকে দেখ্‌তে। তখুনি বিধবার পোষাকে সেজে চল্লুম ওঁর সঙ্গে। "সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশরাশি বিপর্য্যস্তভাবে মাথায় জড়ানো, দুই একটা চূর্ণ-কুন্তল কপালে মুখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষে শ্রান্ত উদাস দৃষ্টি। বৈধব্যের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়াছে।" আমার বৈধব্যের সৌন্দর্য্যে,—শুধু সুরবালা নয়, যদি ভুল না বুঝে থাকি,—তুমিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলে। এ আমার বড়াই করা কথা নয় বোন্‌—এ সত্যি। এ রূপের আঁচে, যে কাছে এসেছে, সেই তেতেছে, কেউ কম, কেউ বেশী। স্পষ্ট বলাই ভাল, তোমার স্বামীও একদিন বল্‌তে বাধ্য হয়েছিল যে, এমন রূপ পৃথিবীতে সে আর দেখে নাই।

আমি জানি, তুমি সুন্দরী। তবু বোন্‌, দেখিস্‌, যেন আমার কথায় ভুল বুঝে দুঃখ না পাস্‌।

(৭)

লাজ, মান, ভয় তিন থাক্‌তে নয়। আমার এ তিনের একটাও ত ছিল না কি না! তাই একদিন আমার উনিকে, উনুনের কাছে পীঁড়িতে বসিয়ে, গরম গরম লুচি খানকয় ভেজে পাতে দিয়ে, আমি আমার অন্তরের সব কথা ওঁকে জানালুম। কেননা, উনি যে অন্তরতম। আর অন্তর্যামী যিনি, তিনি যে সব নিজ চক্ষে দেখেছেন। তাঁর চক্ষুকে ত আর লুকান যায় না। উপনিষদে বলেছে,—হ্যাগো, আমি উপনিষদ্‌ও পড়েছিলাম,—যে, তাঁর সর্ব্বত্র চক্ষু, সর্ব্বত্র পা, সর্ব্বত্র হাত আর মুখ,—অথচ তিনি নিরাকার। থাক্‌ সে তত্ত্ব-কথা।

আমি যখন লুচি ভাজ্‌তে ভাজ্‌তে আত্ম-নিবেদন করেছিলুম,—তখন,—উঃ,—সে কি এক মুহূর্ত্ত,—কি তিক্তমধুর সুধাবিষে মিশে, ফেনিল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সেই মাধুর্য্যের রসোল্লাসে মনে হ'ল, সৃষ্টির দুকূল যেন ছাপিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু আমার অবস্থা তখন কিরূপ—যেমন 'সেঁাতের সেওলি'। তাঁকে বলেছিলুম,—বঁধু হে যদি তুমি আমার উপর নিদারুণ হও, তবে—

'মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।'

রমণীর রূপ কি দিয়েই যে বিধাতা তৈরী করেছিল। কত ছট্‌ফটানী। কিন্তু উঠে যেতে পার্‌লো কৈ? সত্য বিধবা আমি, অনঙ্গ ডাক্তার মুক্ত আমি, সেদিক্ দিয়েও যদি দেখ, আমার ওপর কারু অধিকার নাই। অথচ স্বেচ্ছায় আমি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করিলাম। এইখানেই ত স্বাধীনতা।" অর্থাৎ স্বেচ্ছায় অধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়, যাতে ক'রে সমাজভিত্তি খান খান হয়ে যায়। তিনি বল্লেন, উত্তম। আমার ভাই দিবাকর কলিকাতায় কলেজে পড়্‌বে এবং সে তোমার তত্বাবধা ই থাক্‌বে

(৮)

দিবাকর? ত হো'ক,—দিবাকরই সই! আমার সেই রূপ, আর ভরা যৌবন, আর মনের মাধুরী—এই তিনে মিশে, আমি যেন কোন্ স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটার জন্য শূন্য প্রেক্ষণে চেয়েছিলাম। বেচারী দিবাকর! একদিন,—তারি বুক ফাটে কি আমারি বুক ফাটে, অথচ কিছুই বলা হ'লো না। সে দিন সারা রাত তার সঙ্গে বসে গল্প ক'রে কাটাব, এই স্থির হ'লো।

এসে বসেছি। বস্‌তেই দিবাকর ঠাকুরপো বল্‌লো—"বেশ ত, বৌদি,—তুমি বুঝি ঐ শক্ত বাক্সটার ওপর সমস্ত রাত ব'সে আমার কথার জবাব দেবে।" আমি একটু মুচ্‌কে হেসে বল্লুম,—"এটার ওপর বস্‌লে যদি তোমার ব্যথা লাগে, ঠাকুরপো, না হয় তোমার নরম্ বিছানার ওপরেই উঠে বস্‌বো। কেমন? তা হ'লে ত আর ক্ষোভ থাক্‌বে না?" তুমি মেয়েমানুষ, সহজেই বুঝ্‌তে পার, তার ত তখন কি অবস্থা। আমি স্পষ্ট দেখ্‌লুম—"তার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠ্‌লো। সে লজ্জায় (কিসের?) পাশ ফিরে শুলো।

যাই শোয়া, বল্‌ব কি ভাই, অমনি কোথেকে চিঠি নাই, তার নাই, উনি এসে উপস্থিত। উঃ, মনে হ'লে আমার এখনো যেন গাটা ঝিম-ঝিম ক'রে উঠ্‌ছে। কি আর হবে? এ ক্ষেত্রে যা হয়, তাই হ'লো। উনি আমায় ত্যাগ কর্‌লেন। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, দিবাকর ঠাকুরপোর সঙ্গে ছিল আমার শুধু ছেলে-খেলা। আমার বক্ষের মণিকোঠায় উনিই ছিলেন আমার দেবতা। তা উনি কি সে কথা শুনেন? হায় রে নির্ব্বোধ পুরুষজাতি, এমনি করেই ত তোমরা সব খোওয়াও।

তা আমারো রাগ হ'লো। আমিও বল্লুম—"আমি বিধবা, আমার কাছে দিবাকরও যা, তুমিও তাই।"

তার পরে যখন দেখি, সত্যি চ'লে যায়, তখন দুহাতে পা জড়িয়ে ধর্‌লুম,—বল্লুম—

"আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, ঠাকুরপো। সমস্ত মিথ্যে। সমস্ত মিথ্যে। ছি! ছি তোমার আসনে কি না দিবাকর—"

"যদি কোন দিন, তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে
চির দিবসের হে রাজা আমার!—"

এমন ক'রে বল্লুম, যে বিনোদিনী দিদিও বোধ করি, বিহারী ঠাকুরপোকে বলতে পারতো না। কিন্তু তাতেও যে হ'লো না।

তিনি আমায় লাথি মেরে ফে'লে চ'লে গেলেন। উঃ— !

(৯)

আমায় অবিশ্বাস? এত দূর? যাঁর জন্তে আমি—? না—; তবে—তাই হোক। সেই রাত্রিশেষেই দিবাকর ঠাকুরপোকে নিয়ে জাহাজে ভাসলুম আরাকানে যাব। আমার ভাগ্য-বিধাতা আমায় আরাকানে ডেকে পাঠালেন। তাঁর ডাক ত আর না শুনে থাকবার যো নেই, বোন্। যে যেখানেই থাক, তাঁর ডাক শুনতে হবেই। হ্যাঁ,—সেই জাহাজে,—ক্যাবিনে,—বলছি—সব বলছি।

বেচারী ছেলেমানুষ, খাবে না, শোবে না,—সে এক কাণ্ড। ক্যাবিনের মধ্যে আমি "তাঁর সম্মুখে এসে জানু পেতে উঁচু হয়ে বসে"—যেমন ক'রে অন্ত এক অবস্থায় বিনোদিনী দিদি বিহারী ঠাকুরপোর সামনে মুখ উঁচু ক'রে বসেছিল,—তার মুখে খাবার গুঁজে দিতে লাগিলাম। তার পরে তার—"আর্দ্র ওষ্ঠে চুম্বন ক'রে খিল খিল ক'রে হেসে উঠিলাম", যা বিনোদিনী দিদিও পেরে ওঠে নাই।

তারপর রাত্রে বেচারী বলে কি না, "কোন মতেই হবে না।" আমি বল্লুম,—"কি হবে না ঠাকুরপো, শোয়া?" হায় রে কপাল!

রাত্রিশেষে বাইরে প্রবল ঝড়। সমুদ্রে বাতাসে এক ভীষণ প্রলয় দুলছিল। হতেই হবে। আমাদের আগেও যারা ক্যাবিন-অভিসারে মহাপ্রস্থান করেছিল, তাদেরও ঝড় উঠেছিল। তাদের বেলাও দমকা হাওয়ায় ক্যাবিনের খাট দুলেছিল। তা ত জান? আমি "ওর বুকের উপর আমার শিথিল হস্তখানা আবার একটু চেপে ধ'রে জিজ্ঞেস করলুম, ঝড় না কি?" তারপর "সুদৃঢ় বলের সহিত বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া—"; উঃ—সেও একদিন বটে!

(১০)

আরাকানে সেই লাথি খাওয়ার ব্যাপার? যেমন হয়ে থাকে, তেমনি হয়েছিল! বাড়ীউলী মা এক ধনী মাড়োয়ারী বাবুর সঙ্গে আমার—সব—কথাবার্ত্তা চালাচ্ছিল।

কিন্তু যদি জান্‌তে চাও, আমার তাতে সম্মতি ছিল কি না, আমি বল্‌বো,—ওগো না,—না,—কখনই না। এত নীচে তখনো নামিনি, বোন্‌, যে—। কিন্তু ঐটুকুতেই ওর ব্রহ্মতালু অবধি জ্ব'লে উঠেছিল। তার পর লাথি খেয়ে আমার মত মেয়েমানুষ যা করে, তাই করিলাম। সাম্‌লে নিয়ে বল্লাম,—"এ আর কি, এতে মানুষ খুন করে ফেলে? তুমি ত সামান্য একটা লাথি মেরেচ মাত্র?" কিন্তু সেই রাত্রেই ও পাপটাকে আমি বিদেয় ক'রে দিলুম। কার আশায়? কি জানি, জানি না। সত্যি বল্‌ছি, সেই মাড়োয়ারী বাবুর দিকে আমি কোন দিন ফিরেও চাই নাই। যে যাই ভাবুক, আমার বক্ষের মণিকোঠায় ছিল শুধু আমার উনি।

কিন্তু বাড়ীউলীর কি আস্পর্দ্ধা। আমাকে ভেবেছিল কি না—"বেবুশ্যে"। বেবুশ্যে আমি? আমার ভিতরকার ভদ্র-মহিলা ওই অশ্লীল শব্দটি শুনে এমনি দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠেছিল, যে আমি অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গিয়েছিলুম। ফিটের ব্যারামও ছিল কি না?

তার পরেই গিয়ে পড়্‌লো সতীশ ঠাকুরপো। কোন যাদুমন্ত্রে যেন সব কুয়াসা কেটে গেল। "আমি যেন রাগ ক'রে দুটোদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ী (?) এসেছিলাম।" স্নেহময় দেবর লক্ষ্মণ, তোমার স্বামী যেন আমায় সেধে নিতে এসেছে। "দিবাকরও সাবেক মতই এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর্‌লো," বলিল,—বৌঠান, ভাল ত? আর আমরাও একখানা ফেরতা জাহাজে ফিরে চলে এলাম। তোমার স্বামী বলেছিল, "যার টাকা আছে, গায়ের জোর আছে, তার বিরুদ্ধে সমাজ নাই।" সতীশ ঠাকুর পোর ও দুটোই ছিল কি না? সেই ভরসাতেই ত এলাম। আর তাও বল, থাক্‌তে কি পারি, বোন্‌। আমার উনি যে মৃত্যু-শয্যায়! এ যে একেবারে অন্তরের দিকের।

(১১)

তার পরে ত সব জানই। এমন যে উনি "আজন্ম শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ," সেই ওঁর চোখ দিয়েও, পোড়ার মুখী আমি,—আমার জন্য "জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল।" ছিল কি না, বল? তুমি ত নিজ্‌ চক্ষে দেখেছ—? দেখো, যেন দেখা-হারামি কর্‌রো না, বোন্‌। এ তোমার বল্‌তেই হবে।

ওঁর মাথা কোলে নিয়ে বস্‌তে গিয়েছিনু। তুমিই ত জোর ক'রে ও ঘরে টেনে নিলে। নেওনি? সব মনে আছে, বোন্‌। তোমরা ভেবেছিলে আমি উন্মাদ হয়ে গিইছি। হ'লেও, তেমন উন্মাদ কি অমন ক্লাইমেক্সের অবস্থায় হওয়া যায়? তাই যতটা যায়, তাই গিয়েছিনু, তার বেশী নয়।

(১২)

আবার আমি বিধবা হলুম। এবার কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে। তা অন্তর্যামী দেখেছেন। তা ব'লে ভেবো না যে, আমার জাত গিয়েছে। কেননা, আমার দুই স্বামীই যে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

(১৩)

এখন বল্ছি, শোন। এই আমার শেষ কথা। আমি অসতী নই। যারা সতী ও অসতীর বাঁধা রাস্তায় চলে, আমি সে দুই পথই কোন দিন মাড়াইনি। তবে আমি কি? প্রহেলিকা? কুজ্ঝটিকা? না, তাও না। আমি সতী ও অসতীর মাঝামাঝি রকমের। অথবা আমি এ দুইয়েরি অতীতে,—ঊর্দ্ধে—সাহিত্যের বাসর শয্যাতে—(নহে স্তব্ধ অর্দ্ধ রাতে) দ্বিবা দ্বিপ্রহরে,—অনবগুণ্ঠিতা,—অতি অকুণ্ঠিতা, অথচ বৃন্তহীন পুষ্পসমা,—বুঝেছ কি? বিষভাণ্ড লয়ে দুই করে,—আমি উঠেছি।

কবিত্ব যাক্, বোন্, দিবাকর ঠাকুরপোকে আমি উনির হাত থেকে যে বিশ্বাসে পেয়েছিলাম, সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা আমি কোন দিনই নষ্ট করি নাই। এতে লোকে যাই বলুক, আর যাই দে'খে থাকুক।

আর এতেও যদি তোমার সন্দেহ দূর না হয়, তবে শোন, আরাকানে তোমার নিজের স্বামী আমায় কি বলেছিলেন, "তুমি হবে অসতী! এ আমি ম'রে গেলেও বিশ্বাস করবো না?" কেমন, এখন্ হলো? যদি জান্তে চাও, এ তবে কি রকম সতীত্ব? উত্তরে বলি, 'সতীত্বের এ এক নূতন আদর্শ', অব্যক্ত থেকে প্রকট করিবার জন্য আমি এবং আমরা আরো কয় বোনে এসেছি এবং ক্রমে আসিতেছি। যাক্ এখন তোমায় সব ব'লে আমি নিষ্কৃতি পেলুম। এখন যা তোমার বিচারে হয়, তাই করো। দশজনের বিচারের আমি কি ধার ধারি?

৪।১০।২৪ }
ব্যাস-শিবপুর }

ইতি তোমার অভাগিনী দিদি
শ্রীকিরণময়ী দেবী।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

রূপের ফেরি

রূপের পশরা লয়ে ফিরি বারে বারে,
রূপের বেসাতি করি প্রতি দ্বারে দ্বারে।
কে আছ গো বিশ্ববাসী কিনিবে এ রূপ,
থাকে যদি মূলধন—কেনো অপরূপ!
আপনার রূপ মোরে দিতে যেই পারে,
বিনিময়ে রূপ মোর দিই আমি তারে।
হৃদি-সরে ভাসে এই রূপ-শতদল
বিশ্ব আর মোর তরে ফোটে অবিরল।
রচিয়াছি মধুচক্র মধুর এ রূপ—
নিখিল রসের সার সর্ব্ব-রস-কূপ,
তাই ত রসের তরে ফিরি দ্বারে দ্বারে
কিনে নাও কিনে নাও বলি বারে বারে।
এই রূপ অনশ্বর জীবনে মরণে
নিশিদিন নিরবধি শত আবর্ত্তনে।
এই রূপ নহে শুধু মোহ-পারাবার,
সর্ব্বরূপ মন্থনেতে জনম ইহার।
বিষামৃতে ভরা এই প্রাণের সৌরভ
অন্তরের ছন্দে ছন্দে কর অনুভব।
আছে মধু—সুধা তায় কর যদি পান
আপনার সরবস্ব করি প্রতিদান।
রূপের স্রোতের মাঝে রূপ ভেসে যায়,
মহান্ স্বরূপ এক ফুটে আছে তায়!

শ্রীঅবনীকুমার দে।

দাদা মহাশয়

(১)

"মেন্‌কি, ও মেনি, লক্ষ্মীছাড়ি!"

"কেন গা, দাদামশায়?"

দাদামহাশয়ের সরোষ আহ্বানে মেনকা ছুটিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল। দাদামশায় কাঁধের চাদরটা দাওয়ার এক পাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "মেনা? তোকে না রাস্তায় ছুটে বেড়াতে পই পই বারণ ক'রে দিইছি? তবু তুই রাস্তায় যাবি? হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!"

মেনকা ঘাড় নীচু করিয়া ভারী গলায় বলিল, "আমি তো আর রাস্তায় যাইনে।"

দাদামশায় বলিলেন, "আবার মিথ্যে কথা! কাল রাস্তায় যাস্ নি?"

মেনকা সঙ্কুচিত-কণ্ঠে বলিল, "সে ত একবার গিয়েছিলাম, রাঁধী আমায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।"

"রাঁধী তোর মাথা খেয়েছিল" বলিয়া দাদামহাশয় দাওয়ায় বসিয়া পড়িলেন; চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বৌমা! বৌমা!"

বধূ রমা রন্ধনশালায় ছিল। সে সকড়ী ডালহাতটা উঁচু করিয়া, বাঁ হাতে মাথার কাপড় টানিতে টানিতে বাহিরে আসিল। শ্বশুর তাহার দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ঐ হতভাগা মেয়েটার তরে আমি গলায় দড়ি দেব, না দেশান্তরী হব বল দেখি? একে তো ঐ রূপের ধ্বজা মেয়ে, তার উপর যদি নেংটা কালীর মত রাস্তায় নেচে বেড়ায়, তা হ'লে কে ওকে নেবে বল দেখি? আমার যে চারদিকে শত্রু!"

রমা কোন উত্তর করিল না, শুধু একবার বক্র সরোষ দৃষ্টিতে মেনকার দিকে চাহিল। শ্বশুর বলিতে লাগিলেন, "তাই তো বলি, ঘোষপুরের রাজীব ঘোষাল এক কথার মানুষ, কাল মেয়ে দেখে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবার কথা, সে মানুষ কেন এলো না? ভোরে উঠেই ছুটেছিলাম। ব্যাপার কি জান বৌমা, তারা এসেছিল। তার পর নিতে চক্রবর্ত্তী রাস্তার মাঝে ঐ রূপের ধুচুনীকে দেখিয়ে দেয়। ঐ নেংটা কালী-মূর্ত্তি দেখেই তারা আস্তে আস্তে স'রে পড়েছে। আমি এখন কি করি বল তো বৌমা, তুমি কোথা হ'তে এ ফাঁসি এনে বুড়োর গলায় দিলে?"

রমা নিরুত্তরে বাঁ হাতে গাড়ুটা লইয়া শ্বশুরের কাছে আগাইয়া দিল। শ্বশুর পা ধুইয়া ঘরে ঢুকিয়া তেল মাখিতে বসিলেন।

ভরাহাটেই যজ্ঞেশ্বর বাপুলীর হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যাহাদের লইয়া কেনা-বেচা, তাহারা একে একে চলিয়া গেল, শোকজীর্ণ বুকে কর্ম্মভোগের বোঝা লইয়া বৃদ্ধ ভাঙ্গাহাটে বসিয়া রহিলেন; আর কতক্ষণে সূর্য্য অস্ত যায়, কতক্ষণে কালসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু শুধু সেই সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, ভাঙ্গা হাটেও দোকান খুলিয়া তাঁহাকে কেনা-বেচা করিতে হইল। সাধ্বী সহধর্ম্মিণী চলিয়া গিয়াছিলেন, উপযুক্ত পুত্র নির্ম্মল, ঘর-আলো-করা পৌত্র গোপাল, কন্যা সরস্বতী সব চলিয়া গিয়াছিল, শুধু স্বামিপুত্রহীনা পুত্রবধূ রমা তাঁহারই মত শোকদীর্ণ হৃদয় লইয়া তাঁহার পাশে পড়িয়া রহিল। সুতরাং বাপুলী মহাশয়কে ভাঙ্গাহাটেও আবার দোকান পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

বাপুলী মহাশয়ের মত সাদাসিধা লোক গ্রামে ছিল না বলিলেই হয়, কিন্তু ইদানীং তাঁহার মেজাজটা বড় রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, একটুতেই রাগিয়া আগুন হইতেন। সংসারের আঘাতের পর আঘাতে হৃদয়টা এতই ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল যে, সেখানে একটু ঘা লাগিলেই তিনি অধীর হইয়া উঠিতেন। এ অধীরতা স্থায়ী না হইলেও সেই আঘাতের মুহূর্ত্তটি কিন্তু এমন ভয়ানক হইয়া উঠিত যে, বুড়া বুঝি এবার পাগল হইবে।

বুড়া কিন্তু পাগল হইলেন না; শোকের ভারটা শোকতাপহারীর চরণে নিবেদন করিয়া, অনাথা বধূর মুখ চাহিয়া, সংসারের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন; বধূও শোকাকুল জরাজীর্ণ শ্বশুরের সেবাকেই ইহলোকের একমাত্র কর্ত্তব্য ভাবিয়া লইল। উভয়েই ভাবিল, এইরূপে চলিতে চলিতেই একদিন এই শুষ্ক মরুময় পথের প্রান্তসীমায় উপনীত হইবে। কিন্তু যাহা ভাবিল, তাহা হইল না। সহসা আর একটি ক্ষুদ্র হৃদয় তাহাদেরই মত সংসারচক্রের চাপে দলিত নিষ্পিষ্ট হইয়া, তাহাদের শূন্য বুকের এক পাশে স্থান লইল। সে রমার ভ্রাতুষ্পুত্রী মেনকা।

ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ যখন মারা গেল, তখন রমা পাঁচ বছরের মেয়ে। দেখিবার কেহ ছিল না, অগত্যা রমা তাহাকে আনিয়া নিজের কাছে রাখিল। শ্বশুর বলিলেন, "এ আপদ্ আবার জড়ালে কেন বৌমা?"

রমা উত্তর করিল, "দেখবার কেউ নেই ব'লে এনেছি, দিনকতক থাক্।"

কিন্তু দিনকতক পরে রমা যখন বলিল, "মেয়েটাকে আমার পিস্তুত বোনের কাছে পাঠিয়ে দেব বাবা?" তখন বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "যখন এনেছ, তখন কি আর

পাঠিয়ে দেওয়া ভাল দেখায়? বলবে, এক মুঠো ভাত দিতে পারলে না। কুটুম্বের কাছে একটা লজ্জার কথা। আর তোমারও তো মনবুঝ একটা থাকা দরকার।"

শ্বশুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া রমা মৃদু হাসিল। মেনকা পিসীমা ও দাদামশায়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এক এক সময় বাপুলী মহাশয় মেনকার ক্রন্দনে, উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিরক্ত-ভাবে বলিতেন, "তুমি কেন এ আপদ্ জোটালে বৌমা, আমার সোনার সংসার ছারখারে গেল, শেষে কি না এই লক্ষীছাড়া মেয়েটাকে নিয়ে কর্ম্মভোগ। দূর ক'রে দাও,—দূর ক'রে দাও!"

আবার কখন বা রমা মেয়েটাকে গালাগালি দিলে বা মারিলে বাপুলী মহাশয় বলিতেন, "আহা, কেন ওকে গালমন্দ দাও, মারধর দাও বউমা, ওর আর মুখ চাইতে কে আছে?"

রমা রাগিয়া বলিত, "কেউ যখন নেই, তখন হতভাগীও চুলোয় যাক্ না।"

বিষাদ-গম্ভীর-স্বরে বাপুলি মহাশয় বলিতেন, "চুলোয় তো সকলেই গেছে বৌমা, একটা পরের মেয়ে, সেও যদি চুলোয় যায়, তবে সংসারে আর থাকবে কি?"

এমনই আদর ও অনাদরের মধ্য দিয়া মেনকা যখন একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন সহসা বাপুলী মহাশয়ের চমক ভাঙ্গিল, মেনকার যে বিবাহ দিতে হইবে।

বিবাহ দেওয়া কিন্তু সহজ হইল না। একে কালো মেয়ে, তাহার উপর মা বাপ মরা। সুতরাং এরূপ কুরূপা লক্ষণহীনা মেয়েকে সহজে কেহ গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। যে রাজি হইল, সে তাহার বিনিময়ে এরূপ কাঞ্চনমূল্য চাহিয়া বসিল যে, বাপুলী মহাশয় ভয়ে তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতেই সাহসী হইলেন না। তিনি গ্রামের পর গ্রাম ঘুরিয়া পাত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে মেয়ে বারো বছরে পড়িল, তথাপি বাপুলী মহাশয় তাহার বিবাহ দিতে পারিলেন না। যতই অকৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল।

(২)

শ্বশুর ঘরে ঢুকিলে রমা একবার তীব্রদৃষ্টিতে মেনকার দিকে চাহিল; তার পর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কঠোরস্বরে ডাকিল, "মেন্‌কি!"

মেনকা শঙ্কিত-দৃষ্টিতে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। রমা

ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "পোড়াকপালি, তোর কি মরণ নেই ? সব থেয়ে শেষে আমাকে জ্বালাতে এসেছিস্ ? তোর জন্যে আমাকে কথা শুনতে হয় ?"

মেনকা মৃদু-গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিল, "তা আমি কি করবো ?"

গর্জ্জন করিয়া রমা বলিল, "তুই কি করবি ? আমার শ্রাদ্ধ করবি। খ্যাংরা মেরে বিদেয় করবো, তা জানিস্ ?"

মেনকা মুখ তুলিয়া উদ্ধত কণ্ঠে বলিল, "কৈ, মার দেখি খ্যাংরা। যদি না মার—"

"তবে রে আবাগী" বলিয়া রমা ছুটিয়া আসিল এবং বাঁ হাত দিয়া মেনকার পিঠে কিল-চড় বসাইয়া দিল। মেনকা মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল, রমা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

বাগুলী মহাশয় ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং মেনকার দিকে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীর গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "মেনীকে মারলে বৌমা ?"

রমা রন্ধনশালা হইতেই ক্রোধগম্ভীর-স্বরে উত্তর দিল, "মারবো না তো কি করবো ? পোড়াকপালী সকলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।"

বাগুলী মহাশয় বলিলেন, "জ্বালালে আর কাকে বৌমা,—আমাকে ? তা হ'লে ওটা তোমার মেনীকে মারা হ'লো না, আমাকেই মারা হ'লো। আমি রাগের মাথায় দু'কথা বলেছি ব'লেই তো মেয়েটাকে মারলে।"

রমা আর কোন উত্তর করিল না, আপন মনে গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল। বাগুলী মহাশয় অভিমান-রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ঘুরে ফিরে এসে বড় রাগটা হয়েছিল ব'লেই দু'কথা ব'লেছিলাম। তাতে তুমি এত রাগ করবে জানলে বলতাম না। তা বৌমা, এবার যদি কখনো কিছু বলি, তা হ'লে আমি বামুন হ'তে খারিজ।"

বাগুলী মহাশয় গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। মেনকা দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল, তার পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া দাদামশায়ের খড়ম, প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

বাগুলী মহাশয় স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলেন। ঠাকুর-ঘরে কোন দিনই তাঁহার এক ঘণ্টার বেশী দেরী হইত না; আজ কিন্তু মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার পূজা শেষ হইল না। রমা রাঁধাবাড়া শেষ করিয়া শ্বশুরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মেনকা গিয়া ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়াইল। দেখিল, তখনও দাদামশায়ের পূজা শেষ হয় নাই, পূজাই হয় নাই; পুষ্পপাত্রে ফুল, চন্দন, তুলসী সব সাজানো রহিয়াছে। দাদামশায় শুধু উত্তয় জানুর উপর উভয় করতল স্থাপন করিয়া নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে

ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আছেন। মেনকা যে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে, তাহাও যেন তিনি জানিতে পারেন নাই।

মেনকা ধ্যানমগ্ন দাদামশায়ের নিশ্চল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে ডাকিল, "দাদামশায়, অ দাদামশায়!"

বাপুলী মহাশয় চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন। মেনকা বলিল, "দুপুর যে গড়িয়ে গেল দাদামশায়!"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত "হুঁম্" শব্দ উচ্চারণ করিয়া, বাপুলী মহাশয় পুনরায় আচমন করিলেন এবং ফুল-চন্দন লইয়া ব্যগ্র হস্তে ঠাকুরের মাথায় চাপাইতে লাগিলেন। মেনকা দরজার বাজু ধরিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফুল, চন্দন, তুলসী সব যখন নিঃশেষ হইল, তখন বাপুলী মহাশয় বাষ্পসজল-দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে গভীর বেদনাপ্লুতকণ্ঠে বলিলেন, "দামোদর! মেয়েটার একটা গতি ক'রে দাও, এ অভাগা বুড়োকে শেষ ছুটী দাও ঠাকুর!"

বৃদ্ধের শোকদীর্ণ হৃদয়নিঃসৃত একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস সশব্দে গিয়া দামোদরের চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িল। মেনকা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল।

(৩)

"হ্যাঁরে মেনি!"

"কেন?"

"তোর বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেল?"

"হোক্ না হোক্, তোমার সে কথায় দরকার কি?"

কথাটা হইতেছিল, নিতাই চক্রবর্ত্তীর ভাগিনেয় ক্ষেত্রনাথ বা খেতুর সঙ্গে। খেতু ছিপ ফেলিতেছিল, আর মেনকা তাহার পাশে বসিয়া দূর্ব্বাঘাস খুঁটিতেছিল। খেতু মেনকার একজন প্রধান সঙ্গী ছিল। সে খেতুর নিকট মার খাইত, গালি খাইত, খেতুকে গালি দিত, অথচ দিনের অধিকাংশ সময় তাহার পাছু পাছু ছুটিয়া বেড়াইত। খেতুও মেনকাকে মারিত, গালি দিত, কিন্তু আর কেহ মেনীকে একটা কথা বলিলে তাহার উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িত। যদি সঙ্গীদের কেহ উপহাস করিয়া বলিত, "হাঁরে খেতু, তুই মেনীকে বিয়ে করবি?" তাহা হইলে খেতু রাগিয়া বলিত, "বোয়ে গেছে আমার বিয়ে করতে। এমন স্যাওড়াতলার পেত্নীকেও আবার বিয়ে করে?"

আপনাকে পেত্নী বলিতে শুনিয়া মেনকাও রাগিয়া উঠিত। সে খেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিত, "আমি যদি স্যাওড়াতলার পেত্নী, তবে তুই কি আমড়াগাছের ভূত?"

খেতু বলিত, "আমি ভূতই হই আর যা হই, তাই ব'লে তোর মত কালপেঁচাকে বৌ কর্‌ব না।"

মেনকা রাগে চোখ কপালে তুলিয়া বলিত, "তোর বৌ যদি আমার চেয়ে কালপেঁচা না হয়, তবে আমার নাম মেনকাই নয়।"

খেতু হাসিয়া বলিত, "তোর নাম তো মেনকা নয়ই, মেনী।"

এ সব আগেকার কথা। এখন খেতুর বয়স হইয়াছিল, মেনকাও বড় হইয়াছিল। এখন আর বিবাহের কথা উঠিত না। মেনকাও আর সর্ব্বদা খেতুর সঙ্গে বেড়াইত না। তবে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা হইত; ঝগড়াও যে না হইত, এমন নয়।

খেতুর মামা একে বড়লোক, তাহার উপর বাপুলী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বনি-বনাও ছিল না। আগে অনেক মামলা-মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে; এখন দলাদলি, ঘরাও ঝগড়া মাঝে মাঝে চলিত। সুতরাং খেতুর সহিত মেনকার বিবাহের সম্ভাবনা কোন পক্ষেরই মনে একবারও উঠে নাই। উঠিলেও কোন ফল হইত কি না বলা যায় না। কেন না, খেতুর মামা ভাগিনেয়ের বিবাহ দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

খেতু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কা'ল না তোকে দেখতে এসেছিল? দে'খে কি বল্লে?"

মেনকা উবু হইয়া বসিয়া একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল, "বল্লে দিব্যি মেয়ে।"

জলের উপর কাতলা নড়িতেছিল; খেতু তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সহাস্যে বলিল, "তার পর?"

মেনকা। তার পর আর কি, খেয়ে দেয়ে চ'লে গেল।

খেতু। কি খেলে? তোর মাথা?

মেনকা। না, একটা বড় রুইমাছের মাথা।

খেতু। রুইমাছটা কত বড় মেনি?

চারের কাছে একটা মাছ ঘাই দিল; মেনকা সেইখানে একটা বড় ঢিল ফেলিয়া সহাস্যে বলিল, "ঐ রকম বড়।"

খেতু ছিপ ছাড়িয়া মেনকার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "চারে ঢিল ফেল্‌লি যে?"

মেনকাও গলায় জোর দিয়া উত্তর দিল, "তুমিও কা'ল লোকগুলাকে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দিলে যে?"

খেতু বলিল, "বেশ ক'রেছি, আমার খুসী।"

মেনকা বলিল, "আমিও ঢিল ফেলেছি, আমার খুশী।"

হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া খেতু বলিল, "আচ্ছা, কেমন তোর খুসী দেখবি?"

মেনকা বলিল, "মারবে না কি?"

খেতু বলিল, "মারবো না তো তোকে ভয় ক'রবো না কি?"

মেনকা তাহার মুখের দিকে অতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

খেতু একবার তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল এবং ছিপ তুলিয়া বঁড়শীতে নূতন টোপ গাঁথিতে লাগিল।

মেনকা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তীব্রকণ্ঠে বলিল, "লজ্জা করে না? একটা বুড়ো মানুষ দায় থেকে উদ্ধার হবার জন্যে সারা দেশটা ছুটে বেড়াচ্চে, আর তুমি গেলে কি না তাতে ভাংচি দিতে? মুখ নেড়ে আজ আমায় আবার জিজ্ঞেসা কচ্চো? ছিঃ—"

খেতু দাঁত দিয়া ঠোঁটটা জোরে চাপিয়া ধরিল। মেনকা জোরে জোরে পা ফেলিয়া পুকুরধার হইতে চলিয়া গেল। কিছু দূর চলিয়া গেলে খেতু একবার ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিল। তার পর চার, টোপ, সব জলে ফেলিয়া দিয়া, ছিপ গুটাইতে লাগিল।

(৪)

অপরাহ্ণে বাপুলী মহাশয় ফুলগাছের বেড়া বাঁধিতেছিলেন। মেনকা বেড়ার অপর-পাশে বসিয়া, দড়ি গলাইয়া, বেড়ার বাখারিটাকে সোজা করিয়া ধরিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেছিল। সহসা মেনকা বলিল, "দাদামশায়?"

দাদামশায় উত্তর দিলেন, "কেন মেনি?"

মেনকা। আজকাল তোমার বড্ড বেশী রাগ হয়েছে, না দাদামশায়?

বাপুলী। বড্ড বেশী।

মেনকা। কেন এত রাগ হয়েছে দাদামশায়?

বাপুলী মহাশয় ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন, "সাধে কি রাগ হয় রে দিদি, একে তো শোকে তাপে বুকের হাড়-পাঁজরাগুলো পর্য্যন্ত জ্ব'লে খাক্ হ'য়ে আছে। তার উপর তোর বয়স বাড়্ছে, তোর একটা গতি কত্তে পাচ্চি না। চারদিকে শত্রু, তারা হাস্‌ছে। সারা দেশটা খুঁজে একটা পাত্র পাই না। এর উপর যদি আপনাদের দোষে হাতছাড়া হয়ে যায়, তা হ'লে রাগ হয় কি না বল্ দেখি?"

মেনকাও মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা হয় দাদামশায়।"

বাপুলী। তবে?

মেনকা। তা তুমি রেগেছিলে, বেশ ক'রেছিলে।

বাপুলী। রাগ চণ্ডাল, কি করি বল্, বুড়ো হ'য়েছি, এখন আর মাথার ঠিক রাখতে পারি না।

মেনকা কোন উত্তর দিল না। বাপুলী মহাশয় দড়ির ফাঁসটা টানিতে টানিতে বলিলেন, "আচ্ছা মেনি!"

মেনকা। কি দাদামশায়?

বাপুলী। আমার কথায় তোর সে দিন খুব দুঃখ হ'য়েছিল?

মেনকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "একটুও না।"

বাপুলী। সত্যি?

মেনকা। সত্যি। পিসীমা খুব রেগে উঠেছিল।

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "ও বেটীর কথা ছেড়ে দে। শোকে তাপে ও ভাজা-ভাজা হ'য়ে আছে।"

মেনকা একটু অভিমানের সুরে বলিল, "তা ভাজা হ'য়ে আছে ব'লে বুঝি আমাকে মারবে?"

সহাস্যে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "সে তোকে মারে না মেনি, নিজে নিজেকে মারে। তুই জানিস্ না, কিন্তু আমি জানি; তোর পিঠে যে মারটা পড়ে, তার দশগুণ মার পড়ে ওর উপর। ঐ যা, ফাঁসটা খুলে গেল, দে দিদি, দড়িটা ভাল ক'রে দে।"

মেনকা দড়িটা পুনরায় লাগাইয়া দিতে দিতে বলিল, "দেখ দাদামশায়!"

বাপুলী। কি?

মেনকা। সে দিন তাদের কে ফিরিয়ে দিয়েছিল, জান?

বাপুলী। বোধ হয় ঐ চক্রবর্ত্তী, নয় তো সাধন ঘোষ।

মেনকা। না দাদামশায়, ওরা নয়।

বাপুলী। তবে কে?

মেনকা। ঐ খেতা ছোঁড়া।

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "না না, ও এমন কাজ করতে যাবে কেন?"

মেনকা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ দাদামশায়, আমি তোমার দিব্যি ক'রে বলতে পারি।"

বাপুলী। বটে, তা হ'লে কেউ বোধ হয় শিখিয়ে দিয়েছিল। নৈলে ক্ষেত্তর তো তেমন ছেলে নয়।

মেনকা রাগত-স্বরে বলিল, "না, খুব ভাল ছেলে! তোমার কাছে সবাই খুব ভাল!"

বাপুলী মহাশয় নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মেনকা বলিল, "কিন্তু দাদামশায়, তুমি আর অত ছুটোছুটি কত্তে পাবে না, তা ব'লে দিচ্ছি।"

বাপুলী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ছুটোছুটি না কর্‌লে বর জুট্‌বে কোথা হ'তে রে পাগ্‌লি!"

জোরে মাথা নাড়িয়া মেনকা বলিল, "তা না জোটে না জুটবে!"

বাপুলী। বর না জুট্‌লে বিয়ে হবে কেমন ক'রে?

মেনকা। যেমন ক'রে হয় হবে।

বাপুলী। কেমন ক'রে হবে বল্। তবে কি আমার গলাতেই মালা দিবি?

মেনকা। তাই দেব।

বাপুলী মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মেনকা লজ্জায় মুখ নীচু করিল। বাপুলী মহাশয় সহাস্য-কণ্ঠে বলিলেন, "আরে ভাই, তুই যেন এই বুড়োর গলায় মালা দিলি, আমার কি আর সে সময় আছে দিদি, এখন যাত্রা কর্‌লেই হয়।"

অন্তর্নিহিত পুঞ্জীভূত বেদনা একটা দীর্ঘনিশ্বাসরূপে বাহির হইয়া পড়িল। মেনকাও একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বাপুলী মহাশয় তখন বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে গুন্-গুন্ করিয়া গান ধরিলেন,—

"অবেলায় হাট ভাঙ্‌লি শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।
ভরা হাটের হেটো যারা, একে একে গেল তারা,
আমি কর্ম্মদোষে রইলাম ব'সে পাপের বোঝা শিরে ধরি।"

মেনকা বলিল, "তুমি ত বেশ গাইতে পার দাদামশায়!"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "আর ভাই, এমন একদিন ছিল, যখন তোর দাদা মশায়ের গান শুন্‌বার জন্য কত লোক হাঁ ক'রে থাক্‌তো।"

মেনকা। কৈ, এদ্দিনের ভিতর একদিনও তো তোমাকে গান গাইতে শুনিনি।"

বাপুলী। শুন্‌বি আর কোথা থেকে বল্, নিমে ছোঁড়া কি কিছু রেখে গিয়েছে, গান সুর তাল সব ভুলিয়ে দিয়ে চ'লে গেছে। আজ তোর সঙ্গে কথায় কথায় হঠাৎ মনটা কেমন হয়ে উঠ্‌লো, তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মেনকা আগ্রহের সহিত বলিল, "বেশ মিষ্টি গান, তুমি গাও দাদামশায়।"

"মিষ্টি!" বলিয়া বাপুলী মহাশয় মৃদু হাসিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"রবি যে বসেছে পাটে, কি কর্‌বো এই ভাঙ্গা হাটে,
নে মা কোলে অভাগারে, দে মা তোর ঐ চরণ-তরী।"

অস্তোন্মুখ রবি শেষ রক্তিমচ্ছটায় বৃদ্ধের গণ্ড রঞ্জিত করিয়া চক্রবালপ্রান্তে অদৃশ্য হইল। বৃদ্ধ উদ্বেল-প্রাণে বিহ্বল-কণ্ঠে বার বার আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"নে মা কোলে অভাগারে, দে মা তোর ঐ চরণ-তরী।"

(৫)

"নমস্কার মশায়, আপনারই নাম বোধ হয় যজ্ঞেশ্বর বাপুলী? বুঝি আপনার দৌহিত্রী? তা দেখতে এমন মন্দই বা কি, রংটা একটু ময়লা, তা এর চেয়েও—বুঝ্‌লেন কি না—কালো মেয়ে অনেক আছে। আমি কিন্তু—বুঝলেন কি না—কাল মেয়েই পছন্দ করি; গেরস্ত-ঘরে সুন্দরী নিয়ে কি হবে? কথাতেই আছে—'গাই কিন্‌বে ঝাঁপড়ি, বৌ আন্‌বে'—বুঝলেন কি না,—হা হা হা হা!"

এক নিশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া ফেলিয়া আগন্তুক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বাপুলী মহাশয় বিস্ময়বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে এই নবাগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মেনকা দড়ি ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

আগন্তুক তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "দিব্যি মেয়েটি, কালো হইলে কি হয়, লক্ষণযুক্ত।" তার পর বাপুলী মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমাকে বোধ হয় চিন্‌তে পার্‌বেন না, চিন্‌বেন বা কেমন ক'রে? দেশে ত থাকি না, কচিৎ কখনো যাই আসি। কল্‌কাতার চাকরী করি, সেইখানেই এক প্রকার বসবাস। আমার নাম—বুঝ্‌লেন কি না—প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, ঠাকুরের নাম ৺ধনকৃষ্ণ গাঙ্গুলী।"

বাপুলী মহাশয় ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক হাত নাড়িয়া বলিলেন, "আহা হা, ব্যস্ত হবেন না, আমি এইখানেই বস্‌ছি,—বুঝলেন কি না—দিব্বি জায়গা, হা হা হা হা?"

হাসিতে হাসিতে আগন্তুক সেইখানে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। বাপুলী মহাশয় ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "না না, এখানে বসাটা কি ভাল দেখায়।"

আগন্তুক সহাস্যে বলিলেন, "মন্দই বা কি, আপনি বসুন, এইখানে বসেই কথাবার্ত্তা স্থির হ'য়ে যাক্। আপনারও দেখছি আমার মত ফুলগাছের সখ। তা কল্‌কাতায় এমন ফাঁকা জায়গা কোথায় পাই বলুন, কাজেই—বুঝ্‌লেন কি না—টবেই বসাতে হয়েচে। দুধের স্বাদ—বুঝলেন, কি না—ঘোলেই মেটাতে হয়, হা হা হা হা!"

এই অদ্ভুত-প্রকৃতির লোকটিকে লইয়া বাপুলী মহাশয় যে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। আগন্তুক কিন্তু আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আপনি না কি

নাতনীটি নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। তা আপনার কোন চিন্তে নাই। আমারও এক ছেলে, পাশ টাশ নাই বটে, কিন্তু লেখা-পড়ায় হিসাব-নিকাশে একেবারে হুস্থুরী। কত জায়গা থেকে সম্বন্ধ আস্‌ছে। তা বুঝলেন কি না—সম্বন্ধ কি এলেই হোল? মেয়েটি লক্ষণযুক্ত, মনের মত, বংশটি ভাল, এ সকল চাইতো। টাকা—ছাই টাকা,—টাকায়—বুঝলেন কি না—কি আসে যায়। এই বয়সে কত টাকা রোজগার, কত টাকা খরচ কর্‌লাম। হা হা হা হা?"

বাগুলী মহাশয় এই নবাগতের সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; বলিলেন, "তা উঠে বৈঠকখানায় চলুন, একটু তামাক-টামাক"—

বাধা দিয়া আগন্তুক বলিলেন, "বল্‌ছি তো, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি তামাক খাই না। কোন নেশারই—বুঝলেন কি না—বশ হওয়া ভাল নয়। তামাক যে খেতাম না তা নয়; বললে না বিশ্বাস করবেন, দিনে একশ' ছিলিম তামাক, রাত্রে ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে তামাক খেতাম। তার পরে একদিন বুঝলেন কি না—ইষ্টিমারে কলকাতায় যাচ্ছি, এক বেটা চাষা নারকেল-ছোবড়ায় আগুন ধরিয়ে তামাক খাচ্চে। বড়ই ইচ্ছে হলো। গিয়ে হাত বাড়ালাম। তা বেটা চাষা বল্লে কি জানেন 'থামো ঠাকুর, তোমার লেগে সাজা হয় নি।' মনে বড়ই ধিক্কার হলো। সেই দিন থেকে বুঝলেন কি না—একেবারে ত্যাগ—হুঁকো কল্‌কে টিকে তামাক সব গঙ্গার জলে—"হা হা হা হা?"

অতঃপর বাগুলী মহাশয়ের অনুরোধে আগন্তুক প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলীকে উঠিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বসিতে হইল। সন্ধ্যার পর আর একবার মেয়ে দেখা হইল; মেয়ে দেখিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। আদান-প্রদানের কথা উঠিলে বলিলেন, "এর আবার চুক্তি কি, যারা ইতর, যাদের টাকার খাঁই—তারাই বুঝলেন কি না—আগে হ'তে চুক্তি করে নেয়। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার অভাব কি? আপনার যেমন ক্ষমতা তেমনি দেবেন; একটি হরীতকী দিয়ে—বুঝলেন কি না—কন্যা উৎসর্গ করবেন। আমাকে কি সেই রকম চামার পেয়েছেন! হা হা হা হা।"

পাঁজি খুলিয়া বিবাহের দিন দেখা হইল। মাঘের ২৭শে, ২৮শে ছাড়া আর দিন নাই। ২৮শে বজ্রবিবাহ—ফাল্গুন মাস অকাল। গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "তা হ'লে এই ২৭শে তারিখে, শুভকার্য্য নির্ব্বাহ করতে হবে। ফাল্গুনমাস অকাল, অকালে বিবাহ হ'তেই পারে না। আজ কাল আর এ সব মানে না, কিন্তু আমি—বুঝলেন কি না—এ সকল খুব মেনে চলি। আমাদের আর্য্য-ঋষিরা যে সব ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, তার একটিও বাজে নয়। আজকালকার লোক সব মুখ্যু কি না, এ সকলের কি বুঝবে? হা হা হা হা।"

অগত্যা ২৭শে তারিখেই দিনস্থির হইয়া গেল। মাঝে শুধু একটা দিন। পরদিন সকালেই বাগুলী মহাশয় বরের বাপের সঙ্গে গিয়া পাত্র দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিলেন। বিবাহের দিন সকালে গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেল।

(৩)

"বোষ্টম, বোষ্টম,—বেটা বোষ্টমের ছেলে।"

বাগুলী মহাশয় তখন হাতে আলোচাল লইয়া বরের হাঁটু ধরিয়া বরণ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় একটা গোল উঠিল,—"বোষ্টম, বোষ্টম,—বেটা বোষ্টমের ছেলে।"

কলরব করিতে করিতে গ্রামের একপাল লোক সম্প্রদানস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাগুলী মহাশয়ের হাত হইতে চালগুলা মাটীতে পড়িয়া গেল। একজন বরের হাত টানিয়া বলিল, "তবে রে বেটা বৈরিগী!"

বাগুলী মহাশয় বিস্ময়রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "থাম, এ বোষ্টম নয়, প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর ছেলে অমরনাথ—"

যোগীন পাল চীৎকার করিয়া বলিল, "ওর কোন পুরুষে প্রাণকেষ্ট গাঙ্গুলীর ছেলে নয়, বেটা ডাহা বোষ্টমের ছেলে।"

বাগুলী মহাশয় বলিলেন, "তার প্রমাণ?"

ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া খেতু বলিল, "তার প্রমাণ—আমি। এ সব আমার মামার কারসাজি বাগুলী মশায়, আপনাকে জাতঃপাত করবার ফন্দী। দেখুন দেখি, আপনি এই বেটাকেই আশীর্বাদ ক'রে এসেছিলেন কি না?"

একজন আলোটা সরাইয়া আনিয়া বরের মুখের কাছে ধরিল; বাগুলী মহাশয় বেশ করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "উহুঁ, বোধ হয় যেন সে নয়, যেন একটু তফাৎ—"

খেতু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "একটু কি, অনেকটা তফাৎ। সে বামুনের ছেলে, আর এ বেটা বৈরিগীর পুত। গদারাম বৈরিগীর ছেলে কেনারাম বৈরিগী। বেটা নাম গেয়ে বেড়ায়, আমি ওর সাতপুরুষের খবর জানি। আর প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলীটা কে জানেন? মামার বেয়াই তারাচাঁদ আকুলি।"

জনকয়েক লোক কেনারাম বৈরাগীকে টানিয়া লইয়া গেল। প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলী বা বরযাত্রদের কোনই উদ্দেশ মিলিল না। বাগুলী মহাশয় কুশাঙ্গুরী হস্তে বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

সহসা বাগুলী মহাশয় উঠিয়া দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরে মেনকা নবপট্টবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তখনও বসিয়াছিল। বাগুলী মহাশয় গিয়া তাহার হাত

ধরিলেন; পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আয় মেনকি, তোকে আজ দামোদরের হাতে সম্প্রদান কর্‌বো।"

বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে মেনকাকে টানিয়া আনিয়া কন্যার আসনে বসাইলেন। পুরোহিতকে বলিলেন, "মন্ত্র পড়ান।"

বৃদ্ধের উন্মাদভাব দেখিয়া পুরোহিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাপুলী মহাশয় পুনরায় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি মন্ত্র পাঠ করান। লগ্ন অতীত হইয়া যায়।"

পশ্চাৎ হইতে খেতু বলিল, "দামোদর তো আর মন্ত্র বল্‌তে পারবে না, তাঁর হয়ে মন্ত্র বল্‌বে কে?"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "আমি বল্‌বো।"

খেতু বলিল, "তার চেয়ে আমিই বলি না কেন।"

খেতু 'ফস্' করিয়া বরের আসনে বসিয়া পড়িল। সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "খেতু!"

খেতু হাসিতে হাসিতে বলিল, "পরে বল্‌বার পরে বল্‌বেন এখন লগ্ন বয়ে যায়।" শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। খেতু মেনকার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তোর কথা রইল না মেনী, তোর চেয়ে কালপেঁচা আমার বৌ হ'ল না।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিকভিত্তি ও তত্ত্ববিচার।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্ম"কে হিন্দুজাতির আদি ও মূল ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের প্রামাণ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া, নিজের ব্যক্তিগত মতামতের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন কেন? ইহার উত্তর দেবেন্দ্রনাথ দিতে পারেন এবং সম্ভবতঃ কতক দিয়াছেনও। আমরা শুধু পূর্ব্বাপর সাধ্যমত বিবেচনা করিয়া তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাস, সেই সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমোন্নতি বা অবনতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া, মোটামুটি তাহার ফলাফল চিন্তা করিতে পারি মাত্র।

বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার প্রেরণা আসিয়াছিল দেবেন্দ্রনাথ হইতে নয়, অক্ষয়কুমার হইতে। কিন্তু অক্ষয়কুমার যে ধর্ম্মবুদ্ধিতে বেদকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করিয়াছিলেন,—দেবেন্দ্রনাথ নানারূপ সংশয়দোলায় দুলিয়া পরিশেষে বেদকে অস্বীকার করিয়াও, অক্ষয়কুমারের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিষয়ে", অক্ষয়কুমারের সমধর্ম্মী ছিলেন না। বর্জ্জন করিবার সৎ বা দুঃসাহস অক্ষয়কুমারের মধ্যে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে ছিল, দেবেন্দ্রনাথে তাহা ছিল না। গ্রহণ করিবার ক্ষমতায় অক্ষয়কুমারের যেরূপ উদারতা ছিল, তাহাও দেবেন্দ্রনাথে ছিল না। স্থির হইল, যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বেদের অনেক তত্ত্ব এই বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণিত হইয়াছে, যে তাহা মিথ্যা। কাজেই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি বেদের উপর হইতে পারে না। এই যুক্তিতে অক্ষয়কুমার অগ্রণী হইয়া এবং শেষে দেবেন্দ্রনাথকেও টানিয়া উভয়েই বেদ পরিত্যাগ করিলেন।

প্রশ্ন উঠিল, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বেদ কি হইবে? হিন্দুর বেদকে, না হয়, বর্জ্জন করা গেল। কিন্তু কোন একটা বেদকে ত গ্রহণ করিতে হইবে? অক্ষয়কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "অখিল সংসারই আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য।" ব্রাহ্মসমাজের বেদ কোন বিশেষ জাতির, বিশেষ যুগের, বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থের সমগ্র বা অংশ হইতে পারে না। ইহাই অক্ষয়কুমারের সুস্পষ্ট ঘোষণা। দেবেন্দ্রনাথ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সঙ্কুচিত হইলেন এবং সত্যি সত্যিই এক বিশেষ জাতির

বিশেষ যুগের, বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থের—সমগ্র নহে, অংশকেই তিনি "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ" অর্থাৎ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বেদ বলিয়া প্রচার করিলেন। ইহাতে কি প্রকাশ পাইল? "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ" যে ব্রাহ্মদের বেদ, তাহার কারণ ইহা নয় যে, ঐ গ্রন্থ হিন্দুর মূল প্রামাণ্য শাস্ত্র উপনিষদ্ বা বেদান্ত-বাক্যের সংগ্রহ ও সন্নিবেশ। ঐ গ্রন্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের বেদ, কেন না উহা দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মপ্রত্যয়' সিদ্ধ সত্য। তবে ঋষিদের ভাষায় বা বাক্যে তাঁহারই 'আত্মপ্রত্যয়ের' প্রতিধ্বনি দেখিয়া তিনি সেই 'আত্মপ্রত্যয়' লব্ধ সত্য ঋষিদের বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং ঋষিদের বাক্য বলিয়া নয় দেবেন্দ্রনাথের আত্ম-প্রত্যয় বলিয়াই ইহা ব্রাহ্মদের বেদ।

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া, নানা কাল ও যুগের বিচিত্রতার মধ্য দিয়া ক্রমবর্দ্ধিত হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র একটি জীবন্ত বৃক্ষস্বরূপ। জাতির জীবনেই এই ধর্ম্মবৃক্ষ জীবন্ত। যদি কেহ মনে করেন যে, হিন্দুজাতি মৃত, তবে নিশ্চিতই এই ধর্ম্মবৃক্ষের পঞ্চত্ব ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কেহ হিন্দুজাতির জাতিত্বে অদ্যাপি বিশ্বাস করেন, এবং তাহার মৃত্যুতে সন্দেহ করেন, তবে তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, হিন্দুর শাস্ত্ররূপ ধর্ম্মবৃক্ষ এখনো জীবন্ত। এ অনাগত কালে এই বৃক্ষ তাহার জীবন-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া আরও কত নূতন শাখা-পল্লব, নূতন ফুল-ফলে শোভিত হইবে।

হিন্দুর ধর্ম্মবৃক্ষের কোন্ পল্লব, কোন্ ফুল, কোন্ ফল, এই দেবেন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ"! ইহা সে প্রাচীনবৃক্ষের কোন কিছুই নয়। ইহা উপনিষদ্‌কানন হইতে অযথা বিচ্ছিন্ন ও বিন্যস্ত পাঁচ ফুলের সাজি মাত্র। কেন ইহা হিন্দুর প্রাচীন ধর্ম্মবৃক্ষের অঙ্গ-সংলগ্ন নয়? যেহেতু, ইহাতে ধর্ম্মানুভূতির কোনই নূতনতত্ত্ব নাই। উপনিষদের যুগেই হিন্দুর ধর্ম্ম-বোধ থামিয়া যায় নাই। ধাপে ধাপে তাহার আরও নব নব বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। সেই সমস্ত অভিনব বিকাশ ও সাধনার, তত্ত্বের ও তাহার ব্যঞ্জনার ইতিহাস, দর্শন ও কাব্য খুবই প্রচুর। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুর ধর্ম্মের অভিব্যক্তির এই জীবন্ত ধারাটি সমগ্রভাবে ধরিতে পারিলেন কোথায়? তাঁহার জীবনে নূতন অনুভূতির তত্ত্ব আমাদিগকে কি দিলেন? সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের তত্ত্ব ও তাহার মজলিসি সাধনার নির্দ্দেশ কি ফেরঙ্গ বাঙ্গালীর পক্ষে আজ এতই নূতন বলিয়া মনে হইতেছে? কে জানে, সংস্কারের আলেয়া জাতির ভাগ্যলক্ষ্মীকে গত শত বৎসর কোন্ দিকে কতদূর লইয়া গিয়াছে? পাছে বাঙ্গালী পেছু হটিয়া মধ্যযুগে ফিরিয়া যায়, আশঙ্কায়,—যাহারা গোটা জাতিটাকে মেয়েমানুষ বানাইয়া এক কাল্পনিক "বিশ্ব-মনের" পতিত্বকে বরণ করিতে, ফেরঙ্গ-ভাব ও সাহিত্যের পৌরোহিত্যে ভাড়া করিতেছেন, তাঁহারা জানুন এবং নিশ্চিন্ত থাকুন যে, বাঙ্গালী মধ্যযুগে ফিরিয়া যাইবে না। যত দিন না পৃষ্ঠের উপর চক্ষু গজায়, তত দিন অন্যান্যের মত বাঙ্গালীও হাঁটিতে হইলে সম্মুখের দিকেই হাঁটিবে। তাঁহারা আরও জানুন যে, ধর্ম্ম-

সাধনায় বাঙ্গালীর পক্ষে মধ্যযুগেরও ওপারে সেই উপনিষদের যুগে,—ফিরিয়া যাওয়াও বড় বিপদ্ ও মুস্কিলের কথা, বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথের ঐ ব্রাহ্মধর্ম্মের বেদকে মাথায় লইয়া। কেন না, বাঙ্গালী জাতির বিশ্বাস এবং তাহার কাব্য, দর্শন, স্মৃতি, এক কথায় ইতিহাস সাক্ষী যে, উপনিষদের যুগে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম 'থাতিরজমা' হইয়া আটকিয়া রহে নাই। বাঙ্গালীর ধর্ম্মের প্রাণ আছে। সৃষ্টির প্রকট লীলায়, যুগে যুগে তাহার বিচিত্র প্রকাশও জাজ্বল্যমান। তবে যাহারা বাঙ্গালীর জাত মারিবার জন্য, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য,—'বিশ্বমোহাৎ উদ্ধাছরিব',—সেই সব বামণদের আমাদের কিছুই বলিবার নাই।

দেবেন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ" তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতের অভিব্যক্তি। বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিবর্ত্তনের ইতিহাস যখন উপনিষদের যুগকে অতিক্রম করিয়া, এমন কি, হাঙ্গর-কুম্ভীর-পরিপূর্ণ দুস্তর যে মধ্যযুগ, তাহাকেও যখন পার হইয়া এ দিকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন আর কেন মিছামিছি—অনর্থক ? তা ছাড়া স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ সম্ভবপরও নহে। দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদের যুগে অর্থাৎ তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্মে" সমগ্র বাঙ্গালী পেছু হটিয়া ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত কি না, কেহ ইচ্ছা করিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তবে গত ৭০ বৎসর ধরিয়া এ পর্য্যন্ত ভাবে ও ইঙ্গিতে জাতি যে উত্তর দিয়াছে এবং দিতেছে, তাহা খুব অস্পষ্ট নহে। কে বলিবে, বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াই দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্ম্ম-সংস্কারকে নিস্ফল করিয়াছেন কি না ? কে বলিবে, দার্শনিক আত্মপ্রত্যয়ের ঢক্কানিনাদে—নিজের ব্যক্তিগত মতামতের উপর ভিৎ করিতে গিয়াই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ইমারৎ আজ এমন ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে ? কে জানে, দৈবই প্রবল কি না এবং কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী ?

দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি—বেদ ছাড়িয়া তাঁহার আত্মপ্রত্যয়ের উপর পুঁতিয়াছিলেন, ইহা প্রথম দৃষ্টিতে অনেকের চক্ষুকে এমন এড়াইয়া যায়—যায় কি ? গিয়াছে—এবং এমন সব বড় বড় চক্ষুকে,—যে তাহা প্রকৃতই এক মহা দুশ্চিন্তার বিষয়। তিনি বেদকে ছাড়িলেন সত্য,—অথচ অক্ষয়কুমারের মত, ভরা সাহসে ও ভরা বুকে বলিতে পারিলেন না যে, একমাত্র সত্যকেই গ্রহণ করিব, তা সে সত্য হিন্দুর শাস্ত্রেই হউক—আর খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রেই হউক। কোঁমৎ,—লাপ্লাসের সত্য ত দূরের কথা। যাহারা ইংলণ্ডীয় বিশ্বমোহে মস্গুল হইয়া, আজ আমাদের পথের পাশে পড়িয়া ধুঁকিতেছেন—আর শিকলী-বাঁধা টিয়া পাখীর নকল বুলি সময় অসময় জ্ঞান হারাইয়া কপ্চাইতেছেন, তাঁহারাই অন্তক্ষেত্রে অন্ত অবস্থার বিপাকে পড়িয়া অক্ষয়কুমারের,—যাহা কেশবচন্দ্রেরও পূর্ব্বে—সেই ৭০ বৎসরের প্রাচীন বিশ্বপ্রীতিকে

কেন না স্মরণে আনেন, সন্ধান করেন? কেনই বা আজ এই সব বিশ্বমোহগ্রস্তেরা অখিলের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র ছাড়িয়া যখন দেবেন্দ্রনাথ বেদবর্জ্জনের পরেও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিকে "আত্মপ্রত্যয়ের" উপর দাঁড় করাইয়া, কেবল খানকয় উপনিষদের গোটাকয়,—তখনকার সমালোচনাতেই স্ববিরোধী,—শ্লোকের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন করিলেন, তখন তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের এই নিতান্ত বিসদৃশ ঘোরো হিন্দু-সংকীর্ণতায় চক্ষু বিস্ফারিত কেন না করেন? ঘটনায় ঘটায়, অবস্থায়, কর্ম্মে—?

বাঙ্গালীর সাহিত্য ও জীবন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হউক—এই আমাদের ইচ্ছা, আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি খুঁজিতে গিয়া যে বেদবর্জ্জন করিয়া নিজের 'আত্মপ্রত্যয়'কেই গ্রহণ করিলেন, ইহা অনেকের চক্ষুকে এড়াইয়া যায় কেন? কারণ, দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের মুখোস পরাইয়া, তাঁহার ব্যক্তিগত আত্মপ্রত্যয়কে বাহির করিয়াছেন। নিজের আত্ম-প্রত্যয়কে, শুধু 'আত্ম-প্রত্যয়' বলিয়া প্রচার করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। কারণ, তাঁহার আত্ম-প্রত্যয়ে নূতন প্রত্যয় ত কিছুই ছিল না কি না?—

অথচ ঋষিদের প্রাচীন অনুভূতি ও প্রত্যয় বলিয়া বেদের যে প্রামাণ্য মর্য্যাদা, তাহাও দেবেন্দ্রনাথ যে কারণেই হউক, অস্বীকার করিলেন। যদি ঋষিদের 'প্রত্যয়ে' দেবেন্দ্রনাথ আস্থাস্থাপন না করিতে পারিলেন, তবে তিনিও ত ঋষি,—কাজেই তাঁহার 'আত্ম-প্রত্যয়কেই' বা আমি কেমন করিয়া আস্থা করিব? আবার যদি আমার আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রত্যয়গুলি মিলাইয়া দেখিবারই প্রয়োজন হইল, তবে মূল উপনিষদ্‌গুলি দোষ করিয়াছিল কি? আর নিজের নিতান্ত ব্যক্তিগত 'প্রত্যয়'কে, অথচ যাহার সে এক প্রত্যয়ও নূতন নহে—সমগ্র ব্রাহ্মদের প্রত্যয় বলিয়া চালাইবার চেষ্টা,—আর যাহাই হউক, সাধু নহে। নীতিবিরোধী আর যুক্তি-বিরোধী ত বটেই।

এখানে দেবেন্দ্রনাথের মনের এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটা ছবি আমাদের সম্মুখে আসিয়া ধরা দেয়। তাঁহার স্বভাবে একটা ভীরুতা ও রক্ষণশীলতা ছিল—যাহার জন্য তিনি উপনিষদের মুখোস পরাইয়া তাঁহার 'আত্ম-প্রত্যয়কে' বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহার জন্য অক্ষয়কুমারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এক হিন্দু-শাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্র হইতে তাঁহার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, সংগ্রহ করিতে সাহস পান নাই। এই ভীরুতা, রক্ষণশীলতা বা সংকীর্ণতা—যাহাই বলি না কেন, কিছু আসে যায় না, ইহাই সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহার হিন্দুয়ানী বা হিন্দুত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অথচ তিনি বেদের মহাবাক্যগুলিকে ঋষিসত্যদ্রষ্টৃর উপলব্ধি বলিয়া কোন প্রামাণ্য

মর্য্যাদা দিতে নারাজ। বেদবর্জ্জনের পর আত্ম-প্রত্যয়ের উপর দাঁড়াইলেন। কিন্তু আত্ম-প্রত্যয়কে বেদের মুখোস না পরাইয়া বাহির করিতে সাহসী হইলেন না এইখানেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বংশগত প্রবল আভিজাত্যবোধ, তাঁহার প্রভুত্বাভিমানকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, এবং এই প্রভুত্বাভিমানের উপর দাঁড়াইয়াই তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রত্যয়কে, ব্রাহ্মসাধারণের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের বেদবর্জ্জন, 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে'র মুখোসে এমন বেমালুম ঢাকা পড়িয়া যায় যে, যাঁহাদের দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ, তাঁহারাও ইহা সম্যক্ ধরিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে আমি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের দৃষ্টি ও লেখনী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত-বিশ্লেষণে—এই মারাত্মক ভ্রমটিকে সম্ভবতঃ অনবধানতায় প্রশ্রয় দিয়াছেন, এবং দিয়া ভাল করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের বেদবর্জ্জন,—যিনি ত্রিবেদী, তাঁহার দৃষ্টিকে এড়াইয়া যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত হয় নাই। আশা করি, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার মতটিকে পুনরায় আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

আমরা এত দূরে দেখিতে পাইলাম যে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি অন্বেষণ করিতে গিয়া—বেদবর্জ্জন করিয়া তাঁহার 'আত্ম-প্রত্যয়ে'র উপর দাঁড়াইলেন, এবং সেই আত্ম-প্রত্যয়কে আবার উপনিষদের মুখোস পরাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া প্রচার করিলেন। বেদ পরিত্যক্ত হইলেন। আত্ম-প্রত্যয় গৃহীত হইল। ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য বিচ্ছিন্ন হইল, দার্শনিক ভিত্তিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিশু দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে রামমোহনের সহিত দেবেন্দ্রনাথের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বস্তুতঃই আলোচ্য।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

"হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পূজ্যপাদ কবি স্যর শ্রীরবীন্দ্রনাথ *

মায়াশবল ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বোপাদানভূত অনাদিনিধন এই নাদই আবার অনাহতাহত-ভেদে দ্বিবিধ। "যত্রাহম্ তদন্তরম্।" আহত কি না,—শ্রুত্যাদি উপায় দ্বারা অর্থাৎ স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনা তানাদি দ্বারা সাধিত ও উদ্গীত হইয়া যে নাদ, পিণ্ডদেহ হইতে বাহিরে আসিয়া জনসাধারণের নিকট ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বৈখরীরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বজনের মনোরঞ্জন করে, সংসারের জরা-জন্ম-মরণাদি ক্লেশ নাশ করে, সগুণব্রহ্ম-স্বরূপ তাহাই আহত নাদ।

সুতরাং বুঝিতে হইবে, সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ও আহতনাদ সাধনাই উভয় একই কথা। আহতনাদসাধন হইতেই স্বরগ্রামের ও শ্রুতি-পদার্থের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, দেহাভ্যন্তরস্থ বিবিধ স্নায়ুজাল-সংলগ্ন দ্বাবিংশ প্রকার সমবেদক মুখ্যস্নায়ুর প্রকম্পন হইতে দ্বাবিংশ শ্রুতির "বৈখরী" বিকাশ হইয়াছে। ষড়জাদি স্বরসপ্তকের অপেক্ষা ও আত্মনিষ্ঠ ভেদরহস্য এই দ্বাবিংশ শ্রুতিমধ্যেই নিহিত আছে। ইহাদেরই জাতি ও সংখ্যাগত পরস্পর ইতরবিশেষে মিশ্রণ-নিবন্ধন স্বরসপ্তকের বৈচিত্র্য সংঘটিত হইয়া থাকে। ষড়জঋষভাদি শ্রুতিভেদজাত বিভিন্ন স্বরসপ্তকের সাতটি নাম মাত্র। যে স্বরাদিদ্বারা ষড়জাদি পদার্থ সপ্তকের জ্ঞান হয় শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, তাহারা ব্যাকরণোপদিষ্ট বর্ণমালার অ-আ-ই-উ-এ-ও-ঔ রূপে প্রসিদ্ধ সাতটি স্বরবর্ণ; ইহাদেরই উচ্চাবচ উচ্চারণভেদ নিবন্ধন ষড়জাদি স্বরসপ্তক উদারাদি গ্রামত্রিতয়ে বিভক্ত, শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। ষড়জগ্রাম অ-গ্রামের বাচী। গান্ধার-গ্রাম ই-গ্রামের পর্য্যায়ান্তর; এবং মধ্যমগ্রাম ও উ-গ্রাম, ইহার সমানার্থক। প্রযত্ন অনুপ্রদানাদি নিমিত্ত কারণ-সহায় সঞ্জাত গ্রামত্রিতয়ে প্রবিভক্ত আরোহণাবরোহণাত্মক একবিংশ মূর্চ্ছনাকেই ব্যাকরণোপদিষ্ট অ হইতে ঔ পর্য্যন্ত, এই চতুর্দ্দশবিধ স্বর এবং ক-চ-ট-ত-প-য-শ এই ব্যঞ্জনবর্গ-সপ্তকের বিকাশের মূলীভূত হেতুরূপে আমরা পাইয়া থাকি। অনুস্বর বিসর্গ লইয়া অ হইতে ঔ পর্য্যন্ত ষোলটি স্বরবর্ণ এবং কচটতাদি বর্গসপ্তকে বিভক্ত ত্রয়োত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ একুনে ব্যাকরণোপদিষ্ট বর্ণমালার এই ঊনপঞ্চদশবর্ণ, সঙ্গীতশাস্ত্র-ব্যাখ্যাত ঊনপঞ্চাশদ্বিধ

* প্রেসিডেন্সী রঙ্গালয়ে সঙ্গীত পরিষদের অধিবেশনে পঠিত

কূটতান হইতেই ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, স্বরশব্দাদি নিত্য। সুতরাং এতদ্দ্বারা কেবল যে "সিদ্ধোবর্ণ সমাম্নায়" প্রতিপাদিত হইল, তাহা নহে, শাস্ত্রমতে সঙ্গীত হইতে যে যাবতীয় বৈখরীবাগ্ ব্যবহার সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও প্রতিপন্ন হইল।

সুতরাং বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, ষড়জাদি, ধাতুগত উপাদান ও কাল-পরিমাণার্থক হ্রস্বদীর্ঘাদিমাত্রা প্রযত্ন-প্রেরিত অনুপ্রদানাদি কর্তৃক পরিবিন্যস্ত হইয়া বিবিধ মূর্চ্ছনাতানাদিতে অভিব্যক্ত গীতাদি পদার্থ রচিত ও উদ্গীত হয়। স্বর বা ধাতু ও মাত্রা, গীত পদার্থের ঘটকাবয়ব বা সমবায়ী কারণ এবং পুরুষ-প্রেরিত প্রযত্নানু-প্রদানাদি, ইহারা নিমিত্ত-কারণ। শাস্ত্র বলিয়াছেন, কুম্ভকার যেমন উপাদানভূত সামান্য এক মৃৎখণ্ড কালক্রমে, প্রযত্ন-দণ্ডচক্রাদি নিমিত্ত-কারণ সাহায্যে বিবিধ ছাঁদে অভিব্যক্ত ঘটশরাবাদি যাহা কিছু তাহার বাগাবস্থায় বিবক্ষিত ছিল তাহারই স্থূল সৃষ্টি করিতে পারে, ঠিক তেমনই স্বরাদিবিদ্ তালজ্ঞ ব্যক্তি ধাতু ও মাত্রা সমবায়ে এবং প্রযত্নঅনুপ্রদানাদি নিমিত্ত সাহায্যে যখন যে ছন্দে যে রাগে ইচ্ছা, তখন সেই রাগে, সেই ছন্দেই গীতাদি পদার্থের রচনা ও যথাবিধ রীতিতে তাহার গান করিতে পারেন। বস্তুত, অসাধারণ সৌন্দর্য্যগ্রাহী কবির সূক্ষ্ম বাগাবস্থায় স্থিত যে আন্তর উপলব্ধি তাহাও একই রীতি অনুসারে বর্ণগতধাতু ও মাত্রা সমবায়ে বিচিত্র ছন্দোনিবদ্ধ হইয়াই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূলরূপ পরিগ্রহ করতঃ প্রাকৃত জনসাধারণ-সমক্ষে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

"কাব্যে ছন্দের যে কাজ, সঙ্গীতে তালের সেই কাজ" ইহা অতি সত্য কথা। "তাল সঙ্গীতের একটি প্রধান অঙ্গ।" তালই, সঙ্গীতের ছন্দকে ফুটাইয়া দেখায়। সঙ্গীতে স্বরাদিধাতু-বিন্যাস-সমুদ্ভূত পদাদির অন্তরালে অবস্থিত যে অরূপী অনির্ব্বচনীয় ভাব, তাহা ছন্দোনিবদ্ধ হইয়াই অস্মদ্‌সমক্ষে অপরূপ রূপ ধারণ করে। এই জন্যই হিন্দু সঙ্গীতে তাল সম্বন্ধে এতাদৃশ আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধি নিয়ম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

"সঙ্গীতের মুক্তি"-শীর্ষক প্রবন্ধে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশী, সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়ে কড়াকড়ী যখন বড় হয়, তখন দরকারটাই মাটী হইতে থাকে। * * * ইউরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেক বারেই সমের কাছে গানকে আপন কালের হিসাব নিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না। কেন না, সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা তাঁর নিজের সীমানা বাঁধিয়া দেন।" * *

প্রতীচ্য সঙ্গীত-বিদ্যার সমাচার আমি বেশী রাখিতে পারি নাই। সুতরাং মাঝে মাঝে তাঁহারা সঙ্গীতে বেতালের প্রশ্রয় দেন কিনা, তাহা জানি না। তবে জানি যে, Musical sound meens a uniformity in the periodicity of vibration। এই uniformity of periodicityতে ব্যভিচার যদি ইউরোপীয় সঙ্গীতশাস্ত্র প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রতীচ্য সঙ্গীত-শাস্ত্রের মূলে বৈজ্ঞানিক তথ্য অতি স্বল্প পরিমাণেই নিহিত আছে। হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রের তালাধ্যায়টি কিন্তু বিশ্বব্যাপ্ত কালসম্বন্ধীয় একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিখিল লোক-ব্যবহার এই কালজ্ঞান হইতে জন্ম লাভ করে। কোন্ কালে ইহা করিতে হইবে, এবং কখন্ ইহা করিতে হইবে না, কালজ্ঞান ব্যতীত তাহার অবধারণ অসম্ভব। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানভেদে কাল ত্রিবিধ। পর্য্যায়ক্রম হইতে আমাদের এই কালজ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞানের স্বরূপ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, ইহা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রিকাল-বিষয়ক। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত সংবদ্ধ করিতে না পারিলে বিজ্ঞানের উদয় হয় না। সত্য বা তত্ত্বজ্ঞানই বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক তথ্য (Scientific Truth) প্রাকৃতিক নিয়মসমুদায়েরই পর্য্যায়ান্তর। প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? যে অব্যভিচারী নিয়মানুসারে পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জগতে কার্য্য সম্পাদন করেন, আপনাকে প্রকাশ করেন, আত্মশক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। "Scientific truth is but another name for the laws of nature and a law of nature is merely the uniform mode in which the Diety operates in the created universe." পরিণামের ফলাফলের অপেক্ষা রাখিয়া প্রাকৃতিক তথ্যসমূহ যখন সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্যসিদ্ধি-সাধনোপায়স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন বিজ্ঞান পুষ্টি লাভ করে। ফলাফল কিন্তু উপাদানভূত ধাতু ও পরিমাণার্থক মাত্রাজ্ঞান-সাপেক্ষ। মাত্রাসমষ্টিই কলনাত্মক কাল। বর্ত্তমানের সহিত অতীতানাগতের অব্যভিচারী সম্বন্ধ-জ্ঞানই কালজ্ঞান। সুতরাং বুঝিতে হইবে, অতীতের অপেক্ষায় পরিমাণাত্মক অব্যভিচার ভবিষ্যদ্দর্শনই (quantitative prevesion) পরিপুষ্ট বিজ্ঞান (Devoloped science)। পরিপুষ্ট বিজ্ঞান, কলাবিদ্যারই নামান্তর মাত্র। অরূপীকে রূপ প্রদান করিবার জন্য, অনির্ব্বচনীয়কে বচনভঙ্গীতে প্রকাশ করিবার জন্য, কলাবিদ্যার প্রয়োজন ও প্রচার হইয়া থাকে। সঙ্গীতে, কাব্যে, চিত্রকলায় আমরা ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। কলা কিন্তু কৌশল ব্যতীত উৎকর্ষলাভ করিতে পারে না। যে উপায়ে কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধ্য হইয়া উঠে, তাহাই যোগ, তাহাই কৌশল, "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"।—সঙ্গীত-শাস্ত্রের তালতত্ত্বে, কাব্যের ছন্দতত্ত্বে, আমরা এই পরিপুষ্ট বিজ্ঞানের সমাচার পাইয়া থাকি।

পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, যেমন হ্রস্বদীর্ঘমাত্রা-বিন্যাসই ছন্দের স্বরূপ, সঙ্গীতে তালও ঠিক তদ্রূপ। কলনাত্মক কালই তাল। তাল ছন্দের পর্য্যায়মাত্র। কাব্যে নিহিত ছন্দের ন্যায় তালেরও সঙ্গীতে যতি আছে। সঙ্গীতে তালের যতিকে 'লয়' বলে। লয় প্রাদুর্ভাব-ফলক (প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ফল যাহার) অত্যন্ত বিনাশ নহে। অতীতের অপেক্ষায় পরিমাণাত্মক ভবিষ্যদ্দর্শনই সঙ্গীতে তালের লয় প্রদর্শন। যেমন মাত্রা-সংখ্যা ও যতিগতভেদ নিবন্ধন ছন্দে বিভেদ ঘটিয়া থাকে, সঙ্গীতেও ঠিক তেমনই মাত্রা-সংখ্যা ও লয়ভেদে তালের প্রকারভেদ, সুতরাং নামভেদও হইয়া থাকে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত তালতত্ত্ব পরিপুষ্ট বিজ্ঞান-সম্মত, এবং যাহা বিজ্ঞান-সম্মত, তাহা অব্যভিচারী হইবারই কথা। এই জন্যই হিন্দুর কি সমাজতন্ত্রে, কি সঙ্গীততন্ত্রে বিধিবিধানের ব্যভিচার লইয়া এতাদৃশ কড়াকড়ী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেন না, পরিপুষ্ট বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারে ব্যভিচারের প্রশ্রয় নাই।

সে যাহা হউক, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধাতু-মাত্রা-সমবায়ে স্বরতালজ্ঞ যখন যে রাগে, যে তালে ইচ্ছা, সেই রাগে ও তালে গীত রচনা এবং গানের সহিত তাহার সঙ্গত করিতে পারেন। কিন্তু সঙ্গীতের "মুক্তি-শীর্ষক" প্রবন্ধের পাঠকবর্গ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, আমি কথাটি বড় জোর করিয়া বলিতেছি। কারণ, বিশ্ব-বিশ্রুত কবি লিখিয়াছেন, "অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি। * * * এজন্য ছন্দস্তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সে, ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন * * * আমার রচনার উপর তালের দেবতা * * * ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জ্ঞান ছিল, ছন্দোমধ্যে যে নিয়ম আছে, তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম * * * সুতরাং তারসংযমে সঙ্কীর্ণ থাকিতে পারে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই।"

"কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে। এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কি উৎপাত ঘটিল, একটি দৃষ্টান্ত দিই।"—কবি-প্রদত্ত প্রথম দৃষ্টান্তটি এই,—

কাঁপিছে দেহ-লতা থরথর
চখের জলে আঁখি ভর ভর
দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমার নীল বাসে নীল কায়া
বাদল নিশিথেরি ঝরঝর
তোমার আঁখিপরে ভরভর ইত্যাদি।

ইহার উপর টিপ্পনী-স্বরূপে কবি লিখিতেছেন, "এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটিই এ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি, যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুসী ছিলেন, তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ ছন্দের এক অংশে সাত, আর এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তালে মেলে না।"

এই ত গেল কবির কথা। ছন্দে যদি দোষ না থাকে, তবে সুরে গান করিলে, কেন তালযোগে সঙ্গীত করা যাইবে না? এ কথা কি বেশ পরিষ্কার করিয়া তালতত্ত্ববিদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল? সাহিত্যের দৃশ্‌ভূমি হইতে কবিতাটি আলোচনা করিবার এ স্থান নহে। কবিতাটি যেমনই হউক, সপ্তমে চতুর্থে যতি বিন্যস্ত আছে। আপনারা সকলেই জানেন, বাঙ্গালা পদ্যে হ্রস্বদীর্ঘভেদ-বিবর্জ্জিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দই বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাও সেই একাদশাক্ষরনিবদ্ধ বর্ণবৃত্ত 'বিলাসিনী' ছন্দের স্বরূপ। 'বিলাসিনী' ছন্দে, যতি-বিন্যাসের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায়, ইহার সপ্তম চতুর্থে যতি-বিন্যাসে, কোনই ক্ষতি হয় নাই। (পিঙ্গলাচার্য্য-কৃত ছন্দঃসূত্র ষষ্ঠাধ্যায়, ২৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সুতরাং হ্রস্ব-দীর্ঘ-বিবর্জ্জিত বাঙ্গলা পদ্য সাহিত্যে সপ্তমে চতুর্থে যতি বিন্যস্ত একাদশাক্ষরাত্মক 'বিলাসিনী' ছন্দ কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী ছন্দে গান করিলে, তালযোগে তাহার সহিত সঙ্গত অনায়াসে চলিবারই কথা। সঙ্গীতশাস্ত্রে তালতত্ত্বের মূলীভূত বৈজ্ঞানিক তথ্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, এ বিষয়ে কবির ঔদ্ধত্যকে ভয় করিবার প্রকৃত তালজ্ঞ ব্যক্তির কোনই কারণ নাই। কারণ, যাবতীয় 'বিলাসিনী' ছন্দ, যে শাস্ত্রব্যাখ্যাত তালে সঙ্গত করা যাইতে পারে, সেই একাদশমাত্রাত্মক তালে, সাতটিতালি ও চারিটি ফাঁক আছে এবং ছন্দের অনুযায়ী সপ্তমে ও চতুর্থে লয় আছে। আপনাদের সমক্ষে পরীক্ষা করিলে, এ কথার যাথার্থ্য এখনই প্রতিপাদিত হইবে।

এই ত গেল এগারমাত্রার কথা। কবিবিরচিত আরও একটি গান—

"দুয়ার মম পথ পাশে,
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তাহার রথ আসে,
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি॥"

কবিবর কর্ত্তৃক দৃষ্টান্তরূপে ধৃত ইহা নয় মাত্রার ছন্দ। ইহাও অক্ষরবৃত্ত এবং পঞ্চমে চতুর্থে যতি বিন্যস্ত। হ্রস্বাদি ভেদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহাকে ছন্দোমঞ্জরী-ব্যাখ্যাত "মণিমধ্য" ছন্দের মধ্যে গ্রহণ করা যায় (ছন্দোমঞ্জরী ৩২ পৃঃ ছঃ কুঃ

২২ পৃষ্ঠা)। 'মণিমধ্য' ছন্দে পঞ্চম চতুর্থে যতি বিন্যস্ত হইয়াছে। যদি ঠিক ঠিক ছন্দানুযায়ী গানের সহিত সঙ্গত করিতে হয়, তাহা হইলে যে নয়মাত্রাত্মক তালযোগে সঙ্গত করিতে হইবে, সেই তালে ছয়টি তালি এবং তিনটি ফাঁক আছে। আর ছন্দানুবর্ত্তী পঞ্চমে চতুর্থে লয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবি লিখিয়াছেন যে, এই পাঁচচাধে যতি বিন্যস্ত নবাক্ষরবৃত্ত ছন্দটিকে উল্‌টাইয়া চতুর্থে পঞ্চমে যতি বিন্যস্ত করিয়া নূতন ছন্দে গান রচনা করিয়া, নয় মাত্রার ছন্দকে নয়ছয় করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, তালজ্ঞ ব্যক্তিও ঠিক তদনুরূপ চতুর্থ পঞ্চমে প্রদর্শিত লয়বিশিষ্ট শাস্ত্রসিদ্ধ তালযোগে সঙ্গত করিয়া সভামধ্যে কবির সহিত নকড়া-ছকড়া খেলিতে পারেন।

আরও একটি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। কবি লিখিতেছেন, "চৌতাল ত বার মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বারমাত্রা রক্ষা করিলেও, চৌতালকে রক্ষা করা যায় না। এই ত বার মাত্রা" ;—

"বনের পথে পথে বাজিছে বায়
নূপুর রুণু রুণু কাহার পায়।
কাটিয়া যায় বেলা, মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে,
ভ্রমর মুখরিত বকুল-ছায়
নূপুর রুণু রুণু কাহার পায়।"

এই ত কবিতা। কবি লিখিতেছেন, "ইহা চৌতাল নহে। একতালাও নহে, ধামারও নহে, ঝাঁপতালও নহে। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করেন।"

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, বার মাত্রার হইলেই, সেটি হয় একতালা, না হয় যে চৌতাল হইতেই হইবে, সঙ্গীতশাস্ত্র এমন কি কোন কঠিন নিয়ম বিধান করিয়াছেন? বার মাত্রার তাল আরও অনেক প্রকার আছে। যেমন খেম্‌টা, আড়খেমটা, রাস, মোহন ইত্যাদি বার মাত্রায় ছন্দ। লয়ের প্রভেদ হেতু ইহাদের বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। ধামার যে সাত মাত্রার তাল, তন্মধ্যে ছয়টি পূর্ণমাত্রা, আর দুইটি অর্দ্ধ মাত্রার তাল। সুদক্ষ বাদ্যকরের হাতে তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে। এই জন্যই ধামার এখানে খাটিবে না। ঝাঁপতালও দশ মাত্রার তাল, সুতরাং কবিতার ছন্দ যখন বার মাত্রায় নিবদ্ধ, তখন কবির অভিপ্রায় অনুসারে গান করিতে হইলে, ঝাঁপতালে ইহার সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিলাম না, কবি কোন বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া ধামার এবং

ঝাপতালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। যাক্ সে কথা। প্রোক্ত দ্বাদশাক্ষর নিবদ্ধ ছন্দটী, ছন্দশাস্ত্রব্যাখ্যাত 'বাহিনী' ছন্দ। 'বাহিনী' ছন্দে সপ্তমে ও পঞ্চমে যতি বিন্যস্ত হইয়া থাকে। বাহিনী-ছন্দে গ্রথিত যে কোন কবিতা সুরযোগে গান করিলে, যে বার-মাত্রাত্মক ঠেকা সহকারে সঙ্গত করিতে হইবে, শাস্ত্রসিদ্ধ সেই তালেরও সপ্তমে পঞ্চমে লয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

আরও একটা,—ইহাও কবি বিরচিত নয়মাত্রাত্মক ছন্দ। নাম 'কমলা, ষষ্ঠে ও তৃতীয়ে যতি। (ছন্দমঃ ৩৩ পৃঃ এবং ছন্দ কুসুম ২২ পৃঃ)। কবিতাটি এই,—

"যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে, সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে, সে বাঁধনে তারে বাঁধিল"। ইত্যাদি

যে নয় মাত্রাত্মক তালযোগে, ইহার সহিত সঙ্গত করিতে হইবে তাহারও ষষ্ঠ তৃতীয়ে লয় প্রদর্শিত আছে।

কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী বাংলায় বর্ণবৃত্ত ছন্দে গান করিলে, গানের চেহারাটী কি রূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহা বোধ হয় আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এখন আমাদের শাস্ত্রসঙ্গত পরম্পরাগত প্রথানুযায়ী এই কবিতাটিতে রাগিণী যোজনা করিয়া তাহার সহিত সঙ্গত করিলে, কবিতার রূপশ্রীর কিরূপ ক্ষয় অপচয় হয়, তাহাই একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

পরম্পরাগত প্রথানুযায়ী সঙ্গত করিলে, কবিতাটি যে রূপ পরিগ্রহ করে, তাহা বোধ হয় বিশেষজ্ঞে বুঝিতে পারেন। এই প্রথানুযায়ী মাত্রাবৃত্ত তালে সঙ্গত করিবার সময় কবিতার কোন ভাব বিপর্য্যয় ঘটে কি না, আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

আচ্ছা, আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য কবিবিরচিত ছন্দ আরও একটী তুলনা করিতেছি। নূতন ছন্দে গ্রথিত কবিতাটি এই,—

"ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে।" ইত্যাদি।

ইহাও পিঙ্গলাচার্য্য ধৃত 'হলমুখী ছন্দ'। ইহার তৃতীয়ে ও ষষ্ঠে যতি বিন্যস্ত হইয়াছে। এতদ্ সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন, "এটা যে কি তাল, তা আমি 'আনাড়ী' জানি না, কোনও ওস্তাদ জানেন না।"

ইহা কূপ-মণ্ডুকের কথা। বিশ্ববিশ্রুত কবির মুখে ইহা শোভা পায় না। আমার পুঁজিপাতার ভিতরে নাই, অতএব আর কোথাও থাকিবে না, এটা অতীব বিচিত্র

ধারণা। যাহা আমি কল্পনার ভিতরে আনিতে পারি না, তাহাই অসম্ভব, ইহা ন্যায়-বিরুদ্ধ কথা। এই গানটি 'বসন্ততালে' সঙ্গত করিতে হইবে। "বসন্ততালে কর্ত্তব্যো-নগণগনমস্তথা"। ইহাও নয় মাত্রাত্মক তাল, ইহাতে ছয়টি তাল ও তিনটি ফাঁক আছে এবং তৃতীয়ে ও ষষ্ঠে যতি বিন্যস্ত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি

জ্বালা

(১)

পায় ধরি' ডেকেছিল সাধি' যবে এ রাধায়
দর দর ধারা চোখে ম্লানমুখে শ্যামরায়,
নিদারুণ অভিমানে সে কথা তুলিনি কানে
আজি যে রে তারি তরে কেঁদে কেঁদে সারা হই—
জগৎ আঁধার মোর সেই বাঁকা শ্যাম বই।

(২)

সে দিন হইতে সই সে যে হ'ল জপমালা
শয়নে স্বপনে সদা ভাবি মনে কালা কালা,
শ্বাসে শ্বাসে অবিরাম করি মম শ্যামনাম
হিয়ার মাঝারে মোর একি জ্বালা জ্বলে সই—
কতটুকু জ্বালা আর জ্বলে তুষানলে সই।

(৩)

মুদিব নয়ন চির যে দিন তমালতলে
হেরিব আলোক নব মম মন আঁখিজলে,
অণু-পরমাণু কালা কালারূপে ব্রজ আলা
তুমি আমি সারা ধরা কালা ভয়া হবে সই—
লভিবে জীবন রাধা কালাধনে তবে সই।

শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রেয়।

কমলের দুঃখ

(হারুমাষ্টার—রজনী দত্ত)

কি রজনী দা ! মাষ্টার যা বলেছিল, তা হলো কি না ? আর কি, পথ সাফ ; এ দিকেও সাফ্ ও দিকেও সাফ্ ! এখন শুধু দাদা, তোমার কেরামতিতেই সব দাঁড়িয়ে যাবে। কথাটা কি জান ? বড়কর্ত্তা ত বেশ বেমালুম সরে গেল, সে জন্যে তোমার আমার কোন বৃহৎ উৎকণ্ঠার প্রয়োজনই নাই। এখন কথাটা হচ্ছে কি ? বাবু সময় অসময়ে আমার ঠেঙে কিছু টাকা নিতেন। আমি সে টাকা, জানত ভাই কড়ার ভিখিরী, আমি নিজে আর দেব কোত্থেকে। পরের কাছ থেকে, জামিন হয়ে সেই সব টাকা দিয়েছি। এখন তুমি ত দাওয়ান হলে, এখন আমার গতি কি হবে ? হেনা বাইজী এখন কেনা গোলাম হবার কায়েমী বন্দোবস্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলেন, সে দফা নিশ্চিন্দি। এখন সেই হেনাটিকে ত—বুঝলে কি না, কেন দাদা, বলি, আমাদের প্রাণে কি আর সখ থাক্‌তে নেই ? বলি কুঁজোর কি আর চিত হয়ে শুতে সাধ যায় না গা। এতদিন ধরে যে খেজমতি করে এলুম, কেন হা ! ওই টাকা বুঝি শুধু, তবে আর মাথাটা খাওয়া কি করে হয়। বেটী যেমন আমায় ঘেন্না করে—শালিকে এবার মাষ্টার কি ইয়ার, দেখাব। বল ত দাদা ! আমার না হয় রূপই নেই, তাই বলে কি রঙের গোলাম আমার হাতে নেই। এ প্রাপুর চোদ্দ এখন বাবা আমার হাতে। সব সোনা, জহরৎ হীরে—এখন বুঝলে রজনী দা, হরিনাম সত্য ! হরের্নামৈব কেবলম্। দেখি হেনা কি চিজ্, আর আমিই কি চিজ্। তোমায় কিন্তু দাদা, একবার ওই হ্যাণ্ডনোটগুলো, সই সাবুদের কথা—বুঝলে,—একবার আমাদের এখানে এসো। দাওয়ানী ফৌজদারি যখন ভাগ করা গেছে, তখন এটার একটা ভাগাভাগি করে নিলেই হবে, কি বল ?

(কমল—অমর)

ভাই অমর !

তোমরা আমার হঠাৎ নিরুদ্দেশে খুব চিন্তায় পড়েছিলে, এ আমি বেশ এখন বুঝেছি। আমার জন্যে তোমরা এত ভাব, এও আমার কত সুখের। আবার তাই আমার কত দুঃখের। আমি তোমাদের মধ্যে কতটুকু, তবু তোমরা কেন আমার এত কর ? বৌদিদি—যেন মৃতের মত হয়ে গিছলেন,—বৃদ্ধ দাওয়ানের যেন পুত্র-শোক—বাড়ীর সকলেরই যেন কি এক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। আমার জীবনেও

একটা বদল হয়ে গেছে। তোমায় আজ যে কথা জানাচ্ছি, সে কথা সকলের জানা উচিত নয়।

সে দিন রাত্রে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, সুধীরের সঙ্গে একবার দেখা করতে; আর একটা জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল—অমনি সেরে যাব। সুধীরের সঙ্গে দেখা ক'রে অনেক বকাবকি করলাম; সে শুধু মদ আর মদ—ছেলেটার জন্যে একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে। তাই ওই সুরায় সব শোক ডুবাতে চায়। বলে—"হয়ে গেছে হে, হয়ে গেছে; যদি ঢালায় রাজি হও, বোস—না হও সোজা চ'লে যাও। তোমরা জ্ঞানের রাজ্যে যত পার, কাব্যাদর্শ রচনা কর,—প্রতিমা গড়, মানসী গড়, যা খুসী কর, আমি শুধু ঢালি—সেরেফ ঢালি, যে দিন ফুরুবে, সে দিনও ঢালব। শুনব, বুলবুল বলছে, শুধু মশগুল হয়ে থাক—চাঁদের রোসনি ছেঁকে পান কর, চালাও চালাও—আলো আঁধার কিছুই চাইনে। তোমাদের মতে যখন আলো আঁধার দুই-ই স্বপ্ন—তখন আমার এও স্বপ্ন মনে কর না কেন? তোমরাও স্বপ্ন দেখছ! ইয়ার! রূপের মধু প্রাণ ভ'রে, 'তোমরা জ্ঞানের নিক্তিতে ওজন ক'রে খেতে চাও, আর আমি না হয় রূপ ভোলবার মধু অজ্ঞানের পাল্লা ভ'রে পান করি। তফাৎ কোন্-খান্টায় বলতে পার, যখন তোমার সবই স্বপ্ন? তোমার ফুল ফোটাও স্বপ্ন—তোমার পাখীর গানও স্বপ্ন—তবে আর কেন আমায় টানাটানি? এই দেখছ সার সার এ পিয়ালা, এখন আমার রসিকা প্রেমিকা; যত রকমের সুরা আছে, সব এক ক'রে মিশিয়ে দেখছি—কি বোল বলে, কি বুদ্‌বুদ কাটে, কি সোহাগ করে। এই দেখ, শোন, এ বলছে ভালবাসি, ও বলছে ভালবাসি। ও আমার—এ আমার—পিয়া কি বলছে, তা জান না—আমি তোমারি, এই তোমার পাখী! হাঁ হাঁ, আমার একটা পাখী ছিল, বেড়ে গাইত, সে কি আওয়াজ, প্রাণ তর হয়ে যেত। আমি গেলাম 'অখণ্ডমণ্ডলাকারম্ ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্'; এসে দেখলাম, পাখী ঠিক ফাঁকি দিয়েছে—আমিও এখন দেখছি অখণ্ডমণ্ডলাকার, তুমি দেখতে চাও—ঢাল, পান কর, আরে ছ্যাঃ, তুমি সাম্য বোঝ না। দেখ দেখ, পান ক'রে দেখ—মায়ার পর্দা স'রে যাবে; কেবল দু-হাজার বুলবুল তোমায় প্রাণের তারে ঝঙ্কার দেবে। কেয়া তারিফ্! হাহা হাহা—ঢাল ঢাল, চালাও।" বলতে বলতে যেন সে উন্মাদের মত হয়ে উঠল। কি বলব—বুঝেছি এর আঘাত কোন্‌খানে। আমি, আমি কেঁদে ফেল্লাম, ঝর্ ঝর্ ক'রে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমার মুখের দিকে চেয়ে খুব জোরে হাসলে; বললে "বহুত আচ্ছা! তোমার তবে স্বপ্ন নয়, সত্যি! বেশ এস, এস, এই পান কর, এতে তোমার সব সত্যি আছে। যখন সমুদ্রমন্থন হয়েছিল,—তখন এ উঠেছে। এস এস, দেরী ক'র না—নাও, ধর, তোমার

সব সত্যি ভেঙে একেবারে স্বপ্নে ডুবে যাবে। ওহো! ওহো! কাঁদ কাঁদ ভাই, এখানে নয়; দেখ,—যখন রবির সঙ্গে ধরার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল—তখনও ধরা এমনি কেঁদেছিল। অনন্ত লবণ-সমুদ্র হয়ে গেল, ও দুচার ফোঁটা নোনাপানি কেন ঝরাচ্ছ। এই দেখ,—সেই সমুদ্রমন্থন ক'রে এই পেয়েছি সব সত্যি, সব রসের সেরা রস এতে আছে। এস, পান কর। আর নয়, যদি স্বপ্ন সত্যির পার্থক্য, জ্ঞানের দরজায় মাথা ভেঙে আদায়ের চেষ্টায় থাক, উঠে যাও। সেরেফ চ'লে যাও, সোজা রাস্তা—দেখবে 'আচা-ভুয়ো-বোম্বাচাক্,—যাও।" আমি বল্লাম, "ভাই! সব বুঝ্ছি, কিন্তু এতে কি তোমার জ্বালা নিভেছে—এতে কি শান্তি পাও? এ ত আর—" সুধীর আরো যেন উন্মাদের মত গর্জ্জে উঠ্ল, "কে নিভাতে চায়,—যাও যাও,—কে জ্বালা নিভাতে চায়? এ যেখান দিয়ে গঙ্গায় নাবে, জানান দিয়ে যায়। কে চায় নিভাতে—কোঃ! শান্তি মেয়েমানুষের কথা, যাও যাও, সেইখানে কাঁদ গে। এখানে নয়, এখানে নয়। এক কান্নার জ্বালায় এখানে, আবার কান্না—যাও যাও।" আমি তখন তার হাত ধ'রে বল্লাম, "না ভাই, চল আমরা বাড়ী যাই!" সুধীর বল্লে, "কার জন্যে—না না—আঃ-আঃ!" হঠাৎ তার সমস্ত গলার স্বর বদ্‌লে গেল, ভয়ানক চেঁচিয়ে উঠ্ল—"আঃ—আঃ—আঃ! সত্যি ভেঙেছে, স্বপ্ন—স্বপ্ন, ছেড়ে দে হাত—বেরোও এখান থেকে, খুন করব—খুন করব, আবার এখানে কান্না? আঃ—আঃ!" ব'লে বোতল নিয়ে এমন তাড়া করলে যে, আমাকে আর অন্য উপায় করা চল্‌ল না, ফির্‌তে হ'ল। হায় অমর! কি ছিল, কি হয়ে গেছে; সেই সুধীর আর এই সুধীর! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফির্‌লাম, তখনও চেঁচাচ্ছে—"আঃ আঃ, আবার কান্না, আবার কান্না! সত্যি উঠেছে—সমুদ্রমন্থনে এই সত্যি উঠেছে। হো-হো-হো-হো! ঢাল্ ঢাল্।" ভাবৃতে ভাবৃতে পথে চল্‌তে চল্‌তে অনেকটা এগিয়ে গেলাম। ভাব্‌ছিলাম, এই যা চোখের সাম্‌নে দেখছি, এই যে অদৃশ্য ফুলের গন্ধ বাতাস বহন ক'রে নিয়ে আস্‌ছে, এই যে গভীর নিশীথে বায়ুর স্পর্শে চন্দনের স্নিগ্ধ সুবাস ভেসে আস্‌ছে, এ সব কি স্বপ্ন! আমার চক্ষু, শ্রবণ, নাসা—সবই—স্বপ্ন! এই রূপরসগন্ধময়ী পৃথিবী, এই আদিত্যাদি বরুণ, এই মহা অন্ধকার, এ সবই স্বপ্ন! স্বপ্নই ত। যখন থাকে না—যখন চঞ্চল, তখন স্বপ্ন বৈ কি। শিশুর হাসি দুদিনে ম'রে যায়, যুবতীর ব্রীড়া রোগে কুঞ্চিত হয়, পদ্মপলাশলোচন কোটরে প্রবিষ্ট হয়; ফুল ফোটে, ঝ'রে যায়; মহীরুহও কালে নষ্ট হয়। তবে সত্যি আর কি—গতাগতি। স্বপ্নও গতাগতি—সত্যও গতাগতি। আসে—যায়। ভাবৃতে ভাবৃতে অনেক দূরে এগিয়ে গেলাম; অন্ধকার আকাশে অগণ্য তারা জেগে রয়েছে,—মাথার উপর দিয়ে ছায়াপথ যোজন যোজন ব্যাপী বিস্তার ক'রে চলেছে, চারিদিকে ঝিল্লীর ঝঙ্কার, এক পাশে মাঠের পর মাঠ; অন্ধকারে ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুলিয়ে বাতাস ভেসে আস্‌ছে।

আর এক পাশে গ্রাম, মাঝে মাঝে বাগানবাড়ী। ভাব্‌লাম, এতদূর এসেছি ত আমাদের বাগানটায় গিয়ে উঠি। রাতও অনেক হয়েছে। পথে চল্‌তে চল্‌তে যেন একটা শিয়াল ডেকে চ'লে গেল, একটা কাল-পেঁচা ভয়ানক বিকৃতস্বরে চেঁচিয়ে ডেকে উড়ে গেল, শোঁ শোঁ ক'রে পাশ দিয়ে বাতাস জোরে বয়ে গেল; কখনো পাতার উপর মাড়িয়ে গেলে যেমন শব্দ হয়—এমনি শব্দ। পাশে একটা বাগান—জঙ্গলের মত দূরে সেই ভাঙা বাগানখানা; যেখানে তুমি দেখতে যেতে চেয়েছিলে, সেইখানটার মত মনে হ'ল; দূরে কে যেন একটা দীপ হাতে ক'রে স'রে স'রে যাচ্ছে মনে হ'ল। হঠাৎ একটা দাঁড়কাক কা কা ক'রে মাথার উপর দিয়ে ডেকে গেল। অন্ধকারে যেন কার পায়ের শব্দ—পিছনে; তার পরই কে আমার পিঠে কিসের আঘাত করলে। আমি ফির্‌তে ফির্‌তে ঘুরে পড়ে গেলাম, যখন পড়্‌ছি তখন সাম্‌নে চোখের উপর একখানা ছোরা; অন্ধকারেও ছোরাখানা ঝক্‌মক্ ক'রে উঠ্‌ল; দেখলাম, যেন চেনা মুখ। তার পরমুহূর্ত্তেই সে ছোরা আমার বুকে আমূল বিদ্ধ হ'ল। আমি তখন মাটীতে লুণ্ঠিত—তার পর কি হ'ল, জানিনে। অনেকক্ষণ পরে—কি কত পরে, তা জানিনি, একবার মনে হ'ল, যেন ঝড়ের উপর দিয়ে কে নিয়ে যাচ্ছে। তার পর আর কোন জ্ঞান ছিল না।

যখন জ্ঞান হ'ল, তখন যেন মনে হ'ল, কোন অপরিচিত জগতে। চারিদিকে ফুলে ফুলে ভরা, গন্ধে আমোদিত, কিন্তু তার মধ্যে যেন কার হাহাকার উষ্ণ নিশ্বাস বইছে। যখন অঘোর হয়ে প'ড়ে থাক্‌তাম, মাঝে মাঝে একটু কেমন চমক ভাঙ্‌ত। দেখতাম, যেন কোন অপ্সরী মলিন-মুখে আমার চোখের পাতার উপরে জলভরা আঁখি চেয়ে রয়েছে। মনে পড়্‌ত, যেন পরিচিত চোখ-মুখ, স্মৃতির মাঝে তার সাদৃশ্য খুঁজে দেখতাম। আমার মুখের উপর দীর্ঘ উত্তপ্ত নিশ্বাস আঘাত কর্‌ত। এমনি ক'রে দিন-রাত কেটে যেত। বুকের দাহনে বড় জ্বালা ও যাতনা হ'ত। তার পর আজ প্রভাতে যখন আমার ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন আমার সমস্ত ঘোর কেটে গেছে, কে যেন দূরে গাইছে। কি সুর! তবু অনেকবার চোখ রগ্‌ড়ে—চোখ মুছে স্বপ্ন কি না বুঝ্‌বার জন্যে বার বার তাকিয়ে দেখলাম। পায়ের কাছে কে যেন ব'সে; পদ্মের রাশি লয়ে, আমার পায়ের উপর ফেলে রাখছে। গানের সুর আরো যেন ফুটে উঠ্‌ল, তবুও তখন বুঝতে পারছি নি—বল্লাম, "আমি, আমি, এখানে কেন, আমি কোথায়?" পায়ের কাছে যে বসেছিল, তার মুখখানি শুখনো—যেন পদ্মেরই মত মুখ। সহসা কোন দূরশ্রুত শব্দের ধ্বনিতে যেমন মানুষ চম্‌কে উঠে—সে তেমনি চম্‌কে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "আপনি দাসীর ঘরে!" ভাবলুম, দাসীর ঘরে,—দাসী কে? আবার যেন সুর আরো স্পষ্ট হয়ে এল,—তবুও ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। তখন সেই নারী বল্‌লে, "আপনি আহত হ'য়ে-

ছিলেন ; আপনি পীড়িত ; তাই এখানে।" আমি বল্লাম, "তুমি কে ? তোমায় যেন চিনেও চিন্‌তে পারছি নি।" তখন সেই নারী উত্তর করলে, উত্তর দেবার আগে তার মুখখানা যেন লাল হয়ে উঠ্‌ল, তার পরেই সাদা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। বললে, "আমি দাসী—দাসী—না না, সে অধিকারও নেই—আমি হেনা !" ব'লে আমার পায়ের পাতার উপরে মুখখানা রাখলে। উঃ, সে কি আগুনের মত শ্বাস ! আমি বল্লাম, "ও কি, কি করছ ! কি করছ ?" আমি মনে করলুম, যেন কোন দেবী আমার শিয়রে—কখন আমার পদতলে, কখন আমার এই ক্ষতস্থানে করুণার হাতখানি বুলিয়ে দিচ্ছে। "কিন্তু তুমি, তুমি দেবী, তুমি সেই দেবী !" আশ্চর্য্য ! তখন সে তার সজল মুখখানি তুলে দুই হাতে আমার পা দু'খানি তার বুকের কাছে টেনে নিলে—আমি নির্ব্বাক্। কি করব, কি বলব, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। বল্লুম, "হেনা !"—যেমনি ওই তার নাম উচ্চারণ করেছি, সে আরও আগ্রহে পায়ের পাতা দু'খানা বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে ব'লে উঠ্‌ল—"ও নাম নয়, ও নাম নয়—সে খোসা আমি ফেলে দিয়েছি—দাসীর দাসী ! প্রভু, শ্রীচরণে স্থান দাও বা না দাও—জন্ম-জন্মান্তর তোমারই দাসী ছিলাম—জন্ম-জন্মান্তর অনন্তকাল তোমারই দাসী থাকব—আর কিছুই চাইনে।"—ঝর্ ঝর্ ক'রে চোখ দিয়ে, দর-দর বুক ভেসে আমার পা ধুয়ে গেল ; মাথার কেশ দিয়ে সেই জল মুছিয়ে দিলে। আমি নিস্পন্দ নীরব,—সমস্ত দেহ যেন রোমাঞ্চিত, অথচ শক্তি নেই যে, তার বুক থেকে—সেই পদ্মের মত বিস্ফারিত নয়নের জলধারা হ'তে পা দু'খানা সরিয়ে নিই। তখন যেন দূরের সেই সঙ্গীত আরো স্ফুটতর হয়ে উঠ্‌ল। কানের ভিতর দিয়ে প্রাণের দ্বারে কে যেন কি বললে,—"ওঠ ! ওঠ ! কে ডাকছে শোন্—শোন, মা ডাকছে,—"

মা,—কি রকম যেন সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। মাথার ভেতর কেমন করতে লাগ্‌ল। আবার সেই...আবার সেই···উঠে ছুটে পালাতে গেলাম, মন যেন দাহনের জ্বালায় বিক্ষেপ—চঞ্চল। "কোথা যাও, কোথা যাও নাথ ! এ দুর্ব্বল দেহে কোথা যাও, কষ্ট হয়ো না দেবতা ! কোথা যাও, কোথা যাও" ব'লে হেনা দুই হাতে পথ আগলে বসে পড়ল। আমি যেন তখন উন্মাদের মত হয়ে বল্লাম,—"শোন শোন—ওই শোন, কি গভীর—কি মধুর ওই স্বর ! ওই শোন—শুনতে পাচ্ছ না ? পথ ছাড়, কোন্ পথে যাব, ব'লে দাও দেবি !" তখন সে উঠে দাঁড়াল, অঙ্গে কোন আভরণ নেই। আগুলফ-চুম্বিত তরঙ্গায়িত কেশরাশি বিসর্পিত হয়ে দুলে দুলে উঠ্‌লো। তার মধ্যে নীরব নীথর ঢল ঢল পরিপূর্ণভাবের দীপ্তি উদ্ভাসিত। অরুণাভ কমলদলের মত সেই কাঞ্চন-বর্ণাঙ্গী দেবীমূর্ত্তি বললে, "চল, এই দিকে।" দ্বারের কাছে এসে বললে "চ'লে গেলে, কিন্তু আমার কি রেখে গেলে !" আমি তখন

উন্মত্তের মত চঞ্চল সাগরোর্মিবৎ গর্জ্জিত জনসংঘের বিপুল উচ্ছ্বাসের মাঝে ছুটে পালালাম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিজয়া-দশমীর কোলাকুলি ও কোলাহলের মাঝে মন যেন কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে এক আনন্দ...বাড়ীতে ফিরলাম। তখন রাত হয়ে গেছে, দ্বারে প্রবেশ করতেই দরোয়ানগুলো "জয় বাবু মহারাজকী জয়" ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। শব্দ শুনে বৃদ্ধ দরওয়ান সজল-কণ্ঠে "দাদা দাদা, ক'রে ছুটে এল।" সেখান হ'তে উঠে নগেনের কাছে গেলাম—"ভাই! ভাই!" বলে বুকে নিলাম, ছল-ছল-চোখে নগেন আমার পায়ের ধুলো নিলে; সেই হারু মাষ্টার সেইখানে ছিল, সে আমায় দে'খে অবধি—যেন চোক কপালে তুলে ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল। সেখান থেকে—বাড়ীর ভেতর বৌদিদির কাছে যেতেই তিনি "বাবা, বাবা" ব'লে যেমন মা ছেলেকে কোলে নিতে আসে, তেমনি করে ছুটে এলেন। মা—মা— ব'লে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌লাম। বৌদিদি বুকের এই বাঁধন দে'খে বল্‌লেন, "এ কি, এ কি"...কি বল্‌ব; বল্লাম, "হঠাৎ আঘাত পেয়েছিলুম, বিশেষ কিছু নয়।" তখন বৌদি বল্‌লে, "তুই যে দিন যাস্ আমি খাবার নিয়ে বসে আছি, আর এলিনি, কদিন পরে সু-বউয়ের কাছে এক খবর পেলাম, সেইদিন রাত্রে জবা রামায়ণ পড়্‌তে পড়্‌তে—হঠাৎ তার বুকে কে ছোরামারার মত ব্যথা অনুভব করে।" শুনে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম, সত্যিই ত, ঐ রাত্তিরেই আমি আহত হই। হবে,—মানুষ মানুষের এক প্রাণের তারে সব ঝঙ্কারই বুঝি অনুভব করে। ক্লান্ত অবসন্ন তনুভার যেন ভেঙে পড়্‌তে লাগল। ঘরে গিয়ে দেখি, আমার চিঠিপত্র সব তেমনি টেবিলের উপর প'ড়ে আছে, চারিদিকে ধুলো জমেছে, সেই ধুলোয় কার যেন পায়ের দাগ। এদিক্ ওদিক্ নেড়ে চেড়ে দেখি, মায়ার চিঠিখানা নেই। কি রকম হ'ল, বুঝতে পারলুম না, তন্দ্রা যেন চোখে জড়িয়ে আসতে লাগল—যেন কত কালের ঘুম জড় হয়ে আসতে লাগল। সমস্ত শরীরের ভেতর যেন রিম্-ঝিম্ রিম-ঝিম্ ক'রে উঠ্‌ল। হাত-পা যেন এলিয়ে পড়তে লাগল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম—ভাগ্যের লিখন এমনি, যাকে ঘৃণা করতাম,—ওই হেনাকে মনে মনে ঘৃণা করতাম—আজ সেই আমার জীবনদায়িনী—সেই আমার প্রাণদাত্রী—সে আমায় মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আর যে আজন্ম স্নেহের, প্রাণের প্রাণস্বরূপ—যে শিরার রক্তে জীবন, মৃত্যু হ'তে জীবন লাভ করলে, সে এই বুকের রক্ত দেখলে। তাই চিরদিনই মনে হয়েছে—পৃথিবী কেমন, তা বুঝে উঠ্‌তে পারি নি, আজ বুঝছি—কতক যেন বুঝেছি, তবু মনে হয়, সবই ত বাকী—বুঝ্‌লাম আর কই?

তখন চন্দ্রের উদয় হয়েছে। শরতের জ্যোৎস্নায় ধরা হেসে, হাসির ঢেউয়ে ভেসে চলেছে। ঠিক চাঁদের ডান দিকে একটি ছোট তারা কেমন টিপ্ টিপ্ করছে—সমস্ত যেন সুধার প্লাবনে ভেসে চলেছে।—তখন দূরে কে গান গাইছিল,—

দুখের কথা বল্‌বো কি গো সই
আমার চোখের জল চোখে মেরে ..
হাসি মুখে রই।

শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি, আর মনে নাই।

শিরীষগাছের মাথার কাছে চাঁদের আলো ঢলে পড়্‌ছিল। রাত্রে স্বপন দেখছি, যেন গ্রহ তারা সূর্য্য চন্দ্র ছায়াপথ কিছুই নেই, শুধু নীলিম নিথর অনন্ত—অনন্ত আকাশ কোথাও একটুকরো মেঘ পর্য্যন্ত কোন চিহ্নমাত্রও নেই, যেন নীলোৎপলের পরাগ দিয়ে কে আকাশকে ধুয়ে ফেলেছে। আলোও নেই, অন্ধকারও নেই, অথচ সে এক অরূপ আলোকে যেন সমস্ত আকাশ ভেসে যাচ্ছে, তা এ ভাষায় ফুটিয়ে তোলা যায় না, অনুভবে হয় ত আসে। তারি ভিতর হ'তে একটি উজ্জ্বল তারকা ফুটে উঠ্‌ল, ধীরে ধীরে—আরো জ্যোতির্ম্ময়—আরো মনোরম উজ্জ্বলতর হয়ে উঠ্‌ল। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী তারকা তার পর যেন সে ধরায় ধীরে ধীরে নাম্‌তে লাগ্‌ল; স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কল-ধৌত প্রবাহের মত এসে মিশল, পরে সুন্দর ফুলের রূপে বিকসিত হয়ে উঠ্‌ল। সে এক অপরূপ দীপ্তিময় ফুল—সুবাসে যেন প্রাণে এক নব আনন্দের উৎস বয়ে গেল। তার পর সেই ফুল টুকটুকে লাল হয়ে, একটি জবা ফুল হয়ে, আমার পায়ের উপর এসে পড়্‌ল। আমি যেন তাকে হাতে ক'রে তুল্‌তে গেলাম। যেমন ছুঁয়েছি, অমনি—অমনি সে আমার জবার মত হয়ে উঠে দাঁড়াল; বল্‌লে—'কমল, এয়েছ এয়েছ, এই দেখ, তোমার মত আমার বুকও দীর্ণ হয়ে গেছে; আজ কদিন তোমার জন্যে কাঁদ্‌ছি।" দেখলাম, তার বুকে গভীর ক্ষত, তা হ'তে রক্ত ঝরছে। কথা শুনে আমি যেন শিউরে উঠ্‌লুম, ঘুম ভেঙ্গে গেল। মা, মা ব'লে উঠ্‌লাম, কপালে হাত দিয়ে দেখি, ঘর্ম্মবিন্দুতে আর্দ্র হয়ে উঠেছে, বুকের ক্ষত হ'তে রক্ত ঝরছে। বৌদিদি এসে ডাকলেন, "কমল, কমল!" তখন ভোর হয়ে গেছে—একটা দয়েল শীস দিচ্ছে। নারিকেল-গাছের পাতায় পত-পত শব্দ হচ্ছে, ঠাকুরবাড়ীতে শানাই তখন প্রভাতী সুর ধরেছে। এদিকে ছিলাম ঘরে, কখন্ ছাদে এসে শুয়েছি, মনেও নেই। বৌদিদি আমার সেই বুকের রক্ত পড়া দেখে শিউরে উঠ্‌লেন; আমি হেসে চ'লে গেলাম। যদি জান্‌তেন, এ রক্ত কার আঘাতে!

অমর! এ দুনিয়া বড় মজার—ভাই ভায়ের রক্ত চায়, আবার ভাই তার জন্যে প্রাণও দেয়। কেউ স্বার্থের বঞ্চনায় দাপিয়ে বেড়ায়, কেউ স্বার্থ ফেলে দিয়ে হেসে

ফিরে যায়। জীবনের জ্বালাও যত, জীবনের মাধুর্য্যও তত। যাকে ঘৃণা করি—সে জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন জীবন দান করলে—যাকে আপনার করলে সে তোমার হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে দেখাতে চায়—কত আপনার! এই ত দুনিয়া। কেন যে মানুষ হেথায় এত করে আপনার খোঁজে! যার—সবই একদিকে আঁধার আবার অন্তে আলোক!

(সুধীর—কমল)

ভায়া হে!

অকস্মাৎ আবার তোমাদের স্বপ্নের রাজত্বে নেমে আসতে হ'ল। কোথায় ছিলাম,—মহাব্যোমে সোমেশ্বরের পরিষদে, কেবল কুক্ষিতলে সোমরাজের ক্ষরিত মধু নিয়ে,—তা নয়, আবার গরুর গাড়ীর চাকার মত ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করতে। তোমাদের স্বপ্নের দেশে, কিন্তু বেশ একগাছা মিনিহ্‌তায় আছে,—এক ছড়া বেশ মালা। কেউ সাদা, কেউ লাল, কেউ হরিৎ, কেউ নীল, কেউ পীত, হরেক রকম। সোমেশ্বরের পরিষদে ব'সে দেখছি,—কারও দুটো চাঁদ, কারও চারটে চাঁদ, কারও ছটা, কারও পাঁচটা, যে যমন; আবার কার মোটে একটা—তাও আবার রাহুগ্রস্ত। আবার দেখলাম কি জান, ওই যেটার মাথা নেই, সেইটাই মাথার পরিচয় দিচ্ছে। যেটা ছায়া, সেই-ই জয়পতাকা উড়াচ্ছে। কিন্তু এ সব কথা বলেই বা তোমায় কি হবে বল। হায়! হায়! তুমি ত এ রসের কথা বুঝলে না,—রসে ডুবতে হবে, ডুবতে হবে! তোমরা দেবাসুর মিলে মহাসংগ্রাম ক'রে শেষ পাক দিতে লাগলে—মহানাগ অনন্তকে; আমি দেবও নয়, অসুর নয়—দেখলাম, এক অপরূপ সুধা নাগরাজ ঢালতে আরম্ভ করেছে। এ সংসাররূপ মহাসমুদ্রে যুদ্ধের বদলে যারা সব এক করতে চায়, তাদের সেই সুধা অমৃত সমান। রিম্‌-রিম্ ঝিম্‌-ঝিম্ ঝিন্‌-ঝিন্ বোঁ-বোঁ তার পর সব এক হয়ে গেল। তুমি যুদ্ধ করলে, বুকের রক্ত ঢেলে দিলে, গরুর গাড়ীর চাকা কিন্তু তাতে ভিজল না। সে সেই ক্যাঁ···রর ক্যাঁ···রর করতে করতে ঘুরতে লাগল। তবে যুদ্ধে প্রয়োজন? রক্ত ঢালায় লাভ? না—তোমার স্বপ্নের দেশে বুঝি খতেনের খাতা নেই? যদি নেই, তবে বাধে কেন, সব পরার্থে। ওহো! ধর্ম্মের নামে তোমরা কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ কর—তা বটে; তোমাদের খতেনের পাত নেই—কিন্তু বাধে কেন বোঝাতে পারো? দেখ, এ স্বপ্ন সত্যির ভেদাভেদের মাঝে এ মহা চিহ্ন জন্মেছে—ওই ছেলেটা,—ওই স্বার্থটা। 'আমি' শালা মরেও আঠার বাজি খায়; ওর জাতই এমনি। যেই বললে বাবা, অমনি শালা ভাবা, আর দেবা দেবী অমনি নিন্নে-নব্বইয়ের গাঁট দিতে সুরু করলে—কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ আরম্ভ হ'ল। পাড়ার ছেলেরা ওলাউঠোয় ম'ল, তোমার ছেলে ওলাউঠোয় টিকে নিলে। কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ

তবু বল পরার্থে—তবু বল খতেনের খাতা নেই? তুমি কবে কোথায় ফুলটা দেখে—সুন্দর দেখে মোহিত হয়ে গেলে। বিভোর উন্মাদের মত সুন্দর মুখখানা পদ্মের মত হাতে ধরে, সব প্রাণের ভাবরাশি এক ক'রে, ভাষায় ব্যক্ত করতে না পেরে, চুমু খেলে। খতেনের খাতায় খরচ লেখা হ'ল—ভাইয়ের বুকের রক্ত। আবার তোরা বলিস্ শালা, যে খতেনের খাতা নেই। পরার্থে—অধিকারীর বিদ্যা-দিগ্‌গজি টীকি নেড়ে ব'লে গেল—"নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ওই একমুঠো চাল-কলার ভিখিরী, সেও বলে করোমি। তবে আবার পরার্থ—সংসারটা সবই আমি! শাখার গাছে আমি, পাতায় আমি, ফুলে আমি, ডাঁটায় আমি, ধুলোয় আমি, জলে আমি, আগুনে আমি,—আবার বলে তুমি। ও সব ডোবাও—ডোবাও! পৃথিবী মাথায় বয়ে বয়ে মহা অনন্তের মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেল, আমিও বয়ে বয়ে দেখলাম, এই ফেনা উঠে গেল। ও সব ডোবাও! তোমারও সত্যিতেও কায নেই, স্বপ্নেও কাজ নেই। স্বপ্ন সত্যির বাইরে, যদি যেতে চাও, এই আছে সোমরস;—চাঁদের জ্যোছনা গলে রস হ'য়ে নেমে এসে সমুদ্রে মিশিয়ে ছিল; নাগরাজ উগ্‌রে দিলে। মধু—মধু—মধু! যার বড় জ্বালা, সে যেন জালা ভরে পান করে; দেখবে, তোমার যৌবন-তরঙ্গে নৌকার মাঝি বিহনে, বান্‌চাল হবার ভয় নেই। দেখবে, হেনা বকুল—গন্ধগোকুল সব ভেসে চ'লে গেছে। দেখবে মায়া তার নীল ওড়না খানা গুটিয়ে টেনে চম্পট দিয়েছে; দেখবে, যত যেখানে গাঁট ছিল, সব আল্‌গা হয়ে দড়িগাছটা শুদ্ধ ভেসে গেছে; আর সর্পে রজ্জুভ্রম কখন হবে না। এস, মধু—মধু—মধু—পান ক'রে তাজা হও, নইলে আবার শুক্‌নো চাকায় বুকের রক্ত ঢাল্‌তে হবে। বুকখানি ক'রে ঢেলে দিলেও কঁ্যাচ-কঁ্যাচ বন্ধ হবে না। তোমাদের ও বামনাই স্বর্গ আর খৃষ্টানী নরক ও দুই সমান। অধিকারীর চালকলা-বাঁধা, হৃষীকেশের কোন উত্তর বায়ায় পুরুষের সাধ্যি নেই যে, ও খৃষ্টানী নরক থেকে কেশ ধ'রে ত্রাণ করে। আর ঐ মাথায় টাক, গোঁফ কামান, নব বৃন্দাবনের গাণ্ডারী দূতির কাটের ইন্‌টুর এমন কোন মন্তর নেই যে, অভিসারের রাত্রিতে আমার প্রাণের বঁধুর খোঁজ ক'রে দেবে। যারা নরক রচে—নরকই দেখে, যারা স্বর্গ রচে, তারা স্বর্গই দেখে। যদি স্বর্গ-নরকের বাইরে যেতে চাও, তবে এস আমার এখানে সর্ব্বদোষ হরে গৌরী—আমি তোমার রসের মন্ত্রে দীক্ষিত করব। দুনিয়া ভোল্‌বার এমন সোজা উপায় আর নেই। তবে তুমি যদি পশ্চিমি পণ্ডিতের মত বল,—দুনিয়া ভুলব কেন? আমার উত্তর,—দুনিয়া বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে, কিছু নতুন রকমের অনুভব চাই। দুনিয়ার বাইরে যেতে চাই। এখন চাই,—বাইরে গেলে চাইব কি না, তখন বল্‌ব। দাঁড়াও, ওই সব আমার প্রিয়ারা হা হুতোস্মি কর্‌ছে। তুমি একটু রোস আমি

নিজেকে তাজা ক'রে নিই। হাড়ে হাড়ে ভাজা ভাজা হয়ে গেছি—এইবার একটু তাজা করে নিই। তার পর তোমায় সব বলব। আঃ, কি জালার তৃপ্তি, ছটো আগুনের মশাল এক জায়গায় কর, ছটো আগুন এক হ'য়ে যাবে। ছটো জালা একসঙ্গে কর, অমনি মিশে যাবে। প্রিয়ার এই জলন্ত গোলাপী রঙের জালায় আমার— মিশে এক হোয়ে গেল। যাক্, শোন এখন গল্প! অনন্ত আকাশের তলায় ধরার আশ্রয়ে একটি বৃক্ষ ছিল, প্রভাত হতে প্রভাত পর্যান্ত প্রকৃতি তার সঙ্গে কত খেলা খেল্‌ত, তার পর সেই গাছে একটি অতনু-অ-বরণ ফুল ফুটে উঠল। গাছটা তখন আপনার ভাবে—নিজের মুখের ভাবের সব ভাব, তাতে দেখতে পেয়ে মহা আনন্দিত হ'ল; ভাবলে বারে আমি! তারপর একদিন সকাল হলে দেখলে রাত্তিরে অন্ধকারে চুপি চুপি এসে, ফুলটা কে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। গাছ তখন স্তব্ধ হয়ে "দিবি তিষ্ঠতি একঃ" হয়ে রইল। আমার কথাটা ফুরল নটে গাছটী মুড়ল। এখন গরু কেন ঘাস খায় না— তার বিশ্লেষণ তোমরা করগে। আমি কথা শেষ করেছি এখন শুধু চালি।—দেখ ছনিয়া ভোলবার আগে, ছনিয়া আমার সঙ্গে এক বিষম যুদ্ধ করেছে। একটা বিশেষ দরকার আছে—তোমার নেমন্তন্ন রইল। তীরে গোলাপ ফুটছে—পাশে গঙ্গা বইছে, আমি চালি! ফুল ঝরবে, গঙ্গা বয়ে যাবে—আমি চালি!

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

একখানি পত্র *

(শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও বৈষ্ণব-কবিতার কথা)

প্রণয়াস্পদেষু,

প্রবাসীতে অজিতের বৈষ্ণব-কবিতার সমালোচনা পড়িয়াছি। তুমি আমাকে ইহার একটা জবাব দিতে বলিয়াছ। দিয়া ফল কি, বলিতে পার? অজিত কি আমার কথা বুঝিবে?

আর অজিতের উপরেই কেবল জুলুম কর কেন? অজিত বৈষ্ণব-কবিতার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝে নাই, মানিলাম। কিন্তু যাঁরা অজিতের লেখা পড়িয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, তাঁদের সকলেই কি বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বুঝেন? অজিতের লেখার সমালোচনাও অনেকগুলি পড়িয়াছি, কিন্তু কোথাও ত প্রকৃত রসানুভূতির প্রমাণ-পরিচয় পাই নাই।

আমি অধিকারিভেদ মানি। সকলের সকল বিষয়ে অধিকার জন্মে না, এ কথা ত সকলকেই মানিতে হয়। বই পড়িয়া কি কেহ কখনও বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে পারে? যার যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব নাই, শাস্ত্র-সাহিত্য পড়িয়া সে কখনও সে অনুভূতির কথা কিছুই বুঝিতে পারে না। বৈষ্ণব-কবিতা কতকগুলি রসচিত্র মাত্র। এই রস-বস্তুর প্রত্যক্ষ অনুভব যার হয় নাই, সে বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্ম বুঝিবে কেমন করিয়া? তার বৈষ্ণব-কবিতা পাঠের অধিকার নাই।

বৈষ্ণব-সাধনে যাহাকে রস বলিয়াছেন, তাহা কেবল মনের ভাব নহে—কেবল একটা ভিতরের অনুভূতিমাত্র নয়। এই রসের অনুভবে ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় ছাড়া এই রসের অনুভব হয় না; আবার ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া না গেলেও সত্য রস ফোটে না। বৈষ্ণব রসতত্ত্বে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটিকে বিষয় কহিয়াছেন। এইগুলিকে অবলম্বন করিয়াই রস জন্মে। চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের এই সকল রূপরসাদির জ্ঞান ও ভোগ হইয়া থাকে। এই জন্য এ সকল ইন্দ্রিয় আর এ সকল বিষয় রস আস্বাদনের উপায় ও উপকরণ। এগুলিকে ছাড়িয়া কোনও রসের আস্বাদন সম্ভব হয় না।

---

* আগামী সংখ্যায় আর একখানি পত্র প্রকাশ হইবে।—সম্পাদক।

কিন্তু এ সকল ইন্দ্রিয়কে এবং বাহিরের বিষয়কে ছাড়াইয়া না গেলেও, রস-বস্তুর আস্বাদন হইতে পারে না। বিধাতাপুরুষ আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জগতের রূপ-রসাদির এমনই একটা যোগ বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ হইলেই আমাদের সুখানুভব হইয়া থাকে। আর এই সংস্পর্শজ সুখ বা আনন্দকেই সাধারণ লোকে রস বলিয়া ভাবিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইতে যে সুখ বা উল্লাস জন্মে, বৈষ্ণব মহাজনেরা তাহাকে রস কহিতেন না।

কারণ, তাঁহারা যাহাকে রস বলিয়াছেন, সে বস্তু নিত্য। উপনিষদ্ ব্রহ্মকে রস-স্বরূপ কহিয়াছেন। বৈষ্ণব মহাজনেরা যাহাকে রস কহিয়াছেন, তাহা এই ব্রহ্ম-পর্য্যায়ভুক্ত। এই বস্তু ব্রহ্মেরই স্বরূপ বস্তু—আর ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া এই রসবস্তু অনাদি, অনন্ত, নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised—বস্তু। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংস্পর্শে যে সুখ জন্মে, তাহা নিত্যবস্তু নয়, এই সুখের হ্রাস ও বৃদ্ধি, উৎপত্তি ও বিলয় আছে। ইন্দ্রিয়ের গতির ও স্ফূর্ত্তির একটা সীমা আছে। এই সীমাতে গিয়া ঠেকিলেই ইন্দ্রিয়ভোগে একটা অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। চিত্ত তখন আপনা হইতেই ভোগ্য বিষয় হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। যে ভোগে আদিতে এমন উৎসাহ ও উল্লাস জাগাইয়া দিল, তাহাই পরিণামে অবসাদ ও বিষাদ আনিয়া দেয়।

কিন্তু যেখানে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শজ উল্লাস বা সুখ সত্য রসের ভূমিতে যাইয়া উঠে, সেখানে বিষয়-ভোগে চিত্তের অবসাদ আসে না। ইন্দ্রিয় যে তখন আপনার স্বাভাবিক সীমাকে ছাড়াইয়া অসীম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইয়া পড়ে। যাহা চোক দিয়া দেখা যায় না, রসের অঞ্জন মাখিয়া চক্ষু তখন তাহাই দেখিতে পায়; কানে যাহা শোনা যায় না, রস-সিক্ত শ্রবণ তখন তাহাই শ্রুতিগোচর করে; এই ত্বক্ যাহাকে ছুঁইতে পায় না, রস-ধারা-স্নাত স্পর্শ তখন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহারই সঙ্গলাভ করে।

অর্থাৎ রসের ভূমিতে গিয়া পৌঁছিলে, চক্ষের সঙ্গে রূপের স্পর্শ হইবামাত্রই, চিত্ত চক্ষুকে ছাড়াইয়া, চক্ষু যাহা দেখে না, দেখিতে পারে না, তাহাতে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। আর চিত্তের সাহচর্য্য হারাইয়া চক্ষুও তখন প্রত্যক্ষ রূপের ওজন করিতে পারে না, কেবল ভাবাবেশে মুদিয়া আসে। এইরূপেই রসের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। এইরূপেই ইন্দ্রিয়কে ধরিয়াই, এ রাজ্যে, চিত্ত ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া গিয়া, ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ হইতে যে সুখ বা উল্লাস জন্মে, তাহাকেই রসেতে পরিণত করে। ইন্দ্রিয়-ভোগের বিস্তৃতিতে বা extensionএ, কিংবা বৃদ্ধিতে রস জন্মে না, তাহার পরিণতি বা transformation হইতেই রসের উৎপত্তি হয়।

পরশ-পাথর ছুঁইয়া লোহা যেমন সোনা হয়, রসধারায় ডুবিয়া ইন্দ্রিয়জ সুখই তখন চিদানন্দ হইয়া উঠে।

এইরূপেই প্রকৃত রসানুভবেতে ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। আর ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ে মাখামাখি হইয়াই যদি রসের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়কেই যারা সর্ব্বস্ব বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে, তাদের পক্ষে এ রসানুভূতি-লাভ কখন সম্ভব হইবে না। আবার যারা দেহ ও ইন্দ্রিয়কে উপেক্ষা বা নিষ্পেষণ করিয়া, কেবল নিরাকার চৈতন্যের ভজনা করিবে, তাদের পক্ষেও এই রসানুভব-লাভ কখনও সম্ভব হয় না।

অথচ সারা সংসারটাই ত এইরূপ ভাগাভাগি হইয়া আছে। অধিকাংশ লোকেই ত দেহ ও ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া তার অনুসরণ করে। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীতে যে কিছু সত্য বস্তু আছে, শাস্ত্র ও কিংবদন্তীতে ইহার কথা শুনিলেও, প্রত্যক্ষ দিয়া তাহা ধরিতে পারে না ও ধরিতে যায়ও না। মুখে তারা যাহাই বলুক না কেন, কার্য্যতঃ অনাত্মাকেই অবলম্বন করিয়া চলে, আত্মবস্তুর কোনও সন্ধান পায় না, খোঁজও রাখে না। আর অন্যদিকে মুষ্টিমেয় ধার্ম্মিকেরা দেহ ও ইন্দ্রিয়কে মোক্ষলাভের অন্তরায় বোধে প্রাণপণে চাপিয়া রাখিতে বা পিষিয়া মারিতে চাহেন। এবং দেহসর্ব্বস্ব সাংসারিক লোক এবং পরলোকসর্ব্বস্ব বিবেকী ও বৈরাগী, ইঁহাদের কেহই বৈষ্ণব-কবিতার রস আস্বাদনের সত্য অধিকারী নহেন।

সত্য বটে, অজিতকে দেহসর্ব্বস্ব বলিতে পারি না, আবার পরলোকসর্ব্বস্ব বিবেকী বা বৈরাগীও বলিতে পারি না। কিন্তু অজিত ব্রাহ্ম। আর আমাদের ব্রাহ্মসিদ্ধান্তে এবং সাধনে বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের কোনও স্থান নাই। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত নিরা-কারবাদী। ব্রাহ্মমতবাদে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই নিরাকার, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, জীবের দেহের ও ইন্দ্রিয়াদির কোনও প্রকারের নিত্যত্ব নাই। এই প্রত্যক্ষ জীবদেহ নশ্বর, এই "সুন্দর নরতনুর" পরিণাম শ্মশানের ভস্মমুষ্টিতে। এই নশ্বর দেহের মধ্যে অবিনাশী আত্মা আছেন, কিন্তু ইহার অন্তরালে কোনও অবিনাশী নিত্যসিদ্ধ দেহ নাই। এই আত্মা বিদেহী। এই আত্মার জ্ঞান আছে, কিন্তু কোনও অপরিহার্য্য জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই। কর্ম্ম আছে, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই। এই দেহের ও এ সকল ইন্দ্রিয়ের বিনাশে, মৃত্যুর পরে, অবিনাশী আত্মা, নিরাকার, নিরিন্দ্রিয়, শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রে অবস্থিতি করে। ইহাই ত মোটামোটি আমাদের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত।

মায়াবাদী বৈদান্তিকও নিরাকারবাদী। আর নিরাকারবাদী বলিয়াই মায়াবাদী বৈদান্তিক, জীবের দেহ, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই শব্দস্পর্শ-রূপরসগন্ধময় জগৎকে মায়িক ও অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন। এই জগতের কোনও সত্যতা, কোনও

নিত্যত্ব নাই। কিন্তু আমাদের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত মায়াবাদী নহে। নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম জগৎকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করেন। সংসারের সম্বন্ধ সকলকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়ের যে কোনও নিত্যত্ব আছে, ইহা স্বীকার করেন না। আর কেবল ব্রাহ্মদের কথাই বা কেন বলি? আধুনিক শিক্ষিত-সমাজের প্রায় সকলেই একরূপ নিরাকারবাদী। আর সকলেই এই জগৎটাকে সত্য এবং নিত্য বলিয়াও বিশ্বাস করেন। অথচ কেহই জীবের দেহেন্দ্রিয়ের যে একটা নিত্যস্বরূপ আছে, ইহা মানেন না ও বুঝিতে পারেন না। কিন্তু এই কথাটাই বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের মূল কথা।

এই দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, এ কথা প্রত্যক্ষ। সুতরাং এই দেহ যে নিত্য নহে, ইহা মানিতেই হয়। কিন্তু এই দেহের বিকাশের, দেহেন্দ্রিয়ের ক্রমাভিব্যক্তির বা ইভোলিউশণের (evolution'এর) একটা ক্রম, একটা নিয়ম, একটা অপরিহার্য্য পৌর্ব্বাপর্য্যের বন্ধন ও শৃঙ্খলা যে আছে, ইহাও ত অস্বীকার করা সম্ভব নয়। শুক্রশোণিতবিন্দু-রচিত ক্ষুদ্রতম কোষাণু বা cell হইতে ক্রমে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ, পরে পূর্ণাবয়বসম্পন্ন সদ্যোজাত শিশু, পরে বাল্য, কৈশোরাদি অবস্থাতে এই দেহেন্দ্রিয়সকল তিলে তিলে ফুটিয়া উঠে, ইহা ত প্রতিনিয়তই দেখিতেছি। এই যে ক্রমাভিব্যক্তি, এই যে evolution বা পরিণাম, ইহার কি কোনও বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, না নাই? এই বিকাশ-ক্রম কি কোনও কিছুকে ফুটাইতে চাহে, অথবা আকস্মিক ঘটনাপাতে এই কোষাণু যে-সে রূপেতেই পরিণত হইতে পারিত? এই কোষাণু হইতে যে অমন সুন্দর নরতনুর প্রকাশ হইয়াছে, ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার, একটা accident মাত্র। অন্ধ ঘটনাচক্রে এই কোষাণু হইতে গরুড়ও জন্মিতে পারিত, কুক্কুরও জন্মিতে পারিত, তাই কি সত্য?

এই আকস্মিক ঘটনার প্রভাবেই জগতের যাবতীয় বস্তুর পরিণাম হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইলে, বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন ভাঙ্গিয়া যায়। কারণ জগতের অনিবার্য্য, অপরিহার্য্য কার্য্যকারণ ও পৌর্ব্বাপর্য্যের শৃঙ্খল'র উপরেই জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানাদি, যাবতীয় বিশিষ্ট, পরীক্ষিত, প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অতএব বিজ্ঞানের চক্ষে এই জগৎকে ও এই জীবদেহ ও জীবের ইন্দ্রিয়াদিকে দেখিলে, জগতের ও জীবের দেহেন্দ্রিয়াদির পরিণাম বা অভিব্যক্তির বা evolution'এর মূলে, এ সকলের একটা নিত্যসিদ্ধ, বা eternally realised, স্বরূপ আছে, এ কথা মানিতেই হয়। এই সৃষ্টিপ্রবাহেতে যাহা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে, এই প্রবাহের আদিতে, যে পরমতত্ত্ব হইতে এই প্রবাহের সূচনা, সেখানে তাহা অবশ্যই পূর্ণপ্রস্ফুটিত আছে। এখানে যাহা অপূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতেছে, সেখানে

তাহা পরিপূর্ণ স্বরূপেতে বিদ্যমান আছে। আর প্রত্যেক বস্তু এই বিকাশ-ধারায় আপনার যে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের আভাস দেয়, তাহারই দ্বারা আমরা তার বিকাশের তারতম্য, তার রূপগুণের ইতরবিশেষ, তার ভালমন্দের ওজন ও বিচার করিয়া থাকি। জীবের দেহেন্দ্রিয়ের এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের বৈষ্ণব মহাজনেরা তাঁহাদের অপূর্ব্ব রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই যে মানুষের রূপ দেখিয়া প্রাণটা অমন করিয়া চক্ষুর পেছনে পাগলপারা হইয়া ছুটিয়া যায়, এ রূপ কেবল তার রক্তমাংসের নহে। এই রক্তমাংস, এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাবেশ, এই বর্ণের ভাস্বরতা, এই চোকের ভঙ্গিমা, এই স্বরের মাধুর্য্য, এই স্পর্শের কমনীয়তা, এই অঙ্গের গন্ধ,—এ সকল যে অপূর্ব্ব, যে অলোক-সামান্য, যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সন্ধান দেয়, তাহা রক্তমাংসের নহে, তাহা এই নশ্বর দেহের, এই সম্ভাবিত-জরামৃত্যু-ইন্দ্রিয় সকলের নহে। সে রূপ নিত্যসিদ্ধ—eternally realised বস্তু। সেরূপ এই অশুদ্ধ দেহের নহে, কিন্তু ইহার অন্তরালে যে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ সিদ্ধদেহ আছে, তাহার। রসের ভূমিতে, আমার সিদ্ধদেহ, অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারে সখার সিদ্ধদেহের প্রত্যক্ষ পাইয়া, সখ্যরস ভোগ করে; পত্নীর সিদ্ধদেহের অঙ্গসঙ্গলাভে দেহেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই দেহেন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া গিয়া, রসে মাখামাখি হইয়া দেহীকেই বিদেহী ও বিদেহীকেই দেহী করিয়া তুলে। এই প্রাকৃত দেহ এবং ঐ সিদ্ধদেহ এই দুই ছায়াতপের মতন নিত্যযুক্ত হইয়া আছে। এই পরিণাম-প্রবাহে একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকে না। ঐ সিদ্ধদেহ হইতেই এই প্রাকৃত দেহের উৎপত্তি হইয়াছে। বৈষ্ণবেরা ঐ সিদ্ধদেহকেই স্বরূপ, আর এই প্রাকৃত দেহকে রূপ কহিতেন। আর এই "রূপ" আর "স্বরূপ"—এই দুইটি কথার মধ্যেই বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের কলকাটাটি বাঁধা আছে। চণ্ডিদাস কহেন,—

"স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখন নাহিক হয়।"

ইহাই বৈষ্ণব-কবিতার মূল কথা। এ কথাটা যে না বুঝে, বৈষ্ণব-কবিতা পড়া, তার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বৈষ্ণব ব্রহ্মতত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে ব্রহ্মকে নিরাকার বলে না। মহাপ্রভু নিরাকারবাদ নিরসন করিয়া কহিয়াছেন—

"ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥"

"নারায়ণে" মহাজনপদ ও মহাজন-সিদ্ধান্তের বিচারে এই ভগবৎ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখানে তাহার পুণরুল্লেখ করিয়া পুঁথি বাড়াইব না। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কেবল এইমাত্র বলিলেই চলিবে যে, বাঙ্গালার বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পরমতত্ত্বকে চিদ্দেহে-প্রতিষ্ঠিত, চিদিন্দ্রিয়সম্পন্ন, চিদৈশ্বর্য্যসেবিত, নিত্যসিদ্ধ-রসকলেবর-ধারী সখ্য-বাৎসল্য-মাধুর্য্যাদি-লীলা-পরিকর-পরিবৃত, চিদানন্দ মূর্ত্তিরূপে, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর ভগবানের এই নিত্যস্বরূপকেই বৈষ্ণব মহাজনেরা নিত্যধাম বৃন্দাবন বা ব্রজধাম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেখানে ভগবান্ সেখানেই তিনি চিদানন্দরসময় ও নিত্যলীলাশীল। এই নিত্যলীলা প্রয়োজনে, তাঁর নিজের স্বরূপেতে তিনি নিত্যসিদ্ধ সখ্য-বাৎসল্যাদিরস-বিগ্রহের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আছেন। যেখানে সূর্য্য সেখানেই যেমন তাঁর কিরণমালা, যেখানে চন্দ্র সেখানেই যেমন তার জ্যোৎস্নারাশি, সেইরূপ যেখানে ভগবান্, সেখানেই তাঁর লীলা-সহচররূপে এই সকল নিত্যসিদ্ধ সখ্য-বাৎসল্যাদির রসবিগ্রহ, তাঁহার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া আছে। আর ভগবানের নিত্যধামে, তাঁর অন্তরঙ্গ স্বরূপেতে যে নিত্যরসলীলা হইতেছে; এই জগৎপ্রবাহে, তাহারই ছাঁচে ও ছায়ায়, তাহারই অনুক্রমে ও অনুকরণে, দেশকালের রঙ্গমঞ্চে, আমাদের প্রত্যক্ষ সখ্যবাৎসল্যমাধুর্য্যাদি রসের সম্বন্ধ সকল গড়িয়া উঠিতেছে। সেই নিত্য-রসলীলার নিত্যসিদ্ধ সখ্যমূর্ত্তি, বাৎসল্যমূর্ত্তি ও মাধুর্য্যমূর্ত্তিই আমাদের সখার, পুত্রের, প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রত্যক্ষ পার্থিব দেহেতে আত্মপ্রকাশ করিয়া, আমাদের দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণকে সতত আকর্ষণ করে, এবং এ সকল রসের পরিণতিতে ও পরিপক্কতায়, সেই সকল নিত্যসিদ্ধ রসমূর্ত্তিই এ সকল দেহেতে আবিষ্ট হইয়া, ঐ অপূর্ব্ব চিদানন্দ রসাভিষেক দ্বারা আমাদের সখার, পুত্রের, প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর পার্থিব দেহেন্দ্রিয়কে নিজ নিজ নিত্যস্বরূপেতে ফুটাইয়া তুলিয়া, এ সকল পার্থিব দেহেতেই সেই নিত্যলীলার চিদানন্দ-রস আস্বাদন করাইয়া থাকে।

কিন্তু অজিত কি এ সকল কথা বুঝিবে? সে কি এ সকল কথাকে অজীর্ণের উদ্গার বা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবে না? একদিন আমিও ত তারই মতন নিরাকারবাদী ছিলাম। আর যত দিন এই সাধারণ ব্রাহ্মমতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ছিলাম, তত দিন আমিও এ সকল তত্ত্বের সন্ধান পাই নাই। আমাদের মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মে এই বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের তিলার্দ্ধমাত্রও স্থান ত নাই। নিরাকার ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তে কি জীবের, কি ভগবানের, কাহারই এই নিত্যসিদ্ধ চিদ্দেহের সন্ধান দেয় না। তবে ব্রাহ্মসিদ্ধান্তেও এক প্রকারের রসতত্ত্ব আছে। সে রসতত্ত্বের সাহায্যে ইংরাজ কবি Wordsworth বা মার্কিণ কবি Emerson কিম্বা আমাদের সংস্কৃত কবি ভবভূতির কাব্যরস পর্য্যন্ত আস্বাদন করিতে পারা যায়; কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনপদাবলীর আস্বাদন সম্ভব নহে।

ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যের কথা মামুলী ব্রাহ্মমতবাদেও শুনিতে পাওয়া যায়। আর এই ব্রাহ্ম সৌন্দর্য্যতত্ত্বের উপরেই ব্রাহ্মমতবাদের রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। আমরা প্রত্যক্ষ অনুভবেতে যে অঙ্গ-সমাবেশকে সৌন্দর্য্যের একটা মুখ্যলক্ষণ বলিয়া জানি, নিষ্কল নিরাকার ব্রহ্মেতে সে সৌন্দর্য্য আরোপ করিতে পারি না। আমাদের প্রাচীনেরা কিন্তু এই অঙ্গসমাবেশকেই সৌন্দর্য্য কহিয়াছেন।

"অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্।
সুশ্লিষ্টসন্ধিবন্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমিতীর্য্যতে॥"

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—উদ্দীপনপ্রকরণম্—১৯)

অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধি-সকলের যথাযথ, মাংসলত্ব তাহাকেই সৌন্দর্য্য বলে। কিন্তু ব্রাহ্মমতবাদে যাহাকে সৌন্দর্য্য বলে, তাহা এ বস্তু নহে। আমাদের ভাষায় সৌন্দর্য্য মুখ্যতঃ দেহেরই ধর্ম্ম। কিন্তু ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য একটা moral quality মাত্র। সৌন্দর্য্যের সাক্ষাতে চিত্তে আনন্দ জন্মে। ব্রহ্মচিন্তনেও প্রাণ-মন আনন্দে ভাসিয়া যায়। সৌন্দর্য্যদর্শন এবং ব্রহ্মচিন্তনের মধ্যে এই সামান্যধর্ম্ম দেখিয়াই আমরা ব্রহ্মকে গৌণ অর্থে সুন্দর বলিয়া থাকি। সাধু ব্যবহারে আনন্দ হয়। পরের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগেও গভীর আনন্দানুভব হইয়া থাকে। এই আনন্দ শারীর রূপের সাক্ষাৎকারে জন্মে না, কিন্তু একটা moral perception হইতেই জন্মে। ব্রহ্মের ধ্যানধারণাতে যে আনন্দ হয়, তাহাও এই জাতীয়। ব্রহ্মের নিরবয়ব নিরঞ্জন moral perfectionএর চিন্তা ও ধ্যান হইতেই এই আনন্দলাভ হয়। অতএব ব্রাহ্ম উপাসক ব্রহ্মের যে সৌন্দর্য্যের কথা কহেন, তাহা রূপজ নহে, কিন্তু অরূপ গুণজ। আর ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য যেমন গুণজ রূপজ নহে; ব্রাহ্মমতবাদে আত্মার সৌন্দর্য্যও গুণজ, moral perfection হইতে উৎপন্ন, রূপজ, physical perfection হইতে উৎপন্ন হয় না। সত্য ভালবাসার যোগ আত্মার আত্মায়। এখানে আত্মা দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ বলিয়া দেহের সঙ্গেও প্রেমের একটা সম্পর্ক হয় বটে; কিন্তু এ সম্পর্ক আকস্মিক accidental necessary বা অপরিহার্য্য নহে। ধার্ম্মিক অথচ প্রেমিক পতি আপনার পত্নীর আত্মাতেই অনুরক্ত, দেহের প্রতি নহেন। সতী সাধ্বী পতির আত্মারই প্রতি অনুরাগিণী, দেহেতে আসক্ত নহেন। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসের সম্বন্ধে, এই জন্য, ব্রাহ্ম সাধক প্রাণপণে সখার, পুত্রের, প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর দেহসৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের নিরাকার আত্মার নিরাকার রূপেতেই চিত্তকে আবদ্ধ করিতে চাহেন। এ সকল সম্বন্ধে নিরাকার আত্মা, নিরাকার আত্মার সঙ্গে, নিরাকার রসের নিরাকার বন্ধনে পরস্পরকে আবদ্ধ করিবে,—ইহাই আমাদের নিরাকার ব্রাহ্মমতে নিরাকার রসতত্ত্ব।

তবে এই সাকার স্থূলদেহটাও আছে, নাই বলিয়া তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, নিরাকারের ফুৎকারে ঠেলিয়াও ফেলা সম্ভব নয়। অতএব দেহেটারও একটা ব্যবস্থা করিতে হয় বলিয়া, এই রসতত্ত্বে সখ্যবাৎসল্যাদি সম্বন্ধের দায়িত্বকর্ত্তব্য-ভার বহনের কর্ম্মে এই দেহকে নিযুক্ত করিয়া দেয়। সখ্যাদি সম্বন্ধ ত কেবল রসের বা আনন্দের বা ভোগেরই ব্যাপার নহে। ভোগটা ত এ সকলের লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য সেবা। এই সেবার নিমিত্ত এ সকল রসের সম্বন্ধের গুরুতর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, দায়াদায়, প্রাচীনেরা যাহাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, আধুনিকেরা যাহাকে moral obligations বলেন, তাহাও আছে। এই সকল moral obligationsএর খাতিরে, দেহের সম্বন্ধটাকেও মানিয়া চলিতে হয়। এই সেবা-প্রয়োজনে সখ্যবাৎসল্যাদি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধেও কতকটা দেহ-সংস্পর্শ আছে। ব্রাহ্মমতবাদে এতটুকু পর্য্যন্ত মানে। কিন্তু সখা, পুত্র, প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর দেহটাই যে সখ্যাদি রসের মুখ্য আশ্রয়, ব্রাহ্মসমাজ এমন কথা বলেন না, শুনিলেও বা অনেকে শিহরিয়া উঠিবেন।

পরমেশ্বর মানুষকে শরীর দিয়াছেন, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গড়িয়াছেন, এই শরীরে জ্ঞানসাধক ও ভোগসাধক ইন্দ্রিয়-গ্রামের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁর সেবার জন্য। সমাজস্থিতিরক্ষা এই সেবার অন্তর্গত। এই জন্য ব্রাহ্ম আপনার দেহকে শুদ্ধ ও সুস্থ রাখিয়া দাম্পত্যধর্ম্মপালন করিবে। সন্তানাদি উৎপাদন ও তাহাদের শিক্ষাবিধান সমাজস্থিতিরক্ষার জন্য প্রয়োজন। এই জ ও এই দেহ দিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিবে। দয়াদাক্ষিণ্যাদির অনুশীলন কর্ম্মসাপেক্ষ, ইহার জন্যও শরীরকে সুস্থ করিবে, শরীরের যত্ন করিবে। এ ছাড়াও যে শরীরের আর একটা অধিকার আছে, এই শরীরটা যে সকলের উপরে, রসাধার ও রস-নিকেতন,—ব্রাহ্মমতবাদে এ কথা জানে না, বুঝে না।

এই দেহটা জীবের ধর্ম্মকর্ম্মসাধনের যন্ত্রস্বরূপ—ব্রাহ্মমতবাদে এতটা পর্য্যন্ত স্বীকার করে। কিন্তু এই দেহের যে একটা নিজের অধিকার, নিজের সার্থকতা আছে; জীবের আত্মার যেমন একটা নিজের সার্থকতা আছে, তার দেহেরও সেইরূপ আছে; তার আত্মার মতন তার শরীরটাও an end unto itself; এই রক্তমাংসের দেহ, রক্তমাংসরূপেই যে বিশ্বের একটা অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু, এই রক্তমাংসের সুসমাবেশে শরীরের যে রূপ ফুটিয়া উঠে, তার নিজের যে একটা সাফল্য আছে,—প্রাচীন গ্রীশীয়েরা যে জন্য রূপের আরাধনা করিতেন, রক্তমাংস বলিয়াই, রক্তমাংসরূপেই রক্তমাংসের সমাদর ও সংবর্দ্ধনা করিতেন,—আধুনিক ব্রাহ্মমতবাদে সে বস্তুটির কোনও স্থান নাই। শরীরের রূপলাবণ্যের কেবল রূপলাবণ্য বলিয়া ব্রাহ্মরসতত্ত্বে কোনও প্রতিষ্ঠা নাই।

নীতিবাদী ব্রাহ্ম উপাসক সুনীল আকাশের, জ্যোৎস্নাস্নাতা বনস্থলীর, বসন্তের বরণকিরণগন্ধসম্ভারের, শরতের শ্যামল ঐশ্বর্য্যের, কলনাদিনী গিরিতটিনীর, গহন অরণ্যানীর, অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের, দিগন্তপ্রসারিত সাগরতরঙ্গের,—এ সকলের রূপে মুগ্ধ হন। প্রকৃতির এই রূপ দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া,—এত রূপ যাঁর মানসসৃষ্টি, তাঁহাকে, তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর বলিয়া, গদ্‌গদকণ্ঠে প্রণাম করেন। বিহগকুলের পর্ণ-সম্পদ্, পশুরাজের পেশীগৌরব, প্রজাপতির চিত্রলেখা, এ সকলের রূপেও মুগ্ধ হইয়া, এ সকল রূপকে ধরিয়া পরমেশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্য ধ্যান করেন। সুকুমার বালক-বালিকার "নির্ম্মল" মুখচ্ছবি বা ললিত দেহযষ্টি পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে ধ্যান করিতে পারেন, এই পৌগণ্ড বা বাল্যরূপকেও ভগবদারাধনার আলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু প্রস্ফুট যৌবনা, পীনপয়োধরা, মধুরোজ্জ্বলবরণা রমণী-রূপের অথবা কন্দর্পতুল্য পুরুষের দেহ-সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে ভগবানের রূপলহরী ও রসলীলা তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া উঠে ও লুটিয়া পড়ে ব্রাহ্ম-সাধনা এই রূপ ও রসকে ভগবদারাধনার উপকরণ বা উদ্দীপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই।

অথচ এই নররূপই বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের মূল বস্তু। এই নররূপকে যে কেবল চোরের মতন গোপনে গোপনে, ভয়ে ভয়ে ভোগ করিতে যায়, প্রাণ পূরিয়া বুকে ধরিতে সাহস পায় না; এই নরবপুর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দেখিয়া যে ধর্ম্মভয়ে চোক ফিরাইয়া লয়, চোক দিয়া বুক ভরিয়া এ রূপরাশি পান করিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারে না; এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের ক্ষণস্থায়ী রূপের মধ্যেই যে বিধাতা পুরুষ তাঁর অন্তরের নিত্যসিদ্ধ রসমূর্ত্তিকে তিলে তিলে গড়িয়া তুলেন, মানুষের তৃষিত দৃষ্টির আশ্রয়ে ভগবান্ যে নিয়ত আপনি আপনার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির সৌন্দর্য্যরস পান করিয়া আত্মহারা হইয়া যান ও তাহাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য, বাণবিদ্ধ মৃগীর পশ্চাতে ব্যাধ যেমন বনে বনে ছুটিয়া বেড়ায়, লীলাময় ভগবান্ যে সেইরূপ এই মানুষীরূপের পেছনে পেছনে ঘুরিয়া তার সংসার নাশ করেন,—এ সকল কথা যে বুঝে না, বুঝিতে চায় না, বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, ধর্ম্মহানি হইবে বলিয়া শিহরিয়া উঠে ও ছুটিয়া পালায়,—এই দেহটাকে যে শ্রেষ্ঠপক্ষে কর্ম্মায়তন ও নিকৃষ্ট পক্ষে কামায়তন বলিয়াই জানে, এই দেহের রূপলাবণ্য রক্তমাংসগঠিত হইয়াও যে রক্তমাংসের অতীত, এ অনুভব যার হয় নাই,—বৈষ্ণব-কবিতায় নিগূঢ় রস কেমন করিয়া সে আস্বাদন করিবে?

অজিত ইংরাজী কবিতা বিস্তর পড়িয়াছে, ইউরোপীর কাব্যকলারও কতকটা অনুশীলন করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব যেখানে পৌঁছিয়াছে, ইউরোপের রসতত্ত্ব এখনও তাহার নাগাইল পায় নাই। ফলতঃ আমাদের রসশব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ

ইংরাজীতে নাই, অন্য কোনও ইউরোপীয় ভাষায়ও আছে বলিয়া শুনি নাই। আমরা যাহাকে রসতত্ত্ব বলি, ইউরোপীয়েরা তাহাকে æsthetics বলেন। এই কথাটি গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত। আর প্রাচীন গ্রীসীয়েরা আপনাদের রসতত্ত্বকে ইন্দ্রিয়ানুভবের উপরেই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার এই æsthetics নাম দিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভবকে গ্রীকভাষায়, aisthanomai কহে। এই aisthanomai হইতে æsthetics শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু আমাদের রস-বস্তু কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবেই জন্মে না। রস শব্দে অতি প্রাচীনকাল হইতে অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মতত্ত্বকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছে। এই জন্যই আমরা যাহাকে রসতত্ত্ব বলি, তাহার সঙ্গে একদিকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং অন্যদিকে গভীরতম অতীন্দ্রিয়ানুভূতি, দুই মিশিয়া আছে। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া অতীন্দ্রিয়েতেই এই রসের গতি। ইউরোপ এখনও ভাল করিয়া এই বস্তুটি ধরিতে পারে নাই। কাজেই আধুনিক ইউরোপীয় কাব্যকলা হয় আত্যন্তিকভাবে বাস্তব বা realistic না হয় একান্তই মানসকল্পিত বা idealistic হইয়া আছে। ইউরোপ যাহাকে real বলিয়া ধরিতেছে, আমরা তাহাকেই রূপ বলিয়াছি। ইউরোপ যাহাকে ideal বলিয়া কল্পনা করিতেছে, তার সত্যবস্তুকে আমরা স্বরূপ বলিয়া থাকি। ইউরোপীয় কাব্যকলা এখনও ভাল করিয়া রূপের মধ্যে স্বরূপের প্রত্যক্ষলাভ করে নাই। অথচ ইহাই আমাদের বৈষ্ণব-কবিতার মূল কথা। অজিত ইউরোপীয় কাব্যকলার দাঁড়িপাল্লায় তুলিয়া বৈষ্ণব মহাজনপদের ওজন করিতে যাইয়া যে পদে পদে ভুল করিয়াছে, ইহা আর তবে বিচিত্র কি ?

প্রাচীন ইউরোপের প্যাগান্ সাধনায় নররূপের মাধুর্য্য অপূর্ব্বপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। আমাদের বৈষ্ণব কাব্যকলা যেমন চিরকৈশোরকে আশ্রয় করিয়া আপনার অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তি সকলের প্রকাশ করিয়াছে, গ্রীশীয় ভাস্করকলাও সেইরূপ নরদেহের অদ্ভুত বীর্য্য ও মাধুর্য্য ফুটাইতে যাইয়া চির কিশোরা-কিশোরী—অ্যাপলো Apollo ও ভিনাসের Venusএর মর্ম্মরমূর্ত্তি খুদিয়াছিল। Apollo Velevedere এবং Venus of Milo'র ভাঙ্গা মূর্ত্তি দেখিয়াই আমরা আজ, হাজার হাজার বৎসর পরে, গ্রীশীয় রসতত্ত্ব কি ভাবে, কতটা যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তার সন্ধান পাইয়া থাকি। পাথরে অমন প্রাণতা, অমন লাবণ্য ও কমনীয়তা, অমন শক্তি ও বীর্য্য ত আর কেউ ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই। গ্রীশীয় ও রোমক সাধনায় মানুষকে মানুষরূপে, মানুষের দেহকে রক্তমাংসরূপেই কতকটা গড়াইয়া তুলিয়াছিল, গ্রীক ও রোমকেরা এই সুন্দর নরতনুর কি'ই ভজনা যে করিত, গ্রীশীয় ও রোমক চিত্রকলা ও ভাস্করকলা তার সাক্ষী। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রীশ ও রোমের দেবোপাসনা ও প্রতিমাপূজা বর্জ্জন করিল বটে, তবে ক্যাথলিক সাধনে যিশু, যিশুমাতা ও দেবদূতদিগকে আশ্রয় করিয়া পুরাতন শিল্পকলাকে স্বল্পবিস্তর আত্মসাৎ

করিয়াছিল। কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয়ান সংস্কার একান্ত অন্তর্মুখীন ও নিরাকার তত্ত্বের ও সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, ক্যাথলিক শিল্পকলার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া দিল. এই প্রোটেষ্টাণ্ট মতবাদ আমাদের ব্রাহ্মমতবাদেরই মতন, একান্ত নিরাকার। এই জন্যই খৃষ্টীয়ান নীতিতে সংসার, শরীর ও সয়তান—the world, the flesh and the devil—এক পর্য্যায় বা পরিবার-ভুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ পিউরিট্যানদিগের প্রভাবে ইংরাজি শিল্পকলা ও কাব্যকলা অতিনীতিবাদী, অতি অন্তর্মুখীন হইয়া সমুদায় বস্তুসংস্রব ও ইন্দ্রিয়সংস্রব একেবারে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

আধুনিক যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে, ইউরোপে প্যাগান সাধনার পুনরুদ্ধার আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু এই রেনেসেঁার বা নবজাগরণের ফলে ইউরোপীয় সাধনা ও শিল্পকলা অতিমাত্রায় বাস্তব বা realistic হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ইউরোপীয় বাস্তবতা বা realism আত্যন্তিকভাবে ইন্দ্রিয়তন্ত্র হইয়া আছে। এই বাস্তবকলা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদিকেই একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই যে অতীন্দ্রিয়ের সাড়া জাগিতেছে, এখনও এই সত্যটা ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। এই জন্যই এই ইউরোপীয় বাস্তবতা বা realismএ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব যত বাড়িয়া উঠিয়াছে, রসের প্রসার বা গভীরতা তত জন্মে নাই। এই কারণেই এই আধুনিক বাস্তবকলার বা realistic আর্টের সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির এতটা বিরোধ বাধিয়াছে। জোলা, মোপাঁশা প্রভৃতির কাব্যসৃষ্টিতে এই জন্য যতটা পরিমাণে ইন্দ্রিয়ভোগের প্রেরণা জাগিয়া উঠে, সে পরিমাণে অতীন্দ্রিয়ের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই আধুনিক বাস্তবকলার অনুশীলনে আমাদের বৈষ্ণব রসকলার আস্বাদনের অধিকার জন্মে না। এই বাস্তবকলার শ্রেষ্ঠতম সাধক হুইট্‌ম্যান। আর হুইট্‌ম্যান্‌ও কেবল পুরাতন প্যাগান রসতত্ত্বের পার পর্য্যন্তই পাইয়াছেন, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এক কথায় আধুনিক ইউরোপীয় কাব্য সৃষ্টি হয় realistic না হয় idealistic হইয়াই আছে; হয় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে, না হয় মানসকল্পনাকে বা fancy'কে ধরিয়াই এ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কিন্তু সত্য realism এবং idealismএর—প্রত্যক্ষের ও অপ্রত্যক্ষের—চণ্ডিদাসের কথায় রূপের ও স্বরূপের মধ্যে যে নিত্যসিদ্ধ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ eternally realised organic relation আছে, ইউরোপ এখনও তার সাক্ষাৎকার লাভ করে নাই। এই জন্য আধুনিক ইউরোপীয় রসকলা সত্য spirituality'র বা স্বরূপের ভূমিতে উঠিয়া, আপনার মধ্যে realism ও idealism এর প্রকৃত সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিতে পারে নাই। এই সমন্বয়ের অভাবে, ইউরোপীয় realism বা idealism হু'এর কোনওটির দ্বারাই আমাদের বৈষ্ণব-রসকলার মূল্য কষিতে পারা যায় না। অথচ অজিত এই প্রয়াসই করিয়াছে। বৈষ্ণব-কবিতা যে কি বস্তু, অজিত যে ইহা বুঝে নাই, ইহাই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

অজিতের মতন যাঁরা ইংরাজী বা ইউরোপীয় কাব্যকলার দ্বারা অভিভূত হন নাই, তাঁরাই যে বৈষ্ণব রসকলা বুঝেন, এমনও বলিতে পারি না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত মায়াবাদী। শরীর ও সংসারকে প্রায় সকলেই মায়িক ও পরমার্থদৃষ্টিতে অলীক বলিয়া ভাবেন। এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এবং দ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব গৃহীর মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। বৈদান্তিক মায়াবাদীর পক্ষে শরীর ও সংসারকে বন্ধহেতু, মোক্ষের অন্তরায় বলিয়া ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু বৈষ্ণবেও শরীর ও সংসারকে ভক্তিসাধনে সহায় না ভাবিয়া অন্তরায় বলিয়াই যে মনে করেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার সহায়"—

এ কথা শুনিয়া যাঁহারা ভক্তিতে গদগদ হইয়া পড়েন, তাঁদের মধ্যেই বা কয়জনে ভগবানের এই নরবপু যে নিত্য, সত্য, মায়িক ও মিথ্যা নহে, ইহা বুঝেন বা বুঝিতে চাহেন? ইঁহারা অবতারবাদী। যুগে যুগে ভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন, অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এইরূপ অবতারকালে তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া নরলীলা করেন,—সকল বৈষ্ণবেই এ কথা মানেন। কিন্তু তাঁর নিত্যস্বরূপে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ যে নরবপুসম্পন্ন, ঐ নিত্যসিদ্ধ ভাগবতী তনুর অনুকরণে এবং ছাঁচেই যে এই প্রত্যক্ষ "সুন্দর নরতনুর" সৃষ্টি হইয়াছে—বৈষ্ণবাচার্য্যেরা এ কথা কহিয়াছেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজ তাহা ধরিয়াছে কৈ? দ্বাপরে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে ভগবান্ নরদেহে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া, বৃন্দাবনলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। সকল বৈষ্ণবেই ইহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, আর এই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর নিত্যস্বরূপে নরবপুসম্পন্ন,—সর্ব্বদাই দ্বিভুজ—"ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ"—এই বৃন্দাবনলীলা যে কৃষ্ণের নিত্যলীলা, এই বৃন্দাবন যে নিত্যধাম, ভগবৎস্বরূপের অন্তর্গত; এই শ্রীকৃষ্ণ যে বৃন্দাবন ছাড়িয়া কখনও কুত্রাপি গমন করেন না,—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কশ্চিৎ নৈব গচ্ছতি" আর এই জন্যই এই শ্রীকৃষ্ণ এবং যদুসম্ভুত, অর্জ্জুনসারথি শ্রীকৃষ্ণ যে এক নহেন—"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতঃ"—যদুসম্ভূত কৃষ্ণ আর একজন—এ সকল কথা বাঙ্গালার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা ত এ সকল কথা আজি পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে বা ধরিতে চেষ্টা করেন নাই। এই জন্য বর্ত্তমান বৈষ্ণবমতবাদে ও বৈষ্ণবসাধনভজনে এতটা খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছে। কচিৎ কোনও ভাগ্যবান্ সাধকে প্রকৃত বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের সন্ধান পাইলেও, সাধারণ বৈষ্ণবেরা কেহ বা সহজীয়া প্রভৃতি হীনাচার আশ্রয় করিয়া দেহকেই

আঁকড়াইয়া ধরে, আর কেহ বা দেহেন্দ্রিয়াদিকে মায়াময় ভাবিয়া, দেহ-সম্বন্ধকে বন্ধহেতু ও ভক্তির অন্তরায় বোধে নিপীড়ন বা উপেক্ষা করিয়া, অতিপ্রাকৃত বিগ্রহাদির বা পৌরাণিকী কবিকল্পনার ভজনায় মজিয়া রহেন।

এই জন্য কি ব্রাহ্ম, কি বৈদান্তিক, কি বৈষ্ণব, দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের ও মহাজনপদের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ এতটাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই অজিতের এবং তাহার প্রতিবাদিগণের মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রভেদ দেখিতে পাই না। বৈষ্ণব-কবিতার প্রকৃত রস-আস্বাদনে এখনও ইহাদের কাহারই সত্য অধিকার জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

বিপিনচন্দ্র পাল।

গান

(আমি) মন মজায়ে লুকিয়ে রব
জান্‌তে দেব না,
তফাৎ থেকে বাসব ভাল
ছুঁতে দেব না।

ঘুরব তোমার কাছে কাছে
ওগো বল্‌বে তুমি কোথায় আছে,
ধরা ধরি কর্‌তে গেলে
ধরা দেব না।

দূরে দূরে বাজিয়ে বাঁশী
তোমার প্রাণে ছোঁব আসি,
আসি আসি বল্‌ব শুধু
কাছে যাব না।

বুকের কাছে টেনে নোব
প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে দোব,
চুমুতে ভরিয়ে দেব,
চুম খাব না—
লুকিয়ে খেলা খেল্‌ব আমি—
খেলায় ভুল্‌ব না।

শ্রী :—

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা,

ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল

সূচী

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫১	১৫	বয়সের	বায়সের
২৬৬	২৬	ধারণা	ধর না
২৬৮	২৬	নাথা	মাথা
২৯১	২৪	সবখানে খারাপ	সব খানে-খারাপ
২৯২	৩	পিছনে	পিছ্‌লে
২৯২	১২	বুকে ধরে দমা	বুকে দমা ধরে
২৯২	২৫	ব্যক্তিক্কের	ব্যক্তিত্বের
২৯৪	২১	Cameonic	Cannoic

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা] [ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল।

ধর্ম্মতত্ত্ব-মীমাংসা

পূর্ব্ব-মীমাংসা

স্মার্ত্ত-সমালোচনা

এই সংসারে ধন, ধান্ত, পশু, চতুরঙ্গ, সন্তান-সন্ততি ও উদ্যান-মন্দিরাদি বহুবিধ পার্থিব সুখভোগের সামগ্রী সত্বেও জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা কি একটি অভাব লক্ষিত হয়। সে অভাবটি কিসের?—ধর্ম্মের। ধর্ম্মলাভ না হইলে জীবের শান্তি হয় না। অতএব কি উচ্চশিকার গিরিশৃঙ্গ-সমারূঢ় সভ্যজাতি, কি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন গর্ত্তের তলদেশে পতিত অসভ্যজাতি, কি এতদুভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত অর্দ্ধসভ্যজাতি সকলেই ধর্ম্মের জন্য লালায়িত। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারে না, এরূপ সমাজ বা জাতি জগতে নাই বলিলেই হয়। স্ব স্ব জ্ঞান ও আন্তরিক সংস্কার অনুসারে জগতের সমস্ত সভ্য সমাজই এক একটি ধর্ম্ম গঠন করিয়া থাকেন; এবং তাহা লইয়াই সেই সেই সমাজের লোক জীবনের লীলা সমাপ্ত করিয়া থাকে। কিন্তু জীবনের শান্তি কোথায় মরীচিকাতে কি পিপাসা-নিবৃত্তি হয়? যে পর্য্যন্ত সত্যধর্ম্মের লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত মানবের মনে শান্তিলাভ হইতে পারে না।

সত্যধর্ম্ম সরল ও সুখসাধ্য। কারণ, তাহা ঈশ্বর-প্রণোদিত। ঈশ্বরপ্রদত্ত কোন বস্তুই দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে না। জীবের জীবনে প্রতিক্ষণে আবশ্যকীয় আলোক, বায়ু, জল সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সুলভ। জড় শরীরে জীবনের উপযোগী যাবতীয় বস্তু যদি সুলভ হয়, তবে আত্মার জীবনের উপযোগী ধর্ম্মতত্ত্বটি কেন সুলভ হইবে না?

মেঘমালা হইতে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে ; কিন্তু মধ্যের বায়ুগত স্পর্শদোষে ও পরিশেষে ভূমিগত নানাদোষে দূষিত হইয়া যায়। কাজেই কূপ, তড়াগ বা নদী হইতে জল উত্তোলন করিয়া অগ্নিযোগে বিশুদ্ধ করিয়াই পান করা উচিত। অন্যথা তদ্দ্বারা তাৎকালিক পিপাসা নিবৃত্তি হইলেও পরে অনেক রোগাদি ক্লেশভোগ করিতে হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা।

সৃষ্টির আরম্ভসময়ে শ্রীভগবানের স্পষ্ট বিশুদ্ধ ধর্ম্মই উদিত হইয়া থাকেন। পরে দেবগণ, ঋষিগণ, মানবগণ ও অসুর-রাক্ষসাদির হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের দূষিত হার্দ্দিভাব সকলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নানাগ্রন্থে নানা আকারে অবিশুদ্ধরূপে প্রচারিত হয়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ;—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ম্ বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়ো গৃহ্ণন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ।
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেব-দানব-গুহ্যকাঃ
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধর-চারণাঃ।
কিংদেবাঃ কিংনরা নাগা রক্ষঃকিম্পুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ।
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং মতয়স্তথা।
যথা প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ শ্রবন্তি হি।
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাৎ ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োপরে।
মন্মায়া-মোহিতধিয়ঃ পুরুষা পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি।"

অর্থ—এই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রলয়সময়ে কাল দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল। সৃষ্টির আদি-সময়ে আমি এই বাণী ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলাম—যাহাতে মদাত্মক অর্থাৎ মদ্ভক্তি-প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল। ব্রহ্মা নিজের পূর্ব্বপুত্র মনুকে উপদেশ করিয়াছিলেন। মনুর নিকটে ভৃগু আদি সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষিগণ ইহা অধ্যয়ন করেন। সেই সপ্ত ব্রহ্ম-মহর্ষি-গণের নিকটে তাহাদের পুত্র দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস, কিম্পুরুষাদি সকলেই অধ্যয়ন করেন। ইহাদের প্রকৃতি রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণময়ী বিবিধরূপা। এই প্রকৃতি দ্বারাই ভূতগণের আকৃতি ও

বুদ্ধিভেদ হয়। পরে প্রকৃতি ও বুদ্ধি অনুসারে ভূতসকল বিচিত্র উপদেশ করিয়া থাকে। এই প্রকৃতির বিচিত্রতা হেতু মনুষ্যগণের বিভিন্নরূপা বুদ্ধি হয়। কাহারও পরম্পরা দ্বারা বুদ্ধিভেদ হয় ও কাহারও বা পাষণ্ডবুদ্ধি হইয়া যায়। হে পুরুষর্ষভ! এইরূপে আমার মায়ামুগ্ধবুদ্ধি পুরুষগণ স্ব স্ব কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে অনেক-রূপ শ্রেয়ঃ বর্ণন করিয়া থাকেন।

ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টির আরম্ভে শ্রীভগবান্ নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে কেবল শ্রীভগবদাত্মক ভক্তিপ্রধান বিশুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই উপদেশ আছে। তাহাই ধর্ম্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ। ক্রমে ক্রমে নানাবিধ দেব, ঋষি, মানব ও অসুর-রাক্ষসাদি দ্বারা এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মে তাঁহাদের স্ব স্ব ভাব মিশ্রিত হইয়া ইহাকে অবিশুদ্ধ ও কলিল করিয়াছে।

বিশুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মে মিশ্রিত নানা কুমত সকলকে পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবান্ স্বকীয় শক্তিবলে অনুপ্রাণিত মহাপুরুষ সকলকে সময়ে সময়ে ধরাতলে প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ঈশ্বর-প্রেরিত আচার্য্যগণের পরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশা-বলীকে সাম্প্রদায়িক উপদেশরূপে গ্রহণ করিয়া জীবগণ সেই বিশুদ্ধ বৈদিক (বৈষ্ণব) ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে অতি জঘন্য কুমত ও কুসংস্কার মিশ্রিত হইলে পরম-করুণাময় শ্রীহরি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের আবর্জ্জনা-পরিষ্কাররূপ লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আমরা দুর্ভাগা ও অধম কলির জীব, কিন্তু আমাদের অসীম সৌভাগ্য। যেহেতু, আমরা সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কর্তৃক পরিষ্কৃত বিশুদ্ধধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি।

এ স্থলে ধর্ম্মের বিশুদ্ধরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক। সুতরাং তাহার লক্ষণ জানা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বিশুদ্ধধর্ম্মের এইরূপ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন ;—

"ধর্ম্মো যস্তাম্ মদাত্মকঃ।"

অর্থাৎ মদ্‌ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম বেদের উপদিষ্ট, 'আদিধর্ম্ম' ও বিশুদ্ধ স্বরূপ। ঋগ্বেদেও আদি ধর্ম্মের এইরূপ বিবরণ আছে ;—

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ।
তানি ধর্ম্মাণি প্রথমা ন্যাসন্॥"

অর্থ—দেবগণ সকল যজ্ঞ অর্থাৎ পূজনের দ্বারা যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুকে যজন করিয়া-ছিলেন ; ইহাই প্রথম ধর্ম্ম।

এই মন্ত্রে যজ্ঞশব্দে বিষ্ণু (যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ) ও দ্বিতীয় যজ্ঞশব্দে যাগ। যাগ বলিতে দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ। 'দ্রব্যম্ দেবতাত্যাগশ্চ।'

এই কল্পসূত্রে যাগের এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে ; দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যের ত্যাগ করার নাম যাগ। শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মে শ্রীবিষ্ণু ভগবানের উদ্দেশে আত্মা ও মন সমর্পণ করাই প্রধান যাগ। যেহেতু, ন্যায়শাস্ত্রমতে আত্মা ও মন দ্রব্যমধ্যে পরিগণিত ও উহা সর্ব্বোত্তম দ্রব্য।

এই অনন্তবৈষ্ণবধর্ম্মই বৈদিক ধর্ম্ম ও বেদের প্রধান নিরূপ্য বস্তু। ইহা ক্রমে লোকের বিভিন্নবুদ্ধি অনুসারে বিভিন্নাকারে পরিণত হয়। স্বার্থান্ধ লোকেরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মপরায়ণ সরলচেতা সাধুজনকে প্রতারণা করিয়া থাকেন। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নিজের অভিমত কর্ম্মানুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন। একটু অনুধাবন করিয়া বিচার করিলে জানা যায় যে, নিজের রাজস তামস প্রকৃতি অনুসারে আপন আপন স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যকে স্বার্থপর ব্যক্তিসকল ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। এইরূপে মাংসভক্ষণ ও মদ্যপানকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। এই সকল যে ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এমন কি, কোন কোন সমাজে ব্যভিচার ও পরস্ত্রীগমনও ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহা যে কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই অনুমান করিতে পারেন।

আবার অনেক লোক জনসমাজকে প্রতারণা করিতে চাহেন না, কিন্তু নিজের অজ্ঞানতা ও বুদ্ধির দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত ভ্রমবশে নিজ বুদ্ধিগত মলিনভাবগুলিকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া দেন। ইহাতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সহিত অশুদ্ধভাবের সংমিশ্রণ হইয়া বিকৃত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

পূর্ব্বোক্ত বঞ্চনা ও প্রতারণা প্রযুক্ত বিশুদ্ধ ধর্ম্মে বিজাতীয় ভাব-সংমিশ্রণের পরিমাণ অল্প ; কিন্তু ভ্রম ও অজ্ঞানতাবশতঃ ধর্ম্মবিকৃতির পরিমাণই অধিক।

বিশুদ্ধসত্ত্ব-বিশিষ্ট-বুদ্ধির লোকই বিরল। অতএব বিশুদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও যাজন অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। রজস্তমোবিমিশ্র বুদ্ধির লোকসংখ্যাই অধিক। সুতরাং বিমিশ্র বিকৃত ধর্ম্মের বাহুল্যরূপে প্রচারই অবশ্যম্ভাবী। কারণ, তদ্রূপ রুচিবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা সমধিক। কিন্তু ভ্রান্ত ও অজ্ঞলোককে ভ্রম উপদেশ করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমান্ধকার কূপে পাতিত করা সৎ এবং দয়াবান সদাশয় লোকের কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কঃ ৫ম অঃ—

"ইত্থং বিমৃশ্যগুরুশিষ্যানতজ্জ্ঞান যোজয়েৎ কর্ম্মসু কর্ম্মমূঢ়ান্।
কং যোজয়েন্মনুজোঽর্থং লভেত নিপাতয়ন্নষ্টদৃশং হি গর্ত্তে॥"

কোন কৃপালু ব্যক্তি কোন অন্ধকে গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া কি পুরুষার্থ লাভ

করিতে পারেন? অতএব অজ্ঞজনকে জ্ঞান উপদেশ করাই দয়াবান্ পুরুষের কার্য্য।

অজ্ঞান বা ভ্রমপূর্ণ বুদ্ধিদ্বারা যাঁহারা উপদেশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই শ্লোকোক্ত দোষে দোষী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা সেইরূপ ভ্রমপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধঃপাত অবশ্যম্ভাবী। এরূপ ভাব লইয়া বেদে একটি মন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ,
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
জংঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ,
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

অর্থ—

যাঁহারা অবিদ্যার অন্তরে বর্ত্তমান, তাঁহারাও নিজকে ধীর ও পণ্ডিত মনে করিয়া চতুর্দ্দিকে মাথা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ভ্রমণ করিতেছেন। যেরূপ অন্ধের অনুগত অপর অন্ধ। কারণ তাহারা মূঢ়।

বৈদিক পরিভাষায় কর্ম্মকাণ্ডকেই অবিদ্যা বলা হয়। জীবের হৃদয় যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীভগবৎ-উপাসনা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখনই তাহারা কর্ম্মকাণ্ডে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। কর্ম্মকাণ্ড অর্ব্বাচীন ও অনিত্য। ইহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলা অজ্ঞানের কার্য্য। অতএব কর্ম্মকাণ্ডকে অবিদ্যা বলা হয়। অজ্ঞান ও অবিদ্যা পর্য্যায়বাচী শব্দ; যথা ঘট ও কলস।

কর্ম্মকাণ্ডকে অর্ব্বাচীন ও অনিত্য বলায় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু বিচারপূর্ব্বক দেখিলে ক্ষোভ কিংবা ক্রোধের কারণ কিছুই নাই। মনে করুন, প্রবলতরঙ্গান্বিত প্রলয়কালীন জলনিধির শেষপর্য্যঙ্কে শ্রীভগবান্ শয়ান। তাঁহার নাভিপদ্মে চতুরানন হিরণ্যগর্ভ আছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় সেখানে কর্ম্মকাণ্ড সকল কিরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে? কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে যাগ ও শ্রাদ্ধ এবং বর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকলই প্রধান। কিন্তু সে সময়ে না দুগ্ধ, না দধি, না ঘৃত, না মধু, না কুশ, না কাষ্ঠ, না তিল, না যব, না চন্দন, না পুষ্প, না পৃথিবী, না অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছিল? এরূপ সময়ে অগ্নিহোত্র, বাজপেয়, শ্রাদ্ধতর্পণ বা স্বস্ত্যয়ন-শান্তি পার্ব্বণাদি কর্ম্ম কিরূপে সমাধান হয়? যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং যাগ-শ্রাদ্ধাদি নানা দ্রব্যসাধ্য, আদিকালে সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহার কিরূপে অনুষ্ঠান হইতে পারে? সৃষ্টির আদিকালে ছিলেন শ্রীভগবান্ আর ব্রহ্মা। ব্রহ্মা নিজের মন ও আত্মার অতিরিক্ত আর কি বস্তু শ্রীভগবান্‌কে সমর্পণ

করিতে পারেন ? আর শ্রীভগবান্ই বা তদানীং অসৃষ্ট ও অবর্ত্তমান কাষ্ঠ, কুশ, যব, তিল, তণ্ডুল, ঘৃত, দুগ্ধাদি বস্তুসাধ্য কর্ম্ম কিরূপে উপদেশ করিতে পারেন ? সুতরাং মন ও আত্মসমর্পণরূপ ভাবকেই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে ধর্ম্মরূপে উপদেশ করেন। ইহাই সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং আদিকালে শ্রীভগবদুপদিষ্ট আদিধর্ম্ম।

অগ্নিহোত্রের তত্ত্ব-বিচার সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণে এই ভাবের একটি আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয় ;—

"তদ্ধৈতজ্জনকো বৈদেহঃ যাজ্ঞবল্ক্যং পপ্রচ্ছ বেত্থাগ্নিহোত্রং যাজ্ঞবল্ক্যা ইতি বেদ-সম্রাড়ীতি কিমিতি পয় এবেতি। যৎ পয়ো ন স্যাৎ কেন জুহুয়া ইতি ব্রীহিযবাভ্যামিতি যদ্ব্রীহিযবৌ ন স্যাতাং কেন জুহুয়া ইতি যা অন্যা ওষধয় ইতি যদন্যা ওষধয়ো ন স্যুঃ কেন জুহুয়া ইতি যা আরণ্যা ওষধয় ইতি যদারণ্যা ওষধয়ঃ ন স্যুঃ কেন জুহুয়া ইতি—বানস্পত্যেনেতি যদ্বানস্পত্যং ন স্যাৎ কেন জুহুয়া ইত্যাদ্ভিরিতি যদাপো ন স্যুঃ কেন জুহুয়া ইতি। স হোবাচ ন বা ইদং তর্হি কিঞ্চনাসীদথৈতদহূয়তৈব সত্যং শ্রদ্ধায়ামিতি। বেত্থাগ্নিহোত্রং যাজ্ঞবল্ক্য ধেনুশতং দদামীতি হোবাচ।"

(কাঃ ১১ অঃ ৩ ব্রাঃ ৫)

অর্থ—

বৈদেহ জনকরাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি অগ্নিহোত্র জানেন ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সম্রাট্! জানি। কি অগ্নিহোত্র ?" "পয়ঃ"। "যদি পয়ঃ না হয়, কিসে হোম কর ?" "ব্রীহি-যবে"। "ব্রীহিযব যদি না হয় ?" "অন্য ওষধি দ্বারা।" "অন্য ওষধি না হয় ?" "বনস্পতি দ্বারা"। "বনস্পতি না হইলে ?" "জলের দ্বারা"। "জল না হইলে ? কি দিয়া হোম কর ?" তখন যাজ্ঞবল্ক্য, আবার বলিলেন, "যে সময় এই জগতে কিছুই ছিল না, তখনও অগ্নিহোত্র করা হইত, শ্রদ্ধাতে সত্য হোম করা হইত।" জনক বলিলেন, "তুমি বাস্তবিক অগ্নিহোত্র জান, তোমাকে শতধেনু দান করিতেছি।"

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সত্য বস্তুতে শ্রদ্ধা রাখাই যথার্থ অগ্নিহোত্র ও অনাদিকালের উপদিষ্ট অনুষ্ঠেয়, অন্যান্য অগ্নিহোত্র অর্ব্বাচীন। শ্রীবৈষ্ণবগণ সম্প্রতিও এই সনাতন অগ্নিহোত্র করিয়া থাকেন। এই ভক্তিময় অগ্নিহোত্রই তাঁহাদের প্রধান কর্ম্ম। তাহারা সর্ব্বদা নিজের শ্রদ্ধাতে সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্কে আবাহন করিয়া থাকেন। অর্ব্বাচীন অগ্নিহোত্রের কোন আবশ্যকতা রাখেন না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও বিবিধ কর্ম্মকাণ্ড যে অর্ব্বাচীন ও অনিত্য, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

আদিকালে সমস্ত বেদ শ্রীভগবদুপাসনাময় ছিল। ক্রমে অজ্ঞানতা ও জীবের বুদ্ধির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কর্ম্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়।

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি
ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। (মুণ্ডক ১।২।১)

অর্থ—এইটি সত্য যে, কবিগণ বৈদিক মন্ত্র-সমূহে যে সমস্ত কর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, তাহা ত্রেতাযুগে বহুধা বিস্তৃত হয়।

ইহার ভাব এই যে, দিব্যজ্ঞানময় সত্যযুগে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ভক্তি নির্ম্মল-হৃদয় মুনিগণের মানসদর্পণে বেদার্থরূপে পরিগৃহীত হইত। ত্রেতাযুগে কামনা ও জ্ঞানের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানই বেদার্থরূপে পরিগৃহীত হইতে লাগিল। বৈদিক অর্থ শ্রীভগবদুপাসনা হইতে স্থানচ্যুত হইয়া কিরূপে কর্ম্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হইল, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা দেখান যাইতেছে ;—

"গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে।"

এই একটি যজুর্ব্বেদের মন্ত্র। ইহা সনাতন সময়ে শ্রীভগবানের স্তবে বিনিযুক্ত ছিল। পরে যখন দুর্ব্বলপ্রকৃতি জীব, ভাবময় শ্রীভগবদুপাসনাতে সন্তোষ লাভ না করিতে পারিয়া, আড়ম্বরময় কর্ম্মকাণ্ডে শ্রদ্ধাস্থাপন করিল, তখন এই মন্ত্রটি কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইল। সে সময়ে এই মন্ত্র যজ্ঞে অশ্বাভিধানী-গ্রহণের মন্ত্ররূপে পরিণত হইল। কতকদিনে এই ভাবে থাকিয়া শ্রৌত কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া স্মার্ত্ত কর্ম্মে গণেশ-পূজায় বিনিযুক্ত হইল। বর্ত্তমান যুগে এই মন্ত্রে আমাদের পুরোহিত মহাশয়েরা গণেশ-পূজা করাইয়া থাকেন।

"একমথে দ্বে উর্জ্জে ত্রিণীরায়স্পোষায়।"

এই একটি মন্ত্র, ইহা আদিকালে শ্রীভগবদুপাসনারূপ স্তবে বিনিযুক্ত ছিল. ক্রমে সেই অর্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া কর্ম্মযুগে সোমক্রমণি গাভীর অনুগমনে বিনিযুক্ত হইল। ক্রমশঃ সে স্থান হইতেও ধ্বস্ত হইয়া বর্ত্তমানে বরকন্যার বিবাহে সপ্তপদীতে বিনিযুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি এই মন্ত্র দ্বারা আমরা বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া অর্দ্ধাঙ্গীলাভ করিয়া থাকি।

এইরূপে সমস্ত বেদমন্ত্রের অর্থ ক্রমে ভগবদ্ভাবময় অর্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিবিধ কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া অপকৃষ্ট ভাব ধারণ করিয়াছে।

কর্ম্ম দ্বিবিধ ;—শ্রৌত ও স্মার্ত্ত। দ্বিবিধ কর্ম্মই অবিদ্যা। কর্ম্মকে অবিদ্যা বলা হয় দুই কারণে। প্রথম কারণ অনীশ্বরবাদ। কর্ম্মকাণ্ডে ঈশ্বর নাই। ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনও নাই। কারণ, আমি যেরূপ কর্ম্ম করিব, তদ্রূপ ফলভোগ করিব। যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি লোককে নিত্য সিদ্ধান্ত করিবার জন্য পূর্ব্ব-মীমাংসাতে জগৎকে নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। জগৎ সর্ব্বদা একরূপ। ইহার সৃষ্টি-প্রলয় নাই। সুতরাং ঈশ্বরেরও কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ অপসিদ্ধান্ত কেবল কর্ম্ম ও

কর্ম্মফলের নিত্যতা-প্রতিপাদনের জন্য। যদি জগতের সৃষ্টি-প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রলয়কালে কর্ম্ম ও স্বর্গাদি লোক না থাকায়, কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল অনিত্য হইয়া যায়। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিত্যতা-প্রতিপাদনের জন্য ঈশ্বরের অভাব বা নিরীশ্বরবাদ কল্পনা করার ন্যায় অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা আর কি হইতে পারে ?

পূর্ব্ব-মীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনি ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। কিন্তু ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস জীবের ঈশ্বর-প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা হয়। উহা তর্ক কিংবা উপদেশ দ্বারা একেবারে দূরীভূত করিতে পারা যায় না। সুতরাং এইরূপ অনীশ্বরবাদে জীবগণ বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন ঈশ্বরকে কর্ম্মফলদাতারূপে অভিষিক্ত করা হইল স্মার্ত্ত কর্ম্মকাণ্ড-সকলের মধ্যে এইরূপ ঈশ্বরেরই নিরূপণ। কিন্তু এইরূপ ঈশ্বরের সত্তা ও অভাব দুই-ই সমান। যেহেতু, তিনি জীবকৃত কর্ম্মের ছায়াস্বরূপ। তাঁহার এমত কোন ক্ষমতা নাই যে, তিনি কর্ম্মফলের এক বিন্দু-বিসর্গ অন্যথা করিতে পারেন। জীব যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তদ্রূপই ফল তাঁহাকে দিতে হইবে। তিনি যেন একজন ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডের পরিচালিত পরাধীন ম্যাজিষ্ট্রেট। ম্যাজিষ্ট্রেট জানেন, লোকটি দোষী, কিন্তু আইন তাহা বলে না, তাঁহার নথিতে প্রমাণ নাই। আইন অনুসারে তিনি তাহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য। কর্ম্মকাণ্ডের উপর ঈশ্বরের অধিকার ঠিক এইরূপ।

সুদৃঢ় কর্ম্মকাণ্ডপরায়ণ ব্যক্তিগণ একেবারেই ঈশ্বরের অভাব কল্পনা করিয়া থাকেন। দুর্ব্বলচেতা কর্ম্মকাণ্ডপরায়ণ ব্যক্তিগণ একেবারে ঈশ্বরের অভাব স্বীকার করিতে সাহসী হন না। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মপরতন্ত্র করিয়া কর্ম্মস্থলে বসাইয়া দেন। এই উভয় কারণেই কর্ম্মকাণ্ডকে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বলা হয়।

রাজনৈতিক জগতে যেরূপে আইনের বন্ধন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দোষ করিলেও দোষী হয় না, কর্ম্মকাণ্ডেও সেইরূপ স্বার্থসাধনের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ স্বার্থসাধনকে লোকে প্রতারণা বলিয়া থাকে। স্মার্ত্ত কর্ম্মের ত কথাই নাই, শ্রোত কর্ম্মেও এইরূপ প্রতারণার উদাহরণের অভাব নাই। ইহার নিদর্শনার্থে একটি বৈদিক আখ্যায়িকা এ স্থানে উদ্ধৃত করা হইল ;—

"মনোর্হ বা ঋষভ আস, তস্মিন্ অসুরঘ্নী সপত্নঘ্নী বাক্ প্রবিষ্টাস, তস্য হ স্ম শ্বশথাৎ রবথাদসুররক্ষসানি মৃদ্যমানানি যন্তি, তে হাসুরা সমূদিরে পাপম্ বত নো যমৃষভ সচতে কথং ন্বিমং দভ্নুয়ামেতি কিলাতা কুলি ইতি হাসুরব্রহ্মা বাসতুঃ।১৪। তৌ হোচতুঃ শ্রদ্ধা দেবো বৈ মনুরাবং নু বেদাবেতি তৌ হাগত্যোচতুঃ মনো যাজয়াবত্বেতি

কেনেত্যনেনর্ষভেনেতি তথেতি তস্তা লব্ধস্ত সা বাগপচক্রমে। ১৫। সা মনোরেব জায়াম্ মনাবীম্ প্রবিবেশ তস্তৈ হ স্ম যত্র বদন্ত্যৈ শৃণ্বন্তি ততো হ স্ম এব অসুররাক্ষসানি মৃষ্যমানানি যন্তি তেহা সুরা সমূদিরে ইতো বৈ নঃ পাপীয়ঃ সচতে ভূয়ো হি মানুষী বাক্ বদতীতি কিলাতাকুলি হৈ বোচতুঃ শ্রদ্ধা দেবো বৈ মনুরাবং ন্বেনং বেদাবেতী তৌ হা গত্বোচতুঃ মনো! যাজয়াবঃ ত্বেতি কেনোত্যনয়ৈব জায়য়েতি তথেতি তস্তা আলব্ধায়ৈ সা বাগপচক্রমে। ১৬।

যজুর্ব্বেদ শতপথ ব্রাহ্মণ কাণ্ড ১ অঃ ১ ব্রাঃ ৪

অর্থ—মনুর একটি বৃষভ ছিল। অসুরঘ্নী ও সপত্নঘ্নী বাণী তাহাতে প্রবিষ্ট ছিল। সে যখন শ্বাস ফেলিত বা দৌড়াদৌড়ি করিত ও শব্দ করিত, তখনই অসুর-রাক্ষস-সকল পীড়িত হইয়া পলায়ন করিত। ইহাতে ব্যাকুল হইয়া অসুরগণ বলিতে লাগিল—"এই বৃষ আমাদিগকে বড় কষ্ট দিতেছে। কিরূপে ইহাকে দমন করিব?" অসুরগণের মধ্যে কিলাত ও অকুলী নামে দুই জন ব্রহ্মা ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা জানি, মনু বড় শ্রদ্ধাবান্। আমরা তাঁহাকে ঠকাইতে পারিব।" এই বলিয়া তাহারা দুই জন মনুর নিকটে যাইয়া বলিলেন, "আমরা তোমাকে দিয়া যজ্ঞ করাইব।" মনু বলিলেন, "কিসের দ্বারা যজ্ঞ করাইবেন?" তাঁহারা বলিলেন, "এই বৃষের দ্বারা।" যখন সেই বৃষভকে বধ করা হইল, তখন তাহাতে যে অসুরঘ্নী বাণী ছিল, সে পলায়ন করিয়া মনুর স্ত্রীতে প্রবেশ করিল। মনুর স্ত্রী যখনই আলাপ-সম্ভাষণ করে ও তাহার শব্দ শুনা যায়, তখনই অসুর-রাক্ষস সকল পীড়িত হইয়া পলায়ন করে। তখন অসুরেরা বলিতে লাগিলেন, "ইহাতেও আমাদের আবার কষ্ট হইতে লাগিল। এই যে মানুষী বাণী আমাদের বিনাশ করে।" তখন কিলাত ও অকুলী বলিলেন, "মনু বড় শ্রদ্ধাবান্, তাহা আমরা জানি। পুনরায় তাহাকে ঠকাইব।" ইহা বলিয়া তাঁহারা মনুর নিকটে গমন করিয়া বলিলেন, "আমরা তোমাকে যজন করাইব।" মনু বলিলেন, "কিসের দ্বারা?" তাঁহারা বলিলেন, "তোমার এই জায়া দ্বারা।" মনুর স্ত্রীকে বধ করা হইল ও সে বাণী তাহার স্ত্রী হইতে পলায়ন করিল।

ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, কর্ম্মকাণ্ডে স্বার্থের জন্য প্রবঞ্চনা করা অনেক প্রাচীন কাল হইতে চলিতেছে ও কর্ম্মশ্রদ্ধাক্রান্ত বুদ্ধি যে বিচারশূন্য হইয়া যায়, তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। মনুর বুদ্ধি যদি ভক্তিনিষ্ঠা হইত, তিনি কাহারও কথায় বৃষভকে কি আপনার স্ত্রীকে বধ করিতেন না। কারণ, ভক্তিনিষ্ঠায় স্থাবর জঙ্গম বস্তুমাত্রকে ভগবদ্ভাবে প্রণাম করা ও সম্মান করা বিহিত। স্বর্গ কিংবা ধনপুত্রাদির জন্য অপরের প্রাণ বিনাশ করা পাপকর্ম্ম। এইরূপ স্বার্থ, প্রবঞ্চনা ও হিংসার সংমিশ্রণহেতু কর্ম্মকাণ্ডকে অবিদ্যা ও অজ্ঞান বলা হয়।

বেদে ইহাও দেখা যায় যে, প্রায় যজ্ঞাদি অনেক কর্ম্ম প্রথমে অসুরগণেরই নিকটে ছিল।

স হৈতদ্বাচাসুরেষু বা এযোঽগ্রে যজ্ঞ আসীৎ সৌত্রামণী

সদেবানুপনৈপ্রেৎ।—যজুর্ব্বেদ শতপথ ব্রাঃ কাঃ ১২ অঃ ৯ ব্রাঃ ৫ অঃ ৭

অর্থ—পূর্ব্বকালে এই সৌত্রামণিযজ্ঞ অসুরগণের মধ্যেই ছিল, পরে দেবগণের নিকটে প্রাপ্ত হইল।

ইহাতেও প্রতিপন্ন হয় যে, কতক কর্ম্মকাণ্ড তামস বুদ্ধি হইতে সমুৎপন্ন। বোধ হয়, কতকটা পার্থিব ও ঐন্দ্রিয়িক সুখের লালসায় পরে পরে অসুরগণ হইতে দেবগণ উহা গ্রহণ করিলেন।

অনুমান হয়, আরম্ভে কর্ম্ম অসুরগণ কর্ত্তৃকই প্রচার হয়। কারণ, সকলের প্রথম মনুই যজ্ঞ করেন। যথা,—

"মনুইবা অগ্রে যজ্ঞেনেজে তদনুকৃত্যেমা প্রজা যজন্তে।"

অর্থ—সকলের পূর্ব্বে মনুই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুকরণ করিয়া এই সমস্ত প্রজা যজ্ঞ করিতেছে।

যেরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসুরগণ কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করিতেন, সেইরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবগণও কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার করিতেন। প্রভেদ এই যে, তাঁহারা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করিতেন না। কিন্তু স্বার্থসাধনের ত্রুটি ছিল না।

"তেহ স্মাবমর্শং যজন্তে তে পাপীয়াংস আসুরথ যে নেজিবে তে শ্রেয়াংস আসুস্ততো শ্রদ্ধা মনুষ্যান্ বিবেদ যে যজন্তে পাপীয়াংসঃ তে ভবন্তি যে ন যজন্তে শ্রেয়াংসঃ তে ভবন্তীতি তত ইতো দেবান্ হবির্ন জগাম ইত প্রদানাদ্ধি দেবা উপজীবন্তি।২৪॥ তে হ দেবা ঊচুর্বৃহস্পতিমাঙ্গিরসমশ্রদ্ধা বৈ মনুষ্যা ন বিদৎ তেভ্যো বিধেহি যজ্ঞমিতি।"

অর্থ—তাঁহারা অর্থাৎ মনুষ্যেরা অবমর্শ পূর্ব্বক যজন করেন। তাহাতেই তাঁহারা পাপীয়ান্ অর্থাৎ দুঃখী হইতে লাগিলেন এবং যাঁহারা করিতেন না, তাঁহারা সুখী ছিলেন। এই কারণে মনুষ্যগণের মনে যজ্ঞবিষয়ে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। তাহারা ইহার বিচার করিতে লাগিলেন। যাহারা যজন করেন, তাহারা পাপীয়ান্ হয়েন ও যাঁহারা যজন করেন না, তাঁহারা শ্রেয়ান অর্থাৎ সুখী হন। (ইহাই ভাবিয়া মনুষ্যগণ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিলেন)। তখন এই মনুষ্যলোক হইতে দেবগণ হবি প্রাপ্ত হইলেন না। এই মনুষ্যলোক হইতে হবি-প্রদানের দ্বারাই দেবগণের উপজীবিকালাভ হয়। দেবগণ উপজীবিকার অভাবে কাতর হইয়া যজ্ঞের প্রবৃত্তির জন্য আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে বলিলেন, "মনুষ্যগণের মনে যজ্ঞকার্য্যে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি যাইয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া

পুনরায় যজ্ঞে প্রবৃত্ত কর।" ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবগণও স্বার্থের জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকেন। কিন্তু অসুরগণের ন্যায় প্রতারণা করেন না।

এইরূপ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেও আমরা অনেক ছিদ্র দেখিতে পাই। যখন বৈদিক-কর্ম্মও প্রতারণা ও স্বার্থশূন্য নহে, তখন যে স্মার্ত্তকর্ম্ম বিশুদ্ধ হইবে, তাহা কিরূপে অনুমান করিতে পারা যায়?

সম্প্রতি স্মার্ত্তকর্ম্মের আলোচনা করা যাউক। বৈদিক সময়ে ধর্ম্ম শব্দের সঙ্গে স্মার্ত্তশব্দের সংযোগ ছিল না। কেবল কয়েকটি কর্ম্ম মাত্র স্মার্ত্ত শব্দে বুঝাইত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী স্মৃতিরত্ন।
বৃন্দাবন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি ও তত্ত্ব-বিচার

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ব্রাহ্মণও বটেন; পণ্ডিতও বটেন এবং তিনি ত্রিবেদী। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান। কাজেই তিনি, কি করিয়া অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিলেন, ভাবিয়া পাই না। ত্রিবেদী মহাশয় কি ধর্ম্মে, কি সামাজিক ব্যবহারে, প্রায় গতানুগতিক হিন্দু। তিনি ধর্ম্মের তত্ত্ব কিংবা সাধনা, কোন দিক্ দিয়াই দেবেন্দ্র-পন্থী নহেন। অথচ দেবেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে বেদের কথা বলিতে গিয়া তিনি এমন ভাবোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়াছেন যে, সম্ভবতঃ তৎকালে বেদই তাঁহার মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং দেবেন্দ্রনাথের কথা, সম্পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ অনেকটা আশ্চর্য্য রকমে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সচরাচর ভাবোন্মাদকে প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু ভাব যখন তাঁহাদিগকে হঠাৎ পাইয়া বসে, তখন আশ্চর্য্য নয় যে একটা অপ্রত্যাশিত রকমের দুর্ঘটনা ঘটিয়া পড়ে। তাহা না হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের-ভিত্তি স্থাপন-ব্যপদেশে, হাতের কাছের রামমোহনকে পর্য্যন্ত ঠেলিয়া ফেলিয়া, প্রায় ৭।৮ বৎসর সংশয়-দোলায় দোল খাইয়া, প্রয়োজনের অধিক কলরব করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ করিলেন বেদকে বর্জ্জন; আর দূরাগত ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ, সেই ঘটনার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াও কি না বাঙ্গালী পাঠককে অম্লানবদনে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহাই হইল দেবেন্দ্রনাথের বেদ বা বেদান্ত-গ্রহণ।... ব্রাহ্মণ আজ বেদের গ্রহণ ও বর্জ্জন বুঝিতে পারে না,—বুঝাইতে পারে না! অথচ সেই ব্রাহ্মণ আবার হেঁসেলে বসিয়া ব্রাহ্মণ্যের আস্ফালনও ছাড়ে না!

ফেরঙ্গ বাঙ্গালা! তোমার ঐ নূতন কাঙ্ক্ষকুঞ্জ ইউরোপ-বিশ্বের দিকে তাকাইয়া আজ শতবর্ষ পরে একবার ভাব দেখি, জাতির ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা কেন? কিসে হইল? মনে রাখিও, দীর্ঘ একটি শতাব্দী সংস্কারের অছিলায় সমাজ-দেহের দেহের উপর হাত পাকাইবার জন্য তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কি করিয়াছ? কি করিতে পারিবে মনে কর? ধার-করা ফেরঙ্গভাব, আর তার উপর উপনিষদের প্রলেপ! এই!—জাতি আত্মস্থ হও; সংবুদ্ধ হও! বাঙ্গালী তোমার ধাত ছাড়িয়া গিয়াছে, ফিরাইয়া আন।

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনায় সংস্কৃত শ্লোকের ছড়াছড়ি আছে, জানি। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ 'উপনিষদ' শ্লোকের সংগ্রহ মাত্র, তাহাও জানি। কিন্তু সংস্কৃতের মোহ আর উপনিষদ-শ্লোক-ভীতি কি এতই প্রবল যে, ত্রিবেদী ব্রাহ্মণও সেই মুখোস দেখিয়া ভয় পাইয়া, 'নয়'কে 'হয়' সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন? বাঙ্গলা দেশে বেদবিদ্বেষী-এমন অহিন্দুর ত অভাব নাই, যাঁহারা কথায় কথায় ভূরি ভূরি উপনিষদ-শ্লোক উদ্ধার না করেন। তবে?—এই ন্যাকামি, ভাঁড়ামি, এই প্রাণহীন ছলনার মূল কোথায়?

রামেন্দ্র বাবুর দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই ভ্রমের কারণ কি? সাধারণতঃ লোকে দেবেন্দ্রনাথকে একটু হিন্দুভাবাপন্ন বলিয়া মনে করে। রামেন্দ্র বাবু কি এই 'সাধারণের মনে করার' উপর নির্ভর করিয়া, এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন? কি করিয়া বিশ্বাস করি? তত্রাচ আমি নিবেদন করিয়া যাইতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিস্থাপন করিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ যে ভাবে বেদকে বর্জ্জন করিয়াছেন, বা এমন কি, আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ খৃষ্টানী ধরণের। হিন্দু অথবা মোগলাই গন্ধ ইহাতে কিছুমাত্র নাই। শাস্ত্রের কোন একটা অংশ মিথ্যা হইলেই সমগ্র শাস্ত্র মিথ্যা; অতএব সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, ইহা খ্রীষ্টানী মত, হিন্দুর নহে। প্রত্যেক বড় বড় যুগেই শাস্ত্র-সমস্যা লইয়া হিন্দুমনীষা বিব্রত হইয়াছে, কিন্তু কোন যুগেই খৃষ্টানী মতে কোন হিন্দু শাস্ত্রকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করে নাই,—দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে। এমন যে রামমোহন, যাঁহার সম্বন্ধে মত-দ্বৈধতার অন্ত নাই, তিনিও শাস্ত্রকে আর যাহাই হউক, খৃষ্টানী মতে ব্যাখ্যা করেন নাই। শাস্ত্রের মীমাংসায় বেদবর্জ্জন-ব্যাপারে সংস্কার-যুগের প্রথম খৃষ্টান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

বাঙ্গালীর গত শতাব্দীর সংস্কার-যুগের পথের আকে-বাঁকে এইরূপ সব মারাত্মক খৃষ্টানী গর্ত্ত আছে,—যাহার উপরিভাগমাত্র আমাদের সেই কোন্ কালের ভাঙা মন্দির হইতে সংগৃহীত দু'চারিটা বাসি নির্ম্মাল্যে সুশোভিত। অথচ পল্লবগ্রাহী সাহিত্যিকগণ ইহারি উপর দিয়া, বিনা বিচারে, আমাদের বিংশ শতাব্দীর যাত্রার পথ তৈরী করিয়া চলিয়াছেন। আমরা এই পথে কোন কোন দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা যে না করি-য়াছি, তাহা নহে। কিন্তু তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, যদি আজো তাহা না ভাবি, তবে আর ভাবিবার বেশী দিন বাকী থাকিবে কি?

আর এক কথা এই যে, আমাদের জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী। তিনি অন্ততঃ রামেন্দ্র বাবুর মত সাহিত্যিকের নিকট, সংস্কার-যুগের এক অতি গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে এই দুঃসময়ে 'ভাব'ই আশা করেন, 'পল্লব' নহে।

যাহা হউক, দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ গোঁড়া খৃষ্টানী ধরণে বেদকে পরিত্যাগ করিলেন, রাজা রামমোহন তাহা কদাপি করেন নাই। রাজা রামমোহন আধুনিক ব্রাহ্মদের

ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন কি না, বলা শক্ত। তবে বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য তিনি অধিকারিভেদে বেদের প্রতিপাদ্য যে পরম ব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনাই প্রচলন করিতে সমধিক যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার কালে ইহার একটা সার্থক প্রয়োজন ছিল না, এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ বেদ ছাড়িয়া তাঁহার 'আত্মপ্রত্যয়ে' ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, রামমোহন তাহা কখনও করেন নাই এবং করিতে সম্মত ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের ধারণা এইরূপ যে, বাঙ্গালী হিন্দুরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইলেই আর বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া মানিবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অথচ এই সমস্ত জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত জীবদের মধ্যে কিরূপ ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, তাহা "রামমোহনের তখন বিবেচনায় আইসে নাই"! এখন সেই সমস্ত উন্নত জীবদের জন্য দেবেন্দ্রনাথের 'আত্ম-প্রত্যয়ে'র ধর্ম্ম, প্রচারের আবশ্যক হইল। রামমোহন শুধু যাঁহারা বেদ মানে, তাঁহাদের জন্যই বেদের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনে যাহারা বেদ মানিবে না, তাহাদের জন্য তিনি কিছুই করিয়া যান নাই, এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে বেদকে অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্জ্জন করিতে হইবে, ইহা পর্য্যন্ত রামমোহন ভাবিতে পারেন নাই। রামমোহন সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের ইহাই সিদ্ধান্ত। রামমোহনের পরে সেই অচিন্তনীয় দুরূহ সংস্কার দেবেন্দ্রনাথ করিলেন। ইহা, দেবেন্দ্রনাথের নিজের বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এই ফাঁকে বলিয়া যাইতে হইতেছে যে, রামমোহনের শাস্ত্র, যুক্তি ও লোকসমাজের ব্যবহার এবং অনুষ্ঠানাদির পারম্পর্য্য, এই তিনের যথাযথ সঙ্গতি ও সমন্বয়-মূলক যে শাস্ত্রব্যাখ্যা, যাহাকে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং আমাদের বিশ্বাস, যাহা বহুপ্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রব্যাখ্যাকারগণের নিতান্ত অনুরূপ, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে রাজা রামমোহন হিন্দুর সনাতন শাস্ত্রমীমাংসার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; আর দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুপদ্ধতি সম্যক্ অবগত না হইয়া, খৃষ্টানী বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া, নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার ফলস্বরূপ, রামমোহনের আরব্ধ সংস্কারকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, এখন আমরা দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের "আত্মপ্রত্যয়" নামধেয় দার্শনিক ভিত্তির দুই চারিটা খিলান পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এই 'আত্মপ্রত্যয়ে'র ইতিহাস এবং ভূগোল এই দুই-ই আমাদের তল্লাস করিয়া দেখিতে হইবে। কেন না, আমার বিশ্বাস যে, দেবেন্দ্রনাথ হইতেই বাঙ্গালীর সংস্কারের কটাহে ইতিহাস আর ভূগোলের এমন খেচরান্ন তৈয়ার হইয়াছে যে, এই অদ্ভুত ভোজ্যের পাচকেরাই ইহাকে গিলিয়া পুনরায় কতমতে উগরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া,

পুলিস ও পাদরী-প্রপীড়িত পেটরোগা জাতির পক্ষে ইহা যে বিষম দুষ্পাচ্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বেদ ছাড়িবার পরেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তির জন্য আত্মপ্রত্যয়ের আশ্রয় লইলেন। ইহা আমরা দেখিয়াছি, এবং এই 'আত্মপ্রত্যয়কে' কি অর্থে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দুই একদিন নয়, ক্রমাগত ১৬ বৎসর ধরিয়া নানামতে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও বুঝাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহার কারণ, 'আত্মপ্রত্যয়' এই মনোবিজ্ঞানাশ্রিত দার্শনিক কথাটার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, এবং হয় নাই। ইহার কারণ, 'আত্মপ্রত্যয়' অর্থে আমাদের আচার্য্যেরা যাহা বলিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এবং ইউরোপের দার্শনিকেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ধরিতে পারেন নাই ; অপিচ, এই দুই দেশের স্বতন্ত্র চিন্তার ধারায় সংযুক্ত, অন্যাধিক দুই স্বতন্ত্র বস্তুকে তাহাদের নিজ নিজ স্থানভ্রষ্ট করিয়া, দেশ-কাল-পাত্রের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, জোড়াতাড়া দিয়া সেলাই করিয়া মিলমিশ খাওয়াইবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা তিনি করিয়াছেন—যাহা সম্ভবতঃ 'জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নতেরা' নিতান্তই পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করিবেন। ইহার কারণ, যেমন ধরিয়া বাঁধিয়া পিরীত হয় না, তেমনি চঞ্চল বয়সের মত এ নৈবেদ্য হইতে এক ঠোক ও নৈবেদ্য হইতে এক ঠোক আনিয়া—ভেজাল দিয়া মিশাল দিয়া, জগতে কোন নূতন ধর্ম্মের গোড়াপত্তন হয় না। আজও পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহার আরও কারণ, এবং শেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ—যে, দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে উনবিংশ কিংবা বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জন্য সত্যই কোন নূতন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় নাই—অথচ সেই অবিদ্যমান ও অজ্ঞাত বস্তুর দার্শনিক ভিত্তির জন্য তিনি অনর্থক চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদি সত্যই তিনি কোন নূতন ধর্ম্ম দিয়া যাইতেন, তবে আমরা সম্ভবতঃ এতদিনে তাহার একটা সঙ্গত দার্শনিক ভিত্তির অন্বেষণে তৎপর হইতাম। তাঁহাকে সে জন্য কষ্ট করিতে হইবে কেন ? বাঙ্গালী, শাঙ্কর অদ্বৈত ও মায়াবাদ-নিরসনকারী মহাপ্রভুর ধর্ম্মের—তত্ত্ববিশ্লেষণ করে নাই বা করিতে আলস্য করিয়াছে, অথবা পরাঙ্মুখ হইয়াছে,—এমন ত নহে। এবং মেটে প্রদীপের তেলের আলোকে, ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া—বাঙ্গালী একদিন তাঁর যুগধর্ম্মের, তাঁর প্রাণধর্ম্মের যে তত্ত্ববিশ্লেষণ, যে দার্শনিক বিচার করিয়াছে,—গত শত বর্ষের ফেরঙ্গ বাঙ্গলা তাহার কোন খবর রাখে না, তা জানি,—তথাপি সে দার্শনিক বিচার, পৃথিবীর কোন্ ক্যাণ্ট-অ, কোন্ হেগলের পাত্তে দেওয়া যায় না, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ? ফেরঙ্গ বাঙ্গলা, জর্মাণও জানে না, সংস্কৃতও জানে না, বৈষ্ণব-যুগের যে বাঙ্গলা সাহিত্য, তাহাই জানে না—অথচ খেলো তর্জ্জমার নকল ন্যাকামীতে দেশে ভিঠান দায় হইয়া উঠিয়াছে। এবং কেন ?

১৮৪৮ খৃঃ 'ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে' দেবেন্দ্রনাথ 'আত্ম-প্রত্যয়' এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ১৮৫৫ খৃঃ এই 'আত্মপ্রত্যয়' শব্দের অর্থে তিনি কি বুঝেন, তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার ১৮৬৪ খৃঃ 'আত্মপ্রত্যয়ে'র সহিত "সহজ জ্ঞান" এই কথাটিকে জুড়িয়া দিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের আর এক নূতন ভাষ্য দিয়াছেন। সুতরাং আত্মপ্রত্যয়ের ইতিহাস অন্যূন ১৬ বৎসরের ইতিহাস, এবং এই ১৬ বৎসরে দেবেন্দ্রনাথ একই অর্থে আত্মপ্রত্যয়কে ব্যবহার করেন নাই। ১৮৪৮ খৃঃ আত্মপ্রত্যয়কে যে অর্থেই তিনি ব্যবহার করিয়া থাকুন না কেন, অন্ততঃ তাঁহার ধারণা ছিল যে, বেদ ছাড়িয়া কেবল আত্ম-প্রত্যয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তির জন্য যথেষ্ট হইল। কিছু কাল পরে তিনি দেখিলেন যে, ১৮৪৮ খৃঃর আত্ম-প্রত্যয় যথেষ্ট নহে,—সুতরাং আত্ম-প্রত্যয়ের বিশদ ও বিস্তৃত অর্থ করিতে বসিলেন। পরে যখন তাহাতেও কুলাইল না, তখন শেষাশেষি ১৮৬৪ খৃঃ তিনি আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত 'সহজ জ্ঞান' এই কথাটি ভাবিয়া চিন্তিয়া জুড়িয়া দিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে যেখানে কেবলমাত্র 'আত্ম-প্রত্যয়' ছিল—১৮৬৪ খৃঃ সংস্করণে তাহার সহিত 'সহজ জ্ঞান' আসিয়া মিশ্রিত হইল। ১৮৪৮ খৃঃ দেবেন্দ্রনাথ আত্ম-প্রত্যয়কে যে অর্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া নিঃসংশয়ে ঘোষণা করিলেন—১৬ বৎসর পরে নিজেই তাহার ভুল দেখিয়া সেই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করিবার জন্য সহজ জ্ঞানকে ধার করিয়া গ্রহণ করিলেন। সুতরাং ১৮৪৮ খৃঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিকে ১৮৬৪ খৃঃ এ তিনি নিজেই একরূপ অসঙ্গত ও অসম্পূর্ণ মনে করিয়া—আবার তাহাকে মেরামত করিলেন। ইহাই দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অস্থির ও দোলায়মান ভিত্তি।

১৮৪৮ খৃঃ দেবেন্দ্রনাথ আত্ম-প্রত্যয় অর্থে সম্ভবতঃ ইহাই বুঝিয়াছেন যে—

[ক]—(১) যাহার প্রত্যয় আপনা হইতেই হয়।

(২) যাহার প্রত্যয়ের জন্য শাস্ত্রের প্রমাণ আবশ্যক হয় না।

(৩) যাহার প্রত্যয়ের জন্য যুক্তি-তর্কেরও প্রয়োজন নাই। এবং—

[খ]—(১) যাহা আপনা হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমাদের প্রত্যয় জন্মায়।

ইহার ৭ বৎসর পরে ১৮৫৫ খৃঃ দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে, এই প্রকার সহজাত আত্ম-প্রত্যয়ে ভ্রম থাকিতে পারে কি না—তাহার একটা সমালোচনা—আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত না থাকিলে, আত্ম-প্রত্যয়ের মূল্য কি? কাজেই তিনি আবার আত্ম-প্রত্যয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন—যথা,—

—(১) স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়।

—(২) যুক্তিমূলক আত্ম-প্রত্যয়।

ইহার অর্থ এইরূপ—আত্ম-প্রত্যয়ে কোনরূপ ভ্রম আছে কি না, তাহা বুদ্ধি বা যুক্তি দ্বারা বিচার না করিয়া যদি বিশ্বাস করা যায়—তবে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় বিশ্বাস

করা হইল। "আর যাহার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় কদাপি ভ্রমমূলক নহে"—সেই আত্ম-প্রত্যয় যুক্তিমূলক।

১৮৪৮ খৃঃ—দেবেন্দ্রনাথ স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়কেই যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৫৫ খৃঃ তাহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া, যুক্তিমূলক আত্ম-প্রত্যয়ের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। কেন না, "আত্ম-প্রত্যয়কে প্রত্যয় করা ভ্রম কি না?" ইহার জন্য যে সংশয় আসিল, তাহার ত মীমাংসা চাই। এইরূপ সংশয় যে আসিতে পারে,—৭ বৎসর পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক,—কাজেই যুক্তিমূলক আত্ম-প্রত্যয় আসিয়া মিশ্রিত হইলেন, এবং "তিনি অনেক প্রমাণ অনুসন্ধান" এবং "বহু আলোচনার পর" এই বলিয়া গেলেন যে, "এক আত্ম-প্রত্যয়ই প্রমাণ"—! কলৌ অন্য প্রমাণ নাস্তি, নাস্তি!

সহজাত বা স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ে যে ভ্রম থাকিতে পারে, এবং কখন কখন সেই ভ্রমকে যে যুক্তিমূলক প্রত্যয় দ্বারা নিরাকরণ করিবার জন্য দরকার হইতে পারে, এবং কেবলমাত্র সেই কারণ জন্যই যে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ের উপরে যুক্তিমূলক আত্ম-প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান,—দেবেন্দ্রনাথ তাহা সম্যক্ বুঝিয়াও কেবল এইমাত্র বলিলেন যে, যুক্তি বা বিজ্ঞানমূলক আত্ম-প্রত্যয়ে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, "এক আত্ম-প্রত্যয়ই প্রমাণ।" বাস্! কিন্তু আত্ম-প্রত্যয়ে ভ্রম থাকিতে পারে কি না? থাকিলে যুক্তিমূলক প্রত্যয় তাহা দূর করিবে কি না? এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ নীরব। বাধ্য হইয়া। কেন না, যদি আত্ম-প্রত্যয়ে ভ্রম থাকে এবং যুক্তি তাহা দূর করিয়া তবে প্রত্যয় আনে, তবে ত সোজা কথায় আত্ম-প্রত্যয়ের কোন প্রামাণিক মূল্যই রহিল না। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি ত তাহা হইলে এইখানেই ভূমিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ এ প্রশ্নটিকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার ভাণ করিলেন। কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। পাছে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ে ভ্রম থাকিতে পারে, এই সংশয় হইতেই যুক্তিমূলক আত্ম-প্রত্যয়ের উদ্ভব। অথচ সেই যুক্তিমূলক প্রত্যয় যদি স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ের কোন এক প্রত্যয়কে সত্যই ভ্রমাত্মক প্রমাণ করিতে পারে—তবে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ত গেলেন। কাজেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অমন যে দার্শনিকভিত্তি, তাহাও আর টেঁকে কি করিয়া? আর যদি যুক্তি—স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ের কোন এক প্রত্যয়ের ভ্রমকেই দূর করিতে না পারে,—তবে যুক্তির তাৎপর্য্যই বা কি আর প্রয়োজনই বা কি? এবং যদি স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় নিঃসংশয় রকমের নির্ভুল, তবে সংশয় জাগে কেন? যুক্তির অবতারণা হয় কেন? তবে যুক্তির কার্য্য কি এবং স্থান কোথায়? দেবেন্দ্রনাথ ইহার কোন উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। আমার বিশ্বাস, ১৮৫৫ খৃঃ যুক্তি আসিয়া ১৮৪৮ খৃঃর আত্মপ্রত্যয়কে প্রকৃত প্রস্তাবে বেদখল করিয়াছে—অথচ

দেবেন্দ্রনাথ নিজের ভ্রম বুঝিয়াও স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্নেহবশতঃ তাহা বলিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু আমরা বলিলাম।

এইবার সহজ জ্ঞানের পালা। দেবেন্দ্রনাথের উক্তিই উদ্ধার করিতেছি।

• (১) "উপনিষদের সময়ে জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইয়া এই স্বাভাবিক আত্ম-প্রত্যয়ের উপর সংশয় উপস্থিত হইল। তখন উপনিষদের ঋষিরা সহজ জ্ঞানের আলোকে নিঃসংশয় হইয়া এই আত্ম-প্রত্যয়কে আরো দৃঢ়তর করিলেন।"

এখানে "সহজ-জ্ঞান"—কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইল? ১৮৫৫ খৃঃর সিদ্ধান্তে আমরা দেখিয়াছি যে, দুই প্রকারের আত্ম-প্রত্যয় বিদ্যমান। স্বতঃসিদ্ধ আর যুক্তিমূলক। স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ে সংশয় জন্মিলে যুক্তি বা বিজ্ঞানমূলক আত্মপ্রত্যয় আসিয়া সেই সংশয় দূর করিয়া স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়কে দৃঢ়তর করিয়া দেয়। পরবর্ত্তী ৯ বৎসরের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এমন প্রমাণ নাই। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, দেবেন্দ্রনাথ এখানে "সহজজ্ঞানকে" যুক্তি বা বিজ্ঞানমূলক প্রত্যয়ের অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

আরো একটি উক্তি উদ্ধার করিব।

(২) "কেবল নির্ম্মল সহজজ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হয়েন, এক আত্ম-প্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞানগোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। * * জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায় এবং সেই সত্যেতে আমাদের আত্মার প্রত্যয় হয়।"

এখানে "সহজজ্ঞান"—আর যে অর্থেই হউক, যুক্তিমূলক আত্ম-প্রত্যয় অর্থে, নিশ্চিতই ব্যবহৃত হয় নাই, এবং খুব সম্ভব এখানে সহজজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেবেন্দ্রলীলার প্রথম ও প্রধান ব্যাস ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বাবু। তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকার" ১ম ভাগে সহজ জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ের অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে এবং যুক্তিমূলক প্রত্যয় অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ যে সময়ে সহজজ্ঞানের শরণাপন্ন হন, তার মাত্র দুই বৎসর পরেই রাজনারায়ণ বাবুর "ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা" প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের যে দার্শনিক ভিত্তি পাওয়া যায়, তাহা দেবেন্দ্রনাথের আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধান্তেরই অনুকরণ ও অনুসরণ মাত্র। তবে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যেরূপ স্ববিরোধিতা, অসম্পূর্ণতা, চঞ্চলচিত্ততা এবং অস্পষ্টতা দৃষ্ট হয়, রাজনারায়ণ বাবুর মধ্যে তাহা অপেক্ষাকৃত কম।

যাহা হউক, রাজনারায়ণ বাবু যখন সহজ জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ের অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং দেবেন্দ্রনাথের (২য়) উক্তির উদ্ধৃত অংশের বহুল অস্পষ্টতা সত্ত্বেও যখন সহজজ্ঞান, স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ের অর্থে অপ্রযোজ্য নহে, তখন ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, শেষাশেষি দেবেন্দ্রনাথ সহজজ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ

আত্মপ্রত্যয়ের অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য 'ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা' যখন লেখা হইতেছিল এবং প্রকাশ হইয়াছিল তখন দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বাবুর মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিমূলক ভাব বিনিময় চলিতেছিল, এবং কে না জানে, রাজনারায়ণ বাবু চিরকালই দেবেন্দ্রানুগামী?

অথচ উপরের (১ম) উক্তির উদ্ধৃত অংশ হইতে অতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, দেবেন্দ্রনাথ সহজজ্ঞানকে যুক্তি অথবা বিজ্ঞানমূলক আত্ম-প্রত্যয় অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

"সহজজ্ঞানকে" একবার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়, আর একবার যুক্তিমূলক প্রত্যয় অর্থে ব্যবহার করায় কেবল মত-দ্বৈধতা বা স্ববিরোধিতা দোষ নয়, পরন্তু দেবেন্দ্রনাথের সহজজ্ঞান সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়াই প্রমাণ হয় না। দুই রকম আত্ম-প্রত্যয়ের যে কোন রকমের অর্থেই সহজজ্ঞানকে ধরিয়া লইলেও ইহার যখন কোন নূতন অর্থ দেবেন্দ্রনাথ দিতে অক্ষম, তখন অনর্থক এই কথাটাকে আনিয়া বাগাড়ম্বরের কি প্রয়োজন, তাহা আমরা বুঝি না। দুই রকম আত্ম-প্রত্যয়ের অতিরিক্ত সহজ জ্ঞানের যখন কোন বিশিষ্ট অর্থ দেবেন্দ্রনাথ দিতে পারেন নাই, অথচ পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত ইহার সংযোগের কোনরূপ সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট হেতু বিদ্যমান দেখা যায় না। তখন কেশবচন্দ্রের দেখাদেখি বা শুনাশুনি এই সহজজ্ঞান কথাটাকে খামাকা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিতে গুঁজিয়া দিবার একটা অহেতুকী সখ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

দেবেন্দ্রনাথের এই 'আত্মপ্রত্যয়ের' ইতিবৃত্তকে অনুসরণ করিয়া রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকার" ১ম ভাগে যে দার্শনিক সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, এবং ইন্দ্রিয়, প্রতিবোধ, বুদ্ধি, বিবেক, আত্ম-প্রত্যয়ের এই যে চারি প্রকার শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন,—তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি দ্বারা যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা বস্তুর সংবিৎ, তাহা রাজনারায়ণ বাবুর কথায় 'একাল' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার নহে। নিতান্তই 'সেকালের।'

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্ম প্রত্যয়ের মধ্যে কি সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস নিহিত আছে, তাহা যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন,—তাহাতে 'আত্ম-প্রত্যয়' এই দার্শনিক পরিভাষাটির তাৎপর্য্য তিনি আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে, আমার সন্দেহ আছে। দেবেন্দ্রনাথের আত্ম-প্রত্যয়ের প্রত্যয়গুলির বিশ্লেষণ এইরূপ, যথা,—

(১) "যখন আমি আছি, তখন আমার স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা ব্রহ্ম আছেন।"

(২) "যিনি আমার স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা পুরুষ, তিনি আমার সুহৃদ, সখা, আশ্রয় ও প্রভু।"

(৩) "যিনি আমার সুহৃদ্, সখা, আশ্রয় ও প্রভু—তিনি সকলেরই"—তাই, এবং "তিনি শান্ত মঙ্গল অদ্বিতীয়।"

তর্জ্জমা হিসাবেও ইহা নবমশ্রেণীর নিকৃষ্ট তর্জ্জমা। ইহা যদি "আত্মপ্রত্যয়ের সহজ অকাট্য সিদ্ধান্ত" হয়—তবে হউক। কিন্তু আমরা নাচার। এ কি প্রকার আত্ম-প্রত্যয়, যাহা একেবারে ত্রৈরাশিক অঙ্কপাতের প্ল্যানে তৈরী? ইহা যে প্রচ্ছন্ন যুক্তি। ইহা যে বিশেষ হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে অনুমান মাত্র!

এই ত দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের আত্ম-প্রত্যয় ভিত্তির ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস। এখন আমরা ভূগোল দর্শন করিব।

পৃথিবী,—পণ্ডিতেরা বলেন যে গোলাকার। তবে উত্তরে দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। ঐ দুই দিকের চাপাচাপিতে এখন বিশেষ কিছু পায় না। যত গোল ঐ পূর্ব্ব ও পশ্চিম লইয়া। কেহ বলেন, ইহাদের মধ্যে মরুর ব্যবধান, সমুদ্রের ব্যবধান, পর্ব্বতের ব্যবধান। কেহ বলেন, ইহারা পরস্পর এমন ঘাড়াঘাড়ি, ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়াছে যে, খানিকটা ব্যবধান ব্যতীত উভয়েই পয়মাল হইয়া জাহান্নামে যাইবার জোগাড়। দেবেন্দ্র-লীলার এক জন আধুনিক ব্যাস বলেন যে, দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যে "সুয়েজখাল।"

দেবেন্দ্রনাথ সুয়েজখাল? প্রথমে বুঝিয়া উঠিতেই পারি নাই। তার পর কিছু কিছু যেন বুঝিতে পারিলাম। তবে দেখা যাক্, এই সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আত্ম-প্রত্যয়ের কিরূপ যাতায়াত ও মেলামেশা সংসাধিত হইয়াছে।

অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রে 'আত্ম-প্রত্যয়' কথাটি দৃষ্ট হয়। মুণ্ডকোপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে। দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করেন যে, উক্ত উপনিষদ্ হইতেই তিনি ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। আত্মার চারি প্রকার অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়া, আত্মপ্রত্যয়ই যে ব্রহ্মপ্রত্যয়ের একমাত্র উপায়, উপনিষদের ঋষি এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য উক্ত উপনিষদের টীকায় আত্ম-প্রত্যয়ের অর্থকে বিশদ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য এইরূপ যে, এক আত্মাই সকল অবস্থার মধ্য দিয়া অবিভাজ্যরূপে বিরাজ করিতেছে, সুতরাং সেই আত্মাকে জানিতে গিয়াই ব্রহ্মকে জানা হয়। কেন না আত্মা আর ব্রহ্ম এক, এবং এক ব্রহ্মই অবিভাজ্যরূপে বিদ্যমান। সুতরাং ব্রহ্ম-প্রত্যয়ের একমাত্র উপায় আত্ম-প্রত্যয়। এই আত্ম-প্রত্যয়ে, শাঙ্কর ভাষ্যে, আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া প্রত্যয় হয় না। আত্মা আর ব্রহ্ম 'অবিভাজ্যরূপে এক বলিয়া প্রত্যয় হয়। মুণ্ডকোপনিষদ্ পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে উপনিষদের ভাবার্থকে বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। মুণ্ডক ও শাঙ্কর ভাষ্য এখানে পরস্পর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত।

দেবেন্দ্রনাথ মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে 'আত্ম-প্রত্যয়কে' গ্রহণ করিলেন সত্য; কিন্তু ঋষি বা শঙ্করাচার্য্যের অর্থ তিনি বুঝিতে পারেন নাই,—অথবা বুঝিয়াও তাহা গ্রহণ করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের আত্ম-প্রত্যয়ে জীব ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করিয়া জানে। এই স্বতন্ত্র-জ্ঞান কোনমতেই ঋষি বা আচার্য্য শঙ্করের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং বেদ হইতে দেবেন্দ্রনাথ শব্দ লইলেন, ভাব লইলেন না।

ভাব কোথা হইতে আসিল? দেকার্ত্তদর্শনে আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে জগৎ ও ব্রহ্ম-প্রত্যয়ের আভাস আছে, এবং এখানে আত্ম ও ব্রহ্মপ্রত্যয়ে স্বতন্ত্র ও দ্বৈতভাব বিদ্যমান। দেবেন্দ্রনাথ কার্ত্তেজিয়ান দর্শনের ভাব লইলেন, শব্দ লইলেন না। শব্দ বেদান্তের,—ভাব ফরাসী দর্শনের। জন্মিলেন বর্ণসঙ্কর ব্রাহ্মধর্ম্ম। হইল তার দার্শনিক ভিত্তি। শুনিলাম তার কত 'নাও টানা হইতে পাও টানা' ব্যাখ্যা। বলিয়াছিলাম ফেরঙ্গভাব, উপনিষদের প্রলেপ, নয় কি না? ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই দর্শন, ইহাই সাহিত্য এবং গত এক শত বৎসর ধরিয়া ইহাই—ইহাই—ইহাই।—"ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্যরে ধন্য!"

কোন্ যুগের মুণ্ডকোপনিষদ, কোন যুগের শঙ্করভাষ্য এবং কোন যুগের বা 'কজিটো আর্গোসাম'—দেশ আর জাতি না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। এই সুয়েজ খালের দিনে! অসমান যুগের বহিঃসাদৃশ্যপূর্ণ দুই বস্তু যে বস্তুতঃ প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র, তাহাদের মিলন যে বিজ্ঞান-অসঙ্গত, সভ্যতার ধারায় যে এরূপ মিলন অসম্ভব ও দোষণীয়, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী যে উপনিষদের ঋষি বা শঙ্করের যুগে নাই, এবং বঙ্গভূমি যে দেকার্ত্তের যুগের বা কোন যুগেরই ফরাসী ভূমি নয়, বাঙ্গালী যে ফরাসী নয়, বাঙ্গালী বাঙ্গালী,—ইহা বিবে-চনায় আইসে না। হায়, 'সুয়েজখাল' কি কুম্ভীরকেই না তুমি ডাকিয়া আনিয়াছ?

দেকার্ত্তের পর হইতে হ্যামিল্টন পর্য্যন্ত ওপাড়ার দার্শনিকদের চিন্তায় আত্ম-প্রত্যয়ের মধ্যে যে ব্রহ্ম ও জগৎ প্রত্যয়ের হেতু অথবা 'প্রমাণাভাস' আছে দেবেন্দ্রনাথ সেই সমস্ত দার্শনিকদের ইংরাজী তর্জ্জমা যখন যাহা হাতের কাছে পাইয়াছেন, তাহাই পড়িয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্ম প্রত্যয়ের নানারূপ অদ্ভুত অসঙ্গত বিসদৃশ অর্থ করিয়াছেন। এমন কি কেশবচন্দ্র যখন স্কচ্ দার্শনিকদের অনুরূপ সহজ জ্ঞানকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিলেন, তখন সেই পরের দ্রব্যটিকেও দেবেন্দ্রনাথ না বলিয়া লইবার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারিলেন না। অথচ গিলিয়াও তাহাকে হজম করিতে পারিলেন না। আত্মপ্রত্যয়ের ইতিহাস আলোচনায় ইহা বিল্‌কুল্ আমরা দেখিয়াছি। অথচ দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তের মুখোস্ শেষ পর্য্যন্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। "আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়"—জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্ততস্তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায় মান"। "হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তঃ—ইত্যাদি। ইহাই হইতেছে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়

সংস্কার-যুগের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ,—এই ভণ্ডামী আর ছলনা। ফরাসী, ইংলণ্ড বা জার্ম্মান 'বিশ্বের' ভাব চুরী করিয়া উপনিষদের মুখোস পরাইয়া জাতির সম্মুখে উপস্থিত করাই হইতেছে বাঙ্গালী মস্তিষ্কের এ যুগে মামুলী অপব্যবহার। সুয়েজ খালের ইহাই সব চেয়ে বড় জুয়াচুরী ব্যবসা এবং সুয়েজ খাল এই ব্যবসা চালাইতেছেন একশ বছর ধরিয়া। আজ কি বাঙ্গালী এই ব্যবসার লাভ ও ক্ষতি হিসাব করিবে না?

বেদের মহাবাক্য প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মজ্ঞান আনিয়া দেয়। অথবা বেদের বাক্য শ্রবণ দ্বারা যে তত্ত্ব আসে, সেই তত্ত্বের মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা যে "ধ্যানজ প্রমা জন্মে তাহার ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। শঙ্করমতাবলম্বী বিবরণকার সম্প্রদায় অথবা বাচস্পতি মিশ্রের দল, এই উভয়েই আত্ম-প্রত্যয়কে ত ব্রহ্ম-প্রত্যয়কে এই প্রসঙ্গে যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন,—দেবেন্দ্রনাথ সে দিকে ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করেন নাই। কেননা, বেদের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের সে ভক্তি থাকিলে আর এ দুর্দ্দশা হইবে কেন? বেদের প্রতি যে ভক্তি ও নিষ্ঠা থাকিলে বেদবাক্য সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মজ্ঞান করায়, তাহা দেবেন্দ্রনাথ কেন, রামমোহনেরও ছিল না। গত শত বৎসরে বেদের প্রতি সে নিষ্ঠা লইয়া বাঙ্গলা দেশে একজন মনুষ্য জন্মে নাই, সে ব্রাহ্মণ রামমোহনও নয়, বিদ্যাসাগরও নয়, সে ব্রাহ্মণ আসে নাই। কবে আসিবে, আসিবে কি না, কে জানে? বেদবাক্যকে যেরূপ নিষ্ঠার সহিত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিলে জ্ঞান প্রসন্ন হয়, মনঃসংস্কৃত হয়; এবং ধ্যানজ প্রমা জন্মিয়া তাহাতে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, সে নিষ্ঠা ও সাধনা দেবেন্দ্রনাথের কোথায় ছিল? কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ফল প্রসব করে। সাধনার অনুরূপ সিদ্ধি হয়। ভাবের ঘরে চুরী করিলে একদিন ধরা পড়িতেই হয়। বেদবাক্য, বেদ বলিয়া ত তাহার মান্য নাই, দেবেন্দ্রনাথের আত্ম-প্রত্যয়ের 'প্রতিধ্বনি' (?) বলিয়া তাহার কোন কোন শ্লোক, যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে—তাহার মান্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ আমলের একজন বাঙ্গালী জমিদার মখমলের গদীতে বসিয়া একদিন বলিলেন কি না—"বেদ আমার প্রতিধ্বনি, ধ্বনি আগে না প্রতিধ্বনি আগে? 'জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নতে' বা—কি কহেন? সেকালের রাজর্ষি জনকও একজন দরবারী ব্রহ্মবিৎ ছিলেন। বেদ তাঁহাদের জীবনেই ধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারাও এরূপ কহেন নাই। কেননা, প্রলাপ সুস্থে কহিবেন কেন? যাহা হউক কি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দেকার্ত্তের ফরাসী মদ শঙ্করের কমণ্ডলুতে ঢালিয়া, সোমরস জ্ঞানে তাহাই একদিন কলিকাতার সহরে ইংরেজীনবীশ বাবু বাঙ্গালীকে আফিস-ফেরতা পান করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছিলেন,—তাহার বিবরণ ক্রমে বলিতেছি।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

এক এক রাজার তিন তিন রাণী

কালিদাসের নাটকগুলিতে এক এক রাজার তিন তিন রাণী। মালবিকায় তিন রাণীই রঙ্গমঞ্চে উঠিয়াছেন। একটির নাম ধারিণী, একটির নাম ইরাবতী ও আর একটির নাম মালবিকা। বিক্রমোর্ব্বশীতে এক রাণীর নাম ঔশীনরী, আর এক রাণী উর্ব্বশী। রাজার তৃতীয় ভালবাসার সামগ্রী উদয়বতী নামে বিদ্যাধর-কন্যা। শকুন্তলায় রাজার পাটরাণী বসুমতী, আর এক রাণী হংসপদিকা, আর এক রাণী শকুন্তলা। তিন জায়গায়ই পুরাণ রাণীটি পাটরাণী। কোন রাজার মেয়ে, বয়স একটু হইয়াছে, গৃহিণীপনায় খুব মজবুত, দ্বিতীয়টি নাচে, গানে, ছবি আঁকায় খুব পটু, তার উপর খুব রূপসী, খুব চালাক চতুর। আর তৃতীয় নাটকের নায়িকা, তাঁহার সহিত রাজার প্রেম লইয়াই নাটক। শেষ তিনিই আর দুই রাণীকে ছাপাইয়া উঠিলেন।

মালবিকায় তিনটি রাণীকেই রঙ্গমঞ্চে দেখা যায়। উর্ব্বশীতে দুইটিকে ও শকুন্তলায় মাত্র একটিকে। রঙ্গমঞ্চে দেখিতে না পাইলেও তাঁহারা সকলেই আছেন ও কাজ করিতেছেন। নাটকের কাব্যাংশটাকে পরিপুষ্ট করিতেছেন। তিনখানি নাটক মন দিয়া পড়িলে বেশ মনে হয়, যেন কালিদাস মালবিকায় প্রথম তিনটি রাণীকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আবার যদি তিনটাকেই বাহির করেন, তাহা হইলে জিনিসটা কতকটা একঘেয়ে হইয়া যাইবে। তাই একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীতে এমনই কৌশলে একটি ত্যাগ করিয়াছেন যে, লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। তিনি ঔশীনরীকে দুইবার আনিয়াছেন; একবার আনিয়াছেন, ইরাবতীর মত। ভয়ানক মান। রাজা অন্যের প্রতি আসক্ত, হঠাৎ পথে একখানা ভূর্জ্জপত্রে এই কথাটা পড়িয়া একেবারে রাজার কাছে আসিয়া তাহাকে যার পর নাই তিরস্কার। রাজা পায়ে পড়িয়া মান ভাঙ্গাইতে গেলেন, তাহাতে রাণীর মান ভাঙ্গিল না। তিনি রাগে গর্‌গর্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিদূষক রাজাকে উঠাইল। অগ্নিমিত্র ইরাবতীর উপর রাগ করিয়াছিলেন। এত করে পায়ে পড়িলাম, তাতেও মান ভাঙ্গিল না। যাক্‌, ওর কথা আর ভাবিব না, কারণ সে ত একটা চাকরাণী বই নয়। পুরূরবা কিন্তু তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, দেখ, আমার আর রাণীর উপর সে রকম

টান নাই, সে কথাটা যখন তিনি বুঝিয়াছেন, তখন আমি যতই ভাল কথা বলি, তাহার কানে উঠিবে কেন? প্রাণে লাগিবে কেন? তবে তিনি পাটরাণী বলিয়া উহাকে একেবারে ছাড়িতে পারিলেন না। অপমানের পর অগ্নিমিত্র আর ইরাবতীর নামও করেন নাই! কিন্তু শেষ মিলনের সময় যখন উর্ব্বশী আয়ুকে বড়মার কাছে পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন, তখন রাজা পুরুরবা বলিলেন, না,না, তা হইবে না, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁর কাছে যাব।

এই ত গেল ঔশীনরীর সহিত ইরাবতীর স্বভাবের মিল। কিন্তু ঔশীনরীর আর এক মূর্ত্তি—সে মূর্ত্তিতে তিনি ধারিণীকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। আজি হইতে আমার স্বামী যাহাকে ভালবাসিবেন, অথবা যে আমার স্বামীকে ভালবাসিবে, আমি তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া সংসার করিব। কালিদাস যেন ধারিণী ও ইরাবতী, দুইটি রাণী ভাঙ্গিয়া ঔশীনরীকে গড়িয়াছেন। সুতরাং, ভাল সমজদার এই একটি রাণীকে দুইটি করিয়া লইতে পারেন। তথাপি যে অত সমজায় না, তাহার জন্ম উদয়বতী সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা পথে পথেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে ত তাহাকে আনেনই নাই, অঙ্কেও তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই, প্রবেশকে তাহার নাম করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শকুন্তলায় ইরাবতীও আছেন, ধারিণীও আছেন, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে উঠেন নাই। ঐ যে রাণী হংসপদিকা গানে বলিতেছেন, ভৃঙ্গরাজ, তুমি আমের বউলে একটি চুমা দিয়াই পদ্মের কাছে গেলে, আর সেইখানেই রহিয়া গেলে, বউলের কথা তোমার মনেই পড়িল না। এটিতে রাজার উপর বেশ ঠেস আছে, রাজা দূর হইতে গান শুনিয়া সেটি বেশ বুঝিলেন। আর বলিলেন, বসুমতীর কাছে অধিক থাকি বলিয়া হংসপদিকা আমায় বেশ তিরস্কার করিল। হংসপদিকায়ও ইরাবতীর গন্ধ ভর ভর করিতেছে। আর বসুমতীও যেন ধারিণীর ছাঁচে ঢালা। তিনি রাজার দাসীর হাত হইতে রং ও তুলি কাড়িয়া লইয়া নিজেই সেগুলি রাজাকে দিতে আসিতেছিলেন, পথে শুনিলেন, মন্ত্রীর পত্র লইয়া দ্বারবান যাইতেছে, তাই রাজকার্য্যে বাধা দিবেন না বলিয়া ফিরিয়া গেলেন। অথবা বসুমতীকে ঔশীনরীর নকলও বলা যাইতে পারে। তাঁহাতে একাধারে মানিনীর ও প্রবীণার বেশ মিল হইয়াছে।

শুধু যে একঘেয়ে হবার ভয়েই কালিদাস এক একটি করিয়া রাণীকে রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, এমন নহে। ওরূপ করার আরও কারণ ছিল। কালিদাসের যতই বয়স হইতেছিল, তাঁহার হাতও ততই পাকিতেছিল। আগে মনের যে কথাটা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে অনেক আড়ম্বর করিতে হইত, পরে সেটা এক কথায় বলার ক্ষমতা তাঁহার জমিয়া আসিতে লাগিল। আগে যেটা ফুটাইবার জন্ত তাঁহাকে

বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসিতে হইত, শেষ একবার তুলি বুলাইলেই সেটা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাই অগ্নিমিত্রে যাহা লম্বা চওড়া, শকুন্তলায় সেটা খুব সংক্ষেপ। এইরূপে নায়ক-নায়িকাঘটিত ব্যাপারটা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়া কালিদাস নাটককে লোক-শিক্ষার দাস করিয়া তুলিতে পারিলেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে যেমন চিনি ঔষধের দাস, চিনির ভিতর ঔষধের শুধু বীজটি সূক্ষ্মভাবে আছে, কালিদাসের নাটক তেমনি শিক্ষার দাস, নাটকের মধ্যে ঔষধ বা শিক্ষা সূক্ষ্মভাবে লাগিয়া আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মত মধুতে মাড়িয়া ঔষধ খাইলে ঔষধটা আরও তিত হয়। অশ্বঘোষের কাব্য মধুমাড়া তিত ঔষধ। কালিদাসের সেরূপ নহে।

কালিদাসের হাতপাকার কথা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। দেখুন, মালবিকা-গ্নিমিত্রে রাণীরা তিনজনেই রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছেন। একে নূতন কবি, তাহাতে আবার খুব মুখফোঁড় নয়, পাছে রাণীদের চরিত্র লোকে না বুঝিতে পারে, তাই কালিদাস প্রত্যেক রাণীর সঙ্গে এক একটি চেটী দিয়াছেন। চেটীটি রাণীর দোস্রোট, রাণীও যখন রঙ্গমঞ্চে, চেটীটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে, যেন নূতন কবি রাণীকে একেলা সেখানে আনিতে নারাজ। তাহারা কত কথাই কয়, কত কাজই করে, কেবল রাণীর মনের ভাবটা প্রেক্ষককে বুঝাইবার জন্ত। তবু কবির মন স্পষ্ট হয় না যে, সকলে তাহার কথাটা ঠিক বুঝিতেছে। কিন্তু উর্ব্বশীতে তত আড়ম্বর নাই, তত সন্দেহ নাই, কবির যেন বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার প্রেক্ষককুল তাঁহার মতলবের যথার্থ সমজদার। তাই তিনি পাট-রাণীকে একবার বাহির করিলেন, মানিনী তেজস্বিনী, ইরাবতী সাজাইয়া, আর একবার বাহির করিলেন, গম্ভীর গৃহিণী সাজাইয়া। সঙ্গে সেই একই চেটী, কিন্তু সে কথাবার্ত্তা বড় একটা কয় না। শকুন্তলায় রাণীদের রঙ্গমঞ্চেই আনিলেন না। একজনকে নেপথ্যে একটি গান করাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি মানিনী, ঈর্ষ্যায় ভরপুর হইতে-ছেন; আর একজনকে পথে পথে বিদায় করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, গম্ভীরা গৃহিণী হইলেও রমণী ও রমণীর যাহা স্বভাব, তাহাতে সেটি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। রাজা যে অন্যের প্রতি আসক্ত, এটা তিনি সহিতে পারেন না। এইরূপে একবারমাত্র তুলি বুলাইয়াই তিনি সব কথাগুলি ফুটাইয়া তুলিলেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে কালিদাসের কেবল হাত পাকিয়াছে, সংক্ষেপ করার ক্ষমতা বাড়িয়াছে, এমন নহে। তিনি অনেকটা মোলায়েম হইয়া আসিয়াছেন। সে থর থর ভাব, সে তীব্রতাটা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। যেরূপ অবস্থায়, যেরূপ রাগে ইরাবতী রাজাকে হার ছুড়িয়া মারিল ও আর রাজার মুখ দেখিল না, বরং রাজার ছবির কাছে গিয়া মাপ চাহিবে, তবু জীয়ন্তে রাজার কাছে যাইবে না। তাহার চক্ষে যে অন্তের প্রতি আসক্ত, আমার পক্ষে সে একখানি ছবিমাত্র; একটি পাথরের প্রতিমা মাত্র। ঠিক

সেইরূপ অবস্থায় সেইরূপ রাগ বটে ; ঔশীনরী অত দূর করিলেন না। রাজা পায়ে পড়িয়া মান ভাঙ্গাইতে গেলেও তাহার মান ভাঙ্গিল না, কিন্তু আবার সে আসিয়া বলিয়া গেল, আমার স্বামী যাহাকে ভালবাসেন বা যে আমার স্বামীকে ভালবাসে, সে আমার ভগিনী, আমি তাহার সহিত ভগিনী ভাবে ঘরকরণা করিব। রাণী বসুমতীর অবস্থাও তেমনি, রাগও তেমনি। তিনিও একটা হাঙ্গাম করিবার জন্য দাসীর হাত থেকে রংএর বাক্স ও তুলি কাড়িয়া লইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু রাজা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত জানিয়া ফিরিয়া গেলেন। বসুমতীর এই আচরণে তাঁহার উপর আমাদের বড়ই শ্রদ্ধা হয়। তাঁহার রাগের কারণ আছে সবাই জানে, তাঁহার ব্যথায় সকলই ব্যথী, তিনি একটা হাঙ্গাম করিলেও লোকে তাঁহার নিন্দা করিত না। কিন্তু তাঁহার আত্মত্যাগ অসীম, আমার স্বামী রাজা। রাজকার্য্য তাঁহার সকলের চেয় বড়। আমি তাঁহার রাণী, বড় রাণী, গৃহিনী, সর্ব্বময়ী, সব সত্য। কিন্তু রাজার রাজকার্য্য গৃহিনী রাণী অপেক্ষা ঢের বড়। সুতরাং রাণী রাজকার্য্যের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিলেন, অন্ততঃ মনের রাগ মনে মারিয়া সরিয়া গেলেন। কবি যে কত মোলায়েম হইয়াছেন, ইহাতেই তাহা বোধ হইবে।

আর একটা কথা, তিন রাণীকে রঙ্গমঞ্চে আনিয়া কালিদাস কি দেখাইয়াছিলেন? দেখাইয়াছেন—রিষের বিষ, ঈর্ষ্যার ঝাল, দ্বেষের চূড়ান্ত। ইরাবতীর রিষ, বড়ই বিষ ; কিন্তু তাহাতে পরের অপকারের চেষ্টা নাই। সে রিষের ফল আত্মবিসর্জ্জন, অনুতাপ। কেন মজিয়াছিলাম, কেন ভুলিয়াছিলাম, আমি যে দাসী ছিলাম, সে ত ছিল ভাল। দুদিনের তরে রাণী হইয়া আমার সব গেল। পরের অপকার চেষ্টা নাই বটে, কিন্তু পরের উপর বিশেষ অনুরাগও নাই, বরং তফাৎ থাকার ইচ্ছা অধিক। কিন্তু ধারিণীর রিষের ফল ইরাবতীর সর্ব্বনাশ, তাহাতে তাঁহার মনোবাঞ্ছাপূর্ণও হইল। তিনি ইচ্ছা করিয়া, মতলব করিয়া, তলায় তলায় ষড়যন্ত্র করিয়া ইরাবতীটির লোপ করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও লোপ হইলেন, তবুও ইরাবতীর উপর যে ঝালটা ঝাড়িতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপার আনন্দ। কবি রাণীকে এই আনন্দটুকু উপভোগ করাইয়াই তাঁহার লোপ করিয়া দিলেন। তাঁহার দেবী শব্দটিও গেল, তিনি চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। এই যে রিষের বিষ, এটা ছেলেবেলায়ই ভাল লাগে। আর পরের মন্দ করিতে গিয়া নিজের মন্দ করাও সে অবস্থায় বেশ ভাল লাগে; তাই কালিদাস অল্পবয়সে মালবিকাগ্নিমিত্রে তাই বেশী করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু বয়স হইলে ওটা আর তত ভাল লাগে না, অথচ ওটা প্রকৃতির খেলা, ছাড়িবার যো নাই। তাই ওটাকে একেবারে লোপ না করিয়া নরম করিয়া মোলায়েম করিয়া আনিয়াছেন। হংসপদিকার রিষটা কি রকম দেখুন। সেও ত ঝগড়া করিতে পারিত, একটা হাঙ্গাম করিতে পারিত, কিন্তু কিছুই করিল না। আপন মনে

বীণাটি ধরিয়া মনের দুঃখে গান করিতে লাগিল। সে গান কত মধুর; তাহাতে ঝালের লেশও নাই। আছে কেবল করুণাভিক্ষা ও সেই সঙ্গে একটু হোমিওপ্যাথিক ডোজে একটু তিরস্কার! তুমি আমের বউলে একটি মাত্র চুমা দিয়া কমলের কাছে গেলে, আর সেইখানেই রহিয়া গেলে। বউলের কথা তোমার মনেই পড়িল না। এ কথায় তিরস্কার একটু আছেই, কিন্তু তার চেয়ে করুণাভিক্ষাই অধিক। ওগো, তোমার এমন করিয়া ভুলে থাকা উচিত নয়। মাঝে মাঝে আমায় এক একবার মনে করিও। রাজা করিলেনও তাই, বিদূষককে পাঠাইয়া দিয়া তিনি যে ভুলেন নাই, সেটা জানাইয়া দিলেন। এই মান আর ইরাবতীর মানে কত তফাৎ।

ইরাবতীর প্রতি রাজার আসক্তি ধারিণী সহিতে পারেন নাই। তাহার সর্ব্বনাশের কতই ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন। ঔশীনরী কোনরূপ ষড়্‌যন্ত্র করিলেন না, নিজে পশ্চাতাপে দগ্ধ হইয়া একটা হীন সন্ধি করিয়া গেলেন, হার মানিয়া নিজের মান বজায় রাখিয়া গেলেন। আর বসুমতী জিনিসটাকে বড় একটা গ্রাহ্যই করিলেন না। একটু বিরক্ত হইলেন বটে, একটু চঞ্চল হইলেন বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকমাত্র।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মডেল-নায়িকা

(নিয়ো (Neo ?) "বোষ্টমী")

ওরফে

নিয়ো (Neo ?) "ইবসেমী"

(রসতত্ত্বে বাবুর্চ্চি সংবাদ)

হাঁগা, তুমি বুঝি আমার গৌরের বাবুর্চ্চি ? আমার গৌরের বুঝি এই সেবা হ'ল ? পেলেটে কি কিছু এঁটোকাঁটা আছে ? হাঁগো, জানি,—জানি,—মাছ মাংসে যে আমার গৌরের আঁর এখন তেমন রুচি নাই,—তা জানি। আর থাক্‌লেই বা কি আসে যায়, বল না ? সে দিন যে সহরের সেরা আদালতে, দেশের এক জন ডাকসাইটে বোষ্টম ক'বলে জবাব দিয়ে এল যে ওই—সেই—, কি সংস্কার—দেখ,—ছাই মুখে আন্‌তেও পাচ্ছি না—খায়,—তাতে তাঁর কি হ'লো ? কেঁদুলী, কেতুর, নবদ্বীপের যে বড় বড়াই ক'রে, সেদিন এক তান্ত্রিক বামুণ, বামনাই ফলিয়ে বোষ্টম-মাহিত্ম্য সব নিখ্‌লো, তা কোন্ পাড়ার কোন্ বোষ্টম-সমাজের গায়ে ফোস্কা পড়লো ? দাও না গো, পেলেট থেকে কিছু,—আমি যে গ্রামের পথ বেয়ে সেই কত্‌দূর থেকে পেসাদ পাব বলে এসেছি।

(প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া এবং সেই হস্ত মস্তকে পুঁছিয়া লইয়া)

—আঃ—অমৃত, অমৃত, আমার গৌরের প্রেসাদ যেন অমৃত। তা দাও একটু জল—কেন গো ? ওঃ আমার গৌর বুঝি এই কুয়োর জল,—গরম করে ফিল্টার করে পান করেন ? তা দাও প্রেসাদী জল দাও। এই আমার গঙ্গা, বাবুর্চ্চি, তুমিই আমার ভগীরথ। আজ তুমি ধন্য।

আমার গৌরের শয়ন-মন্দিরের দরজা বুঝি বন্ধ হয়েছে ?

(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া)

আর সেই বিকেলে দেখা হবে ? তা ত জানি গো বাবুর্চ্চি—সেই কত্‌দূর থেকে এসেছি, কাল রাত্রে আমার গৌরকে স্বপ্নে দেখেছি—যেন আমি গৌরের পদসেবা কচ্ছি। তা তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে ? হ্যাঁ, তা বস্‌বো বই কি। এসেছি যখন। তা বেশ ত, বোসো না,—শুনবে তার কি ? আমার গৌরকে যখন বলেছি, তখন তোমাদের বলতে বাধা কি ? তোমরা কি বাবুর্চ্চি,—আমার পর ? তোমরা যে আমার গৌরের 'লীলায় সহচর'।

তা দেখ, গৌর ঘুমিয়েছেন ত ?—তবে শোন।

তখন আমার বয়েস, এই ষোল পেরিয়ে সতেরয় পা দিয়েছে।—আমার খুব রূপ ছিল। বুঝেছ? আর আমার খোকার বয়স এই এক বছর—তিন মাস। তা একদিন—সে দিনটা ছিল বুঝি 'শ্রাবণ মাস'!—আমাদের নিস্তারিণীকে বলুম—বাছা, ছেলেটাকে দেখিস্, আমি চট করে ঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি। দেখিস্, যেন ছেলেটা না কাঁদে।—আর যদি বেশী কাঁদাকাটি করে, তবে কোমরে এই দড়িগাছটা দিয়ে হেঁসেলের কাছে বেঁধে রেখে দিস। দেখিস্, উনি যেন—জান্‌তে না পারে।

বড় কাঁচা বয়সে ছেলেটা হয়েছিল কি না, তাই আমি তার কিছুই যত্ন কর্‌তে পার্‌তুম না। পনর থেকে ষোল কি ছেলে হবার বয়েস, বাবুর্চ্চি? বোষ্টমের রসতত্ত্ব যে একবার বুঝেছে—সে জানে, ছেলে পুলে হওয়াই একটা কী জ্বালা; 'ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক এক সময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত'। ব্রজের গোপিনীদের মত। হয় কি না বল? তখন আমি সবে কিশোরী। প্যাড়ায় পাড়ায় এর তার সঙ্গে মিল্‌বার জন্যই তখন আমার মন ছুবেলা ছুট্‌তো। তা ছাড়া রাত্তিরেও আবার আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তাম!—কি দেখিতাম? আহা—"গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে" আমার প্রাণকৃষ্ণ যেন এসেছেন, বাদিয়ার বেশে এসেছেন।—আমি যেন সেই গোকুল নগরের নাগরী; নব কিশোরী।—বাবুর্চ্চি গো, তুমি কি আমার প্রাণকৃষ্ণের নানাবেশে দৌত্যের কথা শুন নাই?

তা এমনি বয়েসে আর এমনি মনের অবস্থায় ছেলেটা নিতান্ত থামাকা এসে পৌঁছেচে—অথচ আমার যে 'ঘোরো' বাৎসল্য রস,—তা তখনও সবে 'হব হব' কচ্ছে।—আমার গোপাল এসেছে, কিন্তু সে চুরী করে খাবে কি? তখনো যে আমি ননী জুটিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো বাবুর্চ্চি, যে এই আমার জীবন-কথার ভিতর দিয়ে ইঙ্গিতে আমাদের পোড়া সমাজের বাল্য-বিবাহকে আমি আঘাত করে যাচ্ছি।—বুঝে লোকে যে জানে সন্ধান।—তুমি সন্ধান বুঝে বুঝে আমার কথার মার-প্যাঁচের ভিতর দিয়ে ইঙ্গিতটা বুঝে নিও। কিন্তু কোন কিছু অভিপ্রায়ে আমি বল্‌ছি না,—তা যেন মনে থাকে।

এ একেবারে লীলার কথা, রসের কথা—আপনি বেরিয়ে আসে। আর আমি বল্‌ছি, এ অহং জ্ঞান থাক্‌লেও চল্‌বে না। তিনি যাহা কহান, আমি তাই কহি। বুঝ্‌লে কি না?

তা স্নান কর্‌তে গিয়ে আমায় বড্‌ড সাঁতারে পেল। আমি সাঁতার কেটে কেটে মাঝ দীঘীতে পৌঁছিচি, ঠিক এমনি সময় হেঁসেলের সেই দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ছেলেটা এসে আমার চক্ষের সামনে ঘাটলায় নেবে জলে ডুবে—আহা হা, বক্ষ ফেটে যায় বাবুর্চ্চি,—বক্ষ ফেটে যায়।

লীলাময় ভগবান্ আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে বাৎসল্য রসে আমার অধিকার নাই। তাই তিনি গোপালকে আমার কেড়ে নিলেন।

তারপর বাধ্য হয়ে আমি মাধুর্য্যে মন দিলাম। রস ত চাই, সাধন ত চাই? তা সে রসের বিগ্রহ না হলে রসের স্ফূর্ত্তি হবে কি করে? যার কাজ তিনিই করেন। লোকে শুধু না বুঝে বলে আমি করি, আমি করি। লীলাময়ের অপার লীলা। তিনিই বিগ্রহ হয়ে সামনে এলেন।

বল্‌ছি—শোন। আমার প্রাণ-গৌরের কি উঠবার সময় হ'লো? দেখো?

তা যখন ছেলেটা সত্য মারা গেল,—আমার বুকটা যেন খাঁ খাঁ করে পুড়ে যেতে লাগলো, কাজেই মাধুর্য্যের চেষ্টায় আমি ছটফট কর্‌তে লাগলাম। আর ঠিক তখনি সাক্ষাৎ কাশী থেকে বেদ পড়ে ফিরে এলেন—আমাদের গুরু ঠাকুর। বেশী বয়েস কি বল্‌ছো? আমার স্বামীর চেয়েও দু'বছর, সাত মাস, তের দিনের ছোট।—তাঁর রূপের কি ওর ছিল, বাবুর্চ্চি?

"(বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দূর-বিহারী চক্ষুদুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুণ গুণ্ করিয়া গাহিল—

অরুণ কিরণখানি—তরুণ অমৃতে ছানি
কোন্ বিধি নিরমিল দেহা।)"

আমাদের গুরু ঠাকুর ছিলেন আমার স্বামীর ছেলে বয়েসের খেলার সাথী কি না?—না, গো না, ইয়ার হতে যাবে কেন? গুরু ঠাকুরের উপর আমার স্বামীর ভক্তি ছিল কত।

ছেলেটা সবে মারা গেছে, তাই—আমার সান্ত্বনার জন্যে, আমার স্বামী গুরু ঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন। গুরু ঠাকুর একবার শুধু অপাঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে,—তখুনি রাজী হ'লেন। "গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাতে লাগলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হয়েছিল বলে—মনে ত হয় না।" বোষ্টমের আবার শাস্ত্র কি? রসের স্ফূর্ত্তি হ'লেই হ'লো। তবে বিগ্রহ চাই, বাবুর্চ্চি, রসের বিগ্রহ চাই। সেই যে আমার প্রাণকৃষ্ণ,—তিনি নিত্যবৃন্দাবনে অসংখ্য যুবতী গোপিনীসহ নিত্য লীলা কচ্ছেন। তিনিই বিগ্রহ, তিনিই রস। বুঝতে বুঝি পাচ্ছ না?—এই ধারণা এক দিন যখন আমার,—ছাই—এখনো লজ্জার সংস্কার একেবারে ঘোচেনি,—কুলে কুলে ভরা—তখন আমার এই নারীতনুর মধ্য দিয়াই লীলাময় তাঁহার রস—তাঁর অমৃত কত মনুষ্যকে পান করিয়েছেন। নারীদেহের মত, রস বেঁটে দিবার অমন পাত্র ত ভগবানের হাতে আর দুটি নাই। আবার আমার অধর থেকে সুধা, নানা বিগ্রহের মুখে মুখে,—তিনিই আস্বাদন করেছেন। এ সুধা, এ রস—এ অমৃত—এ মাধুরী; যাই বল না

বাবুর্চ্চি,—এ তাঁরি। আবার এ আস্বাদনও তাঁরি। 'স্বাদিতে নিজ মাধুরী'—বুঝেছ ত? তাই আমি এই "রসে আমার সমস্ত মন নিয়ে ডুবে তবে সান্ত্বনা পেয়েছি।" আর তাই আমার রসের বিগ্রহকে "আমার গুরুর রূপেই দেখ্‌তে পেলাম।"

ঘুম থেকে উঠেই আমার মন কেবলি উকি মেরে মেরে দেখতো—তিনি এলেন কি না,—কত দেরী? আমি তাঁকে আহারের নিমন্ত্রণ করতাম। তাঁর পাতের এককণা প্রেসাদের জন্ত আমি কত যে হা-পিত্তেশ ক'রে—বসে থাকতাম। যে দিন তিনি সেবা করতেন, সে দিন—"তাঁহার জন্ত তরকারী কুটিতাম, আমার আঙ্গুলের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজিত।" আমি ত বামুনের মেয়ে নই। তাই এত যে রসারসি, মনমাতামাতি, তাঁকে ত নিজের হাতে কোন দিনই রেঁধে খাওয়াতে পারিনি। এই পোড়া দেশের সৃষ্টিছাড়া সমাজে এই অনাসৃষ্টি জাতবিচের। তা আমি ইঙ্গিতে বলে যাচ্ছি কিন্তু—বুঝে নিও। আমার সেবার কোন দিকে কম্‌তি ছিল না। তবু "আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।" শুধু ওতে কি তা মিটে, বাবুর্চ্চি?

আমার স্বামী ছিলেন একটু সোজা, ভালমানুষ ধরণের লোক। বেচারী! গুরু-ঠাকুর আমার স্বামীকে যখুনি শাস্ত্র বোঝাতে গেছেন, তখুনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন, ওহে, তোমার বোঝবার ক্ষমতার চেয়ে না বোঝবার ক্ষমতা যে ঢের বেশী। কাজেই তোমার শাস্ত্র বুঝতে যাওয়া—বিড়ম্বনা। আমার স্বামীর চেয়ে আমার বুদ্ধি এক-তিলও বেশী ছিল না। কিন্তু আমার কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে আমার গুরুর যেন উৎসাহের অন্ত ছিল না। আমার স্বামী—তাঁর এই স্ত্রী-ভাগ্যে নিজকে পরম সৌভাগ্য-বান্ মনে করতেন।

তার পর একদিন, ফাগুণে আগুন জ্বলে উঠলো। অনেক রাত্তির ধরে গুরু ঠাকুর—নির্জ্জন ঘরে আমায় নিয়ে পরকীয়া রসতত্ত্ব বুঝাচ্ছিলেন। সে বড় কঠিন তত্ত্ব, বাবুর্চ্চি, সে বড় কঠিন তত্ত্ব। পরকে যে আপন বলে জড়িয়ে ধরা,—সে বড় কঠিন কাজ। গুরু ঠাকুর বলছিলেন যে, এই পরকীয়া রসতত্ত্ব ত শুধু পুঁথির বিদ্যে নয়—হাতে খড়ি দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়, এযে একেবারে সাক্ষাৎ অনুভূতির বস্তু। আর সেই জন্যেই ত গুরুর সাহায্য চাহি। গুরু যদি দয়া ক'রে শক্তি-সঞ্চার না করে দেন, তবে সাধ্য কি; তাই তিনি বিশেষ করে—আমার দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন—যে পরকীয়ার আধার আমি হ'তে পারবো কি না? তারপর আরো সব যা গুরু বুঝালেন,—তা কতক কানে শুনতে পেলাম,—আর কতক বা শুনতে পেলাম না। কে জানে, শ্রীগুরুর দৃষ্টিতেই আমার মধ্যে তখন শক্তি সঞ্চারই হতে আরম্ভ হয়েছিল কি না? হা গুরু! হা দয়াল!

(বোষ্টমী আবার গুণগুণ করিয়া আপন মনে গাহিল)

—"সে সুখ-সাগর, দৈবে শুখাওল

(এবে) তিয়াষে পরাণ যায়।"

সে রাত গেল। পরের দিন ভোরের বেলা—ঘাট থেকে নেয়ে, ভিজে কাপড়ে,—ভিজে চুলে একলা পথে বাড়ী ফিরছি—আম বাগানের ভেতর দিয়ে, কেউ কোথায়ও নেই—ডালে ডালে আমের বোল—মৌমাছির ঝাঁক—সেই বোলের উপরে পড়ে কি গুঞ্জন—কি মাতলাম—পথের একটি বাঁকে একটা আমগাছের ঈষৎ আড়ালে দেখি কি না গুরু ঠাকুর! সেই কাল রাত্তির—আবার এই ভোরের বেলা ভিজে কাপড়—কোথায় লুকোই—কি দিয়ে ঢাকি—ছিঃ ছিঃ!

তিনি আমার নাম ধরে ডাক্‌লেন। আমি ত জড়সড় হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ানু, আমার সারা দেহের উপর পরকীয়া দৃষ্টি রেখে,— দয়ার নিধি গুরু বল্‌লেন,—"ও গো—কি সুন্দর, কি সুন্দর, তোমার এই দেহখানি। গুরুদেব বাঁশরীর সুরে গেয়ে উঠিলেন—"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী, অবনী বহিয়া যায়।"

তার পরে—আবার সেই শক্তিগঙ্গার শিরায় শিরায় অনুভব করতে লাগলুম—"মনে হ'লো, সমস্ত আকাশ পাতাল পাগল হয়ে, আলুথালু হয়ে উঠেছে; কি করে যে বাড়ী এনু, কিছু জ্ঞান নেই···সেই ঘাটের পথের ছায়ায় উপরকার আলোর চুমকিগুলি আমার চোখের উপরে কেবলি নাচতে লাগলো।" তবু বাড়ী এসে কোনমতে ঘর ঢুকনু। সেই দীঘি যমুনার তীরে, আম্রকদম্বমূলে বাঁশী বেজে উঠলো, বাবুর্চ্চি, বাঁশী বেজে উঠলো। আমার নাম ধরে, রাধা নামের সাধা বাঁশী বেজে উঠলো, তবু সে দিনের মত বাড়ী ফিরে এসে আমি ঘরেই ঢুকনু।

রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে আসে। উঠে বসলুম। আমার স্বামী টের পেয়ে, তিনিও উঠে বসলেন। একেবারে মুখোমুখী—নিতান্ত স্বকীয়া দৃষ্টিতে তিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। হবার কথাই যে। বাক্যি বলি বটে, তা আমিই এক এক সময়ে অবাক হয়ে যাই।

"আমি বল্লুম, আর আমি সংসার করব না।···তুমি অন্য স্ত্রী বিবাহ কর, আমি বিদায়"—এই না বলে "তার পায়ের কাছে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলুম।" ভক্তি করতুম, বাবুর্চ্চি, স্বামীকে ভক্তি করতুম।

স্বামী বল্লেন, "তোমার সংসার ছাড়তে কে বলিল?"

"আমি বলিলাম, গুরুঠাকুর।"

একেই আমার স্বামীর বুদ্ধি ছিল কম,—তার উপর—হতবুদ্ধি হয়ে বল্লেন, "গুরু-ঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন বল্লেন?"

আমি বলিলাম, "আজ সকালে যখন স্নান করে ফিরছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনি বলিলেন।"

তখন সবদিকেই প্রায় ফর্‌সা হয়ে এসেছে কি না? অথচ অবুঝ স্বামী নেহাৎ খাপছাড়া রকমের বলে উঠলো. "চল না, দুজনে একবার তাঁর কাছে যাই।"

আমি বলিলাম, "উহু!" তার পর হাত জোড় করে বলিলাম, "তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।"

তবু অবুঝ স্বামী আমার মুখের দিকেই চেয়ে রইল। কাজেই আমাকে বাধ্য হয়ে মুখ নামাতে হ'লো। আর কোন কথা হ'লো না। তখন সব ফরসা হয়ে গেছে।

বাবুর্চি গো, তুমি অঙ্গমোড়া দিয়ে তাকাচ্ছ কেন?

গৌর—গৌর—আমার প্রাণ-গৌর,—ক'টা বাজলো বাবুর্চি? আরো আধ ঘণ্টা! বাথ্‌রুম কি, বাবুর্চি? ওঃ—আহা হাঃ—গৌর,—প্রাণগৌর!

না গো, না। আর কি গুরুঠাকুরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে? তাও কি হয়? তা হ'লে যে আমি ব্যিচারিণী হব। ধর্ম্মে পতিতা হব? তা কি পারি? আমি ত কুলটা হয়ে বেরিয়ে আসিনি। সে আগে যারা বেরিয়ে আসত, তাদের কথা স্বতন্ত্র। এখন যারা আমার মতো বেরিয়ে আসে, প্রাণগৌর কাল বলেছেন যে, তারা সতীত্বের এক নূতন আদর্শ দেখাতে বের হয়। তারা ধন্য!

স্বামী ভালবাসত না? কি বল, বাবুর্চি! "পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালবেসেছিল, আমার ছেলে, আর আমার স্বামী। সেই ভালবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যে সইতে পারলে না। একটি আমায় ছেড়ে গেল, আর একটিকে কাজেই—আমি ছাড়লাম। এখন সত্যকে খুঁজছি—আর ফাঁকি নয়"—তাই ত প্রাণগৌরের কাছে এসেছি।

বাবুর্চি গো, রসতত্ত্বের অনেক রস, অনেক তত্ত্ব, অনেক রসোদ্গার, ওর নাম কি না—গা ঘমিঘমির দিন আমার কেটেছে, এখন আর চেয়ে দেখছ কি? সে বয়েস আমার পার হয়ে গেছে। তবে হাঁ, "আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে। এবে বুড়া তবু কিছু"—থাক্। গৌর বুঝি উঠলো? তবে ও কিসের শব্দ?

যদি স্বামী ভালই বাসতো, তবে বেরিয়ে এলুম কেন? হা রাধেমাধব, বাবুর্চি গো, "বাহিরের জন্য যে ক্ষুধা, সে ক্ষুধা ত ঘরে মিটিবে না।" বাহিরে যে বিশ্ব, বাবুর্চি, তুমি বিশ্বের তত্ত্ব গৌরের কাছে শোন নি? তবে তুমি বুঝবে না, এ পোড়া দেশে আর কেউ বুঝবে না। আমার প্রাণগৌর শুধু এর তত্ত্ব জানে। তাই ত এসেছি। আর এ ত এ-পারের কথা নয়; এ ও-পারের কথা। জীবে দয়াল গৌর তাই বিলাতে নিয়ে এসেছেন—আমাদের।

তা কেন হতে যাব গো? আমি ত বল্লুম, আমি কি যার তার মত কুলটা হয়ে বেরিয়ে এসেছি। যে গুরুঠাকুরের—ছিঃ ছিঃ- তুমি বুঝতে পারবে না। এ—এই রকমি যে এখন হচ্ছে গো, এ এক রকম, বুঝলে বাবুর্চ্চি! আমার প্রাণগৌর বুঝেছে। কি জানি, এ বুঝি শুধু বোষ্টমের রসতত্ব নয় গো। এ শুধু দোয়ো-রস নয়, বেয়ো রসের মিশাল এতে আছে। প্রাণগৌর কাল আমায় সব বুঝাচ্ছিলেন—এর ভিতরে ঐ 'বিশ্ব' নাকি যেন সব আছে গো। ঐ বুঝি গৌর আমার উঠেছে,—এই দিকেই আসছে না? সরে যাও, সরে যাও, বাবুর্চ্চি। গৌর, গৌর—(এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।)

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

কমলের দুঃখ

(ইন্দু—কমল)

ভাই! আমার ভাই! আর কি বলে তোকে ডাক্‌ব, আর কি বলে তোর কাছে ক্ষমা চাইব, বলে দে। আমি ত আর কিছু বল্‌তে জানি নি। জবা আর আমি বসে গল্প করছিলাম—আর এখন তাকে নিয়েই সারাদিন কেটে যাচ্ছে না? কুশী এসে বললে, "দাদা এসেছে গো, দাদা এসেছে।" তার কাছে সমস্ত শুনলুম্, আমি যা ভেবেছিলাম, তাত তুমি ঠাকুরঝির কাছে শুনেছ। তাই যদি ভাই তোমায় কিছু বলে থাকি, মায়ের মত বোন্ মনে করে ক্ষমা কর। জবা তোমার খবর পেয়ে, পাগলী কিনা, হেসেই অস্থির। এমন হাসতে আরম্ভ করেছে যে তার হাসির জ্বালায় অস্থির। খানিক আগে তার গল্প বল্‌তে বল্‌তে কাঁদছিল, আর আমায় কাঁদাচ্ছিল। এখন কান্নাই আমাদের সব। আমার কাছে বসে বসে রামায়ণ পড়ছিল, তারপর বল্‌লে রামায়ণ থাক, শোন—আমি কেমন রামায়ণ গান শিখেছি, তারা আমায় শিখিয়েছিল। ওই সেখানে সব ভিখিরীরা আস্‌ত আর গাইত। সব ত আমার মনে নেই, একটু একটু আছে—

বন বন ঢুঁড়ত ঢুঁড়ত মন মে,
কাঁহা জানকী হা হা রে—
হে গিরি তুয়া পায় নমে রঘুবর রায়
বোলহুঁ কাঁহা সোঁ পিয়ারে!
পন্থ বিজন ঘোর, অবরু ঝরয়ে লোর
বেতস লতা জনু কাঁপি।
নীল উৎপল ছল ছল টল টল
শাঁওন ধারা দুহুঁ আঁখি!
শ্বাস-পবন ঘন ঘন ঘন পড়হি
আশা ভাঙ্গি ম্রিয়মান,
হা সীতা, হা সীতা! কাঁহা তুহুঁ কান্তা
রঘুকুল লছমি সমান।

গাইতে গাইতে তার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ শ্রাবণের ধারাই যেন বইল। আহা, একটুকু মেয়ে—এত দুঃখ কি করে সে বোঝে...দুঃখে যারা দিন কাটায়, তারা

লোকের দুঃখ বুঝি ভাল বেশী বোঝে। তাই তাদের চোখ জলে ভরে। গান গেয়ে খানিক চুপ করে বসে রইল—তার পর বল্‌লে, 'হ্যাঁ দিদি, সীতা এত ভাল, তবু কেন এত দুঃখ পেলে?' দূর পাগলি, সীতা অত দুঃখু পেয়েছিল, তবু কেমন—তাইত অত ভাল বল্‌লি। জবা বল্‌লে, 'তা দিদি! দুঃখ পেলেই কি ভাল হয়, তা হ'লে—'বলে একটু আবার চুপ করে রইল। তার পর আবার বল্‌লে, ওঃ! তাই বুঝি তোমার এত দুঃখু—আমি বল্লাম, পাগল আর কি। আমার আবার দুঃখ কি? জবা বলে, ওমা! তোমার আবার দুঃখ কি? তবে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদ কেন···আচ্ছা দিদি, দুঃখ পেলেই যদি সবাই ভাল হয়, তা হ'লে আমার মা কেন অমন হল। বলেই ছল ছল চোখে আমার মুখের দিকে তাকালে আর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি মনে করলাম, আহা মা নেই, মার কথা মনে হতেই কেঁদে উঠল। আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বললে, 'দিদি! আমরা অত দুঃখী ছিলাম না—আমার বাবা খুব বড়মানুষ ছিল। কেষ্টনগর জান ত, সেই কেষ্টনগরে আমাদের মস্ত বাড়ী ছিল, আর বাবার মস্ত জমিদারী ছিল। আমাদের বাড়ী—আমার ছেলেবেলার কথা খুব অল্প মনে পড়ে, ঠিক সব হয়ত মনে নেই, তবু আমাদের বাড়ীতে অনেক লোকজন ছিল। আমার মা, আমার বাবা, আমি ছাড়া আমার বাড়ীর, বাবার সম্পর্কে কত লোক ছিল। বাবার এক বন্ধু ছিলেন, খুব গান বাজনা হত, তিনি আস্‌তেন, আমাদের বাড়ীতে কতদিন থাক্‌তেন, দেখ্‌তে খুব সোন্দর ছিলেন।—আমাকে কোলে করে কত আদর কর্‌তেন, বাবার ওই বন্ধুর কোম্পানির কাগজের আর নুনের কারবার ছিল। তাইতে সব লোকসান হয়—সর্ব্বস্ব যায়। বাবা তাঁর পর নিজের জমিদারী বাঁধা দিয়ে তাকে সেই লোকসান থেকে বাঁচান। আরো অনেক টাকা—শুনেছি প্রায় তিন লাক টাকা দেন। দিন কতক কারবার বেশ চলে। কিন্তু এক বছরের ভেতর দেনা শোধ দেবার কোন উপায় হয় না, এক বছরের ভেতর শোধ দেবার কথা ছিল। বাবার জমিদারী—এক দিকে দেনা অন্য দিকে কালেক্টরীর খাজনা—সব জড়িয়ে নীলামে ওঠে—বাবার ওই বন্ধু কিনে নেয়। জমিদারী বিকিয়ে যাওয়াতে আমরা একেবারে পথের ভিকিরী হলুম। আমাদের বড় কষ্ট হ'ল। সে বন্ধু আর তার পর থেকে আস্‌তেন না। বাবা তাতে দুঃখু করেন নি—বলেছিলেন, বিষয় আমার ত নয়, গেছে তার আর কি কর্‌ব। এই সব নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া হত। আমার মা অনেকটা আমার মত দেখতে, তবে মা অরো সোন্দর ছিল। একদিন সকাল বেলা দেখি, মা আমার কোথায় চলে গেছে। আমার তখন ছ-বছর বয়েস হবে। আমি মাকে না দেখে খুব কেঁদেছিলুম। তারপর বাবার কাঁদ কাঁদ মুখ দেখে আমি বাবার গলা জড়িয়ে অনেকক্ষণ

চুপ করে রইলুম। বাবা সেদিন নিজে রাঁধলে, রেঁধে আমায় খাওয়ালে, তার পর রাত্রে জিনিসপত্র সামান্য নিয়ে বাড়ীর চৌকাটে মাথা রেখে নমস্কার করলে। করে আমায় নিয়ে সেই বিলাসপুরে গিয়ে রইলেন। ওইখানেই আমাদের বাগানের মত ও বাড়ী যাকে বাঙ্‌লা বলেছিল। ওই যে বাঙ্‌লায় কমলবাবু ভাড়া নিয়ে ছিলেন। বাবা আমাকে পড়তে শিখিয়েছিলেন, আর একটা মেম অনেক দিন আমাদের ওই বাঙ্‌লায় ছিল, তার কাছে একটু একটু ইংরিজী শিখতাম, তা সে আমার ভাল লাগত না। মাঝে মাঝে মাকে মনে পড়্‌ত, আর বড্ড কান্না পেত। বিসালপুরের লোকেরা আমাকে পাগ্‌লী বল্‌তে, আমি কেবল ওই ফুল নিয়ে খেলা করে করে যে বেড়াতুম তাই! হ্যাঁ দিদি! আমি কি পাগ্‌লী? তা হোক গে, আমি ওইখানেই রামায়ণ গান শুনতুম, তাদের কাছে শিখতুম, একটা কানা ভিকিরী আসত, ছোট ছেলের হাত ধরে সে খুব চমৎকার রামায়ণ গান করত, তার কাছে অনেক শিখেছিলুম। এই যে কাল্লু, ওরা গোঁড়, ওরা সব কাট বেচে খায়, কার' কার' ক্ষেত আছে, জঙ্গলের ধারে পাহাড়ে সব ঘর, ওরা সব আসত, আমাদের ওই বাগান থেকে ফল পেড়ে নিত। বাবা ত কার কাছে পয়সা নিতেন না তার জন্যে। আহা, আমার কাল্লু তার ছোট বোনের মত ভালবাসত। সে আমায় কত রকমের ফুল কোথা থেকে তুলে এনে দিত। ও দিকে অনেক দূরে রত্নপুরে অনেক হ্রদ আছে, সেইখান থেকে সব পদ্ম তুলে এনে দিত। তারপর অনেক দিন পরে—বাবার কলকাতায় এখানে কি দরকার পড়ে—সেই কেষ্টনগরের বাড়ীর কি ব্যবস্থার জন্যে আসেন, আমিও আসি। একদিন বাবা আমায় যাদুঘর দেখিয়ে নিয়ে এল, আমরা একদিন কালীঘাটে গেলুম, একদিন চিড়িয়াখানা দেখতে গেলুম,—অনেক সব বাঘ সিঙ্গী কত দেখলুম। দুটি কাল হাঁস আছে, আর তাদের ঠোঁটদুটি টুকটুকে লাল। এমন সোন্দর দেখতে—আমার তা দেখে বড় ভাল লাগল। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, কেমন ঘাড় উঁচু করে সাঁতার দিচ্ছে দুটিতে। পাখীর ঘর থেকে খুব জোরে কি পাখী ডাক্‌ছিল, আমরা গেলুম। একরকমের পাখী, সে কি চমৎকার স্বর, আর কি রকম জোর, আর কেমন সোন্দর দেখতে, পালকে কত রকম রঙের সঙ্গে হলদে, আর ন্যাজটি সমস্ত সোনার রঙ। ওই যে বাবা বলেছিল কি 'স্বর্গের পাখী'। আমি বল্লুম, আচ্ছা বাবা, এরা স্বগ্‌গ থেকে এ পাখী কি করে ধরে নিয়ে এল? বাবা হাসলেন,—বললেন—কি দেশের নাম আমি ঠিক রাখতেও পারি নি—বললেন কি আমেরিকা না কি—কোথা তা জানি নি, আমি ভাবলুম, বল্লুম—বাবা! তবে স্বগ্‌গ আকাশে নয়, এখানে? তারপর আমরা সাপের ঘরে গেলুম। উঃ—সে কি সব ভয়ানক সাপ! একটা সাপ সেই কাঁচের ভেতর থেকে ফণা ধরে আপনি আপনি খাড়া হয়ে উঠছিল—আমি সেইখানে

গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, সাপটা সেই কাঁচের ভেতর থেকে ফণা তুলে যুয়ে যেন আমার দিকে কোঁস্ করে এল, আমি ভয়ে যেমন পেছনে সরে আসব, অমনি একজনের ঘাড়ে পড়ে গেলুম—ফিরে দেখি, ঠিক সে আমার মার মত, কিন্তু জুতো পায়ে। আমি যেন কেমন হয়ে গেলুম, পাশেই দেখি বাবার সেই বন্ধু। আমি বাবাকে ডেকে বল্লুম, বাবা! বাবা! দেখ্ ওই কে মার মত। বাবা একবার দেখেই আমায় কোলে করে নিয়ে একেবারে তাড়াতাড়ি বাগান থেকে বেরিয়ে এল। সেই রাত্রেই আমরা রেলে চড়লুম—আবার বিলাসপুরে ফিরে গেলুম। তারপর আবার প্রায় পাঁচবছর পরে বাবা আমাকে নিয়ে এই কল্‌কাতায় আসেন—ওই টাকাকড়ি দলিল পত্তরের কি দরকারে বোধ হয়, ঠিক জানি নি। সে সব কাষ সেরে বাবা আমাকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গিছলেন। প্রফুল্ল হয়েছিল। আমি দিদি কেঁদেই মরি, মাগো, ও সব মা কি দেখা যায়,..বাবাঃ—অমনি করে মানুষকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে, অমনি বিষ খাওয়াতে যাওয়া—বাবাঃ! থিয়েটার থেকে বেরিয়ে বাবা রাস্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে এসে গাড়ী খুঁজছিলেন—খানিকটা এগিয়ে দেখি, ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে অনেক ভিকিরী ভিক্ষে করছে, বাবা তাদের সবাইকে পয়সা দিলে। একটা রাস্তার মোড়ে—যেখানে আমরা গাড়ী রেখেছিলেম, সেই মোড়টায় যাবার আগে একটা ভিকিরী গ্যাসের আলোর সামনে বসে ভিক্ষে করছিল—তার বাঁ পায়ে স্তাকড়া জড়ানো—কুঠ হয়েছে। ছেঁড়া স্তাকড়ায় তার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। হাতের আঙুলেও স্তাকড়া জড়ান বুকের ওপর একটা ছোট ছেলেকে জড়িয়ে রয়েছে। ছেলেটি মাই খাচ্ছে। আমার দেখে এমনি কষ্ট হল। দেখ দিদি, আমি বড় হবার পরেও মা আমাকে বুকে—অমনি করে বুকের ভেতর করে শুত। তাকে দেখে আমার এমনি হল। বাবাকে বল্‌লাম, বাবা! বাবা! দেখ দেখ—আহা, বলে তার মুখের দিকে চাইতেই সেই ভিখিরী মাগী তার সেই স্তাকড়াবাঁধা হাত দুখানা বাড়িয়ে জবা! জবা! করে কেঁদে ফেল্‌লে—সে ডাক শুনে আমার প্রাণ যেন কেঁদে ছিঁড়ে উঠল। বাবা তাড়াতাড়ি আমায় নিয়ে মোড়ের সেই গাড়ীখানায় গিয়ে উঠলেন। গাড়ীতে আমি খুব কাঁদলুম, সে নিশ্চয় আমার মা দিদি! বাবা কিন্তু একটি কথাও আমায় বল্লেন না। রাত্রিতে বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল, দেখি বাবা কোথায় গেছে। বাবা বাবা করে ডাকলুম, কতক্ষণ পরে বাবা এলেন, বললেন—কেন মা এই যে আমি, আমি একটু ওদিকে গিছলুম। তার পরেই আবার আমরা বিলাসপুর চলে গেলাম। কমল বাবু বাবার একমাস আগে আমরা গিয়েছিলাম। বাগানে এসে অবধি রোজ কাঁদতুম, তারপর যখন ওই সব গান শুনতুম, আবার ভুলে যেতুম। কমল বাবু যাবার পর থেকে খুব মালা গাঁথতুম, তোড়া বাঁধতুম। সমস্ত দিন যেন আর

আমার কাজের হিসাব পেতুম না—'কথাটা বলেই পাগলী কেমন মুখখানা লাল করে উঠ্‌ল।—তারপর বললে—'দিদি! মার দুঃখু দেখে বোধ হয় পাহাড় ফেটে যায়—আহা, মা কেন আমার অমন হল। দিদি! আমার মা অমন বলে আমায় তোমরা ঘেন্না ক'র না—'বলে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌ল—আমিও কেঁদে ফেল্‌লুম। বললুম—বালাই ষাট! তুই যে আমার ছোট বোনটি বালাই ষাট! ও কি কথা—না দিদি—সে বললে—না দিদি! ইচ্ছে করে, মাটীর ভেতর মুখটা ঘুষড়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদি—আমার কেন মরণ হল না দিদি, উঃ!"—আমি তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে কেঁদে ফেল্‌লুম। খুব কাঁদলুম—কেঁদে বললুম- লক্ষ্মী বোনটি আমার, কাঁদে না, ছি—ছেলে মানুষে কি কাঁদে—কেবল হাসে। হাস—দুষ্টু হাস, বলতেই হেসে ফেললে। সেই সময় কুশী এসে তোমার আসার খবর দিলে। ঠাকুরঝির কাছে যা শুনেছি, তাতে আমার প্রাণ উড়ে গিছ্‌ল। তোমায় সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা হচ্ছে—তোমার শরীর যে দুর্ব্বল, তোমার ত আর আস্‌তে বলতে পারি নে—তবে আমার নিজে যেতে হলে তাও হয়ে উঠে না, এদের সব ফেলে রেখে কোথায় বা কি করি। তুমি যদি পার, তবে একবার এস। সুখোর মার বড় ব্যায়রাম, তার ত আর কেউ নেই, সুখো অনেকদিন হল মরে গেছে। বলে যা আছে, দিদিমণি! গুরুকে দিয়ে আসব। —আর আমার সুখো আঁব খেতে বড় ভালবাসত—তাই তার নাম করে একটা গাছ দান করে আসি, দিদি! তা তুমি যদি পার, সুবিধা হয়, তবে একবার তার যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ো—আর কে করবে, উনিত বাগানেই থাকেন—কোন কিছুর মধ্যে নেই। আর এদিকে বড় আসেনও না—কি হয়ে গেলেন। অমরও আর আসে না। যার জন্যে ঘরে আনন্দ উথ্‌লে ঘর ভেসে যেত, সে আজ নেই। আজ তাই কেউ আসে না—কেউ আর নিরানন্দের ভাগ নিতে চায় না। তাই বুঝি তোরা সব ফেলে দিস্। হবে! জবা সেরেছে, ভাল আছে। আমি আছি, নইলে তোমায় চিঠি লিখছি কেমন করে—আমিও আছি।

ইতি—তোমার,

ইন্দু দিদি!

(হেনা—যুঁই)

তুই আমার বড় আপনার মত, আমি জগতে তোর কাছে কিছুই কখন লুকুই নি, তা জানিস্। তাই তোকে শেষ কথা জানিয়ে যাচ্ছি, আর হয়ত তোকে কিছু বলতে আসব না—কেন যে আসব না—তাও আর বলতে পারছিনে। তোরা সেদিন

বলেছিলি, হেনা পাগল সত্যি সত্যিই হল। তা তোরা যা বলিস, হবে—আমি পাগল হয়েছি। কিন্তু পাগলের কি এমন সব বল্‌বার শক্তি থাকে—যেমন তোর কাছে বল্‌তে পাচ্ছি। তোরাও এতদিন এত করে দেখলি, কি সুখ পেলি, আমায় বল্‌তে পারিস? কখন না—এ পথে তোরাও পাসনি, তবু তোরা সেই খুঁজে মরছিস্‌। এ পথে তোদের মত আমিও অনেক খুঁজেছি, আমিও কই পাইনি। কিন্তু আমি আর সে সুখ খুঁজে মর্‌তে চাইনি—আমি, আমি সুখের মুখ দেখেছি, আমি যেই তাকে খোঁজা বন্ধ করলুম, অমনি সে আমার দোরের কাছে মাথা খুঁড়তে লাগল আর আমি এখন তাকে চাইনি—সে আমায় চায়। সুখ খোঁজা বন্ধ হলেই সুখ মেলে, নইলে জ্বালা!

যদি আমার মত অবস্থায় একবার পড়তিস, তবে বুঝতিস! তোরা এ সুখের কি জানবি বল। তোরা ভাবিস—এই টাকা, এই আতর গোলাপ, ঝুড়ি ঝুড়ি ফুলের মালা, ফুলের উপর উপর খুব সুখে থাকি। যুঁইফুল, এ সুখের নয় লো সুখের নয়। নারীজন্মের সার্থকতা মা হওয়া। এর চেয়ে এক গাছা নোয়া হাতে স্বামীর ঘর কর্‌তে পেতাম, সে সত্যি জীবন হতো। এ শুধু আগাগোড়া নরকের জ্বালা। এ পথের সুখ বুঝে নিয়েছি। এ পথও ছেড়েছি, আর আমার সব বদলেছে। জানিস, হেনা মরেছে—সে আজ সবার দাসী। আর সুখের পথের রাস্তায় নেই, সে রাস্তা বন্ধ করেছি। এ দেহের বিনিময়ে যে আমায় যা দিয়েছিল, গয়না, টাকা, সোণা, জহরৎ, যে যা দিয়েছিল, তাদের সব ফিরিয়ে দিয়েছি। সকলে নিয়েছে, কেবল দু'জন সব ফিরিয়ে দিয়েছে। একজন নিজে এসে, আর একজন বেঁচে নেই, তার ছেলে। সবই ফিরিয়ে দিলাম—বাকী ছিল তোর সঙ্গে বাগানে গিয়ে প্রথমে যে টাকা পাই, এ সেই টাকা—আমার রাক্ষসী মা এতে সিন্দুর মাখিয়ে লক্ষীর কৌটোয় করে রেখে ছিল। তাও ফিরিয়ে দিলাম, যে এ টাকা দিছল, তাকে ফিরিয়ে দিস্‌, আমার নাম বলে। আর কারো কিছু রাখি নি; পাপের দ্বারা উপার্জ্জিত বাহিরে সব চিহ্ন লোপ করেছি, বাকী শুধু আমার দেহ, যে এই আহরণ করেছিল। তারও ব্যবস্থা করেছি,—একবার সুখসূর্য্যের খবর নিয়ে তারপর মহা আঁধারে চলে যাব। একজন বড় গরিব ছিল—দেখতে বড় সুন্দর, আস্‌ত আমার কাছে,—একদিন এসে বল্‌লে, ভাই—আমি আর তোমার এখানে আস্‌তে পার্‌ব না। আমার ভাই, বাপ মরে গেছে, সংসার আমার ঘাড়ে পড়েছে আর তোমার এখানে কি করে আস্‌ব ভাই! সে বড় সোন্দর দেখতে ছিল; আর ছেলে মানুষ, সেই সবপ্রথম আমার কাছে এসেছিল; আর আমিও তখন ছেলেমানুষ, তখন এত দেখিনি, এত বুঝিনি, এমন হয় নি, তবু তাকে একটু কেমন ভাল লাগত; মাঝে মাঝে মনে হত, তা সে আসুক। না আসুক—কেন আস্‌বে না—এ রাস্তা দিয়েও ত একবার যায় না যে, একটু চেয়ে দেখি। তিন দিন সে এসেছিল, একটি দিন

শুধু আমি তার হ'য়েছিলাম। হায় শুধু সেই একদিন, তারপর অনেকদিন পরে আমি একদিন ময়দান থেকে মোটরে করে বেড়িয়ে আসছি, দেখি তার মত একটি লোক ঘাড় গুঁজে একটা পুরোণ ছাতা হাতে ক'রে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—যেমন কেরাণীরা সন্ধ্যের আগে বাড়ী ফেরে। সে চেহারা নেই, যেন কত বয়স হয়ে গেছে। আমি মোটর থামিয়ে, আমার মোটরম্যানকে বল্লুম—লোকটীর নাম আর বাড়ী কোথা জিজ্ঞেস করতে। মোটরম্যান তাকে জিজ্ঞেস করে এসে বল্লে, "বাবু বলতে চায়ই না—যখন আপনার নাম করলুন, তখন খানিক চুপ করে ভেবে বল্লেন,—আমার নাম মণিমোহন মুখুয্যে, আমার বাড়ী বাগবাজারে। * * * নম্বর বাড়ী ওই বাগবাজার ষ্ট্রীটে। আমি তাকে বলে দিলাম যে, তাঁকে বলিস্—আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। উত্তর দিয়েছিল—"তোমার মনিবকে বল, আমি গরিব লোক আমায় গতর খাটিয়ে খেতে হয়, আমার ত সময় নেই, যদি সময় পাই তবে দেখা করব।" এমন সত্যবাদী মানুষ আমি কমল ছাড়া আর দ্বিতীয় দেখিনি। যুঁই! যারা সোন্দর হয়, সত্যি তাদের সবই সোন্দর হয়। তারপর অনেক দিন পরে খবর নিয়েছিলাম, যখন সে আমার কাছে আসত, তখন সে দুটো পাস করে, বি,এ পড়ছিল। বাপ মারা যায়, আর পড়ার খরচ চলে না, সংসারও চলে না—ঘরে মা, দুটী বিধবা বোন,—একটী ছোট, তার বিয়ে হয় নি। ছেলে পড়িয়ে সংসার চালায়, বড় বোনের আবার একটী ছেলে আছে—এই সব নিয়ে বড় কষ্টে দিন কাটায়। রবিবার ছুটী পায়, সেদিন আবার অন্য একটা কাজ করে। এমনি করে করে বি,এ পাস করেছে। এখন তার বয়েস হবে বছর পঁচিশ, তাতে আমাতে দু বছরের ছোট। এমনি করে করে সে এম,এ পাশ করেছে, কিছুদিন আগে তার বোনের বিয়ে হয়েছে। আমি তাকে ডেকে পাঠাতে, সে কিছুতেই আসতে চায় নি। অনেক করে সেদিন নিজে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলাম। জিজ্ঞেস করতে বল্লে—'দেখ! হেনা, আমার অবসর নেই যে তোমার সঙ্গে দেখা করি কিম্বা তোমার চিঠির উত্তর দিই। এইত আমার অবস্থা জান, বলছ কি হ'য়ে গেছি—হবে আমার মত গরিবের আর রূপের কি দরকার বল। আমি এম,এ পাশ করে কোনরকমে একশ টাকা রোজগার করি, বা করে এম,এ পাশ করেছি, সে কথা তোমায় জানাব কি করে, আর জানাবই বা কেন? এই একশ টাকায় সংসার প্রতিপালন, বাড়ীর ভাড়া, তার উপর বাবার দেনা সব দিতে হয়। এই মাসে আমার বোনের বিয়ে।—তারা তিনহাজার টাকা চায়; যার ইচ্ছে সেইখানে হয়, অথচ আমার টাকা নেই। অতিকষ্টে এর মধ্য থেকে এই চার বছরে একহাজার টাকা সংগ্রহ হয়েছে, আর দু' হাজারের কোন আশা নেই। বিয়ে যদি নিজে করি, তবে হয় ত সহজে বোনের বিয়ে হতে পারে, কিন্তু

তা হবে না। ইহলোকে আর আমি বিয়ে কর্‌ব না। কাজেই তার ভাবনায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। একবন্ধু বড় মানুষের ছেলে আমার সঙ্গে পড়ে ছিল, আমারই নাম, সে 'মিতে' 'মিতে' করে · সে যদি ধার বলে যোগাড় করে দেয়, তবে উপায় হবে।' আমি বল্‌লুম—কেন ভাই, তুমি বিয়ে করবে না, তুমি বিয়ে কর না কেন—আর আমি তোমায় তিনহাজার টাকা দিচ্ছি, তুমি নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। চুপ ক'রে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, তারপর বল্‌লে—যা বল্‌লে তা শুনে আমার চৈতন্য হল, সে কত বড়। সে কত উঁচুতে আর আমি কোন ধুলোর কীট। সে বল্‌লে—'শোন হেনা! আমি ব্রাহ্মণ, আমি বেশ্যাসংসর্গে ধর্ম্ম, নিজের পবিত্রতা নষ্ট করেছি, আমার নূতন সংস্কার কি ক'রে কর্‌ব। আর প্রথম জীবনে তুমি ছাড়া আর কোন নারীর সংসর্গে আসি নি—আমার প্রাণের প্রথম ছাপ তুমি দিয়েছ, সে মূর্ত্তি আমি আজিও মুছতে পারিনি। তোমায় ভুলতে পারিনি, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, আমি বেশ্যাদাস হয়েছিলাম—আমি পতিত, আমি মহাশক্তি হাতে ধরে নেব কি করে? তাই ইহলোকে আমার বিয়ে হতে পারে না—আর তুমি—ব'লেই সে চুপ করলে—আমি বল্লাম, মণি! আবার 'মণি' কথাটা শুনেই বল্লে, 'আবার কেন 'মণি' বলে আগেকার মত ডাকছ। আজ এই পাঁচ বৎসর তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি,—তুমি নারী, তুমি কি বুঝবে এ অন্তরের ব্যথা। মনে ক'র না দরিদ্র ব্রাহ্মণ তোমার দয়া দেখে তোমার সেই পুরাণো স্মৃতির কাহিনী গাইছে। আমি বেশ্যার উপার্জ্জিত অর্থে—সহোদরার বিয়ে দিতে প্রস্তুত নই, তার চেয়ে নিজেকে ধনী গৃহে বিক্রয় সুখকর মনে কর্‌ব—জেনো। না পারি আমারই মত গরীবের ঘরে যাতে সে চিরকাল দুঃখ পায়, তাই কর্‌ব।' আমি বল্লাম,—না মণি! তুমি এত ভালবেসে জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যকে মাথায় তুলে ব'য়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু যে একদিনও তোমার বুকে মুখে ছিল, তাকে কেন তার পাপ থেকে হাত ধরে তোল নি ভাই! আর একটা কথা তুমি নিষ্পাপ, তুমি—তুমি মণি, আমার প্রথম যৌবনের স্বামী; স্বামী কাকে বলে তা জানিনি, কিন্তু তোমার মনে আছে, তোমার কাছে যে দিন প্রথম আসি, তখন গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করেছিলাম, কেন ক'রে-ছিলাম তা জানি নি। তোমাকে কি তোমার রূপকে—তা জানি নি। তুমি ত্যাগ করেছ, তাই দ্বিচারিণী। কেন ত্যাগ করেছিলে—তুমি গরীব ছিলে, আমিও গরীব হয়ে থাকতুম, তা হলে আজ এই পর্ব্বত প্রমাণ ভোগবিলাসের ছায়ায়—মরুভূমির তৃষা হত না। কেন ফেলে দিয়ে গিছলে মণি! এ দেহের সাররত্ন তোমারি পায়ে দিয়ে-ছিলাম, তখন তো আমি দ্বিচারিণী নয়। যদি না ফেলে দিয়ে যেতে, তোমায় মণিহার করে দেশে দেশে রূপের বাজারে ফির্‌তাম! শুনে চুপ করে রইল, তারপর বল্‌লে—'দেখ,

তোমার সঙ্গে দেখা না করাই উচিত ছিল। আজ স্বেচ্ছায় তোমায় এ সকল বল্‌তাম না, কেন বল্‌তাম তা জানিনে,—তবে শোন সবই বলি। আমি ব্রাহ্মণ হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম, যেন তোমার মৃত্যু হয়। তোমার যাতনা যা তুমি বুঝতে পার না, তার অবসান হয় মৃত্যুতে। ইহলোকের কালি মুছে তিনি যেন ধুয়ে তোমায় নেন। তিনি যেন তোমায় মুক্তি দেন। আজিও আমি তাই বল্‌ছি, তাঁর কাছে আশীষ ভিক্ষা কব্‌ছি, তোমার মনের শান্তি আসুক্—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমায় বিদায় দাও!' যুঁই, চোখ ফেটে আমার জল এল। কত কথা বল্‌তে সাধ হল—কিছু বল্‌তে পারলুম না। নীরবে সজল নয়নে তার সেই রক্তাভ পৌরুষমাখা মূর্ত্তি দেখলাম। সে চলে গেল—শুধু নিশ্বাস পড়ল। মনে হ'ল মা রাক্ষুসী, নইলে এত' আমার হ'তই। প্রথম দিনটা মনে পড়ল বুঝলাম, একটা ছাপ আমারও পড়েছিল। তারপর দুনিয়ার ছাই পাঁস এক জায়গায় চাপিয়ে সব মুছে গিছল। তারপর যখন সত্যি আলো দেখলাম—আগুন জ্বলে উঠে সমস্ত ছাই নেড়ে যখন ধক্‌ধক্ করে জ্বালিয়ে দিলে; দেখলাম অরূপ সুন্দর কমলকে। তখন বুঝলাম, গোড়াও যা শেষও তাই—প্রেমই নারীর জীবন, দাসীরই অধিকার। সেদিন প্রথমে না বুঝেও প্রেম আমাকে মণির চরণে নত করেছিল, আজও না বুঝে সমস্ত মন্দের অহঙ্কার, আমাকে কমলের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, প্রেম পর্য্যন্ত, চাওয়া পর্য্যন্ত ঢেলে দিতে, তাকে গুরুরূপে নির্ভর কর্‌তে, নত করেছে। মণিকে মনের অজ্ঞাতে নয়—মনের জ্ঞাতে শুধু দেহ দান করেছিলাম, সে দেহ নিয়েছিল—সে মানুষ, সে মানুষের মত বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল; আর এ কমল হল দেবতা, সে আমার মোহন স্বপ্নভরা মাধুর্যে ডুবিয়ে, মনুষ্যত্ব মাড়িয়ে, রূপ ধুলোর মত হেলায় ফেলে দিয়ে, মহাদেবের মত চলে গেল। তার তেজে সব পুড়িয়ে ছাই উড়িয়ে দিয়ে গেল। দেহের ভোগে মানুষ তৃপ্তি পায় না, দেহের ভোগ নির্ব্বিকারচিত্তে ফেলে দিয়ে, সে আমায় দেবি বলে তার ছাঁচ আমার বুকে ছেপে দিয়ে গেল। যা দিয়ে গেল, আমার সর্ব্বস্বের আত্মসমর্পণের বদলে সে আমায় অঞ্জলিভরে প্রেমতৃষ্ণার নূতন শীতল বারি দিয়ে গেল। আর জনমে কখন তৃষ্ণা আস্‌বে না। তবু সে প্রথম দিন, মণি একদিনের জন্য শুধু আমার হয়েছিল—মণি সচ্চরিত্র, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, সে ভুল্‌তে পারিনি,—আমারও একবার একবার বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। তাই বল্‌ছিলাম, গোড়াও যা শেষও তা। বীজে ফুলের সবই থাকে, ফুটে ওঠে—যখন ঝড়ে শুখিয়ে ধুলায় লুটায়, তখনও সেই বীজই তার পরিণতি। সেবায় নারীর জন্ম, সেবায় সে শেষ মিলিয়ে যায়। আজ নারী জন্ম পেয়েও সে অধিকারটুকু আমার নেই। আমার দেহ অপবিত্র, আমার ভিতরে যে আর একজন আছে, সেত নয়—এ দেহ দিয়ে যদি মানুষের পুজো না হয়, তবে তাই

দিয়ে দেবতার পুজোও ত হবে না। তবে এ দেহকেই ফেল্‌তে—পতিতার জন্তে গঙ্গা শুখোয় নি—বেশ বয়ে যাচ্ছে। সে আমায় ফেল্‌বে না, যে মড়াকে বুকে করে নেয়, সে জ্যান্ত মড়াকে এল্‌বে না, তবে আর ভয় কিসের, নরকের? আত্মহত্যায় লোকের নরকই হয়। আমি ত অনেক দিন আত্মহত্যা করেছি। আমার মধ্যে যে নারী ছিল, সে ত অনেক দিন হত্যা হয়েছে। নরকভোগও করেছি। তবে আশা বা ভয় কিসের? জীবন্ত নরকের চেয়ে কল্পনার নরক বেশী ভয়ানক নয় বোধ হয়, আশা স্বর্গের—তা করি নি, তা চাইও না। কামনা জন্মজন্মান্তরে যেন এই নারীরূপই পাই, জন্মজন্মান্তর যেন কমলের দাসী হয়ে থাকি। মা গঙ্গা আমায় তাই দেবেন, আমার ওই শুধু এক কামনা।

যুঁই! যদি কখন তোদের মনে কোন আঘাত দিয়ে থাকি, যদি কখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তোদের মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি, আমায় ক্ষমা করিস্, আর হেনা তোদের হাটে ব্যাসাতি নিয়ে বস্‌বে না, সে হেনা মরেছে। হাটের এ বেচা-কেনা, বিকিকিনির পশরা সাজান দোকানপাট সব এইবার তুলে ফেলেছি। এখন বেশ— যে আমায় গড়েছিল, বেশ তার সাজান দোকানের পশরাখানাও বুঝি এবার ভাঙল,— ঘুচল সব। আর এ হাটে আস্‌ব না। ছিলাম কোন চাষার ঘরে, কোথা থেকে যে চাষার ঘরে এসেছিলাম, তা জানি নি—ছিলাম কোন চাষার ঘরে—কখন কে নিয়ে এল সহরে—সুখ খুঁজে খুঁজে দেখলাম, সুখের শেষ দুঃখ, আর দুঃখের শেষ সুখ। সুখ আছে দুখ আছে—দু'খানা চেলাকাঠের ভিতরে আগুন থাকে, ঘস্‌লেই জ্বলে উঠে। তারপর যার মধ্যে আগুন লুকান ছিল, সেইটাই পুড়ে যায়। মানুষের সঙ্গে যখন আমার বুকে বুকে সংঘর্ষণ হল, সুখ লুকান ছিল জ্বলে উঠল; কাঠ-খানা যেমন জ্বলে যায়, আমিও তেমনি জ্বলে গেলাম। পড়ে আছে ছাই—তবু মন বোঝে না—মনের এত খেলা!

একটা কেবল ভাবছিলাম, এই যে ফুললতা শুখনো পাতায় মুড়ে সাতরঙের মণি-হারির দোকান সাজিয়ে বসেছিলাম, এ দোকান গড়া কি আমার—না তাঁর! মনে হয়, এ দেহ এ পবিত্র দেহ, কলঙ্ক লেপে কে কাল কর্‌লে? সে কলঙ্কই বা কার সৃষ্টি? যে গাছের ফুলে ঠাকুর পুজো হয়, সেই গাছের ফুল তোর আমার মত নাগরীর সুখজ্বালা-ভরা অগ্নির নিশ্বাসে শুখায়েও ত যায়, ফুলের এ তফাৎ হয় কেন? যাক, চল্লুম—কোথায় তা জানি নি!

(সুধীর—কমল)

বাঃ ভায়া, বেশ ভাই, বাহা! বাহা! খুব, হেকমৎ,—"ইসক্‌কে শির পর লিয়া যো হো সো হো।"—এখন এঁরই প্রেম নিয়েছি মাথায় ক'রে, এই আমার

।পরীতের গোলাপসুন্দরী ঢলঢল! আমি ত মাথায় তুলে নিছি আমার প্রেমের পশরা—আমার পশরা কিন্তু ওই পিয়ালা। তোমাদের মত সুন্দরী অথবা হৃদ্ প্রতিমার ভঙ্গিমে আঁকা নয়নাফাঁদ নয়। আমার এখন সেরেফ পিয়ালার দেয়ালা। দূরে পাতার আড়ালে কাঁদে বুলবুল্—আমি মস্‌গুল হয়ে শুনি; গোলাপের বুকের কোমল সৌন্দর্য্যের স্পর্শে বুলবুল গায় না—কাঁটা ফুটলেই গায়—দুনিয়ার এমনি মজারই; তুমি জান না। ওই গোলাপ ছুঁড়ীও ত লাল সিরাঁজী পান করে লাল, ওই বুলবুলও সেই লালে লাল, আর পিয়াল্য সুন্দরীও লালে লাল—শুধু ভাবছ তোমরা যে আমিই বেহাল,—ভুল ভুল—"ইসক্‌কে শির পর লিয়া"—ঢাল ঢাল, লালে লাল। ওই ভোর হয়েছে—আকাশ লালে লাল, দেবদারুর মাথায় লালে লাল, ওই সব হো হো! ঢাল্ ঢাল্! আমিই সাকী, আমিই পিয়ালা, আমিই সিরাজী, আমিই লাল, হো হো, ভায়া—আঙুরের বুকখানাও লাল। অগণ্য তারকাহার-পরা সুন্দরী নিশীথিনী মুখে ঘোমটা টেনে সরে গেল। আকাশকে বললুম, ওহে অনন্ত, এত লাল কোথা পেলে, কিন্তু আমার প্রদীপটা নিয়ে গেলে, হো হো, ঢাল্ ঢাল্! ভাবছ খুব খেয়াল গাইছি, তা হবে; দুনিয়ায় একা এখন আমিই ওস্তাদ্। তোমায় আস্‌তে বললুম, তুমি এলে না; এলে বুঝতে—পাতা ঝরে, ফুল মরে, পিয়ালা ভাঙে, পিয়ালা গড়ে। এই আরক্ত ফেনিল বুদ্‌বুদের হাসি এইটুকুই সব। আকাশ বললে—চোখে কাপড় বেঁধে, শুধু ঢাল্। অন্ধ হ—অন্ধ হ।

তুমি এলে না কেন বাবা, হঠাৎ আবার আত্রেয় হয়ে গেলে নাকি। কেন বাবা ও বুড় মুণি-ঋষির উপর জুলুম! বৈদিক কবি, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ গৃৎসমদ প্রভৃতি বড় বড় মদ্দেরা মদ্যপান—থুড়ি—সোমরস যজ্ঞে আহুতি দিয়ে চুমুক দিতেন, অথবা পান করতেন বা...চাঁদমামা তখন ভয়েই মরত, কখন তাকে চোলায় চুঁইয়ে নেয়। এখন আর সে ভয় নেই—বা! বা! আজ কাল নিভন্ত আগুনের কবিরাও বুলবুল্,—সিরাজ থেকে সওদাগরের আনীত বুলবুলবস্তার বস্তা বস্তা মিহি আওয়াজ—জ্যোছনার রসে ভিজিয়ে পান করছে। আগে ছিল শাল তমাল পিয়াল, এক্ষণ ঠুন্‌ঠুন্ পিয়ালা—রসে ঢালা—মদের ছুধার বয়ে যায়, তোরা কুড়িয়ে নিবি আয়। সে কালে চাঁদের জোছনাজাল দিয়ে সোমরস তৈরী হত, এখন বিদ্যুতের রোশনিতে ভেজে আরাম করে সব ঋষিত্ব প্রমাণ করা যাচ্ছে! এখন সোমলতা 'লেও সাকি ত ভর পিয়ালা'—নাও ঠেলা।

বাঃ! বেশ তোফা, আল্লা দুর্গার ঠেলায় দেশটা এখন বেদের চোদ্দ পুরুষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। কালাপাহাড় পাথুরে দেবতার নাক কেটে, নিজে নাকেশ্বর হয়েছিল, এখন তোমার নাকগজাল কি? তুমিও ত পাথুরে দেবতা—না হয় গজল, ফারসী গজল গাও, তোমারও গজাবে। এখন সব ঘরে ঘরে কালাপাহাড়—দোষ কিন্তু ঝাটু ধরে

না। তা তোমার এখন রাজিষ্বি করবার সাধ, না পতিতোদ্ধার—ধর্ম্মের দিগ্বিজয়—কালা-পাহাড়ের পথে। দেখ ও সব ছেড়ে দাও, ধর ধর পিয়ালা ধর, হজরত সাকীকে ফাঁকি না দিতে পারলে মালিনীমাসির ফুলবাগানে হেনার গন্ধে ভরে যাবে।

বিবি-পাণ্ডবের বাবুর্চ্চির খানার কথাত শুনেছ মহাভারতে। এও সব এক মহাভারত—কাঁকড়া চচ্চরির ঠেলায় এখন হজরত মহম্মদ পর্য্যন্ত দুরন্ত। আরব দেশের খেজুর ছেড়ে মজুর হ'ল। দিবিা সারাসেনিক গম্বুজ বুরুজ গড়তে লাগল। যেই পেটে একটু আঙ্গুরের রস পড়ল, অমনি পিয়ারী জান, পিয়ারী জান করে—জান হাঃরাণ ক'রে বসল। এমন না হলে—হুঁ—দস্তুরমত সারাসিনিক মোগলাই খানা খেয়ে ময়ূরতক্তের স্বপন দেখতে লাগল। একে বলে ধর্ম্ম, জান না বুঝি,—বল্ আল্লা, নয় তোমার পাল্লা, নামিয়ে দিলে। কেবল ওই আঙ্গুর টুক্‌টুকে আঙ্গুরের রসে ভেজান ছিল বলে। বুঝলে সোনার চাঁদ! সেখানেও ওই পিয়ালা! সেই লালী আঁখি—পাখী ও সিরাজীতে ভোর। নীলকণ্ঠ আমার মত এ আঙ্গুরের রস পান করেন নি, তা হলে হিমালয় গুঁড় হয় যেত। মানস সরোবর উজাড় করে ফেলে—স্বরস্বতী পিয়ালা ধরত। এখন স্বরস্বতী বেদমন্ত্রগানে মউজ করেন না। নেশাখোরের মেয়ে আগে পদ্মে পা দিয়েই ছিল এখন আর সে পদ্মে পা রাখতে পারে না, বড় বেশী বরফ পড়েছে, পায়ে মখমল জড়িয়ে বোকা ছাগলের সাদা চামড়া পায়ে লপেট, পিয়ালার প্রাণ গরম করে নরম হ'য়ে আছে,—অগ্নিদেবতার রক্তময় প্রাণের কাহিনী ভরা সাকী আজ এখানে ফেনিয়ে ফাকি হ'য়ে, তাড়ি গাঁজিয়ে কচুপাতা ঢাকা দিচ্ছে। বাঃ বাঃ, এ তাড়ি যে আজকাল পান না করে সে বেবাক্ আহাম্মক, কি বল ভায়া, এঁ্যা! আমি ভায়া কিন্তু এই গোলাপসুন্দরীর পিরীতে মজগুল্, না—কি মউজ হয়ে আছি। ঢাল্ ঢাল্, ও আকাশ পাতাল খুঁজে কি হবে—বাবা! এই বেশ মোকাম ঠিক করে নেওয়া গেছে। তর্‌তর্ করে সব ব'য়ে চলেছে; আর পাশেই ওই মাটী ফেটে, টুক্‌টুকে লাল গোলাপ মণি—বাঃ বাঃ আবার ওই শোন হাড়িচাচা ডাক্‌ছে। বাঃ বাঃ কি মজা! কণ্টকে গোলাপ, আর কামিনী গাছের ঝোপে হাড়ি চাঁচা, হো! হো! কি মজার দুনিয়া! বাঃ কিছু না। ডুবাও—ডুবাও—স্বপ্ন সত্যি—সব ভুলে যাও। কে চায় কর্ম্ম, কে চায় তোমার ও জরিপের বুদ্ধি? ডুবাও—ডুবাও—অতল বিস্মৃতিতে ডুবাও! শুধু ঢাল্ ঢাল্। ঐ প্রভাতে তোমার কথা বলেচে। সৃষ্টির প্রভাতে ধুলো উড়েছিল, আজ তুমি গোলাপ দেখ্‌ছ। কাল চলেছে, যে ছাপ আঁকিতে ছিল, আজিও মাটী সে ছাপ ভুলতে পারে নি। হো! হো! তাই গোলাপ ফুটেছে—তাই—তাই ঢাল্—ঢাল্,—কে বলতে পারে ওই যেখানে গোলাপ দেখছ, তার তলায় তোমারও সেই হৃদ্‌প্রতিমার টুক্‌টুকে ঠোঁট দুখানি মাটীর সোহাগে মিশিয়ে নেই! পান কর বন্ধু—পান কর। যেখানে মাটীতে চুম্বন দেবে, মাটী ফেটে সেখানে গোলাপ

ফুটবে! জীবনের, প্রাণের পানপাত্রে এই সুরা ছাপিয়ে যাচ্ছে। পান কর—পান কর। যে ফুল ঝরে যায় সেই ফুলই আবার ফোটে, যে পাখী একবার গেয়েছে, সে আবার গেয়ে প্রাণ ভরিয়ে দেয় জীবনের পানপাত্রে যতক্ষণ সুরায় ভরা, ততক্ষণ চলেছে স্রোত; আমি তাই পানপাত্র ভরেছি, এস ভাগ দিতে প্রস্তুত। মিথ্যা—মিথ্যা, কেন খুঁজে মরবে; আছে কি নেই, কে তোমার ও সত্যির দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। দেখেছি দেখেছি! বন্ধু, তোলপাড় করে দেখেছি, ধুলো হতে চিরে চিরে দেখেছি, তৃণ হতে পাতায় পাতায় দেখেছি, গাছে গাছে, ফুলে ফলে, পাখীর গানে, জলের কলকলে, মৃদু মধুর বায়ুর হিল্লোলে ঘোর ঝঞ্ঝা দামিনীর কড়কড়ায় দেখেছি, কল-ধৌত তুষার কিরীট গিরিশিরে রবির প্রথম চুম্বন দেখেছি, চঞ্চল মহোর্ম্মি সাগরের মাঝে ডমরু বাজায়ে চন্দ্রের নৃত্য দেখেছি. তারায় তারায় জ্বলন্ত ভাষায় কি কথা যে কয় শুনেছি, দেখেছি, তারাও তাকিয়ে দেখেছে। ঘূর্ণমান মহাবিশ্ব ফুটে উঠছে, নিভে যাচ্ছে, আদিত্যাদি মহাসৌরপতি সব ঘুরে ঘুরে মরছে, সপ্তর্ষি অরুন্ধতীর হাত ধরে ধ্রুব ধ্রুব করে ঘুরে মরছে, শুধু ঘুরছে তাও দেখেছি। দেখেছি—বনে নদীজলে হরিণী নিজের মুখ নিজে দেখছে—সারঙ্গশব্দে মৃগপতি উদাস নয়নে বনে বনে সুর খুঁজে বেড়াচ্ছে; দেখেছি মৃগ আপন গন্ধে পাগল হয়ে সারা বনে নৃত্য করে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে; শুনেছি, মানবের অদ্ভুত আধ আধ কল ভাষা, দেখেছি যুবতীর আকর্ণবিশ্রুত পদ্মপলাশলোচনের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি, দেখেছি—মাতৃক্রোড়ে শিশুর স্তন্য-ক্ষীরধারা পান, দেখেছি—অন্ধকার ভীমা রজনীর করাল ছায়ায় রক্তলোলুপ ছুরিকা ছুটেছে। কিন্তু পাই নাই। কিন্তু তাকে—তাকে পাই নাই। সে ধূলো যে কে তা জানতে পারিনি। গ্রন্থে গ্রন্থে, শাস্ত্রে শাস্ত্রে, মন্দিরে মন্দিরে, মসজিদে মসজিদে, কাবায় কাবায়, মোল্লার দরগায়, পীরে ফকিরে, সন্ন্যাসে গৃহে, চিত্রে বিচিত্রে, সঙ্গীতে কাব্যে, রৌদ্রে ছায়ায়, বর্ষণে ফাল্গুনে, জীবনে মরণে ওই এক পাই নাই। ভাগ্যের দ্বারের চাবীকাটিটি পাই নি। তার পর দিনান্তের সন্ধ্যা তপন ঘুমায়ে পড়েছে, অন্ধকারে অন্ধকারে খুঁজতে দেখলাম। আমার প্রাণের পানপাত্র ভরা, উপছে পড়ে যাচ্ছে। বিস্মৃতি—বিস্মৃতির ওই এক ঔষধ এক পাত্র ভরা মদিরা। অন্ধকারে অন্ধকারে পাপিয়া মাথার উপরে ডাকতে ডাকতে হাঁ করে আকাশ পানে চাইলে, আপনার সুর আপনি আপনি খুঁজলে আপনার পান আপনি পাইলে; আপনার আনন্দে আপনি মজল গো—হো! হো! এই বিস্মৃতি—সুরা সুরা ঢাল্—ঢাল্—কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করে আমার প্রাণের গোলাপ ফুটেছে, কে জানে হয়ত সেই গোলাপ হয়ে ফুটেছে। ঢাল্ ঢাল্—ওই—ওরি মূলে ঢাল, পাত্র খালি করে মদিরা ঢাল্। এ অনন্ত বরুণের পানপাত্র ফুরোয় না—ফুরাবে না। ঢাল্ ঢাল্!

(ইন্দু—সুধীর)

হে আমার ইহ-পরকালের দেবতা! প্রথম ফুলশয্যার রাতে, তোমার জিজ্ঞাসায় উত্তর দিয়েছিলাম, তুমি! তুমি!—আজও তাই, আজ শেষ কথা তুমি! তুমি! তুমি তুমিই আছ, কিন্তু জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। এই কটা দিন উঃ কটা দিন! সূর্য্য ডুবেছে—এক দিনে সব বদল হয়েছে। বদল হ'ল—কেন এমন বদল হ'ল জানি না। কখন কোন কথা বলি নি, আজ সব বলা ফুরিয়ে এসেছে। কখন ডাকিনি, আজ শেষ ডাকতে হচ্ছে; প্রথম জীবনের ফুলশয্যার রাত আজ জীবনের এ শেষ প্রভাত। তিলে তিলে ফুরিয়ে এল। আজ একবার আসবে না কি? কখন তোমায় আমার বলে চাইনি, আমি যে তোমার, আমি তোমার কাছে বিদায় না পেলে—সেখানে কি ক'রে যাব? আমার কিছু নেই যা তোমার স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখে যাব, আমি কখন তোমায় মিষ্টি করে দুটো কথা কইতে পারি নি, এমন কিছু গড়তে পারিনি, যে তুমি একবার মুখটি তুলে চাইবে। যা তোমার দান তাও ত রাখতে পারি নি। কিছুই ত কর্‌তে পার্‌লুম না। মনের ভেতর যে আমার লুকান ঘর খানি ছিল, তার বন্ধ দুয়ারের চাবী, তোমার চাবিতে খুলে দিয়েছ। তোমাতেই সব হয়েছে নাথ! তুমি স্বর্গ আমি যে তোমার ইন্দিরা। এ স্বর্গ ছেড়ে ইন্দিরা তোমার কোন স্বর্গে যাবে—বলে যাও। হে গুরু, হে প্রভু, হে স্বামিন্! আমি শিষ্যা, যা শিখিয়েছ তাই শিখেছি, তুমি যা বলেছ, তাই বলেছি, তুমি যা ভাবিয়েছ তাই ভেবেছি; আজ বুঝি বলা কওয়ার সব হিসেব নিকেশ হবে, আসবে না কি? হিসাবত বুঝিয়ে দিতে হবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

"সঙ্গীতের মুক্তি" বনাম "বন্ধন"

অহুরুদ্ধ সার রবীন্দ্রের বনেদী বিনয় ও সৌজন্যের ভুরি বিকাশ, তাঁর "সঙ্গীতের মুক্তি"তে পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে উছলিত।

তিনি গুরুতর বিষয়টার আলোচনা কর্‌বার আগে একটু নিমকী রকমের ছলনা করে বলেছেন যে,—"দিশি এবং বিলাতি কোনো সঙ্গীতই আমি জানি না।"

আমার বোধ হয়, তিনি "বিলাতী" না হোক্ "দিশি" ত' জানেনই, অধিকন্তু আজ-কালকার চলিত হিসাবে বেশ ভাল রকমেই জানেন। তবে নওলা এবং গোলাম, তিনি ভোরপুর সুবিধা সত্ত্বেও, পাবার চেষ্টা করেন নি, শুধু এক্কোক-বিস্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে, ঘরে বসে বিস্তি খেলেই হেদিয়ে পড়েছেন।

সঙ্গীতের সম্পর্কে তাঁর খোলসা কৈফিয়ৎ, যেন ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ীর মধ্যবর্ত্তী পন্থায়, অর্থাৎ দালালী কসমে আসিয়া পড়িয়াছে।

বিজ্ঞানের মানে, যদি বিশেষ করে জানা হয়, তা'হলে নাড়ীনক্ষত্র জানাটা, অন্ধ-সংস্কার বলে চালিয়ে দিতে গেলে, আনাড়ীর পৈঠাতে নেমে বস্‌তে হবে বোধ হচ্ছে।

আনাড়ীর, মুখ এবং কলম, ফুটলেই ও চলিলেই, তার অক্ষমতার এবং অব্যব-সায়ীত্বের হিসাব বেড়িয়ে পড়ে। দালালের জানাটা দুতর্‌ফা; তবে "সখি আমায় ধর ধর" বলে ঢলে পড়লে ঘটোৎকচের মত এক কূল চেপে পড়তেই হবে। তথায় শ্যাম এবং কূল বজায় রাখতে গেলে, অকুল পাথার। আনাড়ীর মুখ চিরকাল চাপা থাকা উচিত, সে মুখে খৈ ফুটে উড়তে থাকলে গোবিন্দের পায়ে পৌছায় না।

আচার্য্য এবং ওস্তাদ বড় বেশী পাওয়া যায় না, সেটা ঠিক। অধিকাংশের সর্দ্দারী যেখানে, সেইখানেই বারোইয়ারীর হট্টোগোল। আবার সে গোলমাল থেমে যায়, যখন অধিকারী এসে আসরে দাঁড়ান। তবে সে অধিকারীর রকমফের আছে, যথা;—বংশগত, জাতিগত, সমাজগত, সমিতিগত, সম্প্রদায়গত, পরিষদ্‌গত ও রাষ্ট্রগত। কাল বা যুগধর্ম্ম তাকে মাথা পেতে মানবেই। সার রবীন্দ্র গানের রাজা, এতে কেউ গরমান্যি হবে না। তবে সঙ্গীতের কথায় উপর-পড়া হ'য়ে রাজামি করলে, সারের অসামান্য অসারত্ব প্রতিপন্ন হ'তে বড় বেশী দেরী হবে না।

গান সম্বন্ধে তিনি আনাড়ী ও সানাড়ী এ দুয়েরই পয়লা নম্বর প্রতিনিধি। সেখানে কুলান অকুলানের কথায় নিমকী বড্ড খাস্তা হয়ে পড়ে। কিন্তু যাদের রাস্তা বাঁধা

অর্থাৎ যারা সেয়ানা বা সানাড়ী, তাঁদের চিনে বাছাই করাই মুস্কিল। কাজের সময় বাঁধা রাস্তার মৌতাতিরা, যাঁদের এক ডাক বোঝবার পর বিশ্বাস করেন। আর একটা মহা ফ্যাঁসাদ হয়েছে ঐ আনাড়ী ও অসেয়ানাদের নিয়ে, তারা বিশ্বাসের পর বুঝে নেয়। এই বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও বোঝাবুঝির হিসাব-নিকাশ অন্তরঙ্গের মধ্যে বিগুমান।

কথাটা ঠিক, "কাঁটা বেরোন চন্দনা পড়ে না" বড় পোষও মানে না। তবে সব অপথের সীমা ক্রমে পথে এসে পড়ে। পথিকের যদি চেষ্টা থাকে, ঠেকে, দেখে ও শুনে—সে শিখবেই। অভিজ্ঞতা তাকে পথে তুলে না দিয়ে থাকৃতে পারে না। তখন সব অপরাধ মোকুফ হয়ে মনোহারিত্ব এসে পড়ে। আর শাস্ত্র, শাসনের সামিল হ'য়ে আপনি মিলে যায়। তবে সেটা বুঝে নিতে হবে। তার সাধনা চাই।

বড় দুঃখে তিনি বলেছেন, গীতিকলার রচয়িতা ও শ্রোতার মাঝখানে উপসর্গের মত সুবিধা ও অসুবিধার সমুদ্রমন্থন করেন যিনি, তাঁর নাম ওস্তাদ। তবে কথা হচ্ছে কি না, পুরোহিত প্রাণপণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, ডাক্তারও যথাসাধ্য ফার্মাকোপিয়ায় স াঁতার দেন, তবে বরাৎ ছাড়া পথ নাই। সত্ত্ব রজ তমঃ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর; Father, son and holy ghost; বাদী সম্বাদী ও বিবাদী ইত্যাদি। স্রষ্টা ও ভোক্তার মাঝে পরিবেশন যাঁর হাতে, তাঁর দয়া না হ'লে বা তাঁর ওস্তাদী তামিল না থাকলে, যিনি নিমন্ত্রণ করেন, তাঁর বদ্‌নাম ও যিনি নিমন্ত্রণে আসেন, তাঁরও তৃপ্তি হয় না। আবার ওস্তাদকে পুরোদস্তর খাতির না করলেও উপায় নেই, কেন না, শোনান ও শেখানর সেরেস্তা যে তাঁরই হাতে। শলাকষা যে গুরুর অধিকারে। চাকরীর চেষ্টায় গিয়ে, চাপরাসীকে সন্তুষ্ট না করলে যে বড় সাহেবের ঘরে যাবার উপায় নেই। অনুমতির চাবী যে দরওয়ানের হাতে, তর্ক সেখানে বাড়ালেই বাড়ে। শ্রীগুরু, চাপরাসী ও দরওয়ান, মনের মত মেলাই শক্ত।

ইউরোপের মোজার্ট, বিথোভেন, হ্যাণ্ডেল ইত্যাদির কথা মেকলের বাঙ্গালী বর্ণনার মত বলা যেতে পারে, কিন্তু তাঁদের প্রতিভার সীমানা বরাদ্দ সম্বন্ধে ও বাঁধাবাঁধি মাসোহারার কথা নির্দ্দেশ করা আমাদের পক্ষে শক্ত।

ইউরোপের গান, ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন। ভিন্নক্রেণীর স্ব স্ব প্রাধান্ত বর্ত্তমান। ভারতের গানের আভিজাত্য গৌরব, তার বংশ পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তার কৃতিত্বের ও কর্ত্তৃত্বের অধিকার অতি প্রশস্ত এবং অনধিকার প্রবেশের দণ্ড সালঙ্ক, সঙ্কীরণ ও মহা সঙ্কীরণ। শুদ্ধে পিতৃ পরিচয় অভ্রান্ত। আনন্দের অনাবিল ধারায় শ্রোতা অভিষিক্ত।

শক্তি ও শিক্ষার সামঞ্জস্ত ধরায় বিরল। জয়দেব, চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ, দাশরথী,

গোবিন্দ, নিধু ইত্যাদির জোড়া মিলিলে তুলনায় সমালোচনায় আরম্ভের অবকাশ পাওয়া যাইতে পারিত।

গীতিকাব্য ও গীতিকলা, এ দুইটিই লিখন ও প্রদর্শন সাপেক্ষ, দুইটিই ধাতব। দুইটিই জহুরীর লক্ষণের অপেক্ষা রাখে। দুই-ই সোণা, তবে স্থান ও পাত্রের বিভিন্নতায় খাদের মাত্রা বাড়ে কমে।

সব কাজেই মাঝের লোকের লাভের অংশ বেশী। ঈর্ষ্যায় দুর্ঘটনার তাণ্ডব, জগৎ-প্রসিদ্ধ।

মজলিস, মাহ্‌ফেল ও জল্‌সার সঙ্গীত এবং ঘরোয়া সঙ্গীতের পার্থক্য চিরকাল ছিল ও থাকিবে। একটি তাল-মান-লয়-বিশিষ্ট মৃদঙ্গ ও তবলা সহযাত্রী, অপরটি হারমোনিয়ম ও পিয়ানো বাদিত, মণ্ডিত, বালকলহাস্য মুখরিত, ক্রীড়াভিনয়। প্রথমটির অনেক স্থলে মল্লযুদ্ধে পরিণতি, শুধু আমাদের এ বাংলায় নয়, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। সে কেবল সহানুভূতির স্বাতীনক্ষত্রের জলের অভাবে। রসবোধ এখন অপাঙ্গ ঈক্ষণের ধাপে নামিয়া ক্ষীণ হইয়াছে বটে, তবে বলবতী হয় নাই, এখনও "কি খাইলে বাঁচে" হইয়া আছে ও প্রায় তদ্রূপই থাকিবে, যদি না তাহাকে সময় থাকিতে চ্যবনপ্রাশ ও মকরধ্বজ প্রয়োগ করা হয়। হতাশায় আলোচনায় অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। শ্লেষ-বিদ্রূপের কশাঘাতে মুমূর্ষু নাড়ীর ক্ষীণ স্পন্দনকে বলবতী করিবার কলা কৌশল প্রশংসার্হ নয়। বার্দ্ধক্যে বিস্মৃতির প্রবেশ অপরিহার্য্য। যৌবনের দেহমন সদাই সতেজ ও কর্ম্মক্ষম। পালোয়ানীর চেষ্টা খেয়ে চলা আপনিই আসে ও অঙ্গ সঞ্চালন জীবনীশক্তির মহিমা প্রকাশ করে, বৃদ্ধের বুক-চাপা চলন-বলনভঙ্গী, ভ্রূকুটীর ভ্রূভঙ্গীতে পার পায় না।

বুলবুল চিরকালই শীষ দেয় ও লড়াই করে। শ্রোতা ও দর্শক বরাবরই শুনিতে শুনিতে ও দেখিতে দেখিতে তৈয়ার হইয়া উঠে। এখন আমরা সংযম হারাইয়াছি, ধৈর্য্যও নষ্টপ্রায়। স্মৃতি যেখানে তাল সাম্‌লাইতে না পারে, সেখানে শ্রুতির দোহাই দেয়।

বাস্তবিকই অবস্থা এইরূপ—বাঙ্গলায় ও বাহিরে রাগ বলিতে গেলে "চণ্ডাল" বোঝায়, অর্থাৎ রাগ-চণ্ডাল। আমরা বাংলার পাত্‌কোর ব্যাং বড় বেশী দেখি না, শুনি না। শুনিবার সুযোগ ও দেখিবার সুবিধা বড় একটা ঘটিয়া উঠে না, অথবা না পড়িয়া পণ্ডিত ও না মরিয়া ভূত হইতে পারিলে থাকি ভাল, এবং পরের মুখে ঝাল খাইয়া লঙ্কার দর কষিয়া দেখিতে পারিলে নিজের অভিজ্ঞতাকে ধন্য ধন্য করাইয়া ছাড়ি ও থাকি। আর মতের সঙ্গে না মিলিলে (ক্রোধে মুক্তকচ্ছ হইয়া) রাগ দেখাই, ও মতের সঙ্গে মিলিলে মাথায় করিয়া রাখি ও আগুরন্ত বলি। প্রতিধ্বনির বাহবা দিয়া থাকি, এবং তরুগুল্মলতায় বিশ্বের হৃদয়ের আভা প্রতিফলিত দেখি।

ভোরের হাওয়ায় ঋতু হিসাবে ঋতু হরিতকীর ব্যবস্থা করি, নৈলে যে রসের আধিক্য হেতু বাতিকের জ্বরে ভুগিতে হইবে। ভোরের হাওয়ায় ভৈরব রাগের কল্পনা কেন হ'ল? তার কারণ দেখ্‌তে গেলে, তার গ্রহ, অংশ, স্বাসের হিসেব বুঝ্‌লেই অনির্ব্বচনীয়ত্বের তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হ'য়ে যায়, আর পদ্মের উপর গান বাঁধ্‌তে গেলে, ভাবের বহিন ভাষা সেখানে নাকানি-চোবানি খায় না। হৃদি-সরোসিজের কচি পাতা প্রস্ফুটিত হ'য়ে যায়, তখন ঐ ভোরের হাওয়ায় ভোরাই রাগের রসে পাতা কেঁপে ওঠে, তানের উপর তানের ধাক্কায় পাতা দুলে ওঠে, হাওয়ার উপর সুর ভাস্‌তে থাকে, তখন মন-ভোম্‌রা গুণগুণিয়ে সুরের ঝঙ্কার তুলে ওঙ্কার আওড়ায় এবং যারা শোনে, তারা জগৎ ভুলে যায়। রসের আধিক্য হ'লেই নূতন নূতন তানের সৃষ্টি হয়। রূপের অনির্ব্বচনীয়তায় তখন অনাসৃষ্টি ঘটে। তখন সীমাবদ্ধ আধারে অসীমের দশ কলসীতে কিছু আসে যায় না।

জগতে যখন যে অবতারের আবশ্যক হ'য়েছে, শ্রীভগবান্ তখনই সেইরূপে দেখা দিয়াছেন। সেইরূপ আমাদের সঙ্গীত-জগতে যখন যে রাগ-রাগিণীর অনাটন পড়েছে, তখন সেই অভাব পূরণ হ'য়েছে। অভাব পূরণ হ'তে হ'তে রাগরাগিণীরও অনন্ত সৃষ্টি হ'য়ে গেছে। তারপর, অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী তানসেনের কৃপায় কতক কাটছাঁট করে, একটি বন্দেজ বাঁধা হ'য়ে গেছে। তারা এখন অনাদি, অক্ষয়, অব্যয় ও অচ্যুতের দলে মিশে গেছে। তবে আকরে টান্‌লে ভাগ বাঁটোয়ারায় বিভিন্নতা হয়। কোনো ব্যাপারই তার পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রভাবকে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারে না।

এক ভোরের কথা নিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যায়, যতই ভোর থেকে সকাল বেলার দিকে এগিয়ে এসেছে, রাগরাগিণীও ক্রমে হিমের ঘোমটা ও অবসাদের জড়তা কাটিয়ে বেশ সপ্রতিভ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, সাত সুরের ঠাট সাজান ও রাগাদির হিসাবে যেমন বাদী, সম্বাদী ও অনুবাদীর থাকবন্দী পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ সকালের, দুপুরের, বৈকালের, সন্ধ্যার ও প্রথম হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত যে সব শুদ্ধ এবং সালঙ্ক রাগরাগিণী সাজান হ'য়েছে, তার মধ্যে আশ্চর্য্য রকম বাদী, সম্বাদী, বিবাদী রাগের ও রাগিণীর কেয়ারী বোঝা যায়। কোথাও আজ-কালকার ভাষার মত ও থিয়েটারের রাগরাগিণীর মত গুরুচণ্ডালী ভাব দেখা যায় না। থিয়েটারের রাগরাগিণী এখন বাগ বাগিনী।

বিদ্যাসুন্দরের যাত্রার মত রসের ও ভাবের স্বেচ্ছাচারের গুরুচণ্ডালী সত্ত্বেও শুধু রাগ-রাগিণীর ও নৃত্যের সাজোন-গোজনে মনে একটু অম্লমধুর চাট্‌নীর মত আস্বাদ পাওয়া যায়। না হ'লে বিদ্যা ও মালিনী যে এক ছাঁচে গড়া, এ বুঝ্‌তে বোধ হয়

সকলেই পারে। আবার আজকাল প্রতি থিয়েটারে দু-চারটে ক'রে মালিনী তৈয়ার করে রাখা হ'য়েছে, এ বোধ হয় ঐ বিদ্যাসুন্দরের যাত্রার প্রভাব। কি কুক্ষণে বা অক্ষণে যে মালিনী আসরে নেমেছিল, তা বোঝা যায় না। বা এখন যারা বুঝ্‌তে পারে তারা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছে। এক একটি রস ও ভাবের তারতম্য হিসাবে পাগ্‌ড়ী থেকে জুতা পর্য্যন্ত সব যেন স্থানকালপাত্র ভেদে অদল বদল হ'য়ে গেছে।

কোন ভরাট ও ভাল জিনিষকে তুচ্ছ করে কুচ্ছ শোনা ও গাওয়া দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে কেউ বেমালুম বরদাস্ত কর্‌তে পারে না। তা কর্‌তে গেলেই নিজের দীনতাটা সাম্‌লাতে না পেরে, ছন্নছাড়া হ'য়ে পড়ে। তখন ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী বেজায় খাপ-ছাড়া হ'য়ে পড়ে। ফলে, মনের কথা বলবার যা কিছু সরঞ্জাম, সব বিছিন্ন হ'য়ে যায়। মাটী বেশী জলে মিশে কাদা হ'য়ে যায়, আঁট বাঁধে না, সুতরাং মূর্ত্তি আর গড়া হ'য়ে ওঠে না বড় একটা।

রামায়ণ, মহাভারত যখন গাওয়া হয়, তখন যেখানে যে ভাব আছে, তারই অনু-রূপ সুরে সে আপনিই একটা না একটা রাগরাগিণীর নক্‌সা, সুরের মুখে এসে পড়ে। আবার বেদগানও নানা ছন্দে, নানা সুরে, নানা তালে গাওয়া হয়। সেখানে নীরবে আত্মার আত্মগত নিবেদন নয়। যেখানে গীতিকাব্য, সেইখানেই সুরের ঘোম্‌টার ভিতর রাগিণীর নৃত্য।

হিন্দি গানের কথা, নেহাৎ যা খুসী তাই বলা যেন চোরের উপর রাগ করা হ'ল।

রণ-সঙ্গীতের ব্যবহার ভারতের সাবেক আমলে যে একেবারে ছিল না, তা বড় গলা ক'রে বলা চ'ল না। যদি এক কুরুক্ষেত্রের শাঁকের হিসেব ধরা যায়, তা হ'লে মিলিটারী ব্যাণ্ড যে কি রকমে গঠন হয়েছিল, তার একটু আভাস পাওয়া যেতে পারে। এক পাঞ্চজন্যতেই শত্রুর বুকের রক্ত যে জল হ'য়ে যেত, তার কথা লেখা আছে। সে বিশ্বাস যদি নাও আসে, তা হ'লে নাচার। তবে যদি জয়ঢাক থেকে তুরী, ভেরী, দামামা, দগড়া, কাড়া, নাকাড়া ইত্যাদিকে ধরা যায়, তা হ'লে বলিদানের সময় নেহাৎ কম হাড়-হিম হয় না। আবার আমাদের সঙ্গীতটা যদি ভূমার সুর হয়, তা হ'লে তার গাম্ভীর্য্য যে সঙ্কীর্ণ উত্তেজনা নষ্ট করে দিয়ে বৈরাগ্য ও শান্তি আন্‌তে পারে, সেটা বলিদানের চেয়ে অল্প ক্ষমতার কথা নয়। তা ব'লে রাগিণীর ভিতর হাস্যরসের হেকমৎকে ছেঁটে ফেলা যায় না; অনেক সুর আছে, যা কথার সঙ্গে প্যাঁচ লেগে হাসির লহর তুলে দেয়। তবে হাসি নানা রকম আছে :—অট্ট, ছোট্ট, খাট্ট ইত্যাদি।

সময় ফিরেছে বলেই আজ-কালকার গান আমাদের নজরে যেন ছাঁদ ও ছিরি ফিরিয়ে যাদের সুরের হালকা ঢং, তাদের ছাওয়া এসে পড়েছে। বিলাতী মদের

মত বিলাতী সুর ক্ষণিক উত্তেজনা দেয় বটে, তবে আমাদের প্রাণে দাগ বসাতে পারে না।

দিশী ও বিলাতীর ছিরি ও ছাঁদ, সঙ্গীত কেন, সকল জিনিসেই ঐ তফাৎ ঘটেছে শ্রুতি নিয়ে। ঐ যে মিড়ের ভিতর নাড়ীর সংযোগ, ঐখানেই মারাত্মক ব্যাধির অবস্থান। শ্রুতি তুলে নাও, নাড়ীর সংযোগ ধ্বংস হবেই। তবে ঐখানেই কন্‌সার্টের গতের পরিহাসমুখর অট্টহাসি এবং যারা ঐ দঙ্গলে কন্‌সার্টের স্রষ্টা, তাদের সঙ্গীত, কোন্ পর্য্যায় অধিষ্ঠিত তা স্বতঃই প্রমাণ। নির্ব্বিকার গাম্ভীর্য্যে আমাদের রাগরাগিণী যেখানে অটল হয়ে বিরাজমান, সেখানে দূর থেকে সেলাম বাজিয়ে যারা সরে পড়ে, তাদের বোধ হয় পাপোষের এধারে ঘরের বাইরে থাকাই বিধেয়।

কুলীনের মর্য্যাদা এখনও এই বিলাতী সুরদাসী অনুকরণ প্লাবিত দেশেও বর্ত্তমান। তবে নাম বের ক'ত্তে হলে, সঙ্কতভঙ্গের সাহসের কথা প্রসিদ্ধি লাভ করে বটে, সোজা এক পুরুষের বেশী নয়। তার পর আর বড় মর্য্যাদা থাকে না। তবে স্বর্গের পারিজাতকে যদি পাল্‌তে মাদারের পাশে বসাও, তাহলে দৈত্যের উৎপাতে উদ্‌বাস্ত হতে হবে ও উৎখাত হ'য়ে পড়তে হবে। সব ব্যাপারের স্বকৃতভঙ্গের নামটা থেকে যায়। তার পরই সব আলাদা-গোহালে ঠাঁই পায়।

মহাদেব, নারদ ও ভরত এরা যে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে যান নি যে, তাঁদের উৎকর্ষই চূড়ান্ত, তা হলে পরবর্ত্তীদের সৃষ্টি কি ফেলা যাবে? এতই সৃজন হয়ে গেছে যে, তার পর আর কিছু বাড়াতে গেলে আমাদের বিদ্যায় কুলায় না, বটে, তবে আগেকার একটা না একটায় মিলে যায়। সুতরাং আর বাড়াতে যাওয়া নেহাৎ ধাষ্টাম। রাগে, রঙ্গে, ছন্দে, গানে যাতেই দেখ।

পাহাড়ী, ঝিঁঝিট ও জয়জয়ন্তী, সুরট ইত্যাদির কাঁদুনে ঠোস কীর্ত্তনে চালিয়ে যে সাত্ত্বিক মোহনভোগ তৈয়ার হয়েছে, সেটা আমাদের কোমলতাময় হিন্দু প্রাণের করুণ বিবৃতির স্রেফ্ নিজস্ব, তায় আর ভুল নেই। তবে কলাবতের গান যে ভেসে গেল না, তার সাক্ষী আজও পর্য্যন্ত "কালোয়াতী" গান যে টিকিয়া আছে, ইহাতেই প্রমাণ হয়। মধুর মোহনভোগের পর দরবেশী লাড়ু এখনও চল্‌ছে।

মহাদেব ও নারদের পর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য দেবের কাছে বহু বহু শাস্ত্রীর পরাভব ঘটেছিল, সে তোড়ে বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি আড়ি পেতেছিল, তার হিসাব বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্রন্থের কলেবরে পৈ পৈ করে বলে গেছে। কোন ভাল জিনিস কখনও এক দম অবজ্ঞেয় হয়নি। বুঝবার ভুলে আমরা আম্‌তা—মজিলপুর করি বটে, তবে সম্যক্ বোঝবার ক্ষমতা নেই, অথবা আমাদের বুদ্ধির চাষে মই দেওয়া নয় বলে, না বোঝালে বুঝ্‌তে পারি না, এই ত ব্যবস্থা।

একে আমাদের আল্‌সে চোখ, তার উপর চাল্‌সে কাটাবার জন্ত বিদিশী পরকোলা চোখে দিয়ে আত্মার তৃপ্তির জন্ত আত্মপ্রকাশের চেষ্টা ক'চ্ছি, সব দিকে, কি অধিকারের আর কি অনধিকারের পদার্থে।

পৌরাণিক বেড়ার ও পারে যে দিন যাব, সে দিন আমাদের আত্মার অস্তিত্ব আর থাকবে না। জাতের জীবনের ছেলেবেলার সত্য পথ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন হয়, তখন যে বয়সের যে দর্শক বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে, ঠিক আঁচতে পারে না, কোনখানটা কি রকমে কেটে গেছে! আমাদের সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে সব কটা কলার কাঁদি কেটে নাবাবার পর, থোড় পর্য্যন্ত যখন ব্যবহার হ'য়ে-ব'য়ে যাবে, তখনও আমাদের সঙ্গীত-বিজ্ঞান চর্চ্চা বিনে যে মর্চ্চে পড়েছে, তা কেটে পালিসের জলুস ফুটে উঠ্‌বেই। বিশ্বযাত্রার ভরাট আসরে মোকামের মুখ ধ'রে, সম থেকে সম তেহাই বেঁধে ন-ধা মারবেই। তার তাল কখনও কাট্‌বে না, কেন না, ও যে বাঁধা হিসেব পড়ে আছে। বুঝ্‌তে পারা হয়েছে।

বাংলায় দিনকতক হয় ত চর্চ্চা কমে ছিল, হারমোনিয়াম ও ক্লারিনেটের আমলে, কিন্তু যখন দেশ প্রাচীন ও পূর্ব্বের ভাস্কর্য্যের টুকরো খুঁজে বার কর্ত্তে আরম্ভ করেছে, তখন আশা করা যায় নাকি যে, এক দিন কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইবে।

কুঁড়ে ঘর ও বাউলের গান যে পাড়ায় বর্ত্তমান, সেখানে কর্ত্তাভজার কদর বিদ্যমান, প্রাচীন স্থাপত্যের আদর সেখানে নাই, সেটা ঠিক, কেন না, তা বুঝতে হ'লে জ্যামিতি ত্রিকোণমিতির বিদ্যা আবশ্যক নয় কি?

ভারতের ভারতীয় রাজা বাদ্‌সার আমলে সঙ্গীতের পূজা ছিল বলে, তখন বৈজু, গোপাল, তানসেন জন্মে গেছেন। আবার সেই রকম আদর পেলে ওঁদেরই দ্বিতীয় সংস্করণ দেখা যাবে।

প্রাণের যোগ ও মনের ভোগের মাঝে, না পোড়ে পণ্ডিতির বিচ্ছিরী বিয়োগ এসে পড়ে, সবখানে খারাপ করে দিয়েছে কি না, তাই আদরের গোপালের সে নাদুস-নুদুস গড়ন আর বড় চোখে পড়ে না। জীবনের গতি ও মতি ইচ্ছে করে বেখাপ করলে, স্থাবর অস্থাবর আদর্শের বিচ্ছেদ ঘট্‌বেই। সচল অচলে চাপা দিতে গেলে, ঠোকাঠুকি অবশ্যম্ভাবী। অচলের বিরাট কলেবর সচলের এক রত্তি ওড়নায় ঢাকা পড়ে কি? আদর আছে বলেই আদরের কদর বোঝা যায়।

খোপ এবং খাপের মধ্যেই কপোত ও তরবারির সংকুলান গৃহ এ চিরাচরিত প্রথা; তবে যখন কপোত আকাশে ওড়ে ও তরবারি যুদ্ধে যায়, তখন অনন্ত ও অসীম তাহাদের পন্থা, স্বাধীনতার বৃহত্তর অভিনয়—সেখানে যুগান্তব্যাপী।

সুর যেখানে গানের কথায় অঙ্গে গা ঢালিয়া দেয়, সেখানে ছন্দের খোপে খাপে, লয় ও তালের মধ্যে তানের গেরোবাজ উল্‌টে পাল্‌টে ডিগবাজী খাবেই। তখন খোপ এবং খাপের মধ্যেই তাকে থাক্‌তে হবে, যে পিছনে পড়ে বা হোঁচট্‌ খায়, তার ভাগ্যে "হুও"। তবে যখন আলাপচারি চলে, অনন্ত তার পন্থা ও অসীম তার গতি। কলার অস্থাবর আদর্শের যোগ সেখানে বিচ্ছেদ বাড়ায়। একটু অন্যমনস্ক হ'লেই সন্ধি বিচ্ছেদ।

রতি থাকলেই মতি আসে এবং তার পর গতি যখন সুরু হয়, পরাগতিতেই পৌঁছাতে বড় বেশী দেরী হয় না। নীতি সেখানে ব্যাকরণের মত গড়ে ওঠে। ঠোকা-ঠুকি হ'লে সচল অচলকে হঠাতে পার্‌বে না,—হঠে যাবে।

সরস্বতী যখন দেহী, তখন সীমার শিকলী নিজে গড়ে নিজে পরে বসে আছেন। তাঁর মনের বেগ বীণের মধ্যেই ইণ্টারণড। সরেস বা মাঝারী তখন সবাই তাঁর প্রজা। ভূমার বুকে ধরে দমা যায় না, সৃষ্টি সেখানে শাসনের এক্তারের মধ্যে মানিয়ে জুনিয়ে বসে, রং বদলায় না বা নীরস হয় না।

সাহিত্যের লক্ষ্মীমন্তেরা যখন কোঠা-বালাখানা, গাড়ী, জুড়ী বাগান বাগিচের অধিকারী, তখন তাঁদের সাহিত্যের চরম সিদ্ধি—গানবাঁধা রূপ মন্দির প্রতিষ্ঠায়; তবে যাঁরা যোত্রসম্পন্ন, তাঁদের দেবোত্তর সম্পত্তির বন্দোবস্ত বেশ গোছাল রকমের।

সুরের সঙ্গে ছন্দ বেঁধে গান বেঁধেছ কি মরেছ। রাগরাগিণীর কাৎলামারার মাঠে পৌঁছাতে হবেই, সাঁকোর নীচে খাঁচা এবং বাসা এড়িয়ে যাবার যোটি নেই। নিখাদ যেমন সুরকে টানে, সেই রকম দড়িছেঁড়া ব্যাপার; কিছুতেই আট্‌কাবার উপায় নেই।

সব জাতেরই গান বাঁধনেওয়ালার মনে সুরগুলি এক একটি দল বেঁধে ধাক্কা মারে। রস-পাগলা রচয়িতা যখন ঐ সব দলকে যথাস্থানে সমাবেশ করেন, তখন তানের বাঁটোয়ারা যেন আপনি গড়ে উঠে ঠাটে ভিড়ে যায়।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমাদের রাগ-রাগিণীর এমন মনোমদ মধুর মজা যে, চার পাঁচ সুরের তানের মধ্যে তার আদ্‌রা পাওয়া যায়। জাতিত্ব, ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ঠিক যেন বাড়ীগাঁথার মত, মসলা ঢেলে ইট সাজিয়ে দেওয়াল তোলার মত রাগ-রাগিণীর রূপের ছাঁচে ভরাট হয়ে ওঠে। তবে কেউ বা চুণ-সুরকী, কেউ বা সিমেণ্ট বালি আর কেউ বা কয়লায় খেস দিয়ে গাঁথনী করেন, যার যেমন সাধ্য ও পছন্দ। কালাকাঁদ বরফির তাগাড়ে বা ডিম চা বিসকুটের সাহায্যে তাকে গেঁথে তোল্‌বার উপায় নেই। উপকরণের একটা সামঞ্জস্য না রেখে স্বাধীনতার নৈপুণ্য খুঁজতে গেলেই, পাঠশালের পোড়দের মত 'মু ছে ফেলো' বল্‌তেই হবে ও হাত ময়লা এবং কাপড় নোংরা হবেই।

ভারতের রাগরাগিণীগুলি সবই রসের দানা বাঁধা টুক্‌রো, গানের ভাষা নয়। গানের ভাবের সঙ্গে রসের মিলনের ফল, অখণ্ড সৌন্দর্য্যের শক্তি-সমন্বয়। রস-মাধুর্য্যের নিত্যলীলা।

বাউল ও কীর্ত্তনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, তারা যেন ঠিক মহা সঙ্কীর্ণ জাতি গড়ে উঠেছে, বর্ণ-সঙ্করত্ব প্রমাণের জন্যই। বৈঠকীর হুক্কার দিকে মুলো বাড়াবার সময় ধাক্কা খেয়ে যেন বলে ওঠে, "আমার কিছু আপত্তি নেই।" ওরা যেন আমাদের দেশের বিলাতী সুর। তবে বাউল ও কীর্ত্তনের বনিয়াদ একটু পাকা বলিয়া পৈতা গাছটা ছোট।

বেণ রাজার উপদ্রবে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হলেও, তারা এখনও দেবতা পূজার অধিকার পায় নি এবং সুদূর অতীতের যাগযজ্ঞের বখ্‌রাদার তারা ছিল না ও এখনও তাই আছে। আইনের আমলে তখনও ছিল, এখনও আছে।

তবে কথা হ'চ্ছে এই যে, যে সব সুর আসল সাধকভক্তের অন্তরের ঐকান্তিকী ভক্তির উৎস থেকে গড়ে ওঠে, তার মধ্যে ইষ্ট দেবতার দয়া এমনভাবে ওতঃপ্রোত আছে যে, তাকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যে সালঙ্ক ছাড়া আর কোন ধাপে নামে নি। কোম্পানীর টাঁকশাল থেকে মেকি টাকা বেরোয় না, তবে খাদের কমবেশী হ'তে পারে।

উপমায় প্রতাপসিংহ, প্রতাপ আদিত্য বা তাঁত্তিয়া ভীল হও কিংবা রামমোহন রায়, কেশব সেনই হও, তয়ফাওয়ারী গেয়েছ কি ডুবেছ। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের পুষ্যিপুত্তুর হলেও নয়।

নবধা কুল লক্ষণ যে বলেছে, তার মানে আছে, তাই ত কুলীন বলে। এখন যেন কুক্রিয়ায় লীন না হ'লে কুলীন বলে না।

Europeএ principle melodyর গায়ে যে সব অলঙ্কার দিয়ে ওরা সাজিয়েছে, তাকে Harmony বলে। ওদের সঙ্গীতে Stacatto and pizzicalo প্রবল। মেড়, গমক, মূর্চ্ছনা হীন, সুতরাং স্বরসন্ধিটা অনেক চেষ্টায় মানিয়েছে। এখন সেটা হিসাবের ভেতর মিলে যাচ্ছে ও ওদের কানে বসে গেছে। ওটা যে আমাদের সঙ্গীতে চল্‌বে না, তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে "দুর্গা-আল্লা" বলে কখনও কারও মুক্তি হয় নি। স্মরণাতীত কালের ওধারে নয়, এধারে অস্ত্রচিকিৎসাটা ভারতের দেহতত্ত্বের গান বাঁধার মত চলিত ছিল। দেহ ঢাকবার অধিকরণ যেমন পরের মুখ চেয়ে থাক্‌তে হত না, সেইরূপ কোন জিনিসের জন্য ভারত কখনও কারো মুখাপেক্ষী হয় নি। বড় বেশীদিনের কথা নয়, বিলাতী কাপড় প্রথম আমদানীর সময় ৺রামগোপাল ঘোষ অলিগলিতে, প্রতিপল্লীতে, প্রতিগ্রামে, নগরে নগরে ডেকে হেঁকে বলেছিলেন যে,

"খপরদার, হুসিয়ার, বিলাতী কাপড় কেউ ছুঁয়ো না, ছুঁয়েছ কি গোল্লায় গেছ।" এখন বুঝতে পাচ্ছ কি ব্রাদার?

ধর্ম্মের সংস্কারকেরা যখন কোন জীবের বা জাতির দুঃখে সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছেন, তখনই ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধৃত করে তার দোহাই দিয়ে বাঁধন বেঁধেছেন। বেশী দিনের কথা নয়, ৺বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ-সংস্কারের আলোচনা কল্লে বুঝতে পারা যায়। ধর্ম্মের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কোন সংস্কারক করেন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, স্বাধীন মুক্তির নাম প্রলয় বা খণ্ডপ্রলয়।

ভারতের সঙ্গীত-শাস্ত্র যে আট-ঘাট বেঁধে দিয়ে গেছেন, তা থেকে মুক্তি লাভ করতে গেলেই বিপ্লব বাধবে। অবশেষে মুক্তি রূপান্তরিত হ'য়ে আবর্জ্জনায় গড়িয়ে পড়বে।

পৃথিবীর এধারেই হোক্ কি ওধারেই হোক্, মৌলিক সঙ্গীত যাকে ওরা বলে Homophonic বা one part music or union music of the ancients সেটা এখনও ভারতে, চীনে ও আরবে আর তুরস্কে এখনও চলিত আছে। তারপর polyphonic of the middle ages, with several part; 10th centuryতে Flemish monk Huebaldএর চেষ্টায় সুর মধ্যমে বা পঞ্চমে গলা মিলিয়ে আর মাঝে মাঝে ওদের অষ্টকের সুর দিয়ে জোর করবার জন্ম গান গাওয়া হত, সেটা সহ্য হ'ল না। France আর Flanders এ 11th centuryতে part musicএর চলন হয়। তারা consonanceএ নজর রেখে disonance বাদ দিতো। Dance musicএর ছন্দ সহজবশে তাতে part করা সহজ হয়েছিল। অনেক part এ মধুরত্ব এসে পড়েছিল। 12th centuryতে Netherlands এর composersরা ভজনের সময় যে যার মনের মত সুরের আওয়াজ থেকে Cameonic Imitationএর উন্নতি করেন।

Bach ও Handelএর সময় (1529) Dauce থেকে যন্ত্র সঙ্গীতে part সুরু হয়।

Giacomo Peri single partএর উদ্ভাবন করেন, তারপর Viadanaর Bass যোগ হয়। (16th century) কিন্তু F to F useless for harmonic purposes বলে ছেড়ে দেয়।

সম্বাদীতে যে chords উৎপন্ন হয়, তা আমাদের সঙ্গীতে সম্বাদীর জোড়ে বিভিন্ন রূপে দেখান হয়।

Europe এ 15h century পর্য্যন্ত chord, সুর পঞ্চমে আবদ্ধ ছিল তারপর গান্ধারটা যোগ হয়। তখন Pope Pius. IV. (1559—1565) এর হুকুমে Council of Trent এ এটার চলন হয়। তারপর 17th centuryতে operaর সুর থেকে

harmonic music সুরু হয়। মাঝে part music উঠে যায় আবার Claude Goudimihর ছাত্র Palestrina, (যে Massacre of Lyons এ কাটা পড়ে,) সে খুব উপকার করেছিল, তারই চেষ্টায় part music ত্যাগ করা বন্ধ হয়। (A. D. 1524-1594)

Monier Williams সাহেব বলেন আড় কুয়াড় সংযুক্ত হিন্দু সঙ্গীত লেখা অসম্ভব বলে Europe এ চালান যেতে পারে না।

N. Agustus Williard সাহেবও একটু ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে বলেছেন, যে তাদের হিসেবের অনেক তফাৎ Europe ও Asiaতে তাই একরূপ মুস্কিল হ'ল ওখানে।

Germanyতে John Carmen সাহেব যে new system of notations বের করেছেন তাতেও খাপ খেলে না।

একজন খুব উচ্চদরের সমজদার ছিলেন Fetis সাহেব তিনি বলেছেন:— "There is nothing in the West which has not come from the East.

আমার বোধ হয় ভারতের প্রাচীন সংহিতাকারেরা, অর্থাৎ সোমেশ্বর, সারঙ্গদেব শিহ্লন, সিংহ ভূপাল ইত্যাদি মহা মহা পণ্ডিতদের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ, রত্নাকর, নারায়ণ, চিন্তামণি, কলাধর কৌস্তুভ, রাগবিবোধ, রাগসর্ব্বস্ব সার ও আধুনিক পারিজাত ইত্যাদি, Harmonyর চলনের কথা কিছু না কিছু বলে যেতেন কিন্তু তাঁরা একথা মোটেই উল্লেখ করেন নি।

ভারত সঙ্গীতের ছত্র, দণ্ড, ধ্বজা, আশা সোটা ইত্যাদি বরাবরই ভাগ করে দেওয়া আছে। রাজা সিংহাসনের উপরেই বসেন তাঁকে মাথায় করে কখনই বইতে হয় নি ও হবে না। তান কর্ত্তবে হারমনি যোগ হলে একটা বিরাট সংস্কার হবে বটে, তবে তোড়ী ও মূলতানের ঠাট ঠিক রেখে হারমনি চালাতে গেলে, শ্যাম ও কুল রাখা রাধার পক্ষে মুস্কিল হবে, তখন রাধার মুখে শ্যামের বাঁশী ও শ্যামের মাথায় রাধার ওড়নার ঘোমটা ঝুলে পড়বে না কি?

তালের যুদ্ধে উভয়ের উৎকর্ষই বাড়ে বই কমে না। সব রকম যুদ্ধতো বন্ধ হয়েছে, থাক্‌না কেন, ঐ তালের যুদ্ধ একটুখানি। তবে বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। এখনও তা হচ্ছে বটে তবে আগেকার মত নয়, কেননা সে রকম লড়িয়ের দুর্ভিক্ষ হয়ে পড়েছে।

সঙ্গীতকে শাস্ত্রবিধির অধীনতা থেকে মুক্তি দিলে, তাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলা হবে। তার পর আর মনের মত করে গড়া হবে না। তবে যারা সঙ্গীতের নাগা ফকির

তাঁদের কথা আলাদা, তাঁরা যে সঙ্গীত সংসারের বাইরেকার লোক। সকল বাঁধাবাধির অতীত। নিজের শ্রাদ্ধ যাঁরা নিজে করেন, তাঁদের কথা জুদো।

তবে একটা কথা আছে, ভারতসঙ্গীতকে hybrid করে তুল্‌তে যদি হয়, তাহ'লে তাদের আলাদা গোহালে স্থান দিলেই ভাল হয়।

আমরা বড় আশায় বসেছিলেম, এবারের মাঘোৎসবে, স্যার রবীন্দ্র তাঁর বাঁধা গানের মূর্ত্তিকে কি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে কোন পরিচ্ছদে লোক চক্ষুর গোচরে এনে হাজির করেন, মুক্তি দেন তাই দেখ্‌তে। কিন্তু—

শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ।

চোর

(১)

বিষ্ণু হাজরার ছেলে কেষ্ট হাজরাকে লোকে বোকারাম বলিয়া জানিত।

বাপ বিষ্ণুচরণ যখন মারা যায়, তখন কেষ্টধনের বয়স আঠার বৎসর। মা যে কবে মারা গিয়াছিল, তাহা সে জানে না, বাপকেই সে মা-বাপ দুই বলিয়া জানিত এবং উভয়ের নিকট প্রাপ্য স্নেহযত্ন একজনের নিকটেই আদায় করিয়া লইত। মা বলিয়া কেহ না থাকিলে যে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এ ধারণাটা তাহার আদৌ ছিল না।

বাপও অনেক কষ্টে মা-মরা ছেলেটিকে মানুষ করিয়াছিল, পাঠশালায় দিয়া একটু লিখিতে পড়িতেও শিখাইয়া ছিল। তারপর একটি লক্ষ্মীমন্ত বৌ ঘরে আনিয়া ভাঙ্গা সংসারে নূতন হাট পত্তন করিবার অভিপ্রায়ে মেয়ে খুঁজিতে লাগিল। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর পাড়ারই নকুড় পালের মেয়ে সুবাসিনীকে পছন্দ হইল। মেয়েটি দেখিতে শুনিতে যেমন, তেমনই শান্ত শিষ্ট। নকুড় পাল দুই শত টাকা পণ এবং তিনখান সোণার ও পাঁচখান রূপার গহনা চাহিয়া বসিল। অনেক দর কষাকষির পরে পণের পঁচিশ টাকা কমিল, গহনা আটখানই বজায় রহিল। বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া গেল।

মাঘ মাসে বিবাহ। পৌষের শেষে বিষ্ণুচরণ গুড় নারিকেল দিয়া পৌষ-পার্ব্বণের তত্ত্ব করিল। সেই সঙ্গে রূপার একখানা জিনিষ মল এবং সোণার মুড়কি মাদুলি দিল। কিন্তু রঘুনাথপুরে গুড় কিনিতে গিয়া বিষ্ণুচরণ সেই যে জর লইয়া আসিল, সে জ্বর আর ছাড়িল না। সাত দিনের দিন ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিষ্ণুচরণ পরলোক যাত্রা করিল।

কেষ্ট বাপকে হারাইয়া সংসার শূন্য দেখিল। বাপের দাহকার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া সেই যে শুইল, তিন দিন তিন রাত্রি আর উঠিল না। শেষে পাঁচ জনের উপদেশে ও সান্ত্বনায় উঠিয়া পিতার পারলৌকিক সদ্গতির ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিল।

পুরোহিত আসিয়া উপদেশ দিলেন, "বাপু, বিষ্ণুচরণ একটা লোকের মত লোক ছিল। এখন তার পরলোকে যাতে সদ্গতি হয়, তাই কর। তোমার মত উপযুক্ত

ছেলে রেখে গিয়ে সে যে পরলোকে হা হা করে বেড়াবে, সেটা কি ভাল দেখায়? আহা, বেচারা তোমার মুখ চেয়েই আর বিয়ে পর্য্যন্ত কর্‌লে না।"

বাবা পরলোকে হা হা করিয়া বেড়াইবেন? যিনি বুকের রক্ত দিয়া তাহাকে আঠার বৎসরের করিয়া গিয়াছেন, ছেলের জন্য সকল কষ্ট, সব দুঃখ মাথা পাড়িয়া লইয়াছেন, সেই স্নেহময় পিতা ইহলোকের পরপারে গিয়াও একটু শান্তি পাইবেন না? কেষ্টধনের বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন, কি কর্‌লে পরলোকে বাবা সুখে থাকেন।"

পুরোহিত বৃষোৎসর্গ করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু পাঁচজন বলিল, "সে অনেক টাকার ফের। তার চেয়ে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ আর একটা ভাল রকম ষোড়শ করুক।"

পাঁচ জনের কথাই স্থির হইল। তখন স্বজাতিরা বলিল, "কেষ্টধন, বাপকে তো ফিরে পাবে না। এখন পাঁচ কুটুম্বের পায়ের ধুলো নিয়ে তাকে উদ্ধার করে দাও। কুটুম্ব নারায়ণ।"

বিষ্ণুচরণ ছেলের বিবাহের জন্য কতক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, কতক এ হাত ও হাত করিয়া জমাইয়াছিল। কেষ্টধন বাক্স খুলিয়া দেখিল, দুই শত দশ টাকা মজুত আছে। সুতরাং সে পিতার স্বর্গ কামনায় পাঁচ জনের উপদেশমত কাজ করিতে ইতস্ততঃ করিল না। যে যথাবিধি পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিল। ব্রাহ্মণ ও কুটুম্বগণ পাকা ফলারে পরিতৃপ্ত হইয়া সুদীর্ঘ উদ্গারের সহিত কেষ্টধনের পিতৃভক্তি ও তদীয় পিতার স্বর্গলাভের অবশ্যম্ভাবিতা নির্দ্দেশ করিতে করিতে যখন প্রস্থান করিলেন, তখন কেষ্টধন বাক্স খুলিয়া দেখিল, তাহাতে আর পাঁচ টাকা সাত আনা মাত্র মজুত আছে।

ভাবী শ্বশুর নকুড় পালকেই মাথা হইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। কার্য্য শেষে তিনি হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া পথে বুক ফুলাইয়া বলিলেন, "বাপু হে, আমি ব'লেই দুশো টাকার কাজ সেরেছি। আর কেউ হ'লে তিনশো টাকার এক পয়সা কমে এ ব্যাপার সম্পন্ন হ'তো না। তার অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা নিজের পকেটে ফেলিত।"

কেষ্টধন ভাবী শ্বশুরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

কিন্তু শ্রাদ্ধান্তে কেষ্টধন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। বামুন পিসি আসিয়া বলিলেন, "বাবা কেষ্টধন, তোমার বিয়ের তরে বিষ্টুদাদা আমার কাছ থেকে শুধু হাতে দশগণ্ডা টাকা এনেছিল! বিষ্টুদাদাকে তো অবিশ্বাস ছিল না, এমন কতবার নিয়েছে, দিয়েছে। তা বাবা, এই অনাথা বামুনের মেয়ের টাকাগুলির কি হবে? আমার অনেক কষ্টের টাকা।

কেষ্টধন বলিল, 'না বামুন পিসী, আমি যেমন ক'রে পারি, তোমার টাকা ফেলে দেব।"

বামুন পিসী সহর্ষে বলিলেন, "তাই তো বলি, কেষ্টধন কি তেমন ছেলে। বাপের কাজে আঁজলাভরা টাকা খরচ কর্‌লে, আর বাপকে কি ঋণপাপে জড়িয়ে রাখবে ?"

শুধু বামুন পিসী নয়, ক্রমে ঘোষ গিন্নী, গয়লা-বৌ, রামু সেকরার মা প্রভৃতি একে একে আসিয়া কেহ পাঁচ গণ্ডা, কেহ আট গণ্ডা, কেহ সাড়ে এগার গণ্ডা টাকার তাগাদা আরম্ভ করিল। কেষ্টধন হিসাব করিয়া দেখিল, মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় দেড় শত টাকা। এত টাকা যে কি উপায়ে পরিশোধ করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। ভাবী শ্বশুরকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল, শ্বশুর পরামর্শ দিলেন, "এখন লেখাপড়া কিছু নাই, তখনও সব দেনা দেনাই নয়। এখন ধানগুলো বেচে জমি-জায়গাগুলো বাঁধা ছাঁদা দিয়ে বিয়েটা ক'রে ফেল। আমি ত আর দু'বছর মেয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব না।"

কেষ্টধন ধান বেচিল; তিন বিঘা জমি ছিল, এক শত টাকায় বাঁধা দিল। কিন্তু সে টাকায় সে বিবাহ করিল না, পিতাকে ঋণমুক্ত করিয়া দিল। নকুড় পাল রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। তিনি কেষ্টধনকে ডাকিয়া বলিলেন, "হয় বাপের বাৎসরিক দিয়ে বোশেখ মাসের ভিতর বিয়ে কর, নয় পাঁচ জনের কাছে জবাব দাও, আমি দোসরা চেষ্টা দেখি।"

কেষ্টধন দেখিল, জবাব দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। দুই শত টাকা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, বাঁধা রাখিয়া ধার করিবার মত কোন সম্পত্তিও নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে পাঁচ জন স্বজাতির সম্মুখে জবাব দিয়া আসিল। পাল মহাশয় পাকা-দেখার সময় পণ বাবদ চল্লিশ টাকা অগ্রিম লইয়াছিলেন; তিনি বলিলেন, "টাকা আমি খরচ ক'রে ফেলেছি। অন্যত্র পণের টাকা পেলে ফেলে দেব। কেষ্টধন তাহাতেই সম্মত হইল। গহনা দুই খানের কথার উত্থাপনা আর হইল না।

বৈশাখের শেষেই পাল মহাশয় মেয়ের বিবাহ দিলেন। কিন্তু কেষ্টধন টাকা ফেরত পাইল না। সে কোন উচ্চবাচ্যও করিল না, শুধু বিবাহের রাত্রে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিল।

কেষ্টধনকে অতঃপর উদরান্নের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে বাজারে বৃন্দাবন সাহার গোলদারী দোকানে আট টাকা মাহিনায় বেচা-কেনার চাকরী পাইল। চাকরী কিন্তু বেশী দিন টিকিল না। সাহা মহাশয় যে দিন খরিদ্দার-

বিশেষে দুই প্রকার বাটখারার ব্যবহারের জন্য তাহাকে উপদেশ দিল, তখন সতেরো দিনের মাহিনা চুকাইয়া লইয়া চলিয়া আসিল। লোকে—বিশেষতঃ পাল মহাশয় তাহার নির্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং এরূপ বোকারামের হস্তে কন্যা সম্প্রদান না করিয়া যে বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন, ইহাই জ্ঞাপন করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন।

অনেকে কেষ্টধনকে পুনরায় চাকরীর চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিল। কেষ্টধনের কিন্তু আর চাকরি করিতে প্রবৃত্তি ছিল না। ঘরে একটা গাই ছিল। গাইটা বেচিয়া সেই টাকায় মালা, ঘুন্‌সী, চুড়ী, চিরুণী কিনিয়া মণিহারী জিনিসের ফেরী করিতে আরম্ভ করিল।

কেষ্টধন সকালে উঠিয়া ঘরে চাবী দিয়া ফেরী করিতে বাহির হইত। ফিরিতে কোন দিন অপরাহ্ণ, কোন দিন বা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। ঘরে ফিরিয়া রাঁধিয়া খাইয়া শুইয়া পড়িত। পাড়ার বা গ্রামের লোকের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। তথাপি তাহার নামে পাড়ায় পাড়ায় যথেষ্ট আন্দোলন হইত এবং এইরূপে নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য তাহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিত।

(২)

হাট হইতে ফিরিয়া কেষ্টধন রান্না চাপাইয়াছিল। শীতের সন্ধ্যাটা যেমন স্তব্ধ তেমনই অবসাদময় হইয়াছিল। আকাশ থমথমে মেঘে ভরা; উত্তরে বাতাস নৈরাশ্যের গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত হুহু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। কেষ্টধন ভাতের হাঁড়িতে চাল দিয়া উনানের পাশে বসিয়া তামাক টানিতেছিল। আর গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছিল,—

"পার কর পার কর ব'লে ডাক্‌ছি বারে বারে।
মাঝি বেলা গেল সন্ধ্যে হলো যাব দেশান্তরে।
পার কর পার কর ব'লে—"

"কেষ্ট দাদা।"

গান বন্ধ করিয়া কেষ্টধন তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "কে সুবা?"

সুবা ওরফে সুবাসিনী উত্তর দিল, "হাঁ, তুমি কি রান্না চাপিয়েছ কেষ্টদাদা?"

কেষ্ট বলিল, "হাঁ, কেন রে?"

সুবা ঈষৎ কাতর অথচ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "একবার আমাদের বাড়ী যাবে?"

কেষ্ট। কেন?

সুবা। আমার ভায়ের বজ্ঞ ব্যামো!

কেষ্ট হুঁকাটা ফেলিয়া উঠিয়া আসিল; ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কার? ফকিরের?"

সুবা। হাঁ।

কেষ্ট। কি হয়েছে?

সুবা। দুপুরের পর হ'তে ভেদবমি হ'চ্ছে। বাবাও আজ বাড়ী নেই।

কেষ্ট ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "বলিস্ কি, চল্, চল্।"

সুবা বলিল, "তোমার রান্না?"

ধমক দিয়া কেষ্ট বলিল, "চুলোয় যাক্ রান্না। চল্।"

সুবাকে পিছনে ফেলিয়া কেষ্ট ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সুবার মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা রে, আমার ফকির বুঝি ফাঁকি দেয়।"

কেষ্ট তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। গ্রামে ডাক্তার ছিল না; প্রায় এক ক্রোশ দূরে রায়পুরে একজন ভাল ডাক্তার আছে। কেষ্টর গায়ের কাপড় খানা লইবারও অবকাশ হইল না; কোচার খুঁট গায়ে দিয়াই অন্ধকার মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। তখন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কেষ্ট সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ডাক্তারের বাড়ীতে পৌঁছিল।

ডাক্তার কিন্তু এমন দুর্য্যোগে বাহির হইতে সম্মত হইলেন না। কেষ্ট অনেক কাঁদাকাটা এবং দশ টাকা ভিজিট স্বীকার করিয়া তাঁহাকে রাজী করাইল। তখন ডাক্তার তাহার মাথায় ঔষধের বাক্স এবং হাতে হারিকেনের আলো দিয়া গায়ে গরম কাপড় চাপাইয়া বাহির হইলেন।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিলেন, ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহাকে বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিবার জন্ত কেষ্টধন আট আনা স্বীকার করিয়া একজন লোক ঠিক করিয়া দিল। কিন্তু ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের দাম দিবার সময় বড় গোল বাধিল। সুবার মা বলিল, "কি হবে বাবা কেষ্ট, বাক্সের চাবী যে কর্ত্তার কাছে?"

কেষ্টধন বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সুবার মা নাকের নথ, কাণের পাশা খুলিয়া দিয়া বলিল, "এই দু'টো কোথাও রেখে ডাক্তারের টাকা মিটিয়ে দাও।"

কিন্তু সে রাত্রে কে জিনিষ রাখিয়া টাকা দিবে? কেষ্টধন সাল গস্ত করিতে যাইবার জন্ত ষোলটি টাকা রাখিয়া দিয়াছিল। তাহা হইতেই বারটি টাকা আনিয়া ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের দাম মিটাইয়া দিল। ডাক্তার চলিয়া গেলেন, কেষ্টধন রোগীর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সুবা একবার বলিল, "তোমার খাওয়া হ'লো না, কেষ্ট দাদা?"

কেষ্ট সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "শীগ্‌গীর একটু আগুন কর্ দেখি, সেঁক দিতে হবে।"

কেষ্টধন অনেক চেষ্টা করিল, রোগী কিন্তু বাঁচিল না। ভোরের সময় তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল।

পাল মহাশয় যখন বাড়ীতে ফিরিলেন, তখন দাহকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে খানিকটা হা-হুতাশ করিলেন এবং জাগতিক যাবতীয় ঘটনাই কর্ম্মফল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। তারপর চিকিৎসাদির কথা শুনিয়া আক্ষেপসহকারে বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়, এ সব ব্যারামেও কি মানুষ বাঁচে? হতভাগা না-হোক্ কতকগুলা টাকা বরবাদ ক'রে দিলে। ও হতভাগা ছোঁড়াকে ডাক্‌লে কে?"

(৩)

"হাঁ কেষ্ট দাদা?"

"কেন সুবা?"

"ক'দিন ঘরে ব'সে আছ যে?"

কেষ্টধন মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "ঘরে? হাঁ ঘরে ব'সে আছি। বেরুনো হচ্চে না।"

সুবা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি, কেন বেরুচ্চ না।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কেষ্ট বলিল, "বেরুচ্চি না, শরীরটাও ভাল নয়, মাল-পত্রও আন্‌তে হবে।"

সু। আন্‌তে হবে তা আন্‌চো না কেন?

কে। আন্‌বো বই কি, আন্‌তেই হবে, তারই যোগাড়ে আছি।

সু। কিসের জোগাড়? টাকার?

কেষ্ট সে কথার কোন উত্তর দিল না। উনানটা তখন নিবিয়া গিয়াছিল, উপুড় হইয়া উনানে ফুঁ দিতে লাগিল। অনেকগুলা ফুৎকারেও উনান জ্বলিল না, শুধু কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতে লাগিল। ধোঁয়ায় কেষ্টর চোখদুটো লাল হইয়া উঠিল, দুই চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। সুবা অগ্রসর হইয়া ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "চল, আমি দেখছি, এ সব কি বেটাছেলের কাজ!"

কেষ্ট সরিয়া আসিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে লাগিল। সুবা উনানের ভিতর-কার ঘুঁটেগুলাকে বাহির করিয়া পুনরায় ভাল করিয়া সাজাইয়া দিল। তারপর

দুই তিনটা ফুৎকার দিতেই জ্বলিয়া উঠিল। সুবা গর্ব্বপ্রফুল্লদৃষ্টিতে কেষ্টধনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ্‌লে ?"

কেষ্ট মৃদু হাসিল। তখনও তাহার চোখের জল শুখায় নাই।

কেষ্ট পুনরায় গিয়া উনানের পাশে বসিল; সুবা একটু সরিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, যে কথা বল্‌ছিলাম, তা টাকার যোগাড় হ'য়েছে ?"

কেষ্টধন উত্তর করিল, "না।"

সু। কত টাকা যোগাড় কর্‌তে হবে ?

কে। গোটা পনের ষোল।

সু। তা আমাদের কাছে তো বার টাকা পাবে ?

কেষ্ট হাঁড়ীতে তেল ও লঙ্কা দিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সুবা নিজের কাপড়ের ভিতর হইতে এক ছড়া মুড়কী মাদুলী বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল। কেষ্ট হাতে হাঁড়ীর কাণাটা ধরিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুবা বলিল, "ও কি, হাঁড়ীর তেলটা যে জ্বলে গেল। ওতে কি দেবে দাও না।"

কেষ্ট তাড়াতাড়ি আলু বেগুনগুলা তাহাতে ফেলিয়া দিল। সুবা বলিল, "ও মা, বেগুনগুলো এখন দিলে কেন ? ওগুলো যে সিদ্ধ হবে না।"

কেষ্ট নিরুত্তরে খুন্তি দিয়া সেগুলা নাড়িতে চাড়িতে লাগিল। সুবা বলিল, "তুমি বুঝি এই রকম ক'রে রেঁধে খাও কেষ্ট দাদা ? খাও কি ক'রে ?"

কেষ্ট একটু ম্লান হাসি হাসিল। সুবা তখন মুড়কী মাদুলীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিল, "এইটা বাঁধা দিয়ে বা বেচে টাকার যোগাড় ক'রো।"

কেষ্ট বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "এটা বেচে ? কেন সুবা ?"

সুবা বলিল, "কেন কি, এটা তো তোমাদেরি, কেন দিয়েছিলে মনে পড়ে না ?"

মনে খুবই ছিল। আজ আবার সে কথাটা নূতন করিয়া মনে হওয়ায় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বুকের কাছে ঠেলিয়া উঠিল। কেষ্ট সেটাকে বুকে চাপিয়া রাখিয়া হাত ধুইল এবং মাদুলীছড়াটা লইয়া সুবার পায়ের কাছে রাখিয়া দিল। সুবা জিজ্ঞাসা করিল, "কি কেষ্ট দাদা ?"

কেষ্ট মুখ নীচু করিয়া বলিল, "তুই নিয়ে যা সুবা !"

সুবা তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি নেবে না ?"

কেষ্ট বলিল, "ও তোকে দেওয়া হ'য়েছে।"

সুবা বলিল, "বেশ তো এখন আমিই আবার ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

কেষ্ট বলিল, "ছিঃ !"

কেষ্ট হাঁড়ীতে বাটনা গুলিয়া ঢালিয়া দিল। সুবা কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর গহনাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "নেবে না?"

কেষ্ট বলিল, "তুই নিয়ে যা।"

সুবা উঠানে নামিতে নামিতে ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "নেব না তো ফেলে দেব? কিন্তু এই পর্য্যন্ত কেষ্ট দাদা, যে রকমে পারি, তোমার বারোটা টাকা যদি ফেলে না দিই—"

কেষ্ট ডাকিল, "শোন্ সুবা।"

সুবা দাঁড়াইল। কেষ্ট হাত পাতিয়া বলিল, "দে।"

সুবা তাহার হাতে মুড়কী-মাদুলী দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কেষ্ট তাহা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া পুনরায় রন্ধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সেই দিন কেষ্টধন বৃন্দাবন সাহার হাতচিঠায় সহি দিয়া ষোল টাকা কর্জ্জ লইয়া এবং পরদিন মাল গস্ত করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করিল।

(৪)

বছর দুই হইতে পাল মহাশয় জগন্নাথ গাঙ্গুলীর গাঁজা ও আফিমের দোকানটা উচ্চ ডাকে ডাকিয়া লইয়া চালাইয়া আসিতেছিলেন। হিসাব নিকাশে পাল মহাশয়ের তেমন দক্ষতা ছিল না। ইনস্পেক্টর তদারকে আসিয়া কয়েকবার খাতার ভুল শুধরাইয়া দিয়া গেলেন। কিন্তু সেবারে ভুল শোধরান লইয়া ইনস্পেক্টরের সহিত পাল মহাশয়ের একটু বচসা হইল। ইহার ফলে শীঘ্রই কলেক্টরী আফিস হইতে খাতা তলব হইল।

পাল মহাশয় খাতাপত্র লইয়া কৃষ্ণনগরের কলেক্টরী কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। কলেক্টর সাহেব খাতায় কাটকুট দেখিয়া তাঁহার ২০৲ টাকা অর্থদণ্ডের হুকুম দিলেন। টাকাটা সেই দিনই জমা দিতে হইবে, নতুবা হাজতবাস অনিবার্য্য। পাল মহাশয় টাকা সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

পাল মহাশয় টাকার জন্য যখন উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন সহসা একটা দোকান হইতে কেষ্ট তাঁহাকে ডাকিল। কেষ্টকে দেখিয়া তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "কে, কেষ্টধন? এখানে কেন বাবা?"

কেষ্ট বলিল, "মাল কিনতে এসেছি।"

পাল মহাশয় অকূলে কূল দেখিতে পাইলেন। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাল কেনা হ'য়েছে কি?"

কেষ্ট বলিল, "না, এই দেখা শোনা হচ্ছে।"

পাল মহাশয় সহর্ষে বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে, আজ আর মাল কিনে কাজ

নাই বাবা, টাকা ক'টা আমায় দাও। আমি বাড়ী পৌঁছেই টাকা দেব, কাল তখন মাল নিয়ে যাবে।"

কেষ্ট একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পাল মহাশয় তখন তাহাকে আপনার বিপদের কথা জানাইলেন এবং অকূলের কাণ্ডারী ভগবানই এ সময়ে তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, ইহাও উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। কেষ্ট কিন্তু পাল মহাশয়কে কতকটা চিনিয়াছিল, সুতরাং সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন পাল মহাশয় তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা কেষ্টধন, আমাকে রক্ষা কর বাবা, আমার মান ইজ্জত সব যায়। আমি বাড়ী পৌঁছে ঘরের ঘটী-বাটী বেচেও যদি তোর টাকা ফেলে না দিই, তবে আমি মুচির সন্তান!"

কেষ্ট পেটের কাপড় হইতে একখানা দশটাকার নোট এবং আটটি টাকা খুলিয়া পাল মহাশয়ের হাতে দিল। পাল মহাশয় তাহাকে ধন্যবাদ দিবার অবসর পাইলেন না, টাকা লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে কাছারীর দিকে ছুটিলেন। কেষ্ট এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া জল খাইয়া ঘরে ফিরিল।

পরদিন কেষ্ট টাকাটা চাহিতে গেলে পাল মহাশয় বলিলেন, "এই সারাটা দিন তোমার টাকার চেষ্টাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছি বাবা, তা কোথাও কিছু হ'লো না। লোকে চিৎহস্ত করলে সহজে কি উপুড় হাত করতে চায়? কালের দোষ! গণশা মাঝি সোমবারে দেবে বলেছে, পাওয়া গেলেই তোমাকে দিয়ে আস্‌ব, তাগাদা করতে হবে না।"

তারপর তিনি গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা বড় ভাল ছেলে, সে দিন আমার বিপদের কথা শুনে তাড়াতাড়ি টাকা বার করে দিলে। বল্‌লে, তা পাল মাশয়, আপনার বিপদ যা, আমার বিপদও তা। আহা বড় ভাল ছেলে, বেঁচে থাক্‌, তবু বিষ্টুচরণের নামটা থাকবে।"

পাল মহাশয় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কপাল! তা নৈলে আজ কি কেষ্ট আমাদের অপর পর হ'য়ে থাকতো! মেয়েটারও বরাত। কোথায় আজ সুখে ঘর-ঘরকন্না করবে, তা নয় বিধবা হ'য়ে আমার ঘাড়ে এসে পড়লো।

সশব্দে আর একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাল মহাশয় গামছার খুঁটে শুষ্ক চক্ষুটা একবার মুছিলেন। কেষ্ট আপ্যায়িত ও হতভম্ব হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলেও, কেষ্ট বুঝিল, পাল মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট সোমবার দুই চারি মাসেও আসিবে কি না সন্দেহ। এ দিকে ঘরে মাল নাই, ব্যবসা বন্ধ। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কেষ্ট শেষে বাক্স হইতে মুড়কি মাদুলীছড়াটি বাহির করিল, এবং তাহা চৈতন্য পোদ্দারের দোকানে পনরো টাকায় বাঁধা দিয়া মাল গস্ত করিতে গেল।

(৫)

মাল গস্ত করিয়া কেষ্ট যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্ধকার দাবার উপর মোটটা নামাইয়া কেষ্ট সবেমাত্র ঘরের চাবী খুলিতেছে, এমন সময় চৈতন্ত পোদ্দার লাঠি ধরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "কেষ্ট, কেষ্ট বাড়ীতে?"

কেষ্ট চাবী ঘুরাইতে ঘুরাইতে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "কে, পোদ্দার মশাই?"

পোদ্দার রূক্ষস্বরে বলিল, "হাঁ, আজ সমস্ত দিনে তোমার বাড়ী তিনবার এসেছি। বাপু, আমাদের বিশ্বাস নিয়ে কাজ কারবার। তুমি বিষ্টুচরণের ছেলে, কিন্তু তোমার এই কাজ?"

কেষ্ট আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "কেন পোদ্দার মশাই, আমি করেছি কি?"

পোদ্দার চড়া-গলায় বলিল, "কি করেছ? চুরী, জুচ্চুরী, দমবাজী, যা কিছু সবই করেছ। বাপু, দমবাজীর কি আর জায়গা পেলে না? আমার কাছে চোরাই মাল বাঁধা রাখতে গিয়েছ?"

কেষ্ট সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "চোরাই মাল!"

পোদ্দার বলিল, "আস্ত চোরাই মাল। বলি, মুড়কি মাকুলীটা কার? এতক্ষণ যে আমার হাতে দড়ি পড়্‌তো। শুধু পাল মশায় ভাল লোক বলেই আমাকে রেয়াৎ করেছেন। এখন পুলিশ ডেকে যদি তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া যায়, তা হইলে কি হয় বল দেখি?"

কেষ্ট ভীত-স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় পাল মহাশয় এবং গ্রামের পঞ্চায়েৎ তমিজউদ্দীন মুন্সী বাড়ীতে ঢুকিলেন। পোদ্দার বলিল, "এই যে পাল মশায়, এই নিন আপনার আসামী, এখন আমাকে রেহাই দেন।"

মুন্সীসাহেব কেষ্টর দিকে চাহিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হাঁ হে কেষ্ট, ভদ্দর লোকের ছেলে তুমি, তোমার এই কাজ?"

কেষ্ট নীরব, নিস্পন্দ। মুন্সী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গয়না তুমি পোদ্দারের দোকানে বাঁধা দিয়েছ?"

কেষ্ট উত্তর দিল, "হাঁ।"

মু। এ কার গয়না? তোমার?

কে। না।

মু। তুমি পেলে কোথায়?

কেষ্ট নিরুত্তর। মুন্সী সাহেব আরও দুই তিনবার প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি তাহাকে পুলিশে দিবার ভয় দেখাইলেন। পাল মহাশয় মাঝ হইতে বলিলেন, "যেতে দিন মুন্সী সাহেব, পাবে আর কোথায়, চুরি

করেছে, সেটা কি আর নিজমুখে বলতে পারে। যাক্, এবারকার মত ছেড়ে দিন, ছোঁড়াটা জন্মের মত দাগী হ'য়ে যাবে।"

মুন্সী সাহেব তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তখন পাল মহাশয় কেষ্টকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "হাঁ হে কেষ্ট, তোমার এমন স্বভাব হ'লো কেন? ভাল ছেলে ব'লে ঘরে দোরে যেতে দিই; ছি ছি, তোমার এই কাজ।"

কেষ্ট কোন উত্তর দিল না, একটুও নড়িল না, শক্ত কাঠের মত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পোদ্দার বলিল, "আপনার জিনিষ তো আপনি পেলেন, এখন আমার টাকা?"

পাল মহাশয় সদম্ভে বলিলেন, "আপনার টাকা যাবে কোথায়? ওর ঘর ভিটে বেচে আদায় ক'রে দেব। ছোঁড়া দেশ শুদ্ধ লোকের কাছে ধার ক'রেছে, বুঝলেন মুন্সী সাহেব! সাহাদের দোকানে কত টাকা, আরও কার কার আছে—"

মুন্সী সাহেব বলিলেন, "অভাবে স্বভাব নষ্ট। কিন্তু পাল মশায়, বারাদগর এমনতর হ'লে আমি ছেড়ে দেব না তা ব'লে রাখছি।"

(৬)

খানিক পরে সুবা আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "কেষ্টদাদা!"

কেষ্ট তখন ঘরে আলো জালিয়া তামাক সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছে। সে চমকিত হইয়া উত্তর দিল, "কে, সুবা?"

সুবা বলিল, "হাঁ, আমি। তুমি শেষে চোর হ'লে?"

কেষ্ট সহাস্যে উত্তর দিল, "হ'লাম বা!"

সুবা বলিল, "আমার নাম কল্লে না কেন?"

কেষ্ট বলিল, "মনে ছিল না।"

সু। তোমার তো আচ্ছা মন দেখছি।

কে। আচ্ছা ব'লে আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, এখন তুই ঘরে যা দেখি।

সু। কেন?

কে। একবার তো চুরী ফ্যাসাদে ফেলেছিলি, আবার কি ডাকাতীর মামলায় পড়বো। রাত হ'য়েছে, ঘরে যা।

সুবা কথাটার মর্ম্ম বুঝিল, বুঝিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে শুনিল, কেষ্ট আপন মনে গাহিতেছে,—

"পার করো পার করো ব'লে ডাক্‌চি বারে বারে।
(মাঝি) বেলা গেলো সন্ধ্যে হ'লো যাবো দেশান্তরে॥"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পূজ্যপাদ কবি স্যর শ্রীরবীন্দ্রনাথ

কবির অভিপ্রেত বর্ণবৃত্ত ছন্দানুপাতে গান করা অপেক্ষা পরম্পরাগত স্বরের মাত্রাবৃত্তানুযায়ী গান করিলে গানের রূপশ্রী যে আশাতীতভাবে উছলিয়া পড়ে একথা বোধ হয় প্রেক্ষাবানমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমার মনে হয়, এতদ্দ্বারা পদ্য-কাব্য এবং সঙ্গীতের পার্থক্যও সূচিত হইল! রসাত্মক বাক্য কাব্য। ভাববাহুল্যে, চিত্তবিনোদনে রসাত্মক বাক্যের প্রভূত প্রভাব অস্বীকার করিবার কাহার উপায় নাই। বিশ্বের যে রস, যে সৌন্দর্য্যরাশি ক্রান্তদর্শী কবি কর্ত্তৃক ছন্দ নিবদ্ধ হইয়া অস্মদ্ সমক্ষে যে রূপরসে ভাববৈভবে বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সঙ্গীতে তাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। শ্রুতিসুখ সম্পাদনে ও রসোদ্দীপনায়, কাব্যে যে শক্তি নিহিত আছে, সঙ্গীতে তাহা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শ্রুতি-বিনোদনে, বা রসোদ্দীপনায় কবিকে কল্পনার বিচিত্র শক্তির স্মরণাপন্ন হইতে হয় বটে; কিন্তু সেই অপূর্ব্ব শক্তি কাব্যের সঙ্কীর্ণ পরিধি মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। সঙ্গীতে কিন্তু অভূতপূর্ব্ব স্ফুরণের সহিত নানা ছন্দবন্ধে, সেই শক্তি বিকশিত হইবার অবসর পায়। যেখানে যতটুকু হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সঙ্গীতে সেইখানে সেই পরিমাণেই প্রয়োগ করিবার সুবিধা ও স্বাধীনতা আছে। কাব্যনিবদ্ধ ছন্দের দ্বারা যতিমাত্রা সমবায়ে ভাষার সৌষ্ঠব সাধন হয় সত্য। সঙ্গীতে কিন্তু যতিমাত্রাদি বিন্যস্ত ছন্দ নিবদ্ধ স্বরাদির আরোহণাবরোহণ, মূর্চ্ছনা কম্পন প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে ভাষাকে প্রাণস্পর্শিনী শক্তিতে পরিণত করে। এই জন্যই লোকে সঙ্গীতের অনেক নিম্নস্তরে কাব্যের অবস্থান এই কথা বলিয়া থাকেন। সাহিত্যের পদবহুল গদ্য অপেক্ষা স্বল্প পদ বিন্যাসে রচিত রসাত্মক বাক্য যে কারণে শ্রেষ্ঠ, তেমনি বর্ণবহুল কাব্য অপেক্ষা কেবল স্বল্প ধাতু মাত্র সমবায়ে সমুৎপন্ন সঙ্গীতও ঠিক সেই কারণেই কাব্য হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত কারণ নিবন্ধন রসাত্মক বাক্য যে নিয়মে আবৃত্ত হইয়া থাকে, ঠিক তন্নিয়-মাধীন হইয়া কবিতা গীত হইবার রীতি নাই। এই জন্যই কাব্যের ছন্দ যে নিয়মে রচিত হইয়া থাকে, সঙ্গীতের ছন্দ ঠিক তৎবিধানে সর্ব্বথা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বঙ্গ-ভাষার হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ-বিবর্জ্জিত অক্ষর সমবায়ে পদ্য-কাব্যের ছন্দ গ্রথিত হইয়া থাকে। এই জন্য বাংলাছন্দে রচিত কোন কবিতা বিশেষকে গানের সময়ে, যে রাগিণী যে

কবিতাটিতে সংযোজিত হইবে, সেই রাগিণীর উপাদানভূত স্বরাদি ধাতুতে, কবিতার ছন্দ বিভাগ যতদূর সম্ভব রক্ষা করিয়া, হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রার বিন্যাসপূর্ব্বক তাহা গানে বসাইবার উপদেশ আছে। গানে ধাতু ও মাত্রাই মুখ্য। কবিতায় নিবদ্ধ পদাবলী মুখ্য নহে। গীতাদিতে, কাব্যের পদসমষ্টি যে মুখ্য নহে; গৌণ, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবি রচিত গীতাদির আলোচনা করিলেও তাহা প্রমাণিত হয়। পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত নহে। শব্দ-বানান করিবার প্রণালীও সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। ঠিক প্রাকৃতের মতনও নহে, সংস্কৃত ব্যাকরণে বা ছন্দশাস্ত্রে যে সমস্ত নিয়ম আছে, পদাবলীর রচনায় তাহা রক্ষিত হয় নাই। প্রাকৃত ব্যাকরণও রক্ষিত হয় নাই। ঋ-র-ষ এর পর সংস্কৃতে দন্ত ন যেমন মূর্দ্ধ ণ হয়, পদাবলীর শব্দের বানানে সে নিয়ম রক্ষিত নাই। মূর্দ্ধণ্যাকারান্ত "চরণ" পদে, বিদ্যাপতির রচিত গীতাদিতে দন্তনকারান্ত হইয়াছে। তার পর হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর ব্যবহার নিয়ম বড় সূক্ষ্ম ও কঠিন। আমাদের দেশে তাহা সম্যক্ জানা না থাকায় বিদ্যাপতি রচিত পদাবলীর সংস্করণে গীতাদি অত্যন্ত বিকৃত বিদুষ্ট ছন্দ হইয়াছে। বিদ্যাপতির ছন্দ দেখিতে, হয় পয়ার ত্রিপদী সদৃশ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা পয়ার-ত্রিপদী নহে। বিদ্যাপতি গানের নিমিত্ত পদ রচনা করিতেন, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও আবৃত্তিকালে তাহার যে ছন্দ পতন হইত, তাহা নহে। তিনি সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁহার বহু গ্রন্থ আছে। সুতরাং ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। পদাবলীর ছন্দ সংস্কৃত বর্ণবৃত্তছন্দানুযায়ী নহে। বরং পিঙ্গলাচার্য্য ব্যাখ্যাত জাতি বা মাত্রাবৃত্ত প্রাকৃত ছন্দানুযায়ী। গীতাদিতে মাত্রা ও ছন্দের অনুরোধে হ্রস্ব দীর্ঘের বিনিময় হইয়া থাকে। ইহাও সঙ্গীত শাস্ত্র সঙ্গত। এই সমস্ত কারণে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে, গীতাদি বিষয়ে যে স্বরাদিতে নিবদ্ধ ছন্দ মুখ্য, পদ্যকাব্য সাহিত্যে তাহা গৌণ মাত্র।

যে যাহাই হউক, পদ্যকাব্য শ্রেষ্ঠ, কি সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ, এ কথার বিচার করিবার উদ্দেশ্য এই প্রবন্ধের নহে। আমরা দেখিয়াছি, কাল পরিমাণার্থক হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রাবচ্ছিন্ন ধাতু বিন্যাসই ছন্দের স্বরূপ। বৈখরী বাক্ ব্যবহারে শাস্ত্রকারগণ, এই ছন্দকে দ্বিধা ভাগ করিয়াছেন। অক্ষর বৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত বা জাতি ছন্দ। সংস্কৃত সাহিত্য উভয়বিধ ছন্দালঙ্কারে বিভূষিত। হ্রস্বদীর্ঘবর্ণবিভেদে যে ছন্দ সংস্কৃতকাব্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাই বর্ণবৃত্তছন্দ। কিন্তু যে ছন্দ হ্রস্বদীর্ঘাদি স্বরভেদে বিন্যস্ত হইয়া গ্রথিত হয়, তাহাই জাতি বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। বাংলা সাহিত্যে কিন্তু বর্ণবৃত্তছন্দ বহুল। অবশ্য এতদ্দ্বারা, বাংলা পদ্য সাহিত্য যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার বর্জ্জিত, একথা বলিতেছি না, কারণ, বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, বাসবদত্তা প্রভৃতি কাব্যে আমরা বাংলায় মাত্রাবৃত্তছন্দেরও পরিচয় পাইয়া থাকি। বিদ্যাসুন্দরে যথা,—

"ঝন ঝন কঙ্কন, নূপুর রণ রণ
ঘুমু ঘুমু ঘুঙ্ঘুর বোলে।
লট পট কুন্তল, কুন্তল ঝল মল
পুলকিত ললিত কপালে॥"

অথবা বাসবদত্তে,—

"আগত সরস বসন্তে, বিরহি দুরন্তে, শোভিত বল্লরী ভালে।"

কিংবা অন্নদামঙ্গলে,—

চণ্ড বিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি
দুর্গবিঘাতিনি, মুখ্যতরে।
হে শিব মোহিনী, শুম্ভ নিসূদনি
দৈত্যবিঘাতিনি, দুঃখ হরে॥"

কিন্তু, এবংবিধ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার বাংলার আধুনিক পদ্য-সাহিত্যে প্রায় একেবারেই লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক পদ্যকাব্যের ছন্দ অক্ষরসমষ্টি গণনা ক্রমে গ্রথিত হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে। বাংলার বর্ণবৃত্তছন্দ হইতে আবার বর্ণগত হ্রস্বদীর্ঘভেদ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, বাংলার পদ্যসাহিত্য রচনা হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞানশূন্য। সূক্ষ্ম বাগাবস্থায় স্থিত আন্তর জ্ঞান, বৈখরী বাক ব্যবহারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে। কারণগুণ কার্য্যে বিবর্ত্তিত হয়। আমাদের আধুনিক কবিদিগের অন্তরে যদি সূক্ষ্মাবস্থায় কোনরূপ হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ছন্দবদ্ধ বৈখরী বাক্যব্যবহারে হ্রস্বদীর্ঘাদিভেদে মাত্রা কাল পরিমাণ ভেদ নিশ্চয় পরিদৃষ্ট হইত। কিন্তু, দুঃখের বিষয় তাঁহারা স্বয়ং হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া ছন্দ গ্রন্থন নিবন্ধন লঘু গুরু ভেদবিবর্জ্জিত বাংলা পদ্য সাহিত্যে যে ঊর্জ্জবীর্য্য বিহীন নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, একথা একটু প্রণিধানের সহিত চিন্তা করিলেই বেশ প্রতীয়মান হইবে।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ষড়্জাদিস্বরাখ্য ধাতু ও হ্রস্বদীর্ঘ ভেদে কাল পরিমাণার্থক মাত্রা, এই দুইটি গীত পদার্থের ঘটকাবয়ব। হ্রস্বদীর্ঘাত্মকমাত্রা ও ধাতুর বিনা সমবায়ে গীত পদার্থ রচিত হইতে পারে না। বাংলাগীতি কবিতা সাধারণত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে নিবদ্ধ নহে বলিয়া, আধুনিক লঘু গুরু বর্ণবিভেদ বর্জ্জিত ছন্দবদ্ধ কোন কবিতাকে, গায়ন করিতে হইলে তাহাকে গায়নোপযোগী মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পরিণত করিয়া লইতে হয়। কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনা ও পরীক্ষা করিলে, আমার এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে।

* * * * * *

সুতরাং অল্প কথায় বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে, গীতপদার্থ মাত্রা ও ধাতু-ঘটিত ছন্দ ও স্বরের আলাপ মাত্র। সঙ্গীতে এবংবিধ আলাপে অভিব্যক্ত ছন্দের নামই তাল। এই তাল ও স্বরের সমবায় ও বিচিত্র বিন্যাস হইতেই, শাস্ত্রোপদিষ্ট যাবতীয় রাগরাগিণীর বিকাশ হইয়াছে। ছন্দশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত কাব্যের ছন্দের সহিত সঙ্গীতে অভিব্যক্ত তালেরও বহুল মিল থাকিলেও, সঙ্গীত শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বরাদিনিহিত মাত্রা সঞ্জাত তালের ব্যাপকতা পদ্য সাহিত্যের ছন্দের ব্যাপকতা হইতে অনেক বেশী। কাব্যের ছন্দ হইতে গীত পদার্থের ছন্দের পার্থক্য এইখানেই বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছন্দোমঞ্জরী ব্যাখ্যাত, তোটক, বিদ্যুন্মালা, কুসুমবিচিত্রা, প্রভৃতি কয়েকটি ছন্দ, সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত এক ত্রিতালির মধ্যেই গণনা করা যাইতে পারে। এই জন্যই আমরা দেশীয় গানে, কাব্যের সংখ্যাগত ছন্দবৈচিত্র্য হইতে সঙ্গীতে ব্যবহৃত প্রচলিত তাল সংখ্যা অনেক অল্প দেখিয়া থাকি। তদ্ব্যতীত হ্রস্বদীর্ঘভেদ বিবর্জ্জিত, বর্ণবৃত্তছন্দে গ্রথিত কোন কবিতাকে গীত-পদার্থে পরিণত করিবার জন্য যেরূপে মাত্রাদি সংযোজন করা হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায় সর্ব্ববিধ ছন্দে রচিত কবিতা কোন না কোন প্রচলিত তালযোগে গেয় হইতে পারে। এইরূপে, শাস্ত্র ব্যাখ্যাত বহুসংখ্যক তাল, ব্যবহারে না আসিবার কারণ, অধুনা তাহাদের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। সামগ্রী যদি বহুকাল ধরিয়া ব্যবহারে না আসে, তাহা হইলে তাহার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ক্রিয়াকারিত্বে যাহার ব্যাপকতা বেশী, যাহার লীলাক্ষেত্র সুদূর বিস্তৃত, তাহাই ব্যবহারক্ষেত্র ও উত্তম কার্য্যকরীরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। নির্ব্বাসিত সংকীর্ণের অপ্রসিদ্ধি ও আত্মবিলোপ প্রকৃতিসিদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়মে যোগ্যতমেরই পরিত্রাণ বা উদ্বর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, কলাতত্ত্বেও এতন্নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে অপ্রচলিত তাল সমুদয়ের ব্যাপকতা অপেক্ষাকৃত অনেক ন্যূন বলিয়া, অথবা তদুপযোগী ছন্দে গ্রথিত গীতাদির গায়নাদির ব্যবহার নাই বলিয়া, তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। নচেৎ আমার মনে হয়, আমাদের ভাববৈভব যতই সমৃদ্ধি লাভ করুক না কেন, এমন কোন নূতন ছন্দ রহস্য গ্রথিত হইতে পারে না, যাহা গায়ন কালে কোন না কোন শাস্ত্রসিদ্ধ তালযোগে তাহার সঙ্গৎ করা যাইবে না। সঙ্গীতশাস্ত্র বলিয়াছেন, রাগরাগিণীর যেমন অন্ত নাই, তেমনি তাল-সংখ্যারও অন্ত নাই। যাঁহারা জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, অন্ততঃ তাঁহারা বোধ হয় অবগত আছেন যে, 'ভৃগুশাস্ত্র' নামে একখানি ঋষিপ্রণীত জ্যোতিঃশাস্ত্র আছে। এই শাস্ত্রের কুণ্ডলীচক্র বিধানটী জন্মগত রাশিচক্রের অভিধান-স্বরূপ। কাল-বিশেষে গ্রহাদির পরিভ্রমণ সঞ্জাত বিবিধক্ষেত্রে এমন সুসঙ্গত গ্রহবিন্যস্ত এরূপ বহুসংখ্যক কুণ্ডলী চক্র এরূপ বিধিবদ্ধভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে, জন্মতিথিবারাদি

পাইলে আমি কেন, যে কোন সামান্য জ্যোতিষতত্ত্ববিদ্ আপনাদের প্রত্যেকেরই জন্মরাশিচক্র, তাহা হইতে নিরূপণ, ও ফলাফলাদি মিলাইয়া লইতে পারেন। ইহাও যদি সম্ভব হয়, তবে কাল-ক্রিয়াজাত তাল সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যাপার কেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে? এতদ্দ্বারা আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যিনি ভারতীয় শব্দ সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্র ছাড়া আর নূতন তালের কল্পনা করিতে পারেন না। ব্রাহ্ম সঙ্গীতস্বরলিপিতে যে, "পূজ্যপাদ রবীন্দ্রবাবুর উদ্ভাবিত 'নবতাল', 'একাদশী তাল' প্রভৃতি কবি কর্তৃক দুই তিনটী নূতন সৃষ্ট তাল বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাও নূতন নহে। যথোক্ত 'রূপকড়া'ও, তথাকথিত শ্লেষাঘটিত চিরপ্রসিদ্ধ 'দাঁত কড়া'র ন্যায়ই প্রাচীন ছন্দ, কেবল নাম করণটি নূতন বটে; কারণ, শাস্ত্রে ইহা অন্যনামে পরিচিত।

সে যাহা হউক, ছন্দের একটা বিশিষ্ট ব্যঞ্জনাশক্তি আছে। এই ব্যঞ্জনাশক্তিসহায়েই পদাবলীর অন্তরালে নিহিত ভাবটিও এই ছন্দসাহায্যে শ্রোতার হৃদয়ে একটু বেশ সুনির্দ্দিষ্ট আকার ফুটাইয়া দেয়। একটি ভাব ছন্দহীন ভাষায় প্রকাশ করিলে যেমন হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহা তদুপযোগী ছন্দবন্ধে প্রকাশ করিলে তদপেক্ষা আরও যে হৃদয়গ্রাহী হইবে, সেই বিষয়ে কাহারও সন্দেহই হইতে পারে না! প্রাতঃস্মরণীয় কবিবর মধুসূদন বিরচিত—

> "সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
> বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে, কহ, হে দেবি!—"

ইত্যাদি পদবিন্যাসে অমিত্রাক্ষরছন্দনিবদ্ধ বীররসোদ্দীপক ভাবটি; বিশ্ববিশ্রুত কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিরচিত—

> "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
> বেলা হল, মরি লাজে"—ইত্যাদি,

পদবিন্যাসে অভিব্যক্ত যামিনী অবসানে ব্রীড়া সঙ্কুচিতা অপরিণতা বুদ্ধিমতী অভিসারিকার মর্ম্মপীড়াব্যঞ্জক কুসুমসুকুমার ছন্দে গ্রথিত হইলে, কবি মধুসূদনের অভিপ্রেত বীরহৃদয় ভাবটি কিরূপ আকারে ফুটিয়া উঠিত, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই জন্যই বলিতেছিলাম, তালের একটি ব্যঞ্জনাশক্তি বিশেষ আছে, এবং তাহার সহিত রাগিণী বিশেষেরও একটা সামঞ্জস্যও আছে। এই সামঞ্জস্য হইতেই রাগ রাগিণীর মূল ভাবটিও নানা ছন্দ বৈচিত্র্যে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জন্যও তাল, সঙ্গীতের একটি অপরিহার্য্য প্রধান অঙ্গস্বরূপ। এই জন্যই হিন্দু-সঙ্গীতের ছন্দের মূর্ত্তির সম্যক্ বিকাশের নিমিত্ত মৃদঙ্গ, তবল-মৃদঙ্গ, ঢোল, ডমরু প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য-

বস্তের সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীতের এই অঙ্গকে শাস্ত্রে "আনন্দ" এতদাখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ছন্দের নানা ভঙ্গী প্রকটন জন্তই ইহাদের ব্যবহার। নৃত্যকলাও তাহাই করিয়া থাকে। বিবিধ ছাঁদে চরণবিক্ষেপ নৃত্য ও গানের ছন্দকেই প্রকাশ করে। আর নর্ত্তনের হাবভাব পরিচায়ক নানাছাঁদে-সুকুমার করাদি সঞ্চালন, অঙ্গবিশেষ প্রকম্পন প্রভৃতি গানের লয় প্রদর্শন মাত্র। গীত বাদ্য-নৃত্য এতদ্ ত্রিতয়ের ইতরেতর সম্বন্ধ যাঁহারা প্রণিধানের সহিত চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে, সঙ্গীতের তাল কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দের ন্যায় সঙ্কীর্ণ নহে। সঙ্গীতের বিচিত্রছন্দ প্রদর্শন ব্যাপারে, ইহার ব্যাপকতা নিবন্ধন, কলাবিদের ঘুরিবার ফিরিবার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। প্রত্যেক ছন্দের লয়ভেদে একটা জাতিগত বিশেষ লক্ষণ আছে। গায়নকালে সেই লক্ষণ সম্যক্ রক্ষা করিয়া, কলাবিৎ নিজ ইচ্ছামত তাহাতে বিচিত্র কারুকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। কিন্তু এই বৈচিত্র্যসম্পাদনেও গীতের অন্তরালে সূক্ষ্মভাবে নিহিত ভাববৈভবের কোন বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তাঁহারা অনুক্ষণ ছন্দের আত্মগত লক্ষণ রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। সুতরাং ছন্দের বৈজাত্য সঙ্ঘটন হয় না। গায়নকালে ছন্দের লক্ষণগত বিশেষত্ব অটুট রাখিয়া গীত পদার্থকে বিবিধ বিচিত্র কারুকার্য্যে যথা প্রয়োজন অলকৃত করিবার রীতিতেই আমরা হিন্দু সঙ্গীত-কলাবিদ্গণের সংযম ও স্বাধীনতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি। ধ্রুবপদ, লক্ষ্মীপদ টপ্পা প্রভৃতি দেশীয় গীতাদিকেই, এই সংযম ও স্বাধীনতাপ্রদর্শনের উদাহরণস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কলাবিদের এই সংযম ও স্বাধীনতার পরিচয় আমরা যে কেবল ছন্দেই পাই, তাহা নহে। হিন্দু সঙ্গীতের রাগ রাগিণীতেও ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। যেমন হ্রস্ব দীর্ঘাদিভেদে কালপরিমানার্থক মাত্র বিন্যাস বৈচিত্র্য হইতে ছন্দবৈচিত্র্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ ষড়জাদিধাতু বিন্যাসবৈচিত্র্য হইতে রাগাদির রূপচিত্রণে বৈচিত্র্য সংগঠিত হইয়া থাকে। এই বৈচিত্র্য সম্পাদনেও কলাবিদের যথেষ্ট স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দের ন্যায় প্রত্যেক রাগিণীর একটা করিয়া বিশেষ লক্ষণ, একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছে। জাতিগত সেই লক্ষণাবলীকে রক্ষা করিয়া কলাবিদ্ তাহাকে বিবিধ বৈচিত্র্যে ভূষিত করিতে পারেন। চিত্রকলাবিদেরা কোন একটা জীবজন্তুকে চিত্রার্পিত করিবার কালে তাহার জাতিগত লক্ষণসমূহ বজায় রাখিয়া, আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহাকে হৃষ্টপুষ্ট, অথবা জরাজীর্ণশীর্ণ প্রভৃতি যেমন ইচ্ছা, আপনার প্রতিভানুযায়ী ঠিক তেমনি চিত্রণ করিতে পারেন, এ বিষয়ে তাহার যেমন স্বাধীনতা আছে, ঠিক সেইরূপ একটা অপরিমিত স্বাধীনতা সঙ্গীত কলাবিদেরও আছে। এই স্বাধীনতাও স্বেচ্ছাচারিতা নহে; ইহাও সংযমের আত্মপ্রকাশ মাত্র।

হিন্দু সঙ্গীতের রাগ রাগিণীগুলির এক একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে। শব্দার্থগত সম্বন্ধের ন্যায় রাগও তাহার মূর্ত্তি এতদুভয়নিষ্ঠ সম্বন্ধও নিত্য। মূর্চ্ছনা তানাদির দ্বারা রাগাদির সেইরূপটিকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিয়া তুলিতে হয়। এইরূপে জাতিগত বিশেষত্বকে অটুট রাখিয়া, রাগিণীকে যথাপ্রয়োজন অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত করিতে পারা যায় এবং কলাবিদ্‌গণ তাহাই করিয়া থাকেন। জাতিগত বিশেষত্ব রক্ষা না করিয়া সুরালাপে অসংযত স্বাধীনতা প্রকাশ উচ্ছৃঙ্খলতার পর্য্যায় মাত্র। উচ্ছৃঙ্খলতার সামান্য বন্ধন আপাত-দৃষ্টিতে ছিন্ন ভিন্ন হয় বটে, কিন্তু বৈজাত্য সঙ্ঘটনের সহিত, হয় আপনাকেই নাগপাশে আবদ্ধ হইতে হয়, অথবা গানের জাতীয় অস্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয়। জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বিশেষত্ব অটুট রাখিয়া জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে উন্নতিকল্পে যথাপ্রয়োজন সংস্কার যে প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সংস্কারসাধনকল্পে জাতির সাজাত্য যদি সংরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে প্রোক্ত সংস্কার উন্নতি বিধায়ক হইবে, কি জাতীয় বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত হইবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রয়োজন হইলেই সংস্কার সাধিত হইবে। তাহাকে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রয়োজন ও সংস্কারের স্বরূপ সম্যক্ অবধারণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সে যাহা হউক, যেমন তালসমূহের এক একটি স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা আছে, ঠিক তেমনই একটী ব্যঞ্জনা শক্তি হিন্দুসঙ্গীতের রাগরাগিণীতেও অনুভূত হইয়া থাকে। রাগরাগিণীতে নিহিত সেই শক্তিই হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রের রসতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রত্যেক রাগরাগিণীর একটী করিয়া বিশিষ্ট রসোদ্দীপানাশক্তি আছে। যেমন একটী বিশিষ্ট রসবিশেষ সিঞ্চিত কবিতা আবৃত্তিকালে, আমরা তদ্‌রসের আস্বাদ পাইয়া থাকি, সেইরূপ যদি সেই কবিতাটি আমরা তদুপযোগী রাগিণীযোগে যথাযথ তালমানে গান করিতে পারি, তাহা হইলে কবিতাটী কেবল আবৃত্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে যে তদ্‌রসোদ্দীপক হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। হাস্য, বীর, বীভৎস শৃঙ্গার প্রভৃতি বিবিধ রসে হিন্দুর রাগরাগিণী বিশেষরূপে সিঞ্চিত হইয়াছে।

স-রী বীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে ধো-বীভৎস ভয়ানকে।
কার্য্যৌ গ-নী তু করুণে হাস্য শৃঙ্গারয়োর্ম-পৌ॥"

বীর অদ্ভুত ও রৌদ্র রসে ষড়জ ঋষভ ব্যবহার করিবে। বীভৎস এবং ভয়ানকে ধৈবত ও গান্ধার; নিষাদ করুণে; এবং মধ্যম ও পঞ্চম হাস্য ও শৃঙ্গার রসে ব্যবহার করিবে। এইরূপ বহুবিধ শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, কৈবল্যের ন্যায় বিচিত্র রসোপভোগ বাসনাপরিতৃপ্তি সাধনও হিন্দুসঙ্গীতের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য।

আমার বক্তব্য এই যে, পদ্য সাহিত্যকে যদি বিবিধ রস সিঞ্চিত করিবার উপাদান থাকে, তাহা হইলে হিন্দুসঙ্গীতেও বিবিধ রসস্ফুরণেরও যে উপাদান আছে, চিন্তাশীল-

মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবে। প্রত্যেক স্বরের উপাদানভূত, আত্মপ্রকৃতিগত এক একটী রসবিশেষের ব্যঞ্জনাশক্তি আছে। ইহা আবার অভ্যাস করিলে, অনুপ্রদানাদি দ্বারা বিবিধ স্বরভঙ্গীতে, এই রস বিশেষের স্ফুরণাধিক্য ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্নায়ুবিধানের উপর ষড়্জাদির একটা প্রতিক্রিয়া সমুৎপন্ন করিবার সামর্থ্য আছে। যে সমবেদক স্নায়ুসমূহের ঘটকাবয়ব তরঙ্গায়িত হইলে, আমাদিগকে হাস্যরোদনাদি বিকার-গ্রস্ত হইতে হয়, তত্তৎ রসাত্মক সঙ্গীত কালীন স্বরাদির বিচিত্র বিন্যাসজাত এমন রাগাদির নির্ব্বাচন করিতে হইবে, যাহাতে সেই সেই স্বরাদির বহুল প্রয়োগ হইয়াছে, যাহাদের হাস্যরোদনাদির হেতুভূত সমবেদক স্নায়ুসমূহকে তরঙ্গায়িত করিবার শক্তি বা সামর্থ্য আছে। সঙ্গীতরত্নাকরের মতে 'মধ্যম'-স্বর হাস্যরসব্যঞ্জক। অর্থাৎ 'মধ্যম' স্বর হাস্যের হেতুভূত সমবেদক স্নায়ুসমূহে বিকার ঘটাইবার শক্তি আছে অতএব হাস্য রসাত্মক কোন কবিতা গায়ন করিতে হইলে, তাহাতে এমন রাগিণী যোজনা করিতে হইবে, যাহার বাদী সুর বা জানটি কেবলই যে মধ্যম হইবে তাহা নহে, তাহাতে সেই সুরের সমবাদী, অনুবাদী প্রমুখ স্বরগুলিরও প্রয়োগ বাহুল্য থাকিবে এবং অনুপ্রদানাদি সাহায্যে ঐ রাগিণীটিকে আবার তদ্রসব্যঞ্জক স্বরভঙ্গিমায় অলঙ্কৃত করিতে হইবে। কেবল ইহাই নহে, যথাপ্রয়োজন অনুপ্রদানাদি সাহায্যে বিচিত্র স্বরভঙ্গিমায় অভিব্যক্ত পর্য্যায়ক্রমে সেই সুরগুলির কেবল আলাপ করিলে, তদ্রাগিণীনিহিত রসের একটা সাধারণ উদ্দীপনার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে বটে, কিন্তু তাহা যদি যথাযোগ্যছন্দের ব্যঞ্জনা-শক্তির সহায়তা পায়, তাহা হইলে রাগিণীর ঘটকাবয়ব স্বরূপ সুরগুলি বিশেষভাবে নৃত্য করিতে করিতে সমবেদক স্নায়ুসমূহকে বিচিত্রভাবে তরঙ্গায়িত করিয়া রাগিণী নিহিত রসটীকে বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তুলিবে। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন রাগিণীর দ্বারা বিভিন্ন রসোদ্দীপনা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়। ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ হাস্য-রস অনেকতঃ ব্যক্তিগতপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি, বয়ঃক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ও শিক্ষাদীক্ষাভেদে রসবোধের নাড়ী প্রবাহে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শুষ্ক সমতল পথে চলিতে চলিতে কেহ যদি পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান, তাহা হইলে অপরিণত বুদ্ধি যুবকদের হৃদয়ে হাস্যরসের উদ্রেক হয়, কিন্তু কোমলহৃদয় প্রবীণেরা করুণরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। বিলাতি ধাচের "স্বর-সঙ্গতি" যাহাকে "হারমোনি" বলে, আমাদের সঙ্গীতে প্রচলন করিবার কোন অবসর হয় নাই। কারণ বিলাতী স্বরসঙ্গতি বিবাদী সুর সংমিশ্রণে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আমাদের সঙ্গীতে এবংবিধ কোনও বিবাদি স্বরের সংমিশ্রণ নাই। কাজেই যখন কোন প্রাতীচ্য সঙ্গীতকলাকুশলী, বিবাদী স্বরগুলির সংমিশ্রণে কোনবিধ স্বরসঙ্গতি প্রকাশ করেন, তখন প্রাচ্যসঙ্গীত কলাবিদ্গণ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের

নিকট এবংবিধ স্বরসঙ্গতি,তাঁহাদের পরিচিতসঙ্গীত-প্রকৃতির ক্রটি, বিদ্রূপেরই পরিচায়ক। কিন্তু তাই বলিয়াই কি প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতি মাত্রকেই কি হাস্যরসাত্মক বলিতে হইবে? বীরভাবব্যঞ্জক সুসঙ্গত স্বরসঙ্গতি কি বিলাতবাসীকে হাস্যরসে আপ্লুত করে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের নিকট যেটি হাস্যরসাত্মক, তাহা ভিন্ন প্রকৃতিক অপরের নিকট তদ্রসব্যঞ্জক নাও হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু সঙ্গীতে হাস্যাদি রসোদ্দীপনোপযোগিনী রাগিণী নাই একথা বলা চলে না। কোন্ রাগিণী কোন্ রসব্যঞ্জক রাগিণীবিশেষে ধ্যানেই তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

হিন্দু সঙ্গীতের রসোদ্দীপনা প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ কবি লিখিয়াছেন,—"কোন একটা বিশেষ উদ্দীপনা, যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সঙ্গীতে ব্যবহারে দেখা যায় না।" আমাদের সঙ্গীত অর্থে যদি "বাংলা গান" বুঝায় তাহা হইলে বলিব সেটার জন্য আমাদের সঙ্গীত দায়ী নহে; প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির আইন কানুন, বাংলা সঙ্গীতে তদ্ব্যবহার লোপের মূলীভূত হেতু! "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" ইত্যাদি উপদিষ্ট উপাসনা পদ্ধতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, তন্ত্রশাস্ত্র বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। "ভয়ঙ্করের পূজা বাংলাদেশে যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেরূপ ভারতের কুত্রাপি নহে। সেই তন্ত্রপ্লাবিতদেশে যে বীরোচিত সঙ্গীতাদির ব্যবহার নাই, দেশের হস্তান্তর প্রাপ্তিই তাহার কারণ। বীর-রসোদ্দীপক কাব্যের এবং তদঙ্গীভূত গানের ব্যবস্থা আছে কিনা, শ্রদ্ধেয় গুণী মার্দ্দঙ্গী শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম শর্ম্মণ মহাশয়ের পুঁজি হইতে সংগৃহীত বক্ষ্যমান্ গীতিকবিতাটিই তাহা প্রমাণিত করিবে।

রাগিণী কুন্তল—তাল গজবন্দ

(৭+৫+৪+৫+৩=)

অশদল গজদল সাজন্তি রামা
যোঝন্তা বীর বিক্রম করন্তি এইয়া
অরি কুল দল মারন্তি রে
সুর গণে সাজন্তি যোঝন্তিরে
লঙ্কাপত ডরে থরথর ইয়া

ধাগে তেটে তাগে তেটে—তাগে তেটে কেটে তাগ তাগ তাগ তাগে তেটে তাগে তেটে কেটে তাগ, তাগে তেটে তাকা ছুমা কেটে তাটা গদিঘেনে।

পৃথীরাজের জীবনী সমালোচনা করিলে, কিংবা রাজকবি বিরচিত গীতাবলীর আলোচনা করিলে, আপনারা দেখিবেন, 'মতিদানা, তোটক, প্রভৃতি ছন্দে 'খড়্কা'

নায়ক গীতাদি যথাযথভাবে গায়ন করিলেই আপনাদের অবসন্ন হৃদয় বীররসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

ঝল্ ঝল্ তেজ ঝলাঝল গেল। টটট্টর যথ্য অপক্কর পেল॥
ঠঠঠ্ঠ খিল্লির পিল্লির পায়। ডরড্ডর কাহর দেহ ডরায়॥
চরক্কর মুণ্ড নিরখ্যর নৈন। তবক্কর তীর বরক্কর বৈন॥
থরক্কর সৈন মুরক্কহি নাহি। দরব্বর দৌর পরৈ দল মাহি॥
ধরদ্ধর ধারহি মারহি চুর। ন চৈ ভ্রমভূত সচেতন পূর॥
পরপ্পর ফুট্টত গাত সপূর। ফরফ্ফর ফৈলত ফেরত তুর॥
বরব্বর বেদল আয়ধ বুট্টি॥ ভরভ্‌ভর ভাজত নাহিন রুট্টি॥
মরম্মর ছেদহি মার মুছাল। জজ্জর নাচত ধায় চটাল॥
বরব্বর ফুরত সঙ্গি স্থলগ্‌গি। সুরাসুর দেখত খেলত পগ্‌গ॥

স্যার রবীন্দ্র নাথ বলিয়াছেন, "হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিষ নহে।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐশ্বর্য্য দোলায় দোলায়মান প্রাচীন রাজাধিরাজ প্রমুখ জমিদারগণ গোবিন্দ দাসের ন্যায় কি উক্ত রসে বঞ্চিত ছিলেন? আপনারা বোধ হয় অনেকেই "ভাঁড়েদের" গান শুনিয়াছেন। সে গানে কি বিলাতী সুর সংযোজিত হইয়াছে? বাংলার প্রাচীন কবিগণ মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তই সর্ব্বশেষ কবি। প্রকৃতির ত্রুটি যদি হাস্যরসের হেতুভূত কারণ হয়, তাহা হইলে গুপ্ত কবি রচিত বক্ষ্যমাণ গানটি কি প্রকৃতির ত্রুটির পরিচায়ক নহে? পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচারিত হাস্যরসাত্মক গান অনেকতঃ এতদনুরূপ ভাব-ব্যঞ্জক। গুপ্তকবি গ্রথিত হাস্যরসাত্মক গানটি এই—

বসন্তবাহার—আড়খেমটা।

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহান ভার।
হ'ল পুর্ণিমেতে অমাবস্যা, তের পহর অন্ধকার।
এসে বিন্দাবনে, ব'লে গেল বামী বোষ্টমী,
একাদশীর দিনে হবে জন্ম অষ্টমী;
ক'ল ভাদ্দর মাসের সাতুই
পোষে চড়ক পূজার দিন এবার।
ঐ ময়রা মাগী ম'রে গেল মেরে বুকে শূল,
আর বামুনগুলো ওষুধ নিয়ে মাথায় ব'চ্ছে চুল;
কাল বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে, পুড়ে হল ছারখার,
ঐ শুজ্জিমামা পুর্ব্বদিকে অস্ত চলে যায়;
আর উত্তর দক্ষিণ কোন থেকে আজ বাতাস লেগ্‌ছে গায়;

সেই রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া
সিং উঠেছে দুটো তার।
ঐ কলু রামী ধোপা শামী হাসতেছে কেমন,
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে ক'জন
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার॥

আরও একটি গান, আপনাদের শুনাইতেছি। ইহাও প্রাচীন গান, এবং হিন্দু-সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী রাগিণী ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।—

জঙ্গলা।
আর কিছু কি বাঁকা নাইকো।
বাঁকা শ্যামের বাঁকা নয়ন বই।
বাঁকা যত নদ নদী, খাল গঙ্গা যমুনা,
তাতে চলে বাঁকা তরি চেয়ে দেখ না,
চক্ষের উপর বাঁকা ভুরু, সোজা হলে সাজে কই।
লিখতে গেলে সদাই বাঁকা হয়,
মাথা দাড়ি সোজা তারা কোনই কালের নয়,
(আবার) হলধরের হলটা বাঁকা, তাতে তিনি জগৎজয়ী॥
সকল পাখির পা বাঁকা, গয়লার বাঁক বাঁকা
টাকায় সতের আনা পাকির ঠোঁট বাঁকা
ঘি তুলিতে আঙ্গুল বাঁকা, সোজা হ'লে চলেই কৈ।

ইহাতে বিলাতী সুরের রেশমাত্র নাই। সুতরাং হাস্যরসাত্মক করিতে হইলেই তাহা স্বভাবতই বিলাতী ছাঁদের কেন হইবে, একথা আমরা বুঝিতে অক্ষম। অবশ্য আমরা যদি বিলাতী ধরণে হাসি-কাসি, বিলাতী ধরণে আহার-বিহার করি, বিলাতী ধরণে ভোগ-বিলাস করি, তাহা হইলে বিলাতী সংস্কার বশতঃ বিলাতী স্বর ভঙ্গিমায় আমাদের কথা কহিতে হইবে, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর রাগরাগিণীরও বৈজাত্য সংঘটন হইতে থাকিবে। আপনাকে হারাইয়া পরকে পাওয়া, অনাত্মকে আত্মবোধে পূজা করা যদি উন্নতির ধর্ম্মগতলক্ষণ হয়, তবে সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই।

হিন্দু রাগিণী প্রসঙ্গে আরও এক কথা আছে। তাহা ইউরোপীয়, হার্ম্মনী অর্থাৎ স্বর সঙ্গতি।

আপনারা অবগত আছেন যে, ষড়জঋষভাদি স্বরসপ্তকে হিন্দু শাস্ত্র কল্পিত উদারাদি সংজ্ঞক এক একটি গ্রাম রচিত হইয়াছে। গ্রাম সুতরাং স্বরসপ্তকেরই পর্যায় মাত্র। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, এবংবিধ উত্তরোত্তর ক্রমে স্বরবিন্যাসে রচিত গ্রাম ত্রিতয়ের অপেক্ষা আরও

অনেক গ্রাম কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু মনুষ্যকণ্ঠে প্রোক্ত গ্রাম ত্রিতয়ের অধিক স্বর বিনির্গত হয় না বলিয়া, ত্রিসপ্তকের উপাদানভূত একবিংশ শুদ্ধ স্বরগ্রহণ করিয়াছেন। প্রতীচ্য সঙ্গীতকলাবিদ্‌গণ, এই স্বরগ্রামকে "অক্টেভ্‌" এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'অক্টেভ্‌' অর্থে 'অষ্টক' বুঝায়। সুতরাং ইংরাজী হিসাবে তিন অক্টেভের উপাদানভূত শুদ্ধ স্বরসমূহ সংখ্যায় চতুর্ব্বিংশতি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কার্য্যকালীন তৎ সমুদায়কে পাওয়া যায় না। ইংরাজী হিসাবে চতুর্ব্বিংশতি স্বর স্থলে ব্যবহারকালে আমরা মাত্র দ্বাবিংশতি স্বর পর্য্যায়ক্রমে গণনায় পাইয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুই বা ততোধিক গ্রাম একত্র গ্রহণ করিলে প্রতীচ্য শাস্ত্রোপদিষ্ট গ্রামের স্বরূপ-চ্যুতি ঘটে। ঔপপত্তিক রূপভ্রষ্ট স্বরগ্রামের উপর এই স্বরসঙ্গীত প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই স্বর সঙ্গতে (harmony) প্রতীচ্য কলাবিদেরা সুরের অলঙ্কার স্বরূপে ব্যবহার করেন। প্রতীচ্য সংস্কার সঞ্জাত এই স্বর সঙ্গতিরূপ অলঙ্কার দ্বারা পূজ্যপাদ রবীন্দ্র বাবু ভারতীয় সঙ্গীতকে বিমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের রাগ রাগিণীর আলাপে অভিব্যক্ত তান কর্ত্তবাদি ভারতীয় অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে তিনি বিদেশীয় "স্বর সঙ্গতি" রূপ অলঙ্কার ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু লিখিতেছেন, "হার্ম্মাণি ইউরোপীয় সঙ্গীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি একান্তভাবে তাকে ইউরোপীয় বলিতে হয়, তবে একথাও বলিতে হইবে যে, যে দেহতত্ত্ব অনুসারে ইউরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে, সেটা ইউরোপীয়, অতএব বাঙ্গালীদেহে ওটা চালাইলে ভুল হইবে। হারমণি যদি দেশবিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হইত তবে ত কথাই ছিল না। কিন্তু যেহেতু এটা সত্যবস্তু ইহার সম্বন্ধে দেশকালের নিষেধ নাই।"

কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর লেখনীপ্রসূত এবংবিধ কথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রতিপাদ স্বরূপে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে হিন্দু রাগাদির যে চিত্রাঙ্কণে নাদতত্ত্ববিদ কর্তৃক "কর্ত্তব" রূপে স্মরণাতীত কাল হইতে উপদিষ্ট ও অবধারিত হইয়াছে, তাহাকে বর্জ্জন করিয়া রাগিণীবিশেষে স্বরূপ ভ্রষ্ট করিবার এমন কি বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছে? ভারতীয় রাগিণী বিশেষের আলাপে অভিব্যক্ত তানকর্ত্তব্যাদি রূপে যে অলঙ্কারাদি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি তাহা তদ্‌রাগিণীর উপাদানভূত সমবাদী অনুবাদাদিভেদে স্বরাদিরই বিক্ষেপ প্রক্ষেপ প্রস্তার প্রকম্পন সমুদ্ভূত। রাগিণীবিশেষকে প্রোক্ত তানকর্ত্তবাদি বিবর্জ্জিত করিয়া গান করিলে সমান প্রসবাত্মিকা স্বরূপ তাহার যে জাতিগত লক্ষণ বিশেষ বিনষ্ট হইবে তাহা নহে, বৈরীস্থানীয় বিবাদীস্বর সাহায্যে বিজাতীয় কৃত্রিম অলঙ্কারে তাহাকে বিমণ্ডিত করিলে তাহার বৈজাত্য সজ্ঘটন হইবে। যদি বৈজাত্য সজ্ঘটনই উন্নতিবিধায়করূপে অবধারিত হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। আমার

ধারণা, নিরন্তর বৈজাত্য সঙ্ঘটনে জাতীয় আত্মবিলোপ অবশ্যম্ভাবী। আজ আমরা সকলে যদি বিজাতীয় ভাবাপন্ন হই, তাহাদের বেশ ভূষায় বিভূষিত হই, দশবিধ সংস্কার পরিবর্জ্জন করিয়া, আচার ব্যবহারে প্রিয়ার সম্ভাষণে যদি কেবল বিজাতীয় ভাব ও ছাঁদ অনুকরণ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের জাতিগত ব্যক্তিত্ব বিশেষত্ব বিলোপের সহিত, অতীত কাহিনী হইতে আমরা যে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িব, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতি বিধানটি যে, স্বাভাবিক নহে, ইহা বিজাতীয় সংস্কারসঞ্জাত বা কৃত্রিম পদার্থ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

Strangways সাহেব প্রাচ্য-প্রতীচ্য সঙ্গীত ব্যবহৃত অলঙ্কার বিশেষের তুলনাবসরে বলিয়াছেন, "We think of grace notes as something added to the note, not as something actually inherent in it * * * Indian grace is different in kind, there is not the least suggestion of anything having been added to the note which is graced !"

স্বরসঙ্গতি দেশ কালাবচ্ছিন্ন, বিজাতীয় সংস্কারজাত লক্ষণে বিভিন্ন, হিন্দু রাগরাগিণী বিশেষে তান কর্ত্তব স্থানে তৎযোজনার প্রশ্রয় প্রদান করিলে জাতীয় সঙ্গীত মুক্তি না পাইয়া, বিজাত্য সংঘটনক্রমে একান্তভাবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

আর এক কথা।—কেহ কেহ বলেন, ইহা বর্ব্বরজনোচিত। সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ Roussem বলিয়াছেন, স্বরসঙ্গতি বিধানটি অসভ্য Goth জাতি কর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল এবং সঙ্গীতে ইহা স্থূলদর্শিতা-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এবংবিধ মতদ্বৈধ বর্ত্তমান, যাহা অত্যন্ত আধুনিক এবং যাহার স্বরূপ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, হিন্দুসঙ্গীত সেই বিজাতীয় বেশে বিমণ্ডিত ও তদ্ভাবে ভাবিত করিবার যে চেষ্টা জাতীয় জীবনের সাধকদিগের পক্ষে তাহা কতদূর নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য, সুধীগণই তাহার বিচার করিবেন।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয় শিল্পসাহিত্য বিদ্যাদির সংস্কার সাধন আবশ্যক ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু সংস্কারাদিও সাজাত্য সংরক্ষণাবসরেই করিতে হইবে। দেহে যে বিস্ফোটক হইয়াছে, তাহা যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়াবলম্বনে আরোগ্য না হইয়া যায়, তবেই অস্ত্রদ্বারা তাহার চিকিৎসা করিতেই হইবে। নচেৎ স্ফোটক দর্শনেই অস্ত্রচালাইবার যে ব্যবস্থা তাহা সভ্যতার পরিচায়ক নহে। তাহা বর্ব্বরোচিত কসাই গিরী।—প্রতীচ্য দেহতত্ত্ববিজ্ঞানানুমোদিত অস্ত্রবিদ্যা প্রাচ্য দেহে প্রয়োগ করিলে দেহের বৈজাত্য সংগঠিত হয় না সত্য, কেননা তাহা ব্যাধি বিনাশের উপায়মাত্র; কিন্তু হিন্দুসঙ্গীতে প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতি বিধানটি অস্মদ্দেশীয় সঙ্গীতের তৎস্থানীয় নহে। পূজ্যপাদ

কবির একথাটি একটু অনুধাবন করিয়া বুঝা উচিত ছিল। বিলাতী অস্ত্র অস্মদ্দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে না। আর যেখানে তাহা থাকে, তখন তাহা তৎ দেহকে দুর্ব্বল করিতেই থাকে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কীর্ত্তনাদি বাউল সঙ্গীত শাস্ত্র-ছাড়া ব্যাপার নহে। তৎসমুদয়ই সংকীর্ণ রাগিণীরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাহার তাল তত্ত্বও তন্নিয়মে নিয়মিত।

ভারতীয় সঙ্গীত সুস্বরানুক্রমণ প্রধান (melody) প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, স্বরানুক্রমণের পুষ্টি সাধনজন্য স্বরসংগতি (Harmony) ব্যবহার হইয়া থাকে; ভারতে কিন্তু এই স্বরানুক্রমণের পুষ্টিসাধনরূপে বিবাদী (Dissonent) স্বর বর্জ্জন করিয়া বাদী, সমবাদী অনুবাদী স্বরসমূহের ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন বেহাগ উপরাগে ঋষভ ও ধৈবত বিবাদীবর্জ্জন করিয়া গান্ধার বাদী, নিষাদ গ্রহ এবং বক্রী সমুদায়গুলি অনুবাদী স্বরূপে ব্যবহার নিবন্ধনই রাগটির সুস্বরানুক্রমনটি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যজগতের স্বর সংগতিজনিত পুষ্টিসাধন বিধিটি যদি ভারতের সুস্বরানু-ক্রমিকপ্রধান সঙ্গীতের স্বরূপ বিনাশ করে, তাহা হইলে সরল ভাষায় বলিতে হইবে, তৎবিজাতীয় স্বর সঙ্গীত প্রথাবলম্বনে ভারতীয় সংগীতের পুষ্টিসাধন প্রয়াস পুত্রকামনায় পতির মস্তক চর্ব্বণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এবম্বিধ সংস্কারসাধনে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না, বরং আত্মবিলোপই ঘটিয়া থাকে। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, ভোগায়াতন শরীর ছিন্নভিন্ন করিলে যদি মুক্তি করতলগত হইত, তাহা হইলে শৃগালেরাও দেহপাতে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই বলিতেছি, রবীন্দ্রবাবু কথিত সংস্কার সঙ্গীতের মুক্তি নহে তাহার মহানির্ব্বাণ প্রাপ্তি। Stangways সাহেবও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন। And the first thing that harmony would do, if now applied even tentatively would be to get rid of that feeling and those functions and with them of the grace notes and all that makes Rag worth having * * * To add harmony to it is to kill it. *

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি।

* সঙ্গীত-পরিষদের সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী যাদুমণি দাসী ও গুণী মার্দ্দঙ্গী শ্রীযুত রামব্রহ্ম শর্ম্মার সাহায্য ব্যতীত আমি এ প্রবন্ধ বুঝাইতে ও গুছাইয়া লিখিতে পারিতাম না, এজন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ।

লেখক।

গান

তোমায় আমায় হবে দেখা-শোনা,
এ কথা অন্যে যে মানা।
শুধু তুমি আমি দুজন রব
আর সেথা কেউ রবে না—
হবে দেখা-শোনা!
লাজের আঁচল খুলে দিয়ে মোর,
এ যৌবন-ফুল মধু পিয়ে,
হবে তুমি ভোর,
তোমার আমার মিলন হ'লে,
মিটবে বাসনা—
হবে দেখা শোনা!
ভোমরা রে মোর ভোমরা,
হৃদ্-কমলের পাপড়ি মাঝে—
রবে তুমি ধরা,
তোমায় আমায় মিলে যাব—
চেনা যাবে না,—
আর তফাৎ হবে না—
আর সবারে ফেলে দিয়ে,
কর্‌ব তোমার সাধনা—
কবে হবে দেখা-শোনা!

শ্রীঃ—

———

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

চতুর্থ বর্ষ] প্রথম খণ্ড [পঞ্চম সংখ্যা

চৈত্র, ১৩২৪ সাল।

সূচী।

ভ্রমবশতঃ চৈত্র মাসের "নারায়ণের" পত্রাঙ্কে ৩৪৯ হইতে ৩৫৪স্থলে ৩৫৯ হইতে ৩৬৪ হইয়াছে। মুদ্রাকর

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"বসুমতী প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩২৪ সাল।

ধর্ম্মতত্ত্ব-মীমাংসা

বেদে বৈতানিক অগ্নির উল্লেখ আছে। যে সমস্ত কর্ম্ম বৈতানিক অগ্নিতে সম্পাদন করা হয়, তাহা শ্রৌত ও যে সমস্ত কর্ম্ম লৌকিক অগ্নিতে সম্পাদন করা হয়, তাহাকে স্মার্ত্ত কর্ম্ম বলা হয়। যথা চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি।

এই সমস্ত কর্ম্মের পুরাতন সংজ্ঞা গৃহকর্ম্ম। যে সমস্ত সূত্রে এই সমস্ত কর্ম্মের বিধান লিখিত আছে, তাহাকে গৃহসূত্র বলা হয়। বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত ধর্ম্ম স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম নামে অভিহিত, তাহার অল্প অংশ এই সমস্ত সূত্র হইতে সংগৃহীত এবং অধিকাংশ পরে পরে সংগৃহীত। সূত্রোক্ত স্মার্ত্ত কর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান স্মার্ত্তধর্ম্মের স্বল্প সম্বন্ধ। এই শ্রৌত সময়ের পরেই স্মৃতি সকলের সময়। কিন্তু বর্ত্তমান স্মার্ত্তধর্ম্মে এই স্মৃতি সকলের অধিক সংশ্রব নাই। ইহাতে যে অনেক নির্ম্মূল ও মনঃকল্পিত বিষয় মিশ্রিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

স্মৃতি সকলকে স্মার্ত্তধর্ম্মের আধার বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু স্মার্ত্তধর্ম্মের সংগ্রহ গ্রন্থ সমুদয়ে যে সমস্ত প্রমাণ বচন উল্লিখিত হয়, তাহা মূল স্মৃতি সংহিতাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার নিদর্শন আমরা পরে দিব। প্রথমে মূল সংহিতা সকলের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হউক।

স্মৃতিশাস্ত্রের মীমাংসার একটী পরিভাষা আছে—

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে

অর্থ—মনুস্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি হইবে, তাহা অপ্রমাণ এবং সমস্ত স্মৃতি

সংহিতাতে মনুর আদর করা হইয়াছে। কোনও অর্থকে বিশেষ রূপে প্রমাণিত করিতে গিয়া সকল স্মৃতিকারই বলিয়া থাকেন, "ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ"—এই কথা মনু বলিয়াছেন। এতদ্বারা নিশ্চয় অনুমান হয় যে, মনুস্মৃতি সমস্ত স্মৃতিমণ্ডলের চূড়ামণি। মনুস্মৃতির আলোচনা হইলেই সমস্ত স্মৃতির আলোচনা হইতে পারে।

বর্ত্তমানে প্রচলিত মনুস্মৃতি সেই বাস্তবিক প্রাচীন মনুস্মৃতি কিংবা অর্ব্বাচীন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত মনুসংহিতা এই একটি সংশয়ের বিষয়। এইরূপ সংশয়ের কারণও আছে। বর্ত্তমান মনুস্মৃতির মেধাতিথি ভট্টের টীকায় একটি শ্লোক পাওয়া যায়।

মান্যা কাপি মনুস্মৃতিস্তদুচিতা টীকাহি মেধাতিথেঃ
সা লুপ্তৈব বিধেবর্শাৎ ক্বচিদপি প্রাপ্তং ন যৎ পুস্তকং
ক্ষৌণীন্দ্রো মদনঃ সহারণসুতো দেশান্তরোদাহৃতৈঃ
জীর্ণোদ্ধারমচীকরৎ তত ইতঃ তৎ পুস্তকৈর্লেখিতৈঃ।

মনুঃ অঃ ৩ শ্লোঃ ২৮৬

অর্থ—মান্যা কোন একটি মনুস্মৃতি ছিল ও তাহারই উচিত মেধাতিথির যে টীকা ছিল, তাহা বিধিবশে লুপ্ত হইয়া যায়। এমন কি, যে পুস্তক কোথাও প্রাপ্ত হয় নাই। তখন সাহারণের পুত্র মদনরাজা দেশ বিদেশ হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ও এদিক সেদিক হইতে লিখিত বচনের সংগ্রহ করিয়া মনুস্মৃতির জীর্ণোদ্ধার করিলেন।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, বর্ত্তমান মনুস্মৃতি প্রাচীন মনুস্মৃতি নহে। ইহা মদন-রাজা কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ সংগৃহীত একটি সংগ্রহ মাত্র। মনুস্মৃতি সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ে এরূপ একটি অন্ধবিশ্বাস জটিল হইয়া রহিয়াছে যে, মনুস্মৃতি সম্বন্ধে ওষ্ঠস্পন্দন করিলেই চতুর্দ্দিক হইতে সমাজ খড়্গহস্ত হয়। কিন্তু সত্যের অপলাপ করাও মহাপাপ, তজ্জন্য এই আলোচনা করা হইতেছে।

বর্ত্তমান মনুস্মৃতি যে অর্ব্বাচীন তৎসম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্মরন্তি চ

ব্রহ্মসূত্র অঃ ১ পাঃ ১ সূঃ ১৪

শঙ্করভাষ্য—

অপিচ মনুব্যাস প্রভৃতয়ঃ শিষ্টাঃ সংযমনে পুরে যমা-
য়ত্তং কপুয়কর্ম্ম—বিপাকং স্মরন্তি নাচিকেতোপাখ্যানাদিষু।

অর্থ—মনু ও ব্যাস আদি শিষ্টজন সংযমনপুরে যমের আয়ত্ত পাপকর্ম্মের ফল নাচিকেত উপাখ্যানাদিতে স্মরণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রতীত হয় যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সময়ে প্রচলিত মনুস্মৃতিতে নাচিকেতের উপাখ্যান ছিল। বর্ত্তমান মনুস্মৃতিতে নাচিকেত উপাখ্যান নাই, অতএব ইহা অর্ব্বাচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নির্ণয়সিন্ধুনির্ণয়ামৃত আদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত প্রমাণ বচন মনুস্মৃতির নাম দিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সে সমস্ত বচন বর্ত্তমান মনুস্মৃতিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন মনুস্মৃতিতে সেই সমস্ত বচন ছিল, পরে মদনরাজার সংগৃহীত বর্ত্তমান মনুস্মৃতিতে সেই বচন সংগ্রহ করা যাইতে পারিল না। অতএব বর্ত্তমান মনুস্মৃতিতে সেই সমস্ত বচন নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা মনুস্মৃতিতে অপ্রাপ্ত বচন সকলকে মনুস্মৃতির নাম দিয়া প্রমাণ-রূপে উদ্ধৃত করা ধর্ম্মজগতে একটি প্রবল প্রতারণার কার্য্য বলিতে পারা যায়। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তা সকলকে এই দোষে দূষিত করিতে হয়। এস্থানে মনুস্মৃতির অর্ব্বাচীনতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র-সংগ্রহকর্ত্তাগণের প্রতারকতা, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য।

এই ত গেল বর্ত্তমান মনুস্মৃতির অবস্থা। প্রাচীন মনুস্মৃতি সম্বন্ধেও বৈদিক সময়ের প্রাজ্ঞগণের কিরূপ মত ছিল, তাহাও নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের নিজকৃত ভাষ্যে এই মীমাংসা করিয়াছেন যে, মনুস্মৃতির সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ।

ইতরেষাম্ চানুপলব্ধেঃ।

ব্রহ্মসূত্র অঃ ২ পাঃ ১ সূঃ ২

শঙ্কর ভাষ্য—প্রধানাদিতরাণি যানি প্রধান
পরিনামিত্বেন স্মৃতৌ বিকল্পিতানি মহদাদিনি,
নতানি বেদে লোকে বোপলভ্যংতে ভূতেন্দ্রিয়ানি
তাবৎ লোক বেদ প্রসিদ্ধত্বাৎ শক্যংতে স্মর্তুং অলোক
বেদ প্রসিদ্ধত্বাৎ তুমহদাদিনাম্ ষষ্ঠস্যে বেন্দ্রিয়ার্থস্তন্
স্মৃতি রব কল্পতে।

অর্থ—প্রধান হইতে ইতর প্রধানের পরিণামরূপে যে মহাদাদি তত্ত্ব স্মৃতি শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে, তাহা বেদে ও লোকে পাওয়া যায় না। ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে স্মরণ করিতে পারা যায়, কিন্তু লোকে ও বেদে অপ্রসিদ্ধ মহাদাদি তত্ত্বের স্মৃতি কল্পনা করিতে পারা যায় না। যেরূপ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ার্থের ভিন্ন, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ নাই।

এই শঙ্কর ভাষ্যে মনুস্মৃতিতে কথিত

মহান্তমেব চাত্মানং

১ অধ্যায় ১৫ শ্লোকের উক্ত মহতত্ত্বের কল্পনাকে খণ্ডন করা হইয়াছে ও মহতত্ত্বের কল্পনাকে বেদবিরুদ্ধ বলা হইয়াছে।

এ স্থানে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, শ্রৌতমত ও স্মার্ত্তমতে প্রভেদ কি ? যে মতে চৈতন্য পুরুষ ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই মত "শ্রৌত-মত" অর্থাৎ বৈদিক মত। যে মতে জড় প্রকৃতিকে জগৎ কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই মত "স্মার্ত্তমত"। স্মার্ত্তমতের এই লক্ষণ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্যে মনুস্মৃতির প্রমাণ উদ্ধার করিয়া স্মার্ত্তমতের খণ্ডন করিয়াছেন।

স্যাদেতৎ অদৃষ্টত্বাদয়ো ধর্ম্মা সাংখ্য স্মৃতি-
কল্পিতস্য প্রধানস্যাপ্যুপপদ্যংতে রূপাদি-হীন তয়া
তস্য তৈ রভ্যুপগমাৎ অপ্রতর্ক্য মবিজ্ঞেয়ং
প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ইতি হি স্মরন্তি।

অর্থ। সাংখ্যশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র কল্পিত প্রধানের ও অদৃষ্টত্ব আদি ধর্ম্ম হইতে পারে। কেন না, তাহারা (স্মার্ত্তগণ) তাহাকে (জড়-প্রকৃতিকে) রূপাদিহীন বলিয়া থাকেন। যেরূপ মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে 'যে সেই জগৎ কারণ অপ্রতর্ক্য (তর্ক করিতে পারা যায় না) অবিজ্ঞেয় (জানিতে পারা যায় না) ও সর্ব্বত প্রসুপ্তের ন্যায় ছিল'।

মনুস্মৃতির কোন কোন টীকাকার ও কয়েক জন গোঁড়া ভক্ত এই শ্লোকে অপ্র-তর্ক্য, অবিজ্ঞেয় আদি শব্দকে ব্রহ্মপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাহাদের ভাব এই যে মনু স্মৃতিতে উক্ত শ্লোকে যে জগৎ কারণের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেটি প্রধা-নের নয়, কিন্তু ব্রহ্মের। যেহেতু ব্রহ্মই অপ্রতর্ক্য ও অবিজ্ঞেয়।

কিন্তু শঙ্কর ভাষ্যের টীকাকার গোবিন্দানন্দ-স্বামী এ স্থানের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় প্রধান-কেই নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রধানম্ মহদাদি ক্রমেণ কথম্ প্রবর্ত্তত
ইতি তর্কস্য অবিষয় ইত্যাহ অপ্রতর্ক্যমিতি,
রূপাদি হীনত্বাদবিজ্ঞেয়ং, সর্ব্বতোদিক্ষু
প্রসুপ্ত মিব তিষ্ঠতি জড়ত্বাদিত্যর্থঃ।

অর্থ—প্রধান মহদাদি ক্রমে কিরূপে প্রবর্ত্ত হয়, ইহা তর্কের বিষয় নয় বলিয়া প্রধা-নকে অপ্রতক্য বলা হয়। আর রূপাদি হীন বলিয়া অবিজ্ঞেয় এবম্ সর্ব্বদিকেই প্রসু-প্তের সমান স্থিত থাকে, যেহেতু জড়।

এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে মনুস্মৃতির এই বাক্যকে ব্রহ্ম পর ব্যাখ্যা না করিয়া প্রধান পর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, শঙ্করভাষ্যে যে 'অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং, প্রসুপ্তমিব, সর্ব্বতঃ' বচন উদ্ধার করা হইয়াছে, ইহা মনুস্মৃতির নহে; কিন্তু আর কোন সাংখ্যশাস্ত্রের বচন।

কিন্তু একথা একেবারে অসঙ্গত। যেহেতু এই বচনটি আর কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্মৃতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যে বেদবিরুদ্ধ, ইহা প্রাচীন কালের অনেক দর্শনশাস্ত্রেও প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ—

জৈমিনি সূত্র অঃ পাঃ সূঃ

অর্থ।—যথায় শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হয়, তথায় স্মৃতিবাক্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অনাদরণীয় ও অপ্রমাণ।

এইরূপ মীমাংসা স্মৃতি শাস্ত্রে দেখা যায়।

জাবাল বলিতেছেন,—

'শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী'

অর্থ।—শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই বলবতী।

ব্রহ্ম সূত্র ২য় অধ্যায় ১ম পাদ ১ম সূত্র ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্য নবকাশ প্রসঙ্গো ন দোষঃ।

অতএব বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতির অনবকাশ প্রসঙ্গ দোষ নাই। উপরি-লিখিত এই সকল প্রমাণে প্রতিপন্ন হয় যে, স্মৃতি-শাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত ও মত বেদবিরুদ্ধ।

স্মার্ত্ত-পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, স্মৃতি সকল বেদের অর্থ স্মরণ করিয়া ঋষিগণ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব বেদের মতই স্মৃতির আদর করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, স্মৃতি-শাস্ত্রে অনেক বিষয় আছে, যাহা বেদবিরুদ্ধ। কেহই বলিতে পারেন না যে, স্মৃতি যদি বেদার্থ হয়, তবে তাহাতে বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও মত কিরূপে সংগৃহীত হইল। মূলগ্রন্থের অর্থ যদি মূলগ্রন্থ হইতে বিরুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে অর্থ না বলিয়া খণ্ডন বলা উচিত।

অনেক বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে যে বেদ ও স্মৃতির বিরোধ, তাহার সমন্বয় করিবার চেষ্টা স্মার্ত্ত-পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন। কিন্তু মূল সিদ্ধান্তে যে বিরোধ, তাহা কেহ মিটাইতে পারেন না। অর্থাৎ চেতন ঈশ্বরকে জগৎ কারণ বলিয়া স্থাপন করা "শ্রৌত-সিদ্ধান্ত" ও জড়-প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলিয়া স্থাপন করা "স্মার্ত্ত-সিদ্ধান্ত"।

যখন মূলেই গুরুতর বিরোধ, তখন পত্র-পুষ্প ফলে যে বিভেদ হইবে না; তাহা কে বলিতে পারে?

পূর্ব্ব-মীমাংসার বার্ত্তিককার মনুস্মৃতির নাম উল্লেখ করিয়া তাহার বেদ বিরুদ্ধতা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

তেন যদ্যপি লভ্যেত স্মৃতি কাচিৎ বিরোধিনা
মন্বাদ্যুক্তা তথা প্যাশ্রিয়ে তদেবোপ যুজ্যতে
ত্রয়ী মার্গস্থ সিদ্ধস্থ যে হ্যত্যং তদ্বিরোধিনঃ
অনিরাকৃত্য তান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্ম শুদ্ধির্ন লভ্যাত। মীমাংসা বার্ত্তিক ১।৩।১০

অর্থ।—এই হেতুতে যদ্যাপি মন্বাদ্যুক্ত কোনও স্মৃতিতে বেদবিরুদ্ধ ভাব পাওয়া যায়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে ইহাই করা উচিত যে, স্বতঃসিদ্ধ বেদ-মার্গের যে কেহ অত্যন্ত বিরোধী হয়, তাহাকে নিরাকরণ করিলে ধর্ম্ম শুদ্ধি হয় না।

ইহাতে স্মৃতি সকল যে বেদ-বিরুদ্ধ, তাহা সিদ্ধ হয়। শুধু বিরুদ্ধ মাত্র নয়, বার্ত্তিক-কার বলেন, অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সেই সকল বিরোধী স্মৃতিশাস্ত্রকে নিরাকরণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে বৈদিক ধর্ম্মের শুদ্ধি হইতে পারে না।

স্মৃতি-শাস্ত্রের যে মূল সিদ্ধান্তই বেদ-বিরুদ্ধ, তাহার নিদর্শন আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। উত্তর-মীমাংসার সূত্রকার ভগবান ব্যাসদেবও এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপনা করিয়াছেন।

নচ স্মার্ত্ত মতাদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ শারীরশ্চ। ব্রহ্মসূত্র ১।২।২০

অর্থ।—স্মার্ত্ত (স্মৃতিশাস্ত্রে জগতের কারণরূপে প্রতিপাদিত) প্রধান (জড়-প্রকৃতি) জগতের কারণ নহে! কেন না, অতদ্ধর্ম্ম অভিলাপ (জগৎ-কারণে চেতনের ধর্ম্ম ঈক্ষণের কথন) হেতুক। বেদে দেখা যায় যে, যিনি জগতের কারণ, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে মনে ভাবিলেন—

(একোহং বহু) এক আমি বহুরূপ হই। জড় প্রকৃতির জ্ঞান নাই। সে কোনও বিষয় ভাবনা করিতে পারে না। অতএব স্মৃতিশাস্ত্রে যে জড়-প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা বেদ-বিরুদ্ধ।

যে সমস্ত শাস্ত্রে জড়-প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রের নাম স্মৃতি-শাস্ত্র। এই বিষয়টি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সর্ব্বসমবাদিনীতে বিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

নমু 'নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাদিত্যত্র প্রধানং
স্মৃত্যুক্তমেব, নচ শ্রৌতমিতি প্রতিপাদয়তা
শ্রীবাদরায়নেন পুরাণানামপি প্রাধানিক প্রক্রিয়ত্বাৎ
স্মৃতি ত্বং বোধ্যতে, ন তত্র স্বতন্ত্রং যৎপ্রধানং
তদেব নিষেধয়তা তেন প্রধান স্বাতন্ত্র্য প্রতি-
পাদকং সাঙ্খ্য দর্শনমেব স্মৃতিঃ তেন মন্যতে,
'তদধীনত্বা দর্থব' দিতি সূত্রান্তরেণ হি পরমেশ্বরাধীন
তয়া— বিশ্রুত মধ্যা কৃতাদ্য পর পর্য্যাঙ্গং মন্যতে

এব প্রধানম্। তথাচ পুরাণে দৃষ্টমিতি ন স্মৃতি-
সাধারণ্যং তস্যেতি বেদত্বমেব স্থিতম্।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পুরাণ সকল স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য। যে হেতু "স্মার্ত্তমতং ধর্ম্মাভিলাপাৎ" সূত্রে ভগবান ব্যাসদেব এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্রধানের জগৎ-কারণতা স্মৃতি প্রতিপাদিত। শ্রুতি প্রতিপাদিত নহে। যে সমস্ত-শাস্ত্রে প্রধানকে কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাই স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতি-শাস্ত্রের যখন এই লক্ষণ, তখন পুরাণ সকলকেও স্মৃতিশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। কেন না, পুরাণ সকলেও প্রধান ক্রমেতেই সৃষ্টির বর্ণনা করা হইয়াছে। (ইহা হইল পূর্ব্বপক্ষ) ইহার সিদ্ধান্ত শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন যে, স্বতন্ত্ররূপে প্রধানকে যে শাস্ত্রে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে, তাহাই স্মৃতিশাস্ত্র। অর্থাৎ সাংখ্য স্মৃতির অনুগত।

বেদে ঈশ্বর-প্রেরিত ও ঈশ্বরাধীন প্রধানকে জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। পুরাণ সকলেও এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। অতএব পুরাণ পঞ্চম বেদ। পুরাণ স্মৃতি নহে। এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জগৎ-কারণ-বাদ 'স্মার্ত্ত সিদ্ধান্ত' আর চিৎ-কারণ-বাদ 'বৈদিক-সিদ্ধান্ত'।

স্মার্ত্ত-সিদ্ধান্তের জড়-কারণ-বাদত্বের আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহাতে পঞ্চদেব উপাসনা দেখা যায়। যদ্যপি মনুস্মৃতিতে পঞ্চদেব উপাসনার উল্লেখ নাই, তথাপি বর্ত্তমান স্মার্ত্তধর্ম্মে পঞ্চদেব উপাসনাই প্রধান। অতএব ইহার বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। পঞ্চদেব উপাসনার এই প্রথা—দুর্গা, শিব, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুর পূজা হয়। তন্মধ্যে একটি দেবতাকে মধ্যে স্থাপন করা হয় এবং অপর চারিটি দেবতাকে চারি দিকে স্থাপন করা হয়। যে দেবতাকে মধ্যে স্থাপন করা হয়, সেইটি প্রধান; অপর চারিটি তাহার অঙ্গ। বোধ হয় ইহা যেন পাঁচটি দেবতার একটি কমিটী। যিনি মধ্যে বসিবেন, তিনি চেয়ারম্যান, অপরগুলি অর্ডিনারী মেম্বর। কিন্তু চেয়ার-ম্যান পারমানেণ্ট নহেন। কখনও দুর্গা মধ্যে বসেন। কখনও বা শিব এবং কখনও বা অন্য দেবতাকেও মধ্যস্থানে দৃষ্ট হয়। যে দিন যাহার জন্য ভোট সংগ্রহ হয়, সেইদিন তিনিই চেয়ারম্যান। স্মার্ত্তমতপোষকগণ আমার স্মার্ত্তবান্ধবগণ বলিয়া থাকেন যে, স্মার্ত্তধর্ম্মে সাম্যবাদ নিহিত আছে। এ কথা শুনিতে বড় সুন্দর। আহা! স্মার্ত্ত-ধর্ম্মে কাহারও সঙ্গে কোনও বিদ্বেষ ভাব নাই—সকলই সমান। এই সাম্যবাদটি জড়োপাসনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু স্মার্ত্ত-সিদ্ধান্তে এই পঞ্চ দেবতার এইরূপে স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। দুর্গা (পৃথিবী) তিনি সর্ব্বাধার স্বরূপা। শিব (জলতত্ত্ব) এইজন্য তাহার মস্তকে সর্ব্বদা গঙ্গাজলধারা দেখা যায়। গণেশ (বায়ুতত্ত্ব) বায়ুতেই

শরীর পুষ্ট হয়। সূর্য্য (তেজসতত্ত্ব) প্রত্যক্ষে তেজরূপ। ও বিষ্ণু (আকাশতত্ত্ব)। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

নানাকার মনাকারং গগনাকারং
প্রণমত গোবিন্দম্ পরমানন্দম্।

এইরূপে পৃথিবী জল বায়ু তেজ আকাশের উপাসনা করা হয়। পৃথিবী জল বায়ু তেজ ও আকাশ এই পাঁচটি বস্তু জড় ও প্রকৃতির বিভিন্ন বিকার মাত্র। একটি প্রকৃতির যখন পাঁচটি প্রভেদ, কাজেই সাম্য। পাঁচটি তত্ত্ব পৃথকরূপে হইলেও জড়ত্বে তাহারা সকলেই সমান।

চিৎ-তত্ত্বের উপাসনায় সাম্যবাদ আসিতে পারে না। যেহেতু সে একতত্ত্ব। এক বস্তু কাহারও সমান হইতে পারে না। এইজন্য তাহাকে বলা হইয়াছে—

ন তৎ সমশ্চাভ্যধিক শ্চ দৃশ্যতে

সুতরাং বৈদিকধর্ম্মে একটি পর তত্ত্বই উপাস্য। আর সেটি অদ্বিতীয় হওয়ায় অসমান। সুতরাং বৈদিক ধর্ম্মে সাম্যবাদ আসিতে পারে না। বিশেষতঃ সাম্যবাদ একটি লোক ভুলাইবার কথা। কেহই পঞ্চ দেবতাকে সাম্যভাবে উপাসনা করেন না। যিনি যাহাকে মধ্যে স্থাপন করেন, তিনি তাহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। অপর চারিটিকে তাহার অঙ্গ বলিয়া গণনা করেন। অঙ্গাঙ্গীভাব স্থাপন করিলে কি সাম্যভাব থাকিতে পারে? আর বাস্তবিক জগতে সাম্যভাব কেহই করিতে পারে না। একটি পতি দুইটি পত্নীকে সমানভাবে প্রীতি করিতে পারে না। একটি পিতা দুইটি পুত্রকে সমানভাবে স্নেহ করিতে পারে না। এমন কি, একটি পুরুষ দুইটি হাতে সমান ভাবে কাজ করিতে পারে না। তবে পঞ্চদেবতার উপাসনায় কিরূপে সাম্য থাকিতে পারে?

যদি বা পাঁচটি দেবতাকে সাম্যভাবে উপাসনা করা যায়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে সাধকের কি গতি হয়। সে কৈলাসে যাইবে না বৈকুণ্ঠে যাইবে? দুর্গালোকে যাইবে না গণেশ লোকে? যদি পাঁচটিই তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করেন, তবে তাহার মহা বিপদ। আর সাধক বলিতে পারেন না যে, আমি অমুক দেবতার লোকেই যাইব। কারণ তাহা হইলেই বৈষম্য হইয়া উঠে ও অপরটি দেবতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। আর তিনি যখন জীবদ্দশায় পাঁচটিকেই সমানভাবে সেবা করিয়াছিলেন, তখন মৃত্যুর পরে একটি দেবতার লোকে গিয়া কি অপর চারিটি দেবতার প্রতি ভক্তি তাহার মনে থাকিবে না ও তাহাদের জন্য কি তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইবে না? আর এই ব্যাকুলতা যদি থাকিল, তবে তাহার প্রাণে শান্তি কোথায়?

এই পঞ্চ দেবোপাসনাকেও বাস্তবিক স্মার্ত্তধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না। কারণ

মনু ও যাজ্ঞবল্ক আদি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। বরং মনুস্মৃতিতে গণেশাদি পূজনকারী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ ব্রাহ্মণমধ্যে গণ্য করা হইয়াছে—

শ্বক্রীড়ী শ্যেনজীবিচ কন্যাদূষক এবচ
হিংস্রো বৃষল বৃত্তিশ্চ গণানাংশ্চৈব যাজকঃ।

ইহাতে গণানাংশ্চৈব যাজক পদের ব্যাখ্যায় কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন, বিনায়কাদি গণ যাগ কৃৎ।

বিনায়ক শব্দে গণেশ
লম্বোদরশ্চ বিকট বিঘ্ন নাশো বিনায়ক।

অনেক বহুদর্শী পণ্ডিতগণের ইহাই বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান স্মার্ত্তধর্ম্ম শাক্তধর্ম্মের রূপান্তর। যেহেতু শাক্তধর্ম্মেই মদ্য, মাংস, ও পরস্ত্রী-সংসর্গের বাহুল্য দেখা যায়। এই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও বিরক্তিকর কার্য্যের দ্বারা সমাজ যখন উপদ্রুত হইল, তখনই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য শাক্তধর্ম্ম স্মার্ত্তধর্ম্মরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ও মদ্য মাংস স্ত্রীসহবাসের বিধানের পরিবর্ত্তে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। কিন্তু এ সকল কুবিধানের নিষেধ করিতে পারিলেন না।

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

(মনু অঃ ৫ শ্লোঃ ৫৬)

মাংস ভক্ষণে কোন দোষ নাই। মদ্য পানে কোন দোষ নাই। মৈথুনে কোন দোষ নাই। কারণ ইহা জীব মাত্রের প্রবৃত্তি। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে দোষ হয় না। নিবৃত্তিতে মহাফল। শাক্তধর্ম্ম রূপে যে মদ্য মাংস ও স্ত্রীসহবাসকে ধর্ম্মরূপে বিধান করা হইয়াছিল, স্মার্ত্তধর্ম্ম রূপে আসিয়া এই মাত্র পরিবর্ত্তন হইল যে, এই সকল কার্য্যে নিবৃত্তিতে মহাফল; কিন্তু ইহা করিলে কোন দোষ নাই।

মদ্যপান উন্মাদকর ও সমাজে নিতান্ত ঘৃণিত বলিয়া, স্মার্ত্তধর্ম্ম তাহাকে বিধান রূপে প্রচার করিতে পারিলেন না। কিন্তু মাংসের লোভ ছাড়া হইল না। অতএব মাংস ভক্ষণের যে কেবল বিধান মাত্র করা হইয়াছে তাহা নয়। কিন্তু বলাৎকারে মাংস ভক্ষণের অনুরোধ করা হইয়াছে। মাংস ভক্ষণ না করিলে যে অত্যন্ত দোষ হইবে, তাহাও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

নিযুক্তস্তু যথা ন্যায়ম্ যো মাংসম্ নাত্তি পুরুষঃ
সপ্রেত্য পশুতাম যাতি সম্ভবানেক বিংশতিম্।

(মনু অঃ ৫ শ্লোঃ ৩৫।)

অর্থ—শ্রাদ্ধ বা মধুপর্কে নিযুক্ত হইয়া যে মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করে না, সে মৃত্যুর পর এক বিংশতি জন্ম পর্য্যন্ত পশু হইবে।

মনে করুন, কত বলাৎকারে মাংস ভক্ষণের বিধান! একজন ব্রাহ্মণ, সে যদি সন্ধ্যা বন্দন ও অগ্নিহোত্রাদি না করে, তবে সে পতিত, কিংবা শূদ্র প্রায়। কিন্তু শ্রাদ্ধে মাংস না খাইলে একবিংশতি জন্ম পর্য্যন্ত পশু হইতে হইবে। মনে করুন, একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা বন্দন অগ্নিহোত্রাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু দৈবাৎ একদিন কোন স্মার্ত্ত বান্ধবের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া যদি অন্নাদি ব্যঞ্জনের সহিত পরিবেশিত মাংসকে ত্যাগ করেন। তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে একদিন মাংস ভক্ষণ না করায় তাঁহাকে একবিংশতি জন্ম পর্য্যন্ত পশু যোনি প্রাপ্ত হইতে হইল। সন্ধ্যা বন্দন গায়ত্রী জপ ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তাহাকে কিছুই রক্ষা করিতে পারিল না। মাংস ভক্ষণ কি পরম ধর্ম্ম! যদি বলেন এই বিধানটি যে, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বন্দন ও অগ্নি হোত্রাদি করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে নয়; কিন্তু যাহারা কোনই সৎকর্ম্ম করে না, তাহাদের পক্ষে ইহা প্রযুজ্য; আহা! কি প্রমাদ! যাহারা সর্ব্বতোভাবে সৎকর্ম্ম ও বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, তাহাদেরই এই দুর্দ্দশা। তাহাদিগকেই সমস্ত জীবনের মধ্যে এক-দিন মাংস না খাইলেই একুশ জন্ম পশু হইতে হইবে। কেন না,শ্রাদ্ধে এইরূপ ব্রাহ্মণেরই নিমন্ত্রণ বিধান।" ঋত্বিক্ বরণে মধু পর্কের বিধান। সমস্ত সৎকর্ম্ম সম্পন্ন ও বেদ-বিজ্ঞা না হইলে ঋত্বিক হইতে পারে না। শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মে একবারে মাংস ত দূরের কথা, "আমিষ অন্ন ও আমিষ ফল মূলাদি ভক্ষণ পর্য্যন্ত নিষেধ। কিন্তু স্মার্ত্তধর্ম্মে মাংস না খাইলে একুশ জন্ম পর্য্যন্ত পশু হইতে হইবে। ইহাতেই উভয় ধর্ম্মের মহত্ব বুঝিয়া লউন। কেনই বা মাংস ভক্ষণের জন্য এতদূর আগ্রহ, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। এতভিন্ন মনুস্মৃতিতে আরও একটি সিদ্ধান্তের ঘৃণিত বিধান আছে। তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাহাতে হিন্দু মাত্রের বড়ই কষ্ট হইবে।

বোধ হয় সাহরণ রাজার পুত্র মদন রাজা বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকটে মনুর নামে সংগৃহীত বচন সকল একত্র করিয়া এই বর্ত্তমান মনুস্মৃতি সংগ্রহ করেন, ও পরে নানা রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাহার সংশোধন করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী স্মৃতিরত্ন।
বৃন্দাবন।

আর একখানি পত্র

(বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও সিদ্ধদেহের কথা ।)

প্রণয়াস্পদেষু,

তোমার চিঠি পাইলাম। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সকল কথা যে আমার পূর্ব্ব পত্রে ভাল করিয়া বলা হয় নাই, ইহা বুঝি। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, আমাদের সকলেরই যে একটা স্বরূপ দেহ বা সিদ্ধ দেহ আছে, এই কথাটা সকলের আগে ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। আমাদের প্রত্যক্ষ রক্তমাংসের পার্থিব দেহটা এই স্বরূপ দেহ বা সিদ্ধ দেহ হইতেই জন্মিয়া, ঐ স্বরূপকেই বিশ্বের বিকাশ ধারাতে ফুটাইতেছে। তোমাদের আধুনিক ইভোলিউষণ-বাদে রেগুলেটিভ আইডিয়া (Regulative idea) বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছি। যে আইডিয়া বা আদর্শ ধরিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ইভোলিউষণ বা ক্রমাভিব্যক্তি হয়, যে আদর্শের দ্বারা এসকলের ক্রমবিকাশ নিয়মিত বা রেগুলেটেড (Regulated) হয়, তাহাকেই রেগুলেটিভ আইডিয়া কহে। আধুনিকেরা যাহাকে ইভোলিউষণ-বাদ বা ক্রমাভিব্যক্তি-বাদ কহেন, বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাধনায় তাহাকেই পরিণাম-বাদ কহিয়াছেন। আধুনিক ক্রমাভিব্যক্তিবাদে যাহাকে বস্তুর বিকাশের রেগুলেটিভ আইডিয়া কহে; আমাদের বৈষ্ণবপরিণামবাদে তাহাকেই সিদ্ধ দেহ কহিয়াছেন।

একদিন এসকল কথার কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না। এখনই যে নিঃশেষ বুঝিয়া ফেলিয়াছি, এমন স্পর্দ্ধা করি না। তবে কোন্ সূত্রে, কি অনুভব ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধদেহ ভক্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তার কিছুটা আভাস পাইয়াছি। সেটুকুই তোমাকে বলিতে পারি।

যৌবনের প্রথমে যখন বিশ্বজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, এই জগৎটা কোথা হইতে, কি করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া, একটা মনগড়া দ্বৈত-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ অনুভবে আমরা দুইটি বিজাতীয় বস্তু দেখিতে পাই, একটিকে চৈতন্য আর অপরটিকে জড় কহে। চৈতন্য আর জড় পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মসম্পন্ন। যাহা জড় তাহা চৈতন্য নহে, যাহা চৈতন্য তাহা জড় নহে। সুতরাং জড় হইতে চৈতন্যের কিম্বা চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি অসম্ভব। এই জন্য তখন বিশ্বের মূলে একটা অনাদি ও অনন্ত জড়ত্বে আর একটা অনাদি ও অনন্ত চেতনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রথম যৌবনের বিশ্বজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়াছিলাম।

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বেশি দিন টিঁকিল না। জড় আর চৈতন্য যেমন পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মসম্পন্ন বস্তু, সেইরূপ আবার ইহাদের মধ্যে নিত্যই একটা সম্বন্ধও ত দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য জড়কে চালায়। চৈতন্য চালক, জড় চালিত। জড় ও চৈতন্য যদি একান্তই বিরোধী বস্তু হয়, তবে জড় চেতনের এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ সম্ভব হয় কিসে? এই নূতন জিজ্ঞাসার উদয়ে প্রথম যৌবনের দ্বৈত-সিদ্ধান্তের মূল চলিয়া গেল। চৈতন্যই জড়কে চালাইয়া নেয়, জড় ত তেমন করিয়া চৈতন্যকে চালাইতে পারে না। ইহা দেখিয়া ক্রমে চৈতন্যই যে বড়, চৈতন্যই যে কর্ত্তা, চৈতন্যই যে জড়ের অধিনায়ক ও অধিকারী, এই ধারণা জন্মিতে লাগিল। এই পথ ধরিয়া, ক্রমে বিশ্বের মূলে এক অনাদ্যনন্ত চেতনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিলাম। ইহাই যৌবনের নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর-তত্ত্ব!

কিন্তু ইহাতেও ত সকল সমস্যার মীমাংসা, সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না। ক্রমে ক্রমে আবার নূতন প্রশ্ন উঠিল। জড় হইতে যেমন চৈতন্যের সম্ভব হয় না, হইতে পারে না, চৈতন্য হইতেই তবে জড় উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া? এই প্রশ্নের এক মাত্র উত্তর সম্ভব—যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহা বাস্তবিক জড় নহে, তাহাও চিদ্-বস্তু-জড় চৈতন্যেরই বিকার। তখন ইংরাজিতেই এসকল কথার বেশি আলোচনা করিতাম। তাই বলিলাম, matter is the thonght of god concretised man is the spirit of god incarnated—ভাগবতী চিন্তাই ঘনীভূত হইয়া জড়রূপ ধারণ করিয়াছে; ঈশ্বরের প্রাণ বা আত্মাই দেহধারণ করিয়া মানুষ হইয়াছে। এইরূপেই জড় ও জীব সকলই ব্রহ্মময় হইয়া উঠে।

কিন্তু ক্রমে আবার প্রশ্ন হইল, বিশ্বের প্রত্যক্ষ ভেদাভেদের মীমাংসা কোথায়? চৈতন্য হইতে যে জড়ের প্রকাশ হইল, ব্রহ্ম হইতে যে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা কি কালবিশেষে ঘটিয়াছে, না অনাদিকাল হইতেই আছে? অর্থাৎ আদিতে কেবল নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর মাত্র বিদ্যমান ছিলেন। তখন—

না ছিল এসব কিছু, আঁধার ছিল অতি
ঘোর দিগন্ত প্রসারী

এই কি সত্য? আর সেই একাধার আধার হইতে বিশ্বের বিচিত্র পদার্থসমূহের ক্রমাভিব্যক্তি হইয়াছে, একথা মানিতে পারিলাম না। সৃষ্টিব্যাপার যদি কালবিশেষের সংঘটিত হয়, তবে সৃষ্টির সূচনার পূর্ব্বে স্রষ্টার যে অবস্থা ছিল, তবে পরে সে অবস্থাও থাকিতে পারে না। কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তাতে পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। কিন্তু ঈশ্বরে পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। অতএব সৃষ্টিকেও অনাদি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, না করিলে স্রষ্টার বা ঈশ্বরের নিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মে।

কিন্তু সৃষ্টি যদি অনাদি হয়, তবে সৃষ্ট পদার্থেরও অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয় না কি? যদি বল চন্দ্র সূর্য্যাদি সৃষ্ট পদার্থ অনাদি নহে, একদিন এ সকল ছিল না, ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে; এ কথা অস্বীকার করিতে পারিব না। প্রত্যক্ষ জড়বিজ্ঞানও এ কথা প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু আবার সেই একই প্রশ্ন উঠে; চন্দ্রসূর্য্যাদি কি অবস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? অবস্তু হইতে বা অসৎ হইতে বস্তুর বা সত্তের উৎপত্তি অসাধ্য। সুতরাং হয়, বল যে চন্দ্রসূর্য্যাদি সত্য নহে, বস্তু নহে; অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুবৎ সর্পভ্রম মাত্র; নিরাকারে বা একাকারেতে আকার ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে; এ একটা উত্তর সম্ভব। কিন্তু যদি জগতের বিচিত্র পদার্থ সকলের সত্যতা ও বস্তুত্ব মানিতে হয়, তাহা হইলে, অনাদিকাল হইতে এ সকলের একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ eternally realised form ভগবানের স্বরূপের অন্তর্গত হইয়া আছে, এই একথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যেক পদার্থের এই অনাদিসিদ্ধ স্বরূপ বা eternally realised বা ideaকেই আমাদের বৈষ্ণব পরিভাষাতে সিদ্ধদেহ কহিয়াছেন।

মৃত্যুর আঘাত খাইয়া, সর্ব্বপ্রথমে এই তত্ত্বের আভাষ পাই। জীবনের আশ্রয় যেদিন ভাঙ্গিয়া যায়, সংসারের আলো যেদিন দমকা বাতাসের মুখে পড়িয়া সহসা নিভিয়া যায়, সেদিনই মানুষ প্রথম অমৃতেরও সন্ধান পায়। সেদিন মৃত্যুটা কঠোরতম নিষ্ঠুরতার সত্য হইয়া উঠে। সেদিন মরণটাই জীবনের সকল কথার চাইতে বড় কথা হইয়া পড়ে। অথচ তখনই আবার এই অতিবড় মৃত্যুটাকেও সত্য বলিয়া ধরিতে প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠে। মানুষ মরে, তখন একথা ভাবিতে বুক শুকাইয়া যায়, কথাটা বলিতেও মুখে আটকাইয়া আসে। এই মরণ আঁধারের মাঝে যে দিন শুনিলাম কোনও মানুষই বাস্তবিক মরে না; সাধু মহাজনেরা মৃত্যুতে সিদ্ধদেহ লাভ করেন, সাধারণ লোকে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, সেদিন মানসচক্ষে একটা অভুতপূর্ব্ব নূতন জগৎ খুলিয়া গেল।

মৃত্যুতে সাধুমহাজনেরাই নিজ নিজ সিদ্ধদেহ লাভ করেন, সকলে করে না বলিয়া, কেবল সাধুদিগেরই যে সিদ্ধদেহ আছে, সাধারণ লোকের নাই, তাহা নহে। জীব মাত্রেরই একটা সিদ্ধদেহ আছে। সাধারণ লোকে মৃত্যুতে যে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, আর জীবদ্দশায় তাহারা যে দেহেতে এ সংসারে বিচরণ করে, এই দুই দেহই তাহাদের সিদ্ধদেহের দ্বারা নিয়মিত হয়। এই মর দেহ, আর ঐ সূক্ষ্মদেহ, যাহা জীব মৃত্যুতে গ্রহণ করে, এই উভয়ের মধ্য দিয়াই প্রত্যেক জীবের জীবত্বের ক্রমাভিব্যক্তি বা ইভোলিউষণ হয়। আর এই অভিব্যক্তি ধারাতে তার ঐ সিদ্ধদেহই তার বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ও ধারণ করিয়া, এই অভিব্যক্তির বা ইভোলিউষণের রেগুলেটিভ্ আইডিয়া (regulative idea) বা নিয়ামক হইয়া রহে।

আমাদের সকলেরই এক একটা সিদ্ধদেহ আছে। কিন্তু নাস্তিক্য বুদ্ধিপ্রবণ আধুনিক যুক্তিবাদীকে এ কথা বলা বৃথা, বুঝান অসম্ভব। এই যুক্তিবাদ ঈশ্বর মানে, কিন্তু সে-ঈশ্বর যে-হেতু অতএব দিয়া গড়া। এই যুক্তিবাদ পরলোকও মানে, কিন্তু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলে, এই পরলোক একটা মানসকল্পনায় পরিণত হয়। এই যুক্তিবাদের মুখে মানুষ মরিলেই দেবতা হইয়া যায় "মোহমায়া পাশরি" সেই "আনন্দধামে" চলিয়া যায়, যেখানে জপ নাই, মৃত্যু নাই, পাপ নাই, তাপ নাই, আছে কেবল চিরশান্তি ও নিখুঁত পুণ্য। শূন্য বা নিরাকার আত্মা, শূন্য বা নিরাকার ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়া, মৃত্যুতে সেই নিরাকার শূন্যে বা ব্রহ্মে বিলীন হয়, এই যুক্তিবাদ সাহস করিয়া এ কথাটাও বলিতে পারে না। কিন্তু নিরাকার আত্মা মৃত্যুতে নিরাকারের কক্ষে যাইয়া, নিরাকার হইয়া অনন্ত উন্নতির নিরাকার পথে চলিতে থাকে, এই কথাই বলে। এই কিম্ভূতকিমাকার নিরাকারের পথে সিদ্ধদেহের কোনও স্থান নাই। দেহ মাত্রেই যে সাকার।

বৌদ্ধ-জাতক বুদ্ধদেবের অসংখ্য জন্ম-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যিশু খৃষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের ইতিহাসের কেতাবে তাই লেখে। কিন্তু জাতক বলেন, এই জন্মই বুদ্ধদেবের প্রথম জন্ম নহে। তিনি ইহার পূর্ব্বেও আরও অনেকবার জন্মিয়াছিলেন। অনেকবার জন্মিয়াছিলেন, একথা যদি মানিতে হয়, তবে জন্মিয়া আবার সেই-সেইবার মরিয়াও ছিলেন, ইহাও মানিতে হইবে। যে বুদ্ধ পূর্ব্বে অনেকবার জন্মিয়াছিলেন, জন্মিয়া অনেকবার মরিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধ পঁচিশ শ' বৎসর পূর্ব্বে কপিলবস্তুতে, শাক্যকুলে জন্মিয়াছিলেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই বুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা Individuality বা "ব্যক্তিত্ব", একটা Personality বা "পুরুষবিধত্ব" প্রতিষ্ঠিত হয় না কি? যাহা নিতান্ত নিরাকার, তার কোনও বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব বা পুরুষবিধত্ব ত সম্ভব হয় না। নিরাকার অর্থই ত যার কোনও সীমানা, কোনও নির্দ্দেশ, কোনও সংজ্ঞা, কোনও চিহ্ন নাই। নিরাকার আর একাকার ত একই কথা। অতএব ব্যক্তিত্ব বা Individuality পুরুষবিধত্ব বা Personality মানিলেই আকার মানিতে হয়। এই আকার যে সর্ব্বথা স্থূল, চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, এমন হইতেই হইবে, একথা বলি না। কিন্তু স্থূল না হউক, সূক্ষ্ম; জড় না হউক চিৎ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হউক অতীন্দ্রিয়;—আকার একটা তার থাকিতেই থাকিবে। আর যার আকার আছে, তাহাকেই ত দেহী বলিতে পারা যায়। স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করাই আকারের ধর্ম্ম। দেহ ও দেহীর বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবে যার দেহ নাই, তার যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা কখনও ধরা পড়ে না।

দেহের নিত্যত্ব যাঁরা স্বীকার করেন নাই, তাঁরা আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব

বা পুরুষবিধত্বও স্বীকার করেন নাই। স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য,ব্যক্তিত্ব বা পুরুষবিধত্ব মায়িক, পারমার্থিক নহে ; তাঁরা এই কথাই বলিয়াছেন। মায়া বলিতে তাঁরা—অনাদিকৃত অবিদ্যা বা অজ্ঞান বুঝেন। অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান ; অসত্যে সত্য বুদ্ধি ; ক্ষণিকে নিত্য বুদ্ধি—এ সকলই এই মায়া বা অজ্ঞানের কর্ম। এই অজ্ঞান নিরস্ত না হইলে, সত্য জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। সত্য জ্ঞানের প্রকাশ না হইলে, জীবের মুক্তি হয় না। সত্য জ্ঞানের প্রকাশে জীব মুক্তিলাভ করিলে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করে। জ্ঞান, মুক্তি, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বুদ্ধি, এ সকল পর পর লাভ হয় না। জ্ঞান অর্থই ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি অর্থই কৈবল্য বা মুক্তি। এই কৈবল্য মুক্তিতে মারোপহিত যাবতীয় স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি একান্ত নষ্ট হইয়া যায়। জীবন্মুক্তিতে সংস্কারবশতঃ দেহ থাকে বটে, কিন্তু দেহ রক্ষা করিলে, মুক্ত পুরুষের কোনও দেহান্তর প্রাপ্তি হয় না। ইহাই আমাদের প্রাচীন নিরাকারবাদের পারলৌকিক সিদ্ধান্ত।

আপনার সিদ্ধান্তের স্ববিরোধিতা দোষ আটকাইতে হইলে, আধুনিক নিরাকার-বাদকেও এই পারলৌকিক সিদ্ধান্তই আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু এ নিরাকারবাদ ত নিজের গড়া সিদ্ধান্ত নয়, পরের নিকট হইতে ধারকরা মাত্র। পার্কার, নিউম্যান্, চ্যানিং, কব্, কার্লাইল্, এমার্সণ্, ওয়ার্ডস্‌বার্থ প্রভৃতি খৃষ্টীয়ান্ কবি ও মনীষিদিগের কেতাবি বুলিই ইহার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এ সকল উদার খৃষ্টীয়ান্ মতবাদে পরলোকতত্ত্বের একটা গতানুগতিক ভাব আছে, কিন্তু কোনও সজীব সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা ত হয় নাই। আমাদের প্রাচীনেরা কিন্তু বলিয়াছেন যে, পরলোকসম্বন্ধিনী মতি কোনও দিন তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না। "ধাতুর প্রসন্নতা" লাভ হইলেই কেবল এই "মতি" লাভ হইতে পারে। "ধাতু" যার প্রসন্ন হয় নাই, কেতাব পড়িয়া, কবিতা আওড়াইয়া, কার্লাইল্ এমার্সন্, দেবেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের কল্পসৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়া সে এই "মতি" লাভ করিবে কেমনে?

আধুনিক নিরাকারবাদ স্বদেশীই হউক, আর বিদেশীই হউক, সত্য পারলৌকিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। বহুদেববাদীরা যেমন অদৃশ্য দেবতায় বিশ্বাস করেন, কেবল কিম্বদন্তির আশ্রয়ে ; নিরাকারবাদী সেইরূপ পরলোকে বিশ্বাস করেন, ঐরূপ কিম্বদন্তিরই খাতিরে। পরলোক সম্বন্ধে ইহারাও Idolatrous, প্রতীক উপাসক মাত্র। নিরাকার পদ্ধতির শ্রাদ্ধক্রিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যই পরলোকবিশ্বাসী, তাঁহাদের এই বিশ্বাস তাঁহাদের প্রকৃতিগত আস্তিক্য বুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, যে মতবাদ আশ্রয় করিয়া তাঁরা ধর্মসাধন করেন, তাহার উপরে নহে।

যাঁরা জন্মটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার মনে করেন, এই পৃথিবীতে আমাদের

চক্রের উপরে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবের প্রথম সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয়, যাঁরা এই বিশ্বাস করেন, তাঁদের পক্ষে সত্য পারলৌকিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

কারণ, জন্মটা যদি এরূপ একটা আকস্মিক ব্যাপারই হয়; কালবিশেষে জীবের উৎপত্তি হয়, এই জন্মের পূর্ব্বে জীব ছিল না, এই সিদ্ধান্ত যদি মানিতে হয়; তাহা হইলে, মৃত্যুর পরে জীব থাকে, একথাও ত আর বলা চলে না। জীবদেহের উৎপত্তি কাল-বিশেষে হয়, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। আর এই দেহ কালে বিনাশ পায়, ইহাও প্রত্যক্ষ ব্যাপার। দেহের উৎপত্তিকেই যদি জন্ম বল, দেহের বিনাশই যদি মৃত্যু হয়; তবে এই জন্ম একটা আকস্মিক ব্যাপার, কালবিশেষে ঘটে, ঘটিবার পূর্ব্বে তার অস্তিত্ব ছিল না, আর মৃত্যুর পরেও কিছু থাকে না, ইহাই মানিতে হইবে। কিন্তু "পর" আছে "পূর্ব্ব" নাই, ইহা অনুভবগম্য নহে, কল্পনাও করা যায় না। পরলোক মানিলেই, পূর্ব্বলোক মানিতে হইবে। পরজন্ম মানিলেই পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিতে হইবে। জন্ম আর মৃত্যু, একই শিকলের দুইটা কড়া মাত্র, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য হইবে। জন্ম আর মৃত্যু, যদি এরূপ একই শৃঙ্খলের দুইটা অংশ মাত্র হয়, তবে জন্মকে ছাড়িয়া মৃত্যুকে, এবং মৃত্যুকে ছাড়িয়া জন্মকে, এবং জন্ম ও মৃত্যু যে শৃঙ্খলের দুইটি কড়া বা অংশ মাত্র, সেই শৃঙ্খলকে ছাড়িয়া জন্ম মৃত্যু উভয়ের কোনটিকেই ভাল করিয়া বুঝিতে ও ধরিতে পারা যায় না।

দেহ ধারণকেই আমরা জন্ম বলি। আত্মবস্তুকে যাঁরা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে—"আত্মার অমরত্বে" যাঁরা বিশ্বাস করেন,—অন্ততঃ তাঁদের নিকটে এই অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ এই অমর আত্মার দেহ ধারণই জন্ম, এতদ্ভিন্ন জন্ম শব্দের অপর কোনও অর্থ নাই, থাকিতে পারে না।

কিন্তু যাহা নাই, তাহাকে ত ধরা বা ধারণ করা যায় না। অবস্তুর ধারণও হয় না, গ্রহণও সম্ভব নহে। হয় বল যে আমরা যাকে জন্ম বলি, তাহা একটা মিথ্যা, একটা ভ্রান্তি, একটা ইন্দ্রজাল, যাহা হয় না, তাহা হইয়াছে বলিয়া মনে করা, যাহা ঘটে নাই, ঘটে না, কদাপি ঘটিতে পারে না, তাহা ঘটিয়াছে, বা ঘটিল, এরূপ কল্পনা করা ভিন্ন আর কিছু নহে। মায়াবাদী একথা বলেন বটে। মায়াবাদীর চক্ষে জন্মও মিথ্যা, মৃত্যুও মিথ্যা; দেহও মিথ্যা, জীবনও মিথ্যা; জগৎ মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা। আত্মার বৈশিষ্ট্য মিথ্যা, স্বাতন্ত্র্য মিথ্যা, ব্যক্তিত্ব বা Individuality মিথ্যা। পুরুষবিধত্ব বা Personality মিথ্যা। সকলই রজ্জুতে সর্পভ্রম মাত্র। এরূপ সিদ্ধান্ত আছে; এরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভব।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর বলি, ইংরাজিতে যাঁহাকে Personal God বলে, যে ঈশ্বর জীব হইতে স্বতন্ত্র, যাঁহার সঙ্গে জীবের নিত্য উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ, যে

ঈশ্বরের "নিত্য-দাস" জীব, এই ঈশ্বর তত্ত্বেরও স্থান নাই। ঈশ্বর বা Personal God'ও মানিবে, আত্মার অমরত্বও কপচাইবে, অথচ আত্মা যে দেহ ধারণ করিয়া দেহীরূপে সংসার-প্রবাহে প্রকাশিত হয়, সেই দেহ মিথ্যা, নিতান্ত অনিত্য, এই দেহের কোনও নিত্যত্ব নাই, ইহাও বলিবে, এত হয় না। "স্বতন্ত্র ঈশ্বর" তত্ত্বে, যে তত্ত্বে Personality of God প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে বৈদান্তিক মায়ার স্থান নাই।

"স্বতন্ত্র ঈশ্বর" কিম্বা Personal God বলিলেই, ঈশ্বরতত্ত্ব জীব ও জগৎ হইতে পৃথক্, ভিন্ন,—জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরের আশ্রিত, কিন্তু ঈশ্বর নহে, ইহা বুঝায়। এই স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য ঈশ্বর এবং জীব ও জগতের মধ্যে কোনও না কোনও প্রকারের লক্ষণ বা চিহ্ন থাকা চাই। যাহার দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে আমরা পৃথক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করি, তাহাই যে বস্তুর আকার। এই পার্থক্য নির্দ্দেশই আকারের ভাবগত বা Conceptual লক্ষণ। এইজন্য, আমাদের দেশের প্রাচীন বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বরে বা Personal God এ বিশ্বাস করেন বলিয়া ঈশ্বরকে নিরাকার কহেন না, চিদাকার কহেন।

ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ, সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥

এ সকল কথা, অন্যত্র, অন্য-সূত্রে, মহাজনদিগের ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া, সবিস্তারে কহিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি করিব না।

আর ঈশ্বর স্বতন্ত্র বা Person বলিয়া যদি নিরাকার হইতে না পারেন, তবে জীবও ত স্বতন্ত্র বা Person; জীবেরও ত এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা Personality আছে। তাহা হইলে, ঈশ্বরতত্ত্ব যেমন কদাপি নিরাকার হইতে পারে না, সেইরূপ জীব-তত্ত্বও কদাপি নিরাকার হইতে পারে না। আর ঈশ্বরের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা Personality নিত্য বলিয়া, তাঁর যে বিশিষ্ট আকারের দ্বারা এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়, তাহাও অবশ্যই নিত্য হইবে। ঈশ্বর পরিণামের অধীন নহেন, সুতরাং পরিণাম-ধর্ম্মাধীন কোনও প্রকারের দেহ-ধারণ ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে। ঈশ্বর নিত্যকাল নিজ-স্বরূপে, আপনার চিদ্দেহেতে, আপনার চিদৈশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করেন। ঈশ্বরের এই নিত্যসিদ্ধ চিদ্দেহ "পৌরুষ দেহ"। ভাগবত কহিয়াছেন—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান মহদাদিভিঃ

ভগবান মহত্তত্ত্বাদির সঙ্গে পৌরুষ দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এই পৌরুষ দেহ ধারণ করিয়া তিনি লোকসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বাঙ্গালার

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের চূড়ামণি শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কহিয়াছেন—ভগবান যে পৌরুষরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে, তাহাতেই এই পৌরুষরূপের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ যাহা নাই তার গ্রহণ সম্ভব হয় না। ঘট নাই, অথচ ঘট গ্রহণ করিলাম, এমন কথা ত কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং "জগৃহে"—গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই ক্রিয়ার দ্বারাই ভগবানের এই পৌরুষরূপ তাঁর নিত্য-সিদ্ধ, অনাদিকাল হইতে আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপেই শাস্ত্র-যুক্তি সহায়ে, আমাদের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে ভগবানের নিত্য-সিদ্ধ রূপের বা দেহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব যেমন নিত্য, জীবতত্ত্বও ত সেইরূপ নিত্য। যাঁরা আত্মতত্ত্বে বিশ্বাস করেন; জীবের আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ—এ সকল কথা কহেন; আধুনিক ভাষায় "আত্মার অমরত্ব" স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে জীবের নিত্যত্ব মানিতেই হয়। যাহা চিরদিন ছিল না, তাহা কদাপি চিরদিন থাকিতে পারে না। যাহা "অজ" নহে, তাহা কখনও "অমর" হয় না; হইতেই পারে না।

ঈশ্বর স্বতন্ত্র বা Person বলিয়া যেমন নিরাকার নহেন, কিন্তু চিদাকার; তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য নিত্য বলিয়া যেমন তাঁহার এই চিদাকার বা চিদ্দেহও নিত্য-সিদ্ধ, সেইরূপ জীবও স্বতন্ত্র বা Person বলিয়া যেমন নিরাকার নহে কিন্তু চিদাকার, আর এই স্বাতন্ত্র্য নিত্য বলিয়া, জীবেরও একটা নিত্যসিদ্ধ দেহ বা আকার অবশ্যই আছে। এই নিত্যসিদ্ধ চিদ্দেহেতেই জীব ভগবানের নিত্য-দাস। আর এই নিত্যসিদ্ধ দেহের আশ্রয়েই জীব অনন্তকাল ভগবানের সেবা ও ভজনা করিবে। স্বতন্ত্র ঈশ্বরে বা Personal Godএ যাঁরা বিশ্বাস করেন; মুক্তিতে জীব ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়, এ সিদ্ধান্ত যাঁরা মানেন না; যাঁরা বলেন—জীব অনন্তকাল ঈশ্বরের সেবা করিবে,—জ্ঞান-প্রেম-ও-কর্ম্ম-যোগে তাঁহার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া থাকিবে; তাঁদের পক্ষে, আপনাদের সিদ্ধান্তের সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে, জীবেরও নিত্যসিদ্ধ দেহ আছে, এই কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। তবে যাঁদের কোনও সিদ্ধান্ত নাই, কেবল কতকগুলি অজীর্ণ মতবাদ মাত্র আছে, কিম্বা অনুভূতি নাই, অনুভবের প্রয়াসও নাই, কেবল গতানুগতিক একটা বিশ্বাস মাত্র আছে,—তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা কি মানে বা না মানে, তার বিচার হয় না। যেখানে অনুভবও নাই, সদ্‌যুক্তিও নাই, আছে কেবল খেয়াল বা হটকারিতা সেখানে বিচারেরই বা অবকাশ কৈ?

জীব জন্মিতেছে—আমরা দেখি। কিন্তু জীব জন্মায় কোথা হইতে, এই প্রশ্নের বিচার করি না। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না। জন্ম বলিতে যদি দেহধারণই বুঝি, তাহা হইলেও যে বীজ হইতে জীব-দেহ উৎপন্ন হয়, সেই বীজের মধ্যেই এই দেহের একটা স্বরূপ বা নিত্যসিদ্ধ রূপ নিহিত ছিল, ইহা স্বীকার

করিতেই হয়। বটবীজে সমগ্র, পরিপূর্ণ, বটবৃক্ষ লুকাইয়া ছিল, অনুকূল আধার ও আবেষ্টন বা Environments এর প্রভাবে তাহাই বৃক্ষরূপে প্রকট ও পরিণত—manifested এবং evolved হইতেছে,—একথা আস্তিক নাস্তিক নির্ব্বিশেষে সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। আধুনিক জীবতত্ত্ব বা বাওলজি (B ology) পর্য্যন্ত এই কথা অস্বীকার করিতে পারে না। আর বটবীজের মধ্যে বটগাছের যে পরিপূর্ণ আদর্শটি নিহিত থাকে, তাহাই বটগাছের নিত্যসিদ্ধ দেহ। ঐ নিত্যসিদ্ধ দেহ-লাভেই বটগাছের পরিপূর্ণ সার্থকতা। তাহাই বটগাছের "মুক্তি"। এই ভাবে দেখিলে কেবল মানুষেরই মুক্তি হয়, এমন বলা যায় না; বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর একটা পরম সার্থকতা বা মুক্তি আছে, বিশ্বের পরিণাম বা ক্রমবিকাশ-ধারা ঐ লক্ষ্য মুখেই অবিরাম ছুটিতেছে, ঐটি না পাইলে বিশ্বের কোনও বস্তুর শান্তি ও বিরাম নাই—কোনও বস্তুর জীবন-সংগ্রামের অবসান হয় না—এ সকল কথাই মানিতে হয়। জড়-চেতনাদির ভেদ-জ্ঞান লোপ পাইয়া, তখন মৃৎ ও চিৎ এক হইয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র প্রাণের খেলা, জীবনের লীলা, চৈতন্যের অভিব্যক্তি দেখিয়া, চিত্ত বিস্ময়ে, আনন্দে, প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

জীবের জন্মের মূলে তার একটা বীজ অবশ্যই আছে। জীব জন্মকালে যে দেহ-ধারণ করে, জন্মের পূর্ব্ব হইতেই সেই বীজদেহ তার থাকে, সেই দেহই জীব ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়;—জন্মকর্ম্মের বিচার ও চিন্তা করিয়া, এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হয়। আমাদের প্রাচীনেরা এ সকল বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন বলিয়া—জীব জন্ম-কালে যে দেহ ধারণ করে, জন্মের পূর্ব্বে তার সে দেহ ছিল না, শূন্য হইতে হঠাৎ সে দেহের প্রকাশ হইয়াছে, এ কল্পনা কখনও করেন নাই।

জীবমাত্রেরই একটা নিত্যসিদ্ধ দেহ আছে। এই নিত্যসিদ্ধ দেহ, সংসার-প্রবাহে প্রচ্ছন্ন থাকে, নিত্য-ধামে বা ভগবদ্ধামে নিত্য প্রকট আছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শিখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

"যথা বাঁধ—যথা।"

"যথা আবার কি?"

"জান না? যাকে সাধু ভাষায় বলে 'যূথ' কি 'যৌথ', এই যে তোমাদের কবিরা আজন্ম 'যূথভ্রষ্টা' হরিণীর উপমা দিয়ে আস্‌ছেন, ব্যবসায়িক লেখকেরা আজকাল সংস্কৃত অভিধান খুঁজে খুঁজে যৌথ কারবারের দোহাই মাতিয়ে তুলেছেন, পশ্চিমে তাকেই আপামর সাধারণে ব'লে থাকে 'যথা'। 'যূথ' আর 'যৌথ'র চেয়ে 'যথার' ভিতর একটা জোর আছে। সেই জোরটা আমি বাংলায় আর বাঙালীর ভিতর চালাতে চাই। আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথায়বার্ত্তায়, সভামঞ্চে বাঙ্গলা বক্তৃতা দেবার সময়, মাসিকে, দৈনিকে, সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ লিখ্‌তে ব'সে সব জায়গাতেই 'যথা' কথাটা ঢোকাব স্থির ক'রেছি। এম্‌নি ক'রে ক'রে এর মর্ম্মগত ভাবটা বাঙালীর রক্তে ও কাজে ফুটে উঠ্‌বে।"

"তা যেন হ'ল, এখন এস্থলে করা কি যায়? বিনোদকে এখন শত্রুদের চক্রান্ত থেকে বাঁচান যায় কেমন ক'রে?"

"বিনোদকে বাঁচানর জন্যেই ত বল্‌ছি। দলের বিরুদ্ধে একা কেউ কখন লড়ে জেতে নি, দলের বিরুদ্ধে দল বেঁধে লড়া চাই, সঙ্ঘের বিরুদ্ধে সঙ্ঘ চাই। পঞ্জাবের আর্য্যসমাজকে আমি এই জন্যে বড় ভক্তি করি, ওরা যথাবাদী। "সত্যার্থ প্রকাশ" আমি প্রায়ই পড়ি। দয়ানন্দ স্বামী দেখিয়েছেন, যম নিয়মাদিকে সত্য, অহিংসা, অস্তেয় প্রবৃত্তিকে আর্য্যেরা গৌণ ধর্ম্ম ব'লে জান্‌তেন, তাঁরা আপনাদের সমাজ রক্ষাই মুখ্য ধর্ম্ম জান্‌তেন, সেই সমাজরক্ষার জন্যে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' এই মন্ত্রকে মুখ্যমন্ত্র মুখ্য উপদেশ ব'লে চিনেছিলেন ও প্রচার ক'রেছিলেন। আজকালকার আর্য্য সমাজীরাও তাই কর্‌ছে। আমাদেরও এ স্থলে তাই কর্ত্তে হবে।"

জমিদার বিনোদেন্দু রায়ের বৈঠকখানায় চারি বন্ধুর কথোপকথন হইতেছিল। প্রধান বক্তা বাগ্মী ও বেঙ্গল কৌন্সিলের মেম্বর নরেশচন্দ্র নিয়োগী। এবার তাঁর মেম্বরশিপ লইয়া কিছু গোল বাধিয়াছিল। একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হইয়াছিলেন। এ সঙ্কটে বিনোদেন্দু রায়ের সাহায্যে তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বিনোদেন্দু মনোহরগঞ্জের মস্ত বড় জমিদার। বছর দশেক হইতে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। মিষ্টভাষে, সদালাপে ও সদাচারে সর্ব্বলোকপ্রিয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিনোদেন্দু রায়ের প্রতিপত্তি নরেশের পাব্লিক লাইফে অনেক সময় অনেক কাজ দিয়াছে। কিন্তু সে সংবাদ সর্ব্বজনবিদিত ছিল না। এবার কৌন্সিলের মেম্বরশিপের ঝগড়ায় বিনোদেন্দু যে নরেশ নিয়োগীর পক্ষের লোক এ কথা লোকগোচর হইয়া গেল।

পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী যে সে লোক নহেন, তিনি কালীচকের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা।

রতিকান্ত বাঁড়ুয্যে বিনোদের বাল্যবন্ধু, হাইকোর্টের উকীল, নরেশের কথার জবাবে তিনি বলিলেন,—'সত্যার্থ প্রকাশ' ত আমিও প'ড়েছি, কিন্তু আমি ত তার ভিতর এ তত্ত্ব পাই নি। যা হোক্, দল কি আমাদের নেই? বিনোদের বন্ধু সংখ্যা কি কমী? দল বেঁধে লড়্তে বিনোদ কি পারেন না? কিন্তু বিনোদের বন্ধুদের অসুবিধে এই যে, তারা ভদ্রলোক, মহেন্দ্রনারায়ণের লোকদের মত বিবেকহীন নয়, তারা কোন নীচতার আশ্রয় নিতে পারে না। এ দিকে রাজার লোকেরা শত্রুর সর্ব্বনাশের জন্যে এমন জঘন্য উপায় নেই, এমন কোন নীচতা নেই, এমন কোন মিথ্যা নেই যা অবলম্বন করতে ছেড়েছে বা ছাড়্বে।"

"রতিকান্ত বাবু এ অকর্ম্মণ্য লোকের নালিশ, দুর্ব্বলের জবান, অক্ষমের আত্মোক্তি।"

"সে কি রকম?"

"বিবেক শব্দটা যথাবাদীর অভিধান থেকে ছেঁটে ফেল্তে হবে। যথা পালন আমাদের ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মরক্ষার জন্য সত্যদলন, মিথ্যাপোষণ যখন যেটা দরকার পড়্বে তাই কর্ত্তে হবে। আজ জার্ম্মাণীর কাছে বাকী সব য়ুরোপ এত মার খাচ্ছে কেন? জার্ম্মাণ এই যথাধর্ম্ম চূড়ান্তরূপে আয়ত্ত করেছে, য়ুরোপের বাকী জাতেরা এখনও তাতে ঢের কাঁচা আছে। নিজের অস্তিত্বর জন্যে যথার অস্তিত্ব চাই, যথার অস্তিত্বর জন্যে সত্য মিথ্যা দুটোকেই গোলামীতে বহাল রাখা চাই।"

রতিকান্ত বাবু গরম হইয়া জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া উদীয়মান কবি সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত হো হো করিয়া হাসিয়া, কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া চুলভরা মাথা হেলাইয়া বলিল,—

"বেশ যা হোক্। রতিকান্ত বাবু আপনি দেখ্ছেন না নরেশ বাবু মনের দুঃখে ব্যঙ্গ করে সব কথাগুলো বল্ছেন, এ কি আর ওঁর সত্যিকার মনের ভাব যে, আপনি রীতিমত খণ্ডন করতে উদ্যত হচ্ছেন?"

নরেশ বলিল,—"সুধীন্দ্র তোমার নিতান্ত ভুল, আমি মোটেই ব্যঙ্গ করছিনে।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বল্‌ছি। কথাগুলো একেবারে নিছোক সত্য বলে জেনো। ধর্ম্ম অধর্ম্মের পুরোণ সংস্কার উল্টেপাল্টে বদ্‌লে দেখ্‌তে হবে আমাদের।"

নৃপেন দত্ত এতক্ষণ চুপ করিয়া একপাশে বসিয়া শুনিতেছিল। বিনোদেন্দু রায়ের অতি বড় ভক্ত সে। মুখে বেশী কথা নাই, কিন্তু বিনোদেন্দুর বিপদে অন্তর্দ্দাহে জ্বলিতেছে। নরেশ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, নৃপেন গা ঝাঁকা দিয়া উঠিল, নরেশের সাম্‌নে আসিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"নরেশ বাবু, যথেষ্ট! যে পড়াটা এতক্ষণ ধরে পড়ালেন, বেশ ভাল করে মাথায় প্রবেশ করেছে। আমি আপনার ছাত্রত্ব স্বীকার কর্‌লুম। এখন কি কর্ত্তে হবে বলুন। যথার চার জন ত আমরা এখানেই উপস্থিত! এখন সত্য মিথ্যা, নীচতা উচ্চতার ভাগ করে দিন। আমার জন্যে নীচতা ও মিথ্যা রাখবেন, রতিকান্ত বাবু ও সুধীন্দ্রকে সত্য ও উচ্চতা দেবেন।"

সুধীন্দ্র মুচ্‌কে হাসিয়া বলিল,—"আর নরেশ বাবু নিজে কি নেবেন?"

নৃপেন উত্তর করিল—"উনি আমাদের নেতা, যথাপতি, সুতরাং মিথ্যার রাজ-অংশ উনি গ্রহণ কর্‌বেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেওয়ান রমাকান্ত রাজা মহেন্দ্রনারায়ণকে বুঝাইল, শত্রুতা চরিতার্থের এমন মাহেন্দ্রক্ষণ দুশো বছরে আর ঘুটিবে কি না সন্দেহ। য়ুরোপে কুরুক্ষেত্র, ব্রিটিশরাজ্যে হুলস্থূল, সাম্রাজ্য-রক্ষাকারীদের চিত্তবিপ্লবে বুদ্ধি-বিভ্রাট, স্পেশাল ট্রিবিউন্যাল, ডিফেন্স-অব্-ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট,—তার উপর হতভাগা ছোঁড়াগুলোর অবিরাম পাপাচার—ডাকাতী ও খুন,—এই কটা উপকরণ মিলাইয়া শত্রুর সর্ব্বনাশ সাধনের একটা অব্যর্থ টোট্‌কাও যদি গড়িয়া তুলিতে না পারে, তবে বৃথাই রমাকান্তের দেওয়ান—জন্মধারণ। শুধু যে প্রভুভক্তি বশতঃই রমাকান্ত এই কার্য্যে ব্রতী হইল তাহা নহে। পূর্ব্ব প্রভুর প্রতি কৃতঘ্নতার প্রবল বাসনা তাহাকে বৎসরাবধি দগ্ধ করিতেছিল। মনোহরগঞ্জের জমিদারী কাছারীতে নায়েবী কালে তহবিল ভাঙ্গার অপরাধে রমাকান্ত ধরা পড়ে। কিন্তু রমাকান্ত পরলোকগত প্রাচীন দেওয়ান কমলাকান্তের পুত্র, শৈশবে বিনোদেন্দু রমাকান্তের সঙ্গে একত্রে খেলা করিয়াছেন, গ্রাম্যস্কুলে একত্রে পাঠ করিয়াছেন। বাল্য সহপাঠী, চাকর হইলেও এবং অপরাধী হইলেও বিনোদ তাহাকে চাকরের ন্যায় দেখিতে পারিলেন না এবং অপরাধীর ন্যায় শাস্তি দিতে পারিলেন না। তাহার চাকরী বহাল রহিল এবং তহবিল ভাঙ্গার কথাটাও সাধ্যমত ঢাকা দিয়া রাখিলেন। শেষে গত বৎসর একটা জুগুপ্সাজনক ব্যাপারে গ্রামশুদ্ধ লোক তাহার বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহাকে আর রাখিতে

পারিলেন না, বাধ্য হইয়া ছাড়াইলেন। গ্রামের লোকেরা ধর্ম্মবট করিয়া তাকে তাড়াইল, কিন্তু রমাকান্তের রাগের লক্ষ্য বিনোদেন্দু একাই রহিলেন।

মনোহরগঞ্জের কাছারী হইতে বরখাস্ত হইয়া রমাকান্ত পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণের নিকট গিয়া যুটিল। এ পর্য্যন্ত মহেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বিনোদেন্দুর কোন অপ্রণয় ছিল না। কিন্তু রমাকান্ত সেখানে দাখিল হওয়ার পর হইতেই ছোট খাট উৎপাত আরম্ভ হইল। বিনোদেন্দু ভাবিলেন, এ রকম আঁচড়টা-আসটা জমিদারের জীবনের নিত্য সঙ্গী, এত দিন ছিল না যে তাই আশ্চর্য্য, এখন যে দেখা দিয়াছে তাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার বেশী কারণ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদেন্দুর স্ত্রী নির্ম্মলার হঠাৎ যক্ষ্মাকাশ দেখা দিল। ডাক্তারের আদেশে বিনোদ নির্ম্মলাকে লইয়া করাচী গেলেন। করাচীর হাওয়া-বন্দরে একটা প্রকাণ্ড বাঙ্গলায় দাসদাসী পরিবৃত দম্পতি ছয়মাস যাপন করিলেন। কাছাকাছি আর কোন বাঙ্গলা নাই, কোন লোকজন নাই। করাচীর একজন প্রসিদ্ধ গোয়ানীজ ডাক্তার দিনান্তে প্রতিদিন নির্ম্মলাকে একবার দেখিতে আসেন আর দৈবাৎ কখন কোন দিন সহর হইতে সিন্ধী শেঠ তুলারাম সস্ত্রীক দেখা করিতে আসেন।

সমুদ্রে স্নান, সারাদিন খোলা হাওয়ায় যাপন, নিক্তির ওজনে পথ্য সেবন সবই চলিল। কিন্তু নির্ম্মলার ওজন দিন দিন কমিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় নির্ম্মলা প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। স্বামী বুঝিলেন, এ চাঁদ অনন্তে লীন হইয়া যাইবে, একে ধরিয়া রাখা যাইবে না। হাওয়া-বন্দরে হাওয়ার বিশ্রাম নাই। ক এক রাত্রে সমুদ্র গর্জ্জনের সঙ্গে হাওয়ার গর্জ্জন মিশ্রিত হইয়া এক আতঙ্ককর শব্দ উত্থিত করে। নির্ম্মলা ভয় পায়, স্বামীকে বলে, "দেশে ফিরে চল, সেখানে কি যেন অমঙ্গলের রচনা হচ্ছে মনে হয়।" বিনোদ মনে মনে ভাবে নির্ম্মলাকে হারাইতে বসিয়াছে, এর ছাড়া অমঙ্গল আর কি হইতে পারে? সে অমঙ্গলের রচনা ত এখানেই চলিতেছে, তার দরুণ দেশে ফিরিয়া কি রক্ষা হইবে? যতদিন এখানে থাকে ততদিন বরঞ্চ রক্ষা আছে, দেশে পা ফেলিতে না ফেলিতে সে চলিয়া যাইবে। তাহাই হইল। নির্ম্মলা আর প্রবাসে থাকিতে চাহিল না। তাহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আনা হইল। সপ্তাহের মধ্যে বিনোদেন্দুর গৃহ শূন্য হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাচনের দিন প্রায় সমাগত। নরেশ নিয়োগী দিন পনের ধরিয়া বিনোদেন্দুকে লইয়া তার মোটরে সারাদিন সহর ও সহরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই, লোকের বাড়ী ভোট ভিক্ষা করিতে উপস্থিত। কোন কোন স্থলে নরেশ নিজে যান না, বিনোদকে একা পাঠাইয়া দেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ ও নরেশ নিয়োগীতে তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। কার তীর লাগিয়া যায় এখনও বলা যায় না, দুজনেই সমান ক্ষিপ্রহস্ত, দুইজনেই মহারথী। কিন্তু নরেশই জিতিলেন। মহেন্দ্রনারায়ণের তীর কাণের কাছ দিয়া গেল, লক্ষ্য বিঁধিল না। নরেশ বিনোদেন্দুকে কৃষ্ণ-সারথি করিয়া জয়ী হইলেন। তখন রমাকান্তের পরামর্শে মহেন্দ্রনারায়ণ আর এক লক্ষ্য ভেদের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইলেক্‌শনের জন্য সুপারিশের উত্তেজনা যখন থামিয়া গেল, বিনোদ দেহে মনে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলা হারাণর ক্ষত শুকায় নাই, চাপা ছিল। নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেই একটা শূন্যতা তাঁহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। আর সেই শূন্যতার কেন্দ্রস্থলে যেন কি এক গাঢ় অন্ধকার। এক এক রাত্রে মনে হয়, সেই অন্ধকারের মধ্যে কিরীচের মত কি যেন ঝকমক্ করিতেছে, যেন ঠিক তাঁর মাথার উপর ঝুলিতেছে, যেন এই পড়ে পড়ে। কোন কোন রাত্রে হাওয়া-বন্দরের সেই হাওয়ার গর্জ্জন অবিরাম কাণে প্রতিধ্বনিত হয়, সেই সঙ্গে নির্ম্মলার ভয়োক্তিও প্রবাহিত হইয়া আসে—"ওগো কি যেন অমঙ্গলের রচনা হচ্ছে।"

একদিন সারারাত্রি অনিদ্রার পর ভোরবেলায় ঘুমাইয়া পড়ায় বিনোদেন্দুর বাহিরে আসিতে একটু বিলম্ব হইল। বৈঠকখানার দিকে যাইতেই শিখ প্রতিহারী অর্জ্জুন সিং বন্দেগি করিয়া বলিল, "সাচ্চা পাদশা! কমিশনর বাহাদরকা চাপ্‌রাসী বহুৎ দেরসে ইন্তজার কর্ রহা। কহতা হায়, হজুরইকা হাথমে চিট্টি দেনি হ্যায়, ঔর কিসিকো নেহি"।

"বোলাও"।

লাল চাপকান্ পরা চাপ্‌রাসী আসিয়া সেলাম করিয়া, বিনোদেন্দুর হাতে শীল মোহর করা এক লম্বা লেফাফা দিল। বিনোদেন্দু দেখিলেন, উহা পুলিশ কমিশনের দপ্তর হইতে আসিতেছে। একটু কুতূহলী ও একটু উদ্বিগ্ন হইয়া লেফাফা খুলিয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলাদেবী।

রাজা রামমোহন রায়ের

"তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন"

রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার সংস্কারে হাত দিবার কিছু কাল আগে, সম্ভবতঃ যখন রঙ্গপুরে বাস করিতেন, তখন 'তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করেন। গ্রন্থের ভূমিকা আরবী ভাষায়, আর ফারসী ভাষায় তাহার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, কেননা আজাম প্রদেশের অধিবাসিগণ ওই ভাষা বেশী বুঝিতে পারে। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবুর অনুরোধে মৌলবী ওবায়েদ উল্লা মহোদয় এই গ্রন্থ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর অশেষ উপকার করিয়াছেন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ব্রাহ্ম সাধারণগণ গত এক শতাব্দীরও বেশী এই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদের কোন প্রয়োজনই দেখেন নাই, অথচ এই গ্রন্থ লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নানা বিরোধী মতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিরোধী দলের পরস্পর মতের বিভিন্নতার মাঝে একদল বলেন যে, ইহাই রাজা রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাঁহারা আরো বলেন যে, রাজা শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারা একেশ্বরবাদের প্রমাণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে আবার কেমন করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, সেই একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য তো বটেই বরং দুঃখের কথা এই যে 'তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীনের' অত্যুন্নত যুক্তিবাদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, রাজা শাস্ত্রালোচনার কালে তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অধিকতম উন্নতিশীলদল এই গ্রন্থের যুক্তিবাদকেই ধর্ম্মসংস্থাপনের ভিত্তি করিয়া, রাজা পরবর্ত্তী যে শাস্ত্রমীমাংসা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আর একদল বলেন, ইহা রাজার মানসিক ইতিহাসের একটা ধাপমাত্র, রাজা এই যুক্তিবাদ ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত—এই গ্রন্থ রচনার সময়ে রাজার মনের ও

জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নাই, পরবর্ত্তীকালে শাস্ত্রমীমাংসায় যাহার পূর্ণ-প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতবাদের উভয় দলের অভিমত সম্বন্ধেই আমরা কোন বিশেষ বিচার না করিয়া, বাঙ্গালী পাঠকের মধ্যে ইহার বিস্তৃত আলোচনার জন্যই ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। অনেক ব্রাহ্মসাহিত্যিকগণ এমনও বলেন যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অল্পবয়সে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া ধর্ম্মজীবনের বিকাশে তাঁহাদের উভয়েরই অনেক বিভিন্নতা ও মতান্তর দেখা গিয়াছিল, কিন্তু রামমোহন রায়ের তাহা হয় নাই। আমরা কিন্তু দেখিতেছি ও পরস্পরবিরোধী দুই দলের উক্তিতে ইহাই বুঝিতেছি যে, রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা-জীবনের ইতিহাসে উন্নতি ও অবনতির বিরাম ও অবসর আছে।

আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস যে, রাজা রামমোহনের গ্রন্থাদি ও তাঁহার অদ্ভুত জীবনের ঘটনাবলীর যথাযথ আলোচনা বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পই হইয়াছে।

অনেক ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর মতে বর্ত্তমান যুগ—রামমোহন যুগ। সেই জন্য রাজা রামমোহনের জীবন ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সকল বিষয়েই বিশেষ-রূপে আলোচনা হওয়া উচিত। বর্ত্তমান যুগ বাঙ্গালীর কাছে এক মহা সমস্যার মত দাঁড়াইয়াছে। এই যুগের যে বিশিষ্ট সাধনা, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রাণের যোগ আছে, কি নাই, কি কতটা আছে, আজ তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

নারায়ণ সম্পাদক।

ভূমিকা

পৃথিবীর শেষ সীমান্তের দেশ পর্য্যন্ত কি সমতল ভূমিতে, কি পার্ব্বত্য প্রদেশে সর্ব্বত্রই আমি ভ্রমণ করিয়াছি। এবং দেখিলাম যে, তৎ তৎ প্রদেশের যাবদীয় অধিবাসিগণ সাধারণতঃ এক পরম পুরুষে—যিনি সকল সৃষ্টির মূলাধার ও বিশ্বের বিধাতা তাঁহার সেই অস্তিত্বের বিশ্বাস সম্বন্ধে একমত। এবং কেহ কেহ সেই পরম পুরুষকে নানা বিশিষ্ট গুণে ভূষিত করিতে অন্য মত হয়েন। আবার কেহ কেহ হারাম (নিষিদ্ধ) ও হালালের (বিধিনিষিদ্ধ আইন) মতে ধর্ম্মের যে উপদেশ তাহাতেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভুক্ত। এই উন্নয়নাত্মক অনুমান হইতে আমি ইহা জ্ঞাত হইয়াছি যে, এক অব্যয় পুরুষের প্রতি মনের যে সাধারণ গতি, তাহা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং তাহা সমগ্র ব্যক্তির মধ্যেই সমভাবেই বর্ত্তিয়া আছে। এবং মানবের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভিতর কোন এক বিশিষ্ট দেবতা বা দেবতাসকলের প্রতি এই যে আকর্ষণ, কাহাকেও বা কোন বিশিষ্ট গুণে ভূষিত করা অথবা কোন বিশেষ পদ্ধতিতে পূজা বা ভক্তি করা এবম্বিধ যে আচার ও ইচ্ছা তাহা জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষার ফলে গুণ-বাহুল্য স্বরূপে উদ্ভব ও প্রকাশ পাইয়া থাকে। অভ্যাস ও স্বভাবের মধ্যে কি বিশাল পার্থক্য! কোন কোন সাম্প্রদায়িকেরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের বাক্যের সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মতের সহিত নিজেদের মতদ্বৈধ হওনে তাহাদের বিরুদ্ধ ধর্ম্মমতকে খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। যদিচ তাহাদের সেই পূর্ব্ব-পুরুষেরাও সাধারণ মানবের মতই ভুল ভ্রান্তি ও পাপকর্ম্মের অধীন ছিলেন। সুতরাং এমত হয় যে, এই সকল সাম্প্রদায়িকেরাই (নিজ নিজ ধর্ম্মের মতবাদের সত্য প্রতিষ্ঠার অজুহাতে) হয় তাহারা (তত্ত্বব্যাখ্যায়) সত্যবাদী, নয় অপবাদী হইয়া পড়েন। পূর্ব্ব-পক্ষ গ্রহণ করিলে দুই বিরুদ্ধ মতবাদের একত্র সমাবেশ হয় (যাহা ন্যায়মতে অস্বীকার্য্য)। এবং উত্তর পক্ষে কোন ধর্ম্মমত বিশেষে অথবা সাধারণতঃ সকল মতবাদেই মিথ্যাত্ব আরোপ করিতে হয়। প্রথম পক্ষে হইল তরজিহ্ বিলা মুরাজ্জে অর্থাৎ বিনা কারণে তাহাকে প্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। (ইহাও ন্যায়মতে অস্বীকার্য্য) অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল ধর্ম্মমতেই ভেদ বুদ্ধি ব্যতিরেকে এই মিথ্যাত্ব আরোপ সাধা-রণতই বিদ্যমান হয়। ইহাই অর্থাৎ (আমার এই মতবাদ) আমি পারস্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছি। যেহেতু এই ভাষা আজাম (অর্থাৎ অনা-আরবী জাতি সকল) প্রদেশের অধিবাসীদিগের নিকট অধিক বোধগম্য হয়।

তহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন বা ঈশ্বরবাদীদিগের জন্য দান

যাঁহারা মানবের অভ্যাস ও সচরাচর সঙ্গজনিত যে অবস্থা তাহার সহিত মানবের মধ্যে তাহার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাজনিত ফলে যে সকল ভিতরের স্বাভাবিক গুণজ অবস্থার পার্থক্য বিচার করিতে যত্নতঃ সক্ষম হয়েন এবং যাঁহারা কোন সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির পক্ষপাতিত্ব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সত্যাসত্য নিরূপণে অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রাণপণ যত্নবান হয়েন এবং সেই সকল সর্ব্বজন স্বীকৃত মতবিধি যে সকল লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, যাঁহারা খুব তীক্ষ্ণ ভাবে তাহার পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই সুখে কালহরণ করেন। কারণ পরস্পর বিভিন্ন কার্য্যের জন্য সৃষ্টবস্তুর স্বভাবের সত্য ধারণা করা এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের তারতম্য ও তাহাদের প্রচ্ছন্ন ফলের (উভয়েই যাহা মানবের পরিপূর্ণতার বিশিষ্ট অঙ্গসমূহ) জ্ঞান লাভ করা উভয়েই অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। তথাপি, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অধিকাংশ নেতারা তাহাদের নাম ও যশোলিপ্সার জন্য ধর্ম্মবিশ্বাসের কতিপয় মতবাদ উদ্ভাবন করিয়া, অপ্রাকৃতিক অনৈসর্গিক কর্ম্মের ছলনার দোহাই দিয়া, বা ভাষার বা গলার জোরে অথবা, সমসাময়িকদের অবস্থাবৈগুণ্যের সুবিধামত ব্যবস্থা বা বিধিনিষেধাত্মক উপায় দ্বারা সেই ধর্ম্মমত সকলকে সত্যরূপে প্রচার করিয়াছেন। এবং এইরূপে বহুসংখ্যক জনসাধারণকে তাহাদের কথা মানিতে এবম্বিধ রূপে বাধ্য করিয়াছেন যে, এই সকল দুর্ভাগ্য মানবগণকে আপনাপন বিবেকের বাণী ভুলিয়া, অন্ধের ন্যায় তাহাদের ধর্ম্মনেতৃগণের অনুসরণে বদ্ধ করিতে এবং সত্য ধর্ম্মনীতি ও প্রত্যক্ষ পাপের মধ্যে প্রভেদ বিচার করিয়া, তাহাদের ধর্ম্মগুরুর আদেশ প্রতিপালন করা মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করে। তাহাদের ধর্ম্ম ও বিশ্বাসে আস্থা থাকার জন্য, এমন কি হত্যা, পরস্বাহরণ ও পরপীড়নাদি জঘন্য ক্রিয়াগুলিকেও মহান্ ধর্ম্মের কার্য্য ও অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করে, যদিচ তাহারা এক জাতি বা এক পিতামাতার সন্তান হয়, অপিচ তাহাদের সেই পারমার্থিক গুরুর বা ধর্ম্মনেতার উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনজনিত যে সংস্কার তাহাকেই,—মিথ্যা কথন, বিশ্বাসঘাতকতা, চৌর্য্যবৃত্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি যে সমস্ত ঘৃণ্য অপকর্ম্ম, যাহা কি পারলৌকিক, কি সামাজিক জীবনে নিতান্ত অনিষ্টকর— তাহাকেই—সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তির হেতুরূপে মনে করে, ও নানাবিধ অসম্ভব কাহিনী ও পৌরাণিকী কথা পাঠ ও জল্পনা করিয়া, তাহাদের বহুমূল্য সময় ক্ষেপণ করে এবং যাহা তাহাদের পূর্ব্বতন ধর্ম্মগুরু ও বর্ত্তমান ধর্ম্মধ্বজীপ্রচারকদের উপর বিশ্বাসের ভিত্তিকে উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করিয়া থাকে। যদি বা ঘটনাচক্রে কেহর

মন সুস্থ ও বিচার বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত থাকা নিবন্ধন শক্তিবান হয়; তাহার আচরিত ও অনুষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে জানিবার উৎকণ্ঠা বা ইচ্ছা হয়, তিনি পুনরায় ধর্ম্মমতানুসরণকারীদিগের অভ্যাসমত, সেই ইচ্ছাকে শয়তানের প্ররোচনার ফলস্বরূপ মনে করেন, এবং তাহা, কি ইহ কি পরলোকে নিজের ধ্বংসের কারণ বিবেচনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে বিরত রহেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই শৈশবে, যখন তাহার মনোবৃত্তিগুলি যে সমস্ত ভাব তাহার কাছে আসিত, তাহা গ্রহণ করিতে স্বতঃই ও সহজেই উপযোগী ছিল, সেই সময় হইতে, আত্মীয় কুটুম্ব ও প্রতিবেশিগণ, যাহাদিগের মধ্যে তিনি জন্ম শিক্ষা ও ধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বতন ধর্ম্মগুরুদিগের অদ্ভুত ও অসম্ভব কাহিনী শুনিয়া এবং স্বজাতির মধ্যে প্রতিপালিত ধর্ম্মমতের সুফলের কথা শুনিয়া, স্বধর্ম্ম মতবাদে এমনই দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন যে, তিনি আপন মতবাদের অধিকাংশ স্পষ্টতই অযৌক্তিক ও নিরর্থক হইলেও তিনি তাঁহার সেই গৃহীত ধর্ম্মবিশ্বাসকে কদাপি ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি অপরাপর মতবাদ অপেক্ষায় আপন ধর্ম্মমতকে বিশেষরূপে পছন্দ করিয়া থাকেন, এবং প্রচলিত আচার ও আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধের ধারা পালন করিয়া চলেন, এবং দিন দিন তাহাতেই আরও দৃঢ়ভাবে অনুরক্ত হইয়া রহেন। অতএব ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য কোন ধর্ম্মমতবিশেষে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলে পর তাহার সুস্থ মন পুস্তক হইতে অধীত ও গৃহীত জ্ঞান ও বিদ্যায় পুষ্ট হইয়া পরিণত অবস্থা প্রাপ্তান্তর, বহু বৎসরের প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রগুলির সত্যাসত্য নিরাকরণ করিবার অনিচ্ছাবশতঃ প্রকৃত নিগূঢ় তথ্য আবিষ্কার করণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়। পরং সেই ব্যক্তিই কখন কখন নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে তথাকথিত যুক্তি ও প্রচলিত সংস্কারকে ভিত্তি করিয়া, মুজতাহিদ বা ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানকর্ত্তার—সম্মান অর্জ্জন করিবার আশয়ে নূতন নূতন যুক্তিতর্কের সৃষ্টি ও অবতারণা করিয়া, তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসের নীতিগুলিকে আরো দৃঢ় করিবার জন্য নিতান্ত উদ্‌গ্রীব হয়েন। এদিকে যাহারা মুকালিদ্ বা সাধারণ নিরক্ষর ব্যক্তির দল, অন্ধ অনুকরণে সেই ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া, প্রবাদ কথায় যেমন আছে যে, "কুক্ দিলে পাগল নাচিয়া উঠে" সেইমত, যাহারা সর্ব্বদাই পরের ধর্ম্মাপেক্ষা নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠত্ব দান ও প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা সেই সকল বৃথা মিথ্যা তর্কযুক্তিগুলিকে বিচারের ভূমি সৃষ্টি করিয়া নিজেদের ধর্ম্মের বড়াই করে, এবং অন্যের ধর্ম্মের ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যদিস্যাৎ দৈববশতঃ কখন কেহ, তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসের সূত্রসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন প্রশ্ন করে, তখন তাহার সমধর্ম্মীরা যাহাদের ক্ষমতা থাকে, তাহারা সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বর্শার জিহ্বা ফলকে নিক্ষেপ করে, (অর্থাৎ

হত্যা করে) এবং যেখানে সেই বর্ষামুখে নিক্ষেপ করিবার সুবিধা না থাকে, সেখানে তাহাকে তাহাদের জিহ্বার ক্ষুর ধারায় নিক্ষেপ করে, (অর্থাৎ তিরস্কার ও লাঞ্ছনার ভারে তাহাকে পিষিয়া মারে। এই সকল ধর্ম্মানুসরণকারীদিগের উপর ধর্ম্মনেতাদিগের এমনই প্রভাব এবং তাহাদের প্রতি যে বাধ্যতা তাহা এমন উৎকট মাত্রায় গিয়া ঠাঁই লয় যে, কত শত ব্যক্তি তাহাদের ধর্ম্মগুরুর উপদেশাদির উপর দৃঢ়বিশ্বাস পরায়ণ হইয়া, প্রস্তর তরু গুল্ম অথবা পশুগণকে তাহাদের উপাসনার সত্য নিত্যবস্তু-রূপে গ্রহণ করে, এবং যাহারা তাহাদিগোর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই পূজার্চ্চনার মূর্ত্ত বস্তুগুলিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, বা তাহার অবমাননা করে, তাহাদিগের রক্তপাত করা বা তাহার জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করাকে ধর্ম্ম, ও জগতে মহান্ গৌরবের কর্ম্ম, ও ভবিষ্যত জীবনে মোক্ষের চরম কারণ বলিয়া মনে ধারণা করে। ইহা আরও বিস্ময়কর হয় যে, মুজতাহিদেরা অর্থাৎ ঐ সকল ধর্ম্মসূত্র ব্যাখ্যাকারেরা অন্যান্য ধর্ম্মের নেতাদিগের দৃষ্টান্ত মত, ন্যায় ও সততা পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মবিশ্বাসের মতগুলির স্বপক্ষে যুক্তি ও বুদ্ধিবিচার রূপের অনুমত এমন বাক্যাবলী উদ্ভাবন করে, যাহা সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে অর্থহীন ও অসম্ভব, এবং এইরূপে যাহারা অন্তর্দৃষ্টি শূন্য ও বিচারবুদ্ধি বিহীন সাধারণ ব্যক্তি তাহাদিগোর ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিবার জন্য যত্ন করে।

"আমাদিগের পাপ প্রলোভন ও আমাদিগের পাপকর্ম্ম হইতে রক্ষার জন্ত ঈশ্বরের আশ্রয়ের আমরা প্রার্থনা ও অনুসন্ধান করি।" *

যদি চ ইহা বস্তুতঃ সত্য, এবং তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই, যে মানবজাতি স্বভাবতঃ সামাজিক জীব ও সমাজবন্ধনে একত্র বসবাস করাই তাহাদের প্রয়োজন মত হইয়াছে, তথাপি সমাজ যেমন তদঙ্গীভূত ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের ভাব বিনিময় ও কতিপয় সামাজিক নিয়মাদির অস্তিত্ব সাপেক্ষ্য, যে নিয়ম সমূহের দ্বারা পরস্পরের বিষয় সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সূচিত হয় এবং একে অন্যের অত্যাচারাদি হইতে রক্ষিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন দেশবাসী জাতিসকল, এমন কি দূরস্থ দ্বীপবাসিগণ বা উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শিখরাধিবাসিগণ সকলেই বিশিষ্টভাবব্যঞ্জক এমন শব্দাদির উদ্ভাবন করিয়াছে, যাহা তাহাদিগের ধর্ম্মসৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ হয় ও যাহার উপর তাহাদের সমাজ সঞ্জীকরণ নির্ভর করে। যেহেতু আত্মা, যাহাকে বস্তুগত্যা শরীরের নিয়ন্তৃ-রূপে অভিধা করা হয় ; তাহার অস্তিত্বের বিশ্বাসের উপর ও সেই পরলোকের অস্তিত্বের বিশ্বাসের উপর (যে স্থান দেহ হইতে আত্মার পৃথক্ হইবার পর, এই পৃথিবীতে কৃত সৎ ও অসৎ কর্ম্মের ফলাফল লইবার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)—যেমন সকল

* কোরাণ হইতে উদ্ধৃত বচন

ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সেই হেতু সমাজের কল্যাণার্থে আত্মা ও পরলোকের সত্য বাস্তব অস্তিত্ব (যদিচ ইহাদিগের প্রকৃত তথ্য গুহানিহিত ও রহস্যময়)—স্বীকার ও তৎশিক্ষা প্রদানের জন্য তাহারা (মানবজাতি) ক্ষমার্হ; কেন না, তাহারা শুধু মাত্র পরলোকে শাস্তি ভোগের ভয়ে, অপিচ সাংসারিক কর্ত্তৃত্ববিদ্ কর্ত্তাদিগের দণ্ড ভয়ে বে-আইনী কর্ম্ম হইতে বিরত রহেন। কিন্তু এই উভয় অপরিহার্য্য ধর্ম্মমতে বিশ্বাস-সহ ভোজ্য এবং পেয়, শুচিত্ব ও অশুচিত্ব, শুভাশুভত্ব বিষয়ক শত শত অপ্রয়োজনীয় দুঃখ ও ক্লেশ সহন ব্যবস্থা, সংযোজিত হইয়াছে এবং এইরূপে তাহারা সামাজিক জীবনের অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণ স্বরূপ হইয়াছে এবং তদঙ্গীভূত জনসাধারণের সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধায়ক না হইয়া তাহাদিগের সকল অমঙ্গলের মূল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার কারণ হইয়াছে।

হা ভগবান্! (অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা) সে মুজাহিদ অর্থাৎ ভবরোগ-বৈদ্যদিগের পক্ষে এবম্বিধ তীব্র, বিবিধ উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিতে এমন এক অন্তর্গত ধীশক্তি বর্ত্তিয়া আছে যে, সুস্থচিত্তসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি যদি কোন ধর্ম্মবিশেষের মতবাদগুলি মানিয়া লইবার পূর্ব্বে অথবা পরে বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মুখ্য অথবা গৌণ মতবাদসমূহের মূলে নিহিত তথ্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে এবং ন্যায় বিচারের আশয়ে অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, তিনি অসত্য হইতে সত্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া এবং হেত্বাভাসপূর্ণ তর্কজাল হইতে তথ্য কথা চয়ন করিয়া লইতে পারিবেন, অধিকন্তু তিনি ধর্ম্মের বিধি নিষেধাত্মক সংযমাদি যাহা সময়ে সময়ে একজনের উপর আর একজনকে অযথা বিরূপ করিয়া তুলে এবং তাহাদিগের আধিব্যাধির মূলীভূত কারণে পরিণত হয়, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া সেই এক পরম পুরুষ যিনি সকল বিশ্বের সামঞ্জস্যীভূত সার্ব্বভৌমিক একাত্ম সৃষ্টির উৎস তাঁহার প্রতি ধাবমান হইবেন এবং সমাজের যাবৎ শুভকর কার্য্যের প্রতি মনঃসংযোগে যত্নবান্ হইবেন। "ঈশ্বর যাহাকে লইয়া যান (ধর্ম্মপথে) তাহাকে কেহই ভ্রান্তিতে লইয়া যাইতে পারে না এবং যে নিজে ভ্রান্তপথে যায়, তাহার অন্য কোন গুরু নাই।" *

ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিশিষ্ট ধর্ম্মের মতাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন যে যিনি সত্য স্রষ্টা তিনি এই মানবজাতিকে এক বিশেষ ধর্ম্মের মতগুলিকে মানিয়া চলার দ্বারাই ইহ পরকালের সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত গ্রথিত কর্ত্তব্যপালনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অন্য ধর্ম্মমতাবলম্বীরা, যাহারা তাহাদের ধর্ম্মানুগত বিশ্বাসের মূলসূত্রগুলি হইতে অন্যমত হয়েন তাহারা পরলোকে শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়েন। এবং যেহেতু প্রত্যেক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ই তাহাদের আপনাপন

---

* কোরাণের উদ্ধৃত বচন।

কৃতকর্ম্মের শুভফলের ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের কুপ্রথা জনিত পরলোকে কুফলের ধারণা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হয়েন, সেই হেতু তাঁহাদের মধ্যে কেহই এই জীবনের ধারায় অন্যের ধর্ম্মমতকে খণ্ডন করিতে পারে না। ফলতঃ সরলতার পরিবর্ত্তে তাহারা ঘৃণা ও পরস্পর হৃদয়ে অনৈক্য বীজই বপন করে এবং পরস্পর পরস্পরকে অমর আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত করে। যেহেতু ইহা স্পষ্টই পরিস্ফুট রহিয়াছে যে, তাহারা সকলেই বহিঃ প্রকৃতির যত কিছু আশীর্ব্বাদ (মুক্ত আকাশ) তাহা সমভাবেই ভোগ করে যেমন সূর্য্যের আলোক, নববসন্তের আনন্দ সুখ, বৃষ্টির ধারা, শরীরের স্বাস্থ্য, বাহ্য ও অন্তরের সকল শুভ এবং জীবনের অন্যান্য ভোগসুখ; সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অসুবিধা ও বেদনা, যেমন অন্ধকারের তমসাগূঢ়তা, এবং শৈত্যের তীব্রতা, মানসিক ব্যাধি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্কীর্ণতা, বাহ্য ও অন্তরের অশুভ, সমভাবেই সহ্য করে, কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মমতাবলম্বী বলিয়া তাহাদের কোন পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না।

যদিচ মানবের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই, কাহার নিকট হইতে শিক্ষা ও পরিচালনা ব্যতীত, শুধু মাত্র তাহাদের তীব্র অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এবং প্রাকৃতিক রহস্যের ভিতরে গভীর অভিজ্ঞতার দ্বারা—যেমন বিভিন্ন প্রকার জীব ও উদ্ভিদনিচয়ের বিভিন্ন প্রকারে নির্দ্দিষ্ট জীবন-ধারণের ধারা, তাহাদের জীবসৃষ্টির নিয়ম; গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ভ্রমণের নিয়ম, পশুদিগের শাবক প্রতিপালনের জন্য তাহাদের আপন প্রাণের অন্তঃপ্রদেশে যে স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ, অথচ তাহাদিগের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ কোন উপকার প্রত্যাশা না রাখিয়া, যে প্রতিপালন এবং এইরূপ আরও বিবিধ প্রকার;—তাহার নিজের ভিতরে এক অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি, যাহা দ্বারা সে ইহা স্থির করিয়া লয়েন যে, এক পরম পুরুষ আছেন—যিনি (তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা) এই সমস্ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; তথাপি ইহা পরিষ্কার পড়িয়া রহিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই যে জাতির মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে সেই জাতির ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করিয়া এক বিশিষ্ট দেবতার অস্তিত্ব (তাহাতে বিশিষ্ট গুণযুক্ত করিয়া) প্রচার করে, এবং সেই সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ কয়েকটী মতবাদকেই অনুকরণ করিয়া চলে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যথা—তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা মনুষ্যগুণ যুক্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, মানুষের মত ক্রোধ, দয়া, ঘৃণা ও প্রেম প্রভৃতি আরোপ করে; কেহ বা সমস্ত প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসবান; অতি অল্প লোকেই নাস্তিক্যবুদ্ধিতে বিশ্বাসী, অথবা দাহর (কাল) বা প্রকৃতিকে বিশ্বের সৃষ্টি শক্তির মূলীভূতকারণ মনে করেন। এবং কেহ কেহ বা সৃষ্টিতে যাহা বিশাল বা বিরাট তাহাতেই ভগবদ্‌বিভূতি আবিষ্ট করিয়া, পূজার্চ্চনার বস্তু করিয়া তোলে। এই সকল ব্যক্তিবর্গ বিশিষ্ট শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে যে বিশ্বাস, তাহার সহিত সৃষ্টির মূল কারণের প্রতি যে স্বতঃ বিশ্বাস, ইহাদের কোন

পার্থক্যই করিতে পারেন না,—মানবজাতির মধ্যে যাহা অবর্জনীয় ও বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়,—এবম্বিধরূপে তাহারা কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলিত ধারা অনুসন্ধানের প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া, অভ্যাস ও প্রচলিত রীতির প্রভাবে বিশ্বাস করে যে, নদীতে স্নান, বৃক্ষকে পূজা, বা সন্ন্যাসী হওয়া, এবং গুরু পুরোহিতের নিকট হইতে নিজেদের পাপের ক্ষমা অর্থদ্বারা ক্রয় করা প্রভৃতি, (বিভিন্ন ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ মতানুসারে) সারাজীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তির বিশিষ্ট কারণ বলিয়া বিশ্বাস করে। এবং তাহারা মনে করে যে, এই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পবিত্র হওন, পুরোহিতদিগের অমানুষিক ক্রিয়া ও তাহাদের আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসের ফল এবং তাহা তাহাদের নিজেদের খেয়াল ও অন্ধ বিশ্বাসের ফল নহে। কিন্তু যাহারা এই সকল বিশ্বাস ও ধর্ম্মমতে অনৈক্য ও শ্রদ্ধাবান্ নহেন, তাহাদের উপর এ সকল কার্য্যের কোন সুফলই হয় না। যদ্যপি এই সকল কাল্পনিক বস্তুর সত্যই কোন সত্য সুফল থাকিত, তাহা হইলে ইহা সকল বিভিন্ন জাতির অনুসরণের ধারায় একই প্রকার হইত, এবং মাত্র শুধু এক বিশিষ্ট জাতির ধর্ম্মগত বিশ্বাস ও অভ্যাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত না। কারণ, যদিচ ফলের শক্তির মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন শক্তিমান ব্যক্তির শক্তি-অনুসারে তারতম্য ঘটে, তথাপি ইহা একজন বিশেষ বিশ্বাসীর ধর্ম্মমতের উপর নির্ভর করে না। তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, যদি কেহ অমৃত বলিয়া মিষ্টান্ন বিশ্বাসে বিষ ভক্ষণ করে, তাহাতে অবশ্যই বিষের ফল ফলিবে ও তাহার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী! "হে ঈশ্বর! আমাকে অভ্যাস ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যবিচারের সুদৃঢ় শক্তি প্রদান কর।"

ধর্ম্মসংস্থাপনকারীরা অপ্রাকৃতি ও অলৌকিক কার্য্যসকলের ভাবকে নিজেদের মধ্যে বিশেষ ধর্ম্মের উৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া, সাধারণ লোকের উপর আপনাদের বিশ্বাসের প্রভাব বর্দ্ধিত করেন।

সাধারণ লোকের ইহাই রীতি, যাহারা খেয়ালের বশে খাটিয়া মরে, তাহারা যখন দেখে যে, কোন্ কার্য্য কৃত, কোন্ বস্তু সৃষ্ট, অথবা প্রাপ্ত ও যাহা তাহাদের বুঝিবার শক্তির ও সামর্থ্যের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হইয়া পড়ে, অপিচ যাহার কোন সহজ কারণ পরিষ্কাররূপে তাহারা নিরাকরণ করিতে পারে না, তখনই সেই কার্য্যকে তাহারা অপ্রাকৃতিক ও অলৌকিক বলিয়া আখ্যা দেয়। রহস্য এইখানেই যে, এই ধারায় যথায় কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলার ভিতর সকল বস্তুই পরস্পর শৃঙ্খলিত ও গ্রথিত রহে, প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বই বিভিন্ন কারণ ও অবস্থার উপর নির্ভর করে; কেন না, যদি শেষ কারণগুলির আমরা বিচার করি, আমরা এমত কহিতে পারি যে, প্রকৃতিতে যে কোন একটী বস্তুই আছে, সমগ্র বিশ্বের সহিত তাহা বিজড়িত হয়। কিন্তু যখন অভিজ্ঞতার অভাবে এবং খেয়ালের প্রভাবে, সেই বস্তুর কারণ কাহার নিকট অজ্ঞাত রহে, অন্য এক ব্যক্তি সেই

সময়ে নিজের স্বার্থসাধনের সম্যক্ সুবিধা ও সুযোগ বুঝিয়া, নিজের দৈবীশক্তির উপর তাহার কারণ নির্দ্দেশ করে, এবং জনসাধারণকে আপন দলে আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষে এই বর্ত্তমান সময়ে অপ্রাকৃতিকত্বে ও অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এমনই মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, যখনই তাহারা কোন আশ্চর্য্য বস্তু নিরীক্ষণ করে, তখনই তাহা তাহাদের অতীতের কোন মহাপুরুষের ক্রিয়ার সঙ্গে বর্ত্তমান কোন ঋষির সহিত মিলাইয়া দেয়, যদিও সেই বস্তুর অস্তিত্বের পরিষ্কার প্রত্যক্ষ কারণ সত্ত্বেও তাহারা তাহা স্বীকার না করিয়া অবজ্ঞা করে। পরন্তু যাঁহাদের সুস্থ মন এবং যাঁহারা জ্ঞানের অভিন্ন সুহৃদ্, তাঁহাদের কাছে ইহা লুক্কায়িত রহে না যে, অনেক জিনিস আছে, যেমন ইউ-রোপীয় জাতির অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রের আবিষ্কার সকল, ও ঐন্দ্রজালিকদিগের ভোজবাজী, তাহাদের কারণ যদিও খুব পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না, এবং মনুষ্যের বুদ্ধি ও ক্ষমতার অতীত বলিয়া মনে হয়, তথাপি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা বা অন্যের নিকট শিক্ষার দ্বারা, সেই সমস্ত কারণই উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। এই উন্নয়নাত্মক কারণ মাত্রেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ নানা দৈবী-ক্রিয়ার প্রবঞ্চনা হইতে যথেষ্ট নিরাপদ হইবার পন্থা। এই বিষয়ে আমরা যতদূর পর্য্যন্ত বলিতে পারি, তাহা এই যে, কোন কোন বিষয়ে, খুব তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী বুদ্ধি-বিচার-শক্তি থাকিলেও কোন কোন বিস্ময়কর বিষয়ের কারণ, কাহার কাহার কাছে অজ্ঞাতই রহিয়া যায়। তখন সেই সব বিষয়ে আমাদের নিজেদের সংবিতের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহাকে এই প্রশ্ন করিতে হয়, যথা,—যে আমাদের বুদ্ধির বিচারের সহিত মিলাইবার পর আমরা মানিয়া লইতে পারি কি না যে, সেই কারণ বুঝিতে আমরা অপারগ, অথবা ইহা কোন অসম্ভব শক্তির কার্য্য, যাহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী হয়? আমার বোধ হয়, আমাদের বোধী প্রথমটীকেই গ্রহণ করিবেন। অধিকন্তু যাহা আমরা নিজেরা প্রত্যক্ষ দর্শন করি নাই, এবং যাহা প্রত্যক্ষ দর্শনের নিয়মের সহিত বিরোধী হয়, সে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন করায় আমাদের কি প্রয়োজন হয়? যেমন, মৃতকে পুনর্জীবিত করণ এবং স্বশরীরে স্বর্গে গমন ইত্যাদি,—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল, এমত শুনা যায়। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বলিয়া মনে হয় যে, যদিচ লোকে বৈষয়িক ব্যাপারে, একের সহিত অন্যের নির্দ্দিষ্ট যোগের ব্যাপার না জানিয়া, তাহারা বিশ্বাস করে না যে, একটী কারণ আর অন্যটী তাহার ফল, অথচ যখন ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের প্রভাব তাহাদের উপরে পড়ে, তখন তাহারা একটীকে কারণ আর অন্যটীকে ফল বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, যদিচ সেই উভয়ের মধ্যে কোন সংযোগ বা কোন পারম্পর্য্য নাই। যেমন দোয়া'র (অর্থাৎ কোনরূপ প্রার্থনা) ফলে বিপদ হইতে দূর হওন অথবা কোন তুক্‌তাক্ বা রক্ষাকবচ ইত্যাদি দ্বারা রোগ হইতে মুক্ত হওন।

যখন এই সকল রহস্যময় বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করা হয়, যে সমস্ত বিস্ময়কর কার্য্যে, বুদ্ধি জ্ঞান তাহার সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে দ্বিধা বোধ করে, তখন ধর্ম্ম-গুরুগণ তাঁহাদের অনুচরদিগের তুষ্টির জন্য ব্যাখ্যা করেন যে, ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে, বিচার ও তর্কের কোন কার্য্যই নাই; এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের ব্যাপার ভগবদ্‌-কৃপা ও বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে। যে বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই এবং যাহা যুক্তিজ্ঞানের স্ববিরোধী এবং যাহা তাহার সহিত সঙ্গত বলিয়া বিবেচনায় আইসে না, বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বা কেমন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ও স্বীকৃত হইতে পারেন?—"হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জনগণ, ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। *

ন্যায়শাস্ত্রে তাহাদের গভীর জ্ঞান ও অধিকার থাকার জন্য তাহারা কখন কখন তর্ক করিতে আরম্ভ করে যে, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ক্ষমতার কাছে ইহা কিছুই অসম্ভব নয় যে, সম্পূর্ণ অবস্তু হইতে এই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি করা, মৃতদেহের মধ্যে দ্বিতীয় বার আবার প্রাণসঞ্চার করা এবং এই প্রশংঙ্কাত্মক শরীরে আলোকের গুণ ও ধর্ম্ম বা বায়ুর উপরে এমন ক্ষমতা প্রদান করা যাহাতে অল্পক্ষণের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারে। কিন্তু এই সকল তর্ক যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ঐ সকল ঘটনা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা আছে, অথচ তাহাদের পূর্ব্বতন ধর্ম্মগুরু-দিগের ও আধুনিক মুজতাহিদ্‌দিগের অপ্রাকৃতিক কার্য্যসকলের প্রমাণ করিতে চায়, এমতে ইহা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে স্পষ্টই পরিষ্কার বোধগম্য হয় যে, এই যুক্তি তর্কে কোন তক্‌রিব † নাই।

ইহা ব্যতীত যদ্যপি তাহাদের যুক্তিকে সত্য বলিয়াও ধরা যায়, তবে 'মানজারা' অর্থাৎ তর্ক-বিতর্কে বা বাদানুবাদের সময় 'মানা' অর্থাৎ ব্যাপ্তি নিরূপণে সাধ্য পক্ষ ও তত্ত্ব প্রতিপাদ্যের সত্য বিষয়ে প্রশ্ন করার কোন উপায়ই রহে না। এবং কোন প্রতিজ্ঞাকে, তাহা যাহাই হউক না কেন, ত্যাগ করার দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ, যে কেহই অসম্ভব বস্তুসকলের প্রমাণের জন্য চেষ্টা করে, বিচার-কালে সেই প্রকারের সাধ্য ও পক্ষের পথ লয়, এবং এইরূপে সম্ভব ও অসম্ভব উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার কোন নিরাকরণই হয় না, ফলতঃ প্রতিজ্ঞার সমস্ত ভিত্তি এবং ন্যায়বিচারের গাঁথনি ধূলায় লুণ্ঠিত হয়। যদ্‌হেতু ইহা স্বীকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে যে, স্রষ্টার অসম্ভব বস্তু সৃষ্টির কোন ক্ষমতাই নাই; দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত অংশীদারীর সম্পর্ক বা ঈশ্বরের অনস্তিত্ব অথবা দুই বৈপরীত্যের এককালে স্ববিরোধী অস্তিত্ব ইত্যাদি।

---

* কোরাণ হইতে উদ্ধৃত আরবী বাক্য।

† ন্যায়শাস্ত্রে তক্‌রিবের অর্থ—প্রতিজ্ঞার প্রামাণ্যের সহিত মীমাংসার সামঞ্জস্য।

হাফেজ হইতে একটী শ্লোক।

বাহাত্তরটী সম্প্রদায়ের যে বিরোধ তাহা ক্ষমা করা যাইতে পারে, কারণ তাহারা সত্যের দর্শন না পাইয়া, উপকথা ও অবান্তর কথার পথ মাড়াইয়া চলিয়াছে। *

যেহেতু সময়ের ব্যবধানের জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের গুরুগণের অতিমানুষিক ক্ষমতার বিষয় বহিরিন্দ্রিয়ের অর্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত করা যায় না। (যাহা কোন কোন অবস্থায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বস্তু) সেই হেতু বিভিন্ন ধর্ম্মধ্বজী-দিগের আচার্য্যগণ তাহাদের অনুচরদিগের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, সেই সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ জন্য 'তোয়াত্তর' (পৌরাণিকী কথা বা সাধারণের দ্বারা সংগৃহীত ধারাবাহিক প্রচলিত চলিত কথা) এর ভাবকে পোষণ করে। অথচ 'তোয়াত্তরের' ভাবসম্বন্ধে বিশেষ অনুধাবন করিলেই যাহা স্থির বিশ্বাসকে আনিয়া দেয় এবং ধর্ম্মের অনুসরণকারীদিগের দ্বারা যে 'তোয়াত্তর' গৃহীত হয়, তাহার দ্বারা এ উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যা হেত্বাভাস বা ন্যায়ের ফাঁকি তাহা বিদূরিত করা যাইতে পারে। কারণ, ধর্ম্মের অনুসরণকারীদিগের মতে 'তোয়াত্তর' এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে আগত হয়, যাহাদের উপর মিথ্যার আরোপ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু পুরাকালে সেই শ্রেণীর লোকের সত্য অস্তিত্ব ছিল কি না, বর্ত্তমান কালের লোকেদের কাছে, অভিজ্ঞতা বা বহিরিন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা তাহা তাহাদের নিকট সম্পূর্ন অজ্ঞাত তো বটেই, বরং তাহা অত্যন্ত অসম্ভব ও সন্দেহজনক। তাহা ব্যতীত অতীতকালের প্রত্যেক ধর্ম্মের গুরুদিগের মধ্যে বিশাল মতান্তর, তাহাদের ধারণাকে মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণ করে। যদ্যপি ইহা বলা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর লোকের দ্বারা কথিত বিষয়ের সত্যতা যাহারা তাহাদের গুরুগণের অলৌকিক কার্য্যের চাক্ষুষ সাক্ষ্য দেয়, তাহাদের পরের শ্রেণীর লোকের যাহারা তাহাদের সমসাময়িক—কথার দ্বারা প্রমাণ করিতে হয়, এবং সেই পরের শ্রেণী অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের কথার সত্যতা আবার তৃতীয় শ্রেণীর লোকের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে হয়। (যাহারাও তাহাদের সমসাময়িক) তাহাদেরও যোগ করা কর্ত্তব্য; কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের কথার সত্যাসত্যও প্রমাণ সাপেক্ষ এবং সেই প্রকারে তৃতীয় শ্রেণীর কথার জন্যও চতুর্থ শ্রেণীর যোগ প্রয়োজন, এবং এই প্রকার ধারাবাহিক সাক্ষ্য প্রমাণের ধারা পরবর্ত্তী কাল অবধি আসিয়া পড়ে। ইহা পরিষ্কার বোধগম্য হয় যে, সুস্থ মনের লোকেরা সেই শ্রেণীর লোকদিগকে যাহারা তাহাদের সমকালেই ছিল,

* মুসলমানদিগের মধ্যে ৭২টি সম্প্রদায় আছে।

একথা মানিতে দ্বিধা করিবে; বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ে কোন মিথ্যার আরোপ তাহাদিগের উপর করা যায় না। এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যৎ বাণীর স্বীকার এবং অস্বীকার ও ধর্ম্মগুরুদিগের বহুতর উত্তম উত্তম গুণসম্বন্ধে, প্রকাণ্ড বিরোধ দেখা যায় এবং এই সকল বিরোধী মতামত সেই 'তোয়াত্তরের' দ্বারাই প্রমাণীকৃত হয়। সুতরাং প্রত্যেক দলের কথার সত্যতা যদিও গ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে দুই বিভিন্ন বিরোধীমতকে স্বীকার করিতে হয়। এবং একজনের কথার উপর বিনা কারণে আর একজনের কথার বিশ্বাস স্থাপন করা হয় (অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট কারণ না দেখাইয়া বিশ্বাস করা) কারণ প্রত্যেকদলই সমভাবেই ছলনা করিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কথাই সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য। কথা এই যে, 'তোয়াত্তর' বা প্রচলিত কথা যেখানে বিচার বুদ্ধির নিকট গ্রহণীয় বা যে লোকের কথার সত্যের কোন প্রতিবাদ কাহার দ্বারা হয় নাই, সেইখানেই স্থির বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই প্রকার 'তোয়াত্তর' বিচার-বুদ্ধির বিরোধী অসম্বদ্ধ কথা হইতে অনেক পৃথক্। এই প্রকার মত বিচারের দ্বারা নিম্নলিখিত তর্কবিচারের ধারাকে (ভবরোগবৈদ্যদিগের দ্বারা গঠিত) সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। তাহারা বলে, প্রথমতঃ, যে, "কেমন করিয়া সেই সমস্ত লোক যাহারা ইতিহাসে লিখিত পৌরাণিক রাজাদিগের কাহিনী ও প্রচলিত তোয়াত্তর বা প্রচলিত-কাহিনীর ধারায় বিশ্বাস করে, তাহারা যে ধর্ম্মের গুরুদিগের দৈবী কার্য্যসকলের কথা, যাহা বহুকাল হইতে জাতির যে সনাতন প্রচলিত কথা ও জনশ্রুতি বা পুরাতন পুঁথির মধ্যে উল্লেখ আছে, তাহাকে যে ত্যাগ করে, তাহার ন্যায়মতে বিচার কি হয়? এবং দ্বিতীয়তঃ, কেমন করিয়া সেই সমস্ত লোক যাহারা তাহাদিগের হইতে বর্ণ, আকার ও সামাজিক রীতিনীতিতে পৃথক্ হইয়াও এবং নিগূঢ় তত্ত্ব তাহাদের নিকট গুপ্ত থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ বংশের ধারার জন্মের কথায় যাহা 'তোয়াত্তরের' দ্বারা পাওয়া যায়, তাহাতে যাহারা বিশ্বাসবান্ হয়, তাহারা কেমন করিয়া পুরাতন মুজতাহিদ্‌দিগের পবিত্রতা ও অলৌকিক কার্য্য বিশ্বাস করিতে দ্বিধা করে, যাহাও সেই একই প্রকার তোয়াত্তরের দ্বারাই পাওয়া যায়?" অধিকন্তু অতীতকালের রাজাদিগের কাহিনী যেমন কোন রাজার সিংহাসনারোহণ ও শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ ইত্যাদি যাহা বিশ্বাসযোগ্য ও সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে, অথচ ওই সকল দৈবকার্য্যের কাহিনী যাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর তাহাকে অগ্রাহ্য করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন কোন এক শ্রেণী জন্তুর জন্ম যেমন চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হয়, কিন্তু পিতা মাতা ব্যতিরেকে সন্তানের জন্ম বুদ্ধি জ্ঞানের বিশ্বাসে সম্পূর্ণ বিরোধী হয়।

"এক পথ হইতে অন্য পথের মধ্যে কি বিশাল পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখহ।"

এতদ্ব্যতীত অতীতকালের রাজাদিগের কাহিনী অথবা তাহাদের বংশাবলীর ধারার কথা মনে শুধু মাত্র ধরিয়া লওয়া হয় এবং যদি কোন ধর্ম্মের ধর্ম্মমত সকলের বিশ্বাস, তাহাদের ধর্ম্মানুশাসন মতে তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টবস্তু হয়, সুতরাং এইরূপ বস্তুগত পার্থক্য থাকায় একের সহিত অন্যের কোন সাদৃশ্য বিচারই হইতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও যখন ইতিহাসে রাজাদিগের কাহিনী বা বংশাবলীর কথায় যদি কোন বিরোধ উত্থাপিত হয়, তখন সে সমস্ত কথা ও কাহিনী অবিশ্বাস্ত বলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন অলিকসুন্দরের চীনবিজয় ও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে গ্রীস ও পারস্যের ইতিহাস লেখকদের পরস্পর মতবিরোধ দেখা যায়, সুতরাং তাহাকে সঠিক সত্যরূপে ও নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

কেহ কেহ এইরূপ ভাবে তর্ক করে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ স্রষ্টা, ধর্ম্মগুরু ও অবতার-দিগের মধ্য দিয়াই পথপ্রদর্শকরূপে এই পৃথিবীর জীবদিগকে চলিবার পথ খুলিয়া দিয়াছেন। ইহা পরিষ্কাররূপেই ভ্রম, কারণ সেই সকল লোকেরাই বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিতে সকল বস্তুরই অস্তিত্ব, কি সৎ বা অসৎ সকলেই সেই মাঝে থাকা দালাল ব্যতীত মহান্ স্রষ্টার সহিত সংযুক্ত এবং তাহাদের অস্তিত্বের সকল অবস্থা ও মাঝে থাকাই তাহাদের দ্বিতীয় কারণ। অতএব এখন দেখিতে হইবে যে, আপ্তবাক্য ও অবতারদিগের প্রেরণা ও আদেশ যাহা তাহাদিগের নিকটে আইসে, তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ নিকট হইতে না ঐ সকল মধ্যবর্ত্তী লোকের নিকট হইতে আইসে। প্রথম পক্ষে লোকের জন্য পথ দেখাইবার একজন মাঝে থাকা দালালের কোন প্রয়োজনই নাই এবং অবতার বা আপ্তবাক্যের মত যন্ত্রের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। এবং দ্বিতীয় পক্ষে মাঝে থাকা দালালের ধারাই চলিয়া আইসে যাহার আর কোন সমাপ্তিতেই শেষ হইবে না। অতএব অবতার বা আপ্তবাক্যের আবির্ভাবও প্রকৃতিতে অন্যান্য বিষয়ের মত ঈশ্বরের সম্বন্ধ ব্যতীতই বাহিরের কারণের উপরই নির্ভর করে অর্থাৎ তাহা উদ্ভাবকের উদ্ভাবনার উপরেই নির্ভর করে। অবতার প্রভৃতি উদ্ভাবিত সম্প্রদায়সকলের উপদেশের বিশেষ কোন বাণী বহন করিয়া আইসে না। এতদ্ব্যতীত কোন এক জাতি যাহাকে তাহার সত্য বিশ্বাসে পৌঁছিবার বিশেষ পন্থা বলে, অন্যে তাহাকে ভুল করিয়া ভুলপথে লইয়া যাওয়াই কহে। ধর্ম্মানুসরণকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবংবিধ তর্কও করিয়া থাকেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মের উপদেশের মধ্যে অনৈক্য থাকায় ইহা প্রমাণিত হয় না যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যেই মিথ্যা আছে। পৃথিবীর পুরাকালের ও বর্ত্তমানের শাসনকারী-দিগের আইনের মধ্যে যেমন অনৈক্য দেখা যায়, সমাজের ধর্ম্মের এই অনৈক্যও ঠিক সেই একই প্রকার; আধুনিক শাসনকারীরা যেমন বিভিন্ন সময়ে সমাজের বিভিন্ন

অবস্থা বুঝিয়া, পূর্ব্বেকার গ্রথিত আইনসকলকে যখন তখন রদ করেন, সেই প্রকার এই সমস্ত ধর্ম্মসকলের পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এ সকলই তাঁহারই ইচ্ছায় একটা রদ হইয়া আর একটার প্রতিষ্ঠা হয়। এই তর্কের উত্তরে আমার জবাব এই যে, এই আইন বা শাসনপ্রথা কি সত্যস্বরূপ ভগবানের, যিনি ধর্ম্মানুসরণকারীদিগের মতে, প্রত্যেক অণুপরমাণুর বিশেষ অবস্থার সহিত পরিচিত এবং যিনি স্বয়ম্ভু, যাঁহার নিকট ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলই সমভাবে জ্ঞানে প্রতিভাত এবং যাহার প্রভাবে সমস্ত মানব জাতির হৃদয়ে তিনি যখনই যাহা ইচ্ছা করেন, তখনই তাহাদিগের হৃদয়কে সেই পথেই ফিরাইতে পারেন এবং যিনি সকল বস্তুরই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কারণের সংগোপ্তা এবং যিনি তাঁহার নিজস্ব কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্বার্থ হইতে দূরে রহেন, এবং যিনি খেয়ালের কল্পনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাঁহার কার্য্যের সহিত মানবজাতির আইন বা শাসন-প্রথার কোন সাদৃশ্য বিচারই হইতে পারে না; কারণ যাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি অসম্পূর্ণ এবং যাহারা তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যের বিশেষ চরম উদ্দেশ্য বুঝিতে সম্পূর্ণ অপারগ এবং যাহারা সদাই ভুল-ভ্রান্তির বশীভূত এবং যাহাদের সকল কার্য্যই স্বার্থপরতা প্রবঞ্চনা এবং ছলনায় ভরা। ইহা কি সেই প্রকারের সাদৃশ্য উপমান বিচার নহে; দুই বস্তু উভয়েই যাহারা তাহাদের আসল স্বত্বতেই পৃথক্? এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত মতকে গ্রহণ করায় আরও বহু ঘোরতর বাধা আছে। যেমন ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতে সনাতন প্রথামত আসিয়াছে এবং ভগবানের নিকট হইতে এই কঠিন আদেশ প্রাপ্ত যে, চিরকালের জন্য তাহারা তাহাদের আচার ও রীতিনীতি পালন করিবে ও এই বিশ্বাস রক্ষা করিবে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভগবদ্ বাক্য প্রামাণ্য হইতে এইরূপ অনেক আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং আমি, ভগবানের সৃষ্টিতে আমি অতি অধম ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছি, সেই ভাষা শিক্ষা করিয়াছি এবং সেই সকল অনুজ্ঞা হৃদয় মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি এবং এই জাতি (ব্রাহ্মণেরা) ভগবদ্ অনুজ্ঞায় এমনই বিশ্বাসবান্ যে, তাহা কদাপি তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না; যদিচ তাহারা ইহার জন্য অনেক শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে এবং ইস্‌লামের প্রবর্ত্তকদিগের হইতে হত্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে ইস্‌লামের অনুসরণকারীরা তাহাদের কোরাণের পবিত্র শ্লোকের মতানুসারে (পৌত্তলিকদিগকে যেখানে দেখিবে, সেইখানেই হত্যা করিবে) এবং (সর্ত্তে আবদ্ধ করিবে অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে অবিশ্বাসীদিগকে বন্দী করিবে তাহার পর হয় অর্থ লইয়া, না হয় তাহাদিগকে ধর্ম্মে বাধ্য করিয়া পরে মুক্তি দিবে)—ভগবান্

হইতেই প্রামাণ্য দেখায় যে, পৌত্তলিকদিগকে হত্যা করা এবং প্রতিপদে তাহাদিগ্যের উপর যন্ত্রণা ও অত্যাচারাদি দ্বারা পীড়ন করা, ভগবানের আদেশেই এইরূপ করিতে বাধ্য। পৌত্তলিকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর পৌত্তলিক। অতএব ইস্‌লামের অনুসরণকারীরা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের গোঁড়ামীর উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া ভগবানের বাণী বহন করিবার আকাঙ্খায়, বহু দেববাদীদিগকে যাহারা পয়গম্বরের বাণী ও ইহ-পরলোকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ তাহা বিশ্বাস না করে, তাহাদিগকে নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়িত করিতে ও হত্যা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে বিমুখ হয় না। ভগবৎ আশীর্ব্বাদ যেন তেঁহ ও তাঁহার শিষ্যদিগের উপর রহে। এখন এই সকল বিরোধী মত ও উপদেশ সেই মহান্ সদাশয় ও নিঃস্বার্থ স্রষ্টার দয়া ও জ্ঞানের সহিত মিলন হয় না, ধর্ম্মের অনুসরণকারীদিগের মিথ্যা জাল রচনা হয়? আমার বিবেচনায় এই আইসে যে, যে কোনও সুস্থ প্রকৃতির ব্যক্তি শেষোক্ত মতবাদটী গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না। তৎপরে ইহাও বিচার করিতে হইবে যে, উভয়ের মধ্যে কোনটী যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ হয় এই সকল আদেশ বা অনুজ্ঞা ভগবানের দিক্ দিয়া লইতে হইবে, নয় বিরোধী সনাতনী প্রচলিত কথা বলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন এক শ্রেণী তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের প্রামাণ্যে বলে যে, ধর্ম্মগুরুগণের সঙ্গেই ভবিষ্যতের বাণী রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং অন্যদলে দাবী করে যে, ভগবানের প্রামাণ্য আদেশ হইতে ইহাই বলে যে, ভবিষ্যতের বাণী দাউদের বংশপরম্পরায় শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিবে। বস্তুতঃ এই দুই কথাই প্রচলতি বা ভবিষ্যৎবাণী এবং ইহারা কোন আদেশ বা আইন নহে যে, ইহা রদ করা যাইবে। কারণ, একে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যে অবশ্যই মিথ্যা হয় কিন্তু পরিবর্ত্তনের যে আশঙ্কা বা মিথ্যা হওয়া, উভয় মতেই সমভাবে প্রযোজ্য। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই সকল ধর্ম্মনেতাদিগের প্রস্থানের সময় হইতে শত শত শতাব্দীর পর ভারতবর্ষে ও অন্যান্য প্রদেশে নানক ও অন্যান্য লোক ভবিষ্যৎবাণীর পতাকা উড়াইয়াছেন এবং নানা প্রলোভনের দ্বারা বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নিজেদের অনুগামী করিয়াছেন ও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বরং যাহারা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও সামান্য বুদ্ধির লোক তাহাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য পরিপ্রাপ্তির দ্বার সর্ব্বদাই একেবারে মুক্ত হইয়া রহে। ইহা প্রতিনিয়তই দেখা যাইতেছে যে, শত শত ব্যক্তি কোন সম্মান বা সামান্য পদার্থ লাভেচ্ছু হইয়া তাহার জন্য নানাপ্রকার শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন ও অনাহারে কষ্ট ভোগ করে অর্থাৎ প্রতিনিয়তই উপবাস করা, স্থির হইয়া গতিবিহীন করিয়া হস্ত উত্তোলন করা, শরীরকে দগ্ধ করা ইত্যাদি। (যাহা হিন্দু সন্ন্যাসী ও মোহন্তদিগের মধ্যে দেখা যায়)। অতএব ইহা বিস্ময়কর

নয়, যে (অতীত যুগে) কোন কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির লোকের নিকট নেতা হইবার সম্মান অর্জন করিবার জন্য অথবা লোকের নিকট নিজেদের শ্রদ্ধার পাত্র ও বস্তু করিয়া তুলিবার জন্য এই সকল কৃচ্ছ্রসাধন ও সময়ের নানাবিধ বিপদ সহ্য করে। একটা কথা আছে, যাহা প্রায়ই ধর্মাচার্যগণের নিকট হইতে শ্রুত হওয়া যায়, এবং যাহা তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রামাণ্য বলিয়া উদ্ধার করে। তাহারা প্রত্যেকেই বলে যে, তাহার ধর্মে, মৃত্যুর পরে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পুরস্কার বা শাস্তির সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করে, তাহা হয় সত্য নয় মিথ্যা। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি তাহা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন পুরস্কার ও শাস্তিই থাকে না, তবে তাহা হইলে তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কোন ক্ষতিই নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষে অর্থাৎ যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে অবিশ্বাসীদিগের পক্ষে বিশেষ বিপদের কথা। বেচারা সাধারণ লোক সকল যাহারা ধর্মব্যাখ্যাকারীদিগের মতের অনুগামী, তাহারা নেতাদিগের বাক্যকেই চূড়ান্ত তর্ক-বিচার-নিষ্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করে ও সর্বদাই তাহারা অহঙ্কার ও বড়াই করে। সত্য হইতেছে এই যে, মানবজাতিতে অভ্যাস ও শিক্ষাসংস্কার চক্ষু এবং কর্ণ থাকিতেও অন্ধ ও বধির করে। উপরোক্ত বাক্য উভয় প্রকারেই হেত্বাভাসও ন্যায়ের ফাঁকি। প্রথমতঃ— দ্বিতীয় পক্ষে, তাহাদের কথায় যে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কোন ক্ষতি নাই ইহা গ্রহণ করা যায় না। কারণ জীবন্ত অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার পর সেই বস্তুর সত্যঅস্তিত্বে বিশ্বাস, মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পাইতে হইবে। কিন্তু সেই সকল বস্তুর স্বরূপ অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, যাহা বুদ্ধিজ্ঞান হইতে বহু দূরে রহে এবং অভিজ্ঞতার কাছে দুঃসহ অবজ্ঞার কারণ হয়, তাহা বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের ক্ষমতায় আইসে না। দ্বিতীয়তঃ সেই সকল বস্তুতে বিশ্বাস থাকায় অভিজ্ঞতার অভাবে ও জঘন্য অজ্ঞানতার জন্য, ইহা নানাপ্রকার অন্যায় কার্য, অত্যাচার, দুর্নীতিপরায়ণ কর্মের মূল হইয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ গোঁড়ামী, প্রবঞ্চনা, ইত্যাদি। যাহা হউক এই পক্ষে যদি এ বিচারকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, এবং ইহা হইতেই সকল প্রকার ধর্মের যাহা সত্য, তাহার নিরাকরণ হয়; কারণ, প্রত্যেক ধর্মানুসরণকারিগণ একই তর্কের ধারা সমভাবেই প্রকাশ করিতে পারে—তাহা হইলে সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, একটীকে গ্রহণ ও অপরটিকে বর্জন করা যে কোন লোকের পক্ষে অত্যন্ত গোলমাল হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রথমটী যেমন অসম্ভব ফলতঃ দ্বিতীয়টীকেও অবশ্য গ্রহণ করিতে হয়। এবং এ পক্ষেও তাহাকে পুনরায় নানা ধর্মের সত্য ও মিথ্যায় অনুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হইতে হয়। এবং ইহাই আমার এই তর্ক বিচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অতঃপর কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্যগণের যুক্তি এই যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রচলিত সনাতন প্রথা ও সাম্প্রদায়িক আচার ও রীতিনীতির মধ্যে কি সত্য, বা মিথ্যা আছে, তাহার কোন অনুসন্ধান বা বিচার না করিয়াই আমাদিগ্যের তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য এবং সেই সকল ধর্ম্মানুশাসন ও সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা অথবা তাহা হইতে অন্যমত হওয়ায় ইহলোকে লজ্জা ও পরলোকে দুঃখ বহন করিয়া লইয়া যায়, এবং ঐ প্রকার কার্য্য আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি অবমাননা ও ঘৃণার ব্যবহার করা হয়। তাহাদিগ্যের এই মিথ্যাযুক্তিতে যাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালমত পোষণ করে,—সাধারণ লোকের মনে বেশ ভাল রকমই ফল ফলে, এবং ফলে ন্যায়পথ অবলম্বনে ও সত্যানুসন্ধানে তাহাদিগকে বাধা দেয়। এই যুক্তির হেত্বাভাস ও অসারত্ব একটু চিন্তা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে। কারণ. ইহা সমভাবেই প্রযোজ্য যে, প্রথমতঃ—যাহারা কোন নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া, জনসাধারণকে তাহাদিগ্যের প্রতি আকর্ষণ করে, এবং দ্বিতীয়তঃ—যাহারা তাহাদিগোর ধর্ম্মগুরুদিগের নিকট হইতে উপদেশ ও অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের আচরিত পুরাণ পথ হইতে ভিন্নপথ লয় এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মপদ্ধতির ভিত্তিকে টানিয়া উপড়াইতে চেষ্টা করে। যদি কোন মনুষ্য কেবলমাত্র নিজের আবিষ্কারকে ভগবানের উপর আরোপ করার অপরাধের জন্য শাস্তি পাইতে হয়, তাহা হইলে-এই পথ অবলম্বনই খুব প্রশস্ত উপায়। কথাটা এই যে, এক ধর্ম্ম পরিহার এবং অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ, যাহা পূর্ব্বতন কালের লোকদিগের নিকট সচরাচর প্রচলিত ছিল, তাহাতে বুঝায় যে, ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ মানবজাতির অভ্যাসের মধ্যেই বর্ত্তিয়া আছে। ইহা ব্যতীত মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভগবান্ সে বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই বোধগম্য হয় যে, অন্যান্য জীবের মত, মনুষ্য তাহার জাতির অন্যান্য জাতভাইদিগের অনুসরণ করিবে না বরং সে তাহার অধিকৃত জ্ঞানের দ্বারা ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সৎ ও অসৎ বিচার করিবে, যাহাতে তাহার এই মহামূল্য ভগবৎ দান বৃথায় ব্যয়িত না হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের অনুসরণকারীরা কখন কখন পৃথিবীতে ঈশ্বরবাদীদিগের সংখ্যার প্রাচুর্য্য দেখিয়া গর্ব্ব করে যে, অধিকাংশ লোক তাহাদিগ্যের দিকেই আছে। ইহা দেখিতে হইবে যে, কোন বাক্যের সত্যতা, কথিতের সংখ্যার অধিক গুণফলে নির্ভর করে না, এবং কোন ঘটনার বর্ণনার বিশ্বাসযোগ্যতা শুধু মাত্র কথিতের সংখ্যার প্রাচুর্য্য নিবন্ধন হয় না। কারণ, সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগের নিকট, ইহা গ্রহণীয় হইয়াছে যে, যদিচ অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার বিরুদ্ধ হয়, তথাপি সত্যকেই অনু-

সরণ করিতে হইবে। অধিকন্তু এই প্রতিজ্ঞাকে গ্রহণ করিলে পর অর্থাৎ কথিতের সংখ্যার প্রাচুর্য্যতা, কথার অসত্যতাই জানিয়া দেয়—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত—এবং সকল প্রকার ধর্ম্মের প্রতি মারাত্মক আঘাত করাই প্রমাণ করে। কারণ, প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রারম্ভে অতি অল্প লোকেই তাহা মানিয়া লয়। যথা—ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার অতি অল্প একনিষ্ঠ সরল অনুগামিগণ, যাহারা তাঁহার সহিত একই উদ্দেশ্যে জড়িত; এবং তাহারা পরে তর্কের এত প্রকার বহুল ধারা ও এত রাশি রাশি গ্রন্থসকল লিখেন ও সেই অল্প লোকের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহা প্রকাশ করেন—যেমন একগাছি তৃণের উপরে পর্ব্বতের প্রতিষ্ঠা করার মত,—অথচ প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল ভিত্তি হইতেছে যে, এক সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের উপর বিশ্বাস। যাহারা ভগবান্ হইতে স্বাভাবিক আদেশের স্থানে এই সকল তৈয়ারী আপ্তবাক্যের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান্ হয়, যাহা শুধু আপনাপন জাতির সামাজিক জীবনের ধারার মধ্যেই নিহিত এবং মিথ্যা হইতে সত্য বিচার করিবার সংবিত ও বিচারবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগের সকল সমস্থই ব্যক্তির পরস্পর স্নেহ ও ভালবাসার দ্বারা হৃদয়ের মিলন না করিয়া, আকার, বর্ণ, ধর্ম্ম, ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য না ধরিয়া, যাহা প্রকৃতিতেও ভগবানের নিকট একমাত্র পবিত্র উপাসনা বলিয়া গ্রহণীয়,—কতকগুলিন বিশেষ পরিবর্ত্তন ও শারীরিক মতিগতির নিয়মকে মুক্তির মুখ্য কারণ ও সর্ব্বশক্তিমানের কৃপা পাইবার বিশেষ কারণ বলিয়া মনে করে। তাহারা বস্তুতঃ ভগবানের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তনের আরোপ করে, এবং মনে করে যে, তাহাদের শারীরিক কার্য্য ও মানসিক ভাবসকল অপরিবর্ত্তনশীল ভগবানের পরিবর্ত্তন আনিবার ক্ষমতা রাখে। আমাদের আপন কার্য্যসকল বা প্রাণের ভাবসকল কোন কারণেই ভগবানের ক্রোধ শান্তি বা তাঁহার ক্ষমা ও কৃপাপ্রাপ্তির কারণ হইতে পারে না। কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা সত্যকেই ধরাইয়া দেয়।

শ্লোক।

সেখগণের বা আধ্যাত্মিক গুরুগণের এই সকল প্রবঞ্চনা কার্য্যের কোন মূল্যই নাই। মানবের প্রাণে শান্তি দান কর, এই একমাত্র ভগবদ্ উপদেশ।"

স্বল্প কথায় ইহাই বলা যায়, মানবজাতির মধ্যে যাহারা প্রবঞ্চক এবং যাহারা প্রবঞ্চিত হয় এবং যাহারা উভয়ের কোনটাই নয়—ইহারা চারিভাগে বিভক্ত।

প্রথমতঃ—এক শ্রেণীর লোক আছে, যাঁহারা জনসাধারণদিগকে তাহাদিগের দলে টানিয়া লইবার জন্ত ইচ্ছা করিয়া সাম্প্রদায়িক উপদেশ, নীতি, ও ধর্ম্মমত পদ্ধতির রচনা করে, এবং জনসাধারণকে দুঃখে নিক্ষেপ করে ও পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের কারণ সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ—এক শ্রেণীর প্রবঞ্চিত লোক, যাহারা সত্যের কোন অনুসন্ধান না করিয়া তাহাদের মতে অনুগমন করে।

তৃতীয়তঃ—এক শ্রেণীর লোক, যাহারা প্রবঞ্চকের দল ও নিজেরাও প্রবঞ্চিত। তাহারা নিজেরা অন্যের বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অন্যকে সেই উপদেশ মত চলিবার জন্য টানিয়া আনে।

চতুর্থতঃ—যাহারা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের প্রসাদে প্রবঞ্চনাও করে না এবং প্রবঞ্চিতও হয় না।

হাফেজের রচিত শ্লোক।

কোন জীবের কোন অনিষ্টের জন্য ঘুরিও না এবং তাহা ব্যতীত যাহা খুসী হয় করিও। কারণ ইহা ব্যতীত আমাদের পথে, আমাদের আর কোন পাপই নাই।

এই স্বল্প কয়েকটী কথা, অল্প এবং প্রয়োজনীয়, ভগবানের সৃষ্ট এই অধম জীবের মতে —কোন গোঁড়ামী বা একদেশী না হইয়া পক্ষপাতিত্ব শূন্য হইয়াই লিখিত হইয়াছে, এই আশায় যে সুস্থ মন ও চিত্তযুক্ত ব্যক্তিগণ ন্যায়ের চক্ষে ইহাকে দেখিবেন। "মানাজারা তুল * আদিয়ান" নামে মৎ লিখিত অন্য এক গ্রন্থে ইহা বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। নকলকারীদিগের দ্বারা কোন পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় লিখিত হইবার পরেই ইহা আমি মুদ্রিত করিয়াছি। সকলে জ্ঞাত হউন যে, এই গ্রন্থে যে সকল আশীর্ব্বচন মহাজনদিগের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আরব ও আজমের রীত্যনুসারেই অনুসরণ করা হইয়াছে মাত্র।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

সমাপ্ত।

এই অনুবাদে যথাসম্ভব রাজা রামমোহন রায়ের ভাষার ও রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে। ইতি— অনুবাদক।

* মানজারা পরস্পর কথাবার্তার ছাঁচেই রচনা তাহাকে মানজারা বলে; যাহাতে দুই তিন জনের অধিক ব্যক্তিও রহেন ও যে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে প্রকার তর্ক ও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন।

কি দেখা

আমি তখন সুদূর পশ্চিমে চাকরী করি। বৈশাখ মাস, চারিদিকে গাছ-পালাগুলি যেন মরিয়া বাঁচিয়া আছে। আফিস হইতে বাড়ী ফিরিতে একটু দেরী হইয়াছিল। সারাদিনের খাটুনির পর একটু বিশ্রামের জন্য সামনের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। চাকর তামাক দিয়া গেল, আপনার মনের গম্ভীরতার সঙ্গে গুড়্‌গুড়ির গম্ভীর আওয়াজে চারিদিক বেশ জমিয়া উঠিতেছিল; এমন সময় ডাকহরকরা আসিয়া তিনখানি চিঠি আমার হাতে দিয়া গেল। একখানা, সরকারের কাছ হইতে আমার পঞ্চাশ টাকা মাহিনা বৃদ্ধির সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, আর একখানা কয়লাওয়ালার হিসাব, তৃতীয়খানা আমার বাল্যবন্ধু উ···র কাছ হইতে। উ··· ও আমি এক সঙ্গেই পশ্চিমে আসি। আজ ছয় সাতদিন হইল, হঠাৎ উ··· দুই মাসের ছুটী লইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহা কেহ জানিত না, আমাকেও কিছু বলিয়া যায় নাই। আমার প্রথমে বন্ধুর ব্যবহার একটু অদ্ভুত লাগিয়াছিল, এই চিঠিটা পাইয়া আমারও মনে হইল, উ··· ও যেন মরিয়া বাঁচিয়া আছে।

উ···র পত্র।

প্রিয়—

তুমি যে আমাকে কি ভাবিতেছ জানি না। আমি কোন কারণে হঠাৎ এখানে চলিয়া আসিয়াছি। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, কাহাকেও কিছু বলিব না, তোমাকেও না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা চাপিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। একজন ব্যথার ব্যথী না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইব। আমি এই পত্রের সঙ্গেই সরকারের কাছে কাজ ছাড়িবার আবেদন পত্র পাঠাইতেছি, আমার আর কাজ করিবার বাসনা নাই। এ পত্র তুমি যখন পাইবে, তখন আমি যে কোথায় থাকিব তা জানি না। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না, আর কারও সঙ্গে দেখা করিব না, তুমি বোধ হয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। তবে শোন,—আজ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার লক্ষ্ণৌতে আসি, তোমার বোধ হয় মনে আছে। তখন এখানে একজন ধনী মুসলমানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। একদিন আমার নূতন বন্ধুটি তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলাম। দেখিলাম, খালি খাওয়া নয়, গান-বাজনার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। সেখানে আমি মতিয়াকে প্রথম

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

চতুর্থ বর্ষ] প্রথম খণ্ড, [ষষ্ঠ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩২৫ সাল।

সূচী।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] [বৈশাখ, ১৩২৫ সাল।

নারায়ণ

নারায়ণ !

তুমি প্রভু কৃপা করি, যুগে যুগে অবতরি,
অবনীর পাপভার করিলে হরণ,—
দুষ্কৃত করিয়া নাশ, ঘুচাইয়া ভয়-ত্রাস,
দয়ায় করিলে ত্রাণ সাধু মহাজন !
ঘুচায়ে ধর্ম্মের গ্লানি, তুমি দেব চক্র-পাণি,
যুগে যুগে করিয়াছ ধর্ম্ম সংস্থাপন,
হে মধুসূদন !

নারায়ণ !

যখন নিখিল-বিশ্ব, লুপ্ত গুপ্ত, নহে দৃশ্য,
অদ্বৈত অনধিগম্য আত্ম-নিমগন,—
নহে সৃষ্টি নহে লয়, কি জানি তাহারে কয়,
তুমি সেই—তুমি সেই অবাঙ্মনন !

এ অনন্ত বিশ্বভরা, অনন্ত জীবন-ময়া,
অলক্ষ্যে তোমার বক্ষে করে সন্তরণ,
তব সে বিশাল ছায়া, ও নীল গগন কায়া,
প্রকাশিলে কবে তুমি লীলা-নিকেতন !
কি বিপুল বহ্নিরাশি, উল্লাসে উঠিল হাসি,
আবর্ত্তিয়া মহাকাশে প্রথম পবন,
বাষ্পময় বিন্দু বিন্দু, কত পৃথ্বী রবি ইন্দু,
কত মরু গিরি সিন্ধু—নব আয়োজন !
তাহে তুমি হয়গ্রীব, মৎস্যরূপে নবজীব,
উদ্ধারিলে জগতের প্রথম জীবন,
জীবনের সারধর্ম্ম, শ্রুতিরূপে বেদমর্ম্ম,
প্রথম করিলে তুমি বিশ্বে বিতরণ !

নারায়ণ !

তোমার চরণ তলে, বসি রমা সিন্ধুতলে,
অঞ্চলে চরণ-রেণু করিয়া চয়ন,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য-শোভা, গাঁথে মালা মনোলোভা,
কত মরকত মণি মুকুতা রতন !
তোমার চরণামৃত, চন্দ্রে হ'ল উচ্ছলিত,
বিশ্বের বাঞ্ছিত সুধা মৃত-সঞ্জীবন,
পুণ্যপদ মদ গন্ধে, ফুটিল মন্দার ছন্দে,
ভুবন-আনন্দ সে যে ভবিষ্য-নন্দন !
হে প্রভু ক্ষীরোদশায়ী, রাজ্য নিলে আততায়ী,
দীনবেশে সোমপায়ী ফিরে সুরগণ,
হিংসা দ্বেষ অত্যাচার, সে স্বপ্ন-মন্দর ভার,
অবনী পারে না আর করিতে বহন।
সে জল তরল তনু, কম্পিত শিথিল অণু,
টলমল কল কল উছলে সঘন,
নাশি সে পাপের ভীতি; সে কাঁচা কোমল ক্ষিতি,
কূর্ম্মরূপে ধর্ম্ম পৃষ্ঠে করিলে ধারণ !

দেবতারে দিলে জয়, শশী-সুধা সমুদয়,
রাজলক্ষ্মী রাজদণ্ড রাজ-সিংহাসন,

যখন ধরণী জাগে, প্রথম সে স্থলভাগে,
নাহি তরু নাহি লতা তৃণ-গুল্ম-বন,
অনুর্ব্বরা মরুভূমি, উর্ব্বরা করিলে তুমি,
বরাহ বিশাল দন্তে করিয়া কর্ষণ!
শ্যামশস্পে বসুন্ধরা, ফল-পুষ্পে হ'ল ভরা,
হৃষীকেশ, কৃষিদেশ—প্রথম নূতন,
রক্ষিতে জীবের স্থিতি, তোমার কল্যাণ-নীতি,
কত কি কালের গর্ভে রয়েছে গোপন!

যখন পশুর বলে, হিরণ্যকশিপু দ'লে,
সরল বিশ্বাস-ভক্তি প্রীতি অতুলন,
দৈত্যের চরণদাপে, পৃথিবী ভরিল পাপে,
শূন্য করি মর্ত্ত্য করে পুণ্য পলায়ন!
অবিধি বিধির আধা, বিচার-বর্জ্জিত সাক্ষ্য,
কণ্ঠে হ'ল রুদ্ধ বাক্য—রসনা শাসন,
অটল আদেশে তার, গৃহ হ'ল কারাগার,
কত অত্যাচার আর কত নির্য্যাতন!
ক্ষিপ্ত ফণী দৃপ্ত রোষ, দংশে বুকে বিনা দোষ,
অবিশ্বাস অসন্তোষ করে উদগীরণ,
উন্মত্ত পাপ-স্পর্দ্ধা, বিনাশিল ভক্তি-শ্রদ্ধা,
কৃপাণ কৃপার স্থলে হ'ল নিয়োজন!
না হইতে সোণা-ভোর, আঁধারি উষার ক্রোড়,
অরুণের মত কত তরুণ জীবন,
নাশিতে উদ্যত পাপী, সাম্রাজ্য উঠিল কাঁপি,
লুণ্ঠিত চরণতলে কুণ্ঠিত ভুবন!
কত কি হইল জানি, জগতে ধর্ম্মের গ্লানি,
মলিন হইয়া গেল গ্রহতারাগণ,

নিশির শিশির মত, দিনে রেতে অবিরত,
ঝরিতে লাগিল কত অজস্র নয়ন !
সে শোকাশ্রু পুণ্যতমা, স্ফটিকের স্তম্ভে জমা,
হে কৃষ্ণ তোমার তাহা দেব-নিকেতন,—
ধর্ম্মের উদ্ধার তরে নরসিংহ কলেবরে,
অবতীর্ণ তুমি তাহে শ্রীমধুসূদন !

দৈত্যের তপস্যা যোগ, উদ্দেশ্য বিলাস ভোগ,
পূরাইতে পাপাকাঙ্ক্ষা—পাপ আকিঞ্চন,
তাই এক পদে দলি, রসাতলে দিলে বলি,
রক্ষিলে দু'পায়ে ঢেকে ভূতল-গগন !

যখন রাক্ষসচয়, ত্রিভুবন করে জয়,
নারীর লুঠিয়া লয় পবিত্র যৌবন,
পরিতপ্ত তিন লোক, সাগরে উছলে শোক,
গর্জ্জে ক্রোধ নীলজলে দ্রব হুতাশন !
পত্নীহারা পতি দিলা, বুক পেতে সেতুশিলা,
জলধি লঙ্ঘিলা তাহে বন-সৈন্যগণ,
পোড়াইলা স্বর্ণলঙ্কা, নাশিলা ত্রিলোক-শঙ্কা,
পাপদেশ ভস্মশেষ অশোকের বন !

জীবহত্যা মহাপাপে, পৃথিবী যখন কাঁপে,
পরিতাপে করুণা করিল পলায়ন,
তুমি বুদ্ধ পৃথিবীতে, আসিলে নির্ব্বাণ দিতে,
শোক-দুঃখ জরা-মৃত্যু করিতে বারণ !
ছাগ তরে দিতে প্রাণ, হে মহান্ ! হে মহান্ !
কি করুণা বরষিলে এই ধরা'পরে,
আজো পৃথ্বী কেঁদে মরে, তোমারে তোমারে স্মরে,
কোথা দেব চক্রপাণি ! আছ কোথা সরে !

এস নারায়ণ !

যুগ-যুগান্তের পাপ, যত দুঃখ পরিতাপ,
দুঃসহ অসহ প্রভু সহনে না যায়,

মহাকাল চক্রধারে, ব্যোমভেদী হাহাকারে,
ঘূর্ণ্যমান মহাবিশ্ব প্রলয়ের প্রায়।
যায় ধর্ম্ম রসাতলে, পুণ্য-তপোবন-স্থলে
রাক্ষসী মায়ার বলে সব ধ্বংসে যায়,
কনক উষার রেখা, আর সে যায় না দেখা,
দিক্‌চক্র মহাঘোরা অন্ধকারে ছায় —
তপোবনে সামগানে, আর সে জাগে না প্রাণে,
গেছে ধ্যান, গেছে প্রাণ, নিভিয়াছে দীপ,
সাঁঝের দেউটী ঘরে, জ্বালিব কেমন ক'রে,
এ আকাশে সন্ধ্যা-মণি পরে নাক' টিপ।
পঙ্গু জড় মূক সম, আছি ডুবে অন্ধতম,
কি ত্রিতাপে! এ প্রদেশে আলোক না ভাতে,
এস তুমি শক্তিধর! আলো করি চরাচর,
প্রাণ-সরেঃ দাও আলো হৃদিপদ্ম-পাতে।
বুভুক্ষিতে অন্ন দাও, বস্ত্রহীনে বস্ত্র দাও,
ভাষা দাও, বাণী দাও, মূকের এ মুখে,
পঙ্গুতে লঙ্ঘিবে গিরি, তব নাম লয়ে ফিরি,
মহানন্দে, দেশে দেশে বিলাইবে সুখে।
শূদ্রের শূদ্রত্ব যাবে, তব নামে শক্তি পাবে,
যাবে অবসাদ, গাবে আলোকের জয়,
নর, নরোত্তম হবে, আবার জাগ্রত ভবে,
আত্মস্থ হইবে সবে হবে পাপ ক্ষয়!
অধর্ম্মের যত গ্লানি, দূর কর দণ্ডপাণি,
মহারুদ্র! শূলদণ্ডে কর বিদারণ —
টুটে যাক্ তন্দ্রাঘোর, সে আলোকে হোক্ ভোর,
সংহারে নূতন সৃষ্টি হোক্ আবাহন।
হে লীলা-চঞ্চল সখা, দাও দেখা, দাও দেখা,
রাঙা-পায়!—ধরি পায় এস নারায়ণ!
জীবের শরণ্য তুমি, দেবের বরেণ্য তুমি,
ভক্তের জীবন-বাঞ্ছা শ্রীমধুসূদন!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

স্বাগতম্! *

হে আমার মা আনন্দময়ী বাঙ্গলার সন্তানগণ, আজ গঙ্গা-পদ্মা-করতোয়া-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র-নদ বারি-বিধৌত সেই প্রাচীন গৌড়-বঙ্গের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময় পুরীতে মা আমাদের ডাকিয়াছেন, তাই আজ আমরা মার কথা কহিবার জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি। 'বন্দে মাতরম্'—সুজলা সুফলা নদীবহুলা এই আমার মাতৃভূমিকে বার বার বন্দনা করি! জননী আমাদের যে বাণী দিয়াছেন, মাতৃকণ্ঠের সেই গীর্ব্বাণী—সেই মা মা ধ্বনি, পবনে গগনে ধ্বনিত হইয়া পদ্মার পারে পারে যেন সেই বাণী দুলিতে থাকে, মাও যেন প্রাণমন ভরিয়া সন্তানের এ বাণী শুনিয়া আকুল হন।

আজ সংক্রান্তির ক্রান্তিপাত পড়িয়াছে, বর্ষ ওই চলিয়া যায়, 'নূতন' তাহার স্বর্ণোজ্জ্বল বিভায় মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আমাদের ঘরে অতিথি হইতে আসিয়াছে; সেই কবেকার পুরাতন নূতন হইয়া আসিয়াছে, আর সেই কবেকার গৌড়ের আঙ্গিনায় সেই পুরাতন আবার নূতন হইয়া আসিয়াছে। তাই আজ বলিতেছি, হে আমার পুরাতন, হে আমার নূতন স্বগৃহে স্বাগতম্! এই গৃহের রজে পিতৃপিতামহের পদারবিন্দের রেণুকণা আছে, এই ধূলি মস্তকে গ্রহণ কর, এই আয়ুষ্মন্ বায়ুতে তাঁহাদের নিঃশ্বাসের গন্ধ আছে, প্রাণ ভরিয়া মাখিয়া লও, এই পদ্মা-গঙ্গার জলধারায় তাঁহাদের তর্পণ হইয়াছে, তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন, আজি আমরা তাঁহাদের সেই স্মৃতির স্মরণে ধন্য হইব।

কত দিনের এ দেশ! কত সভ্যতার কাহিনী এই ধূলিতে তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গেছে, কত দান-সাগর এই পদ্মা-সাগরের তীরে তীরে ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ছড়াইয়া গেছে, কে আজি তাহার সে স্মৃতির ধ্যান করে। কিন্তু স্মৃতি আত্মস্থ হইতে শিখায়, প্রতি ব্যষ্টিতে চৈতন্যের আভাস জাগাইয়া দেয়, তাই স্মৃতির স্মরণ পুণ্যকথা। সেই পুণ্যকথার শ্রবণে মনুষ্য-জন্ম ধন্য হয়, তাই আজ মাতৃ-মন্দিরে সেই পুণ্যকাহিনী শুনিতে আমরা মিলিত হইয়াছি। মাতৃরূপা এই শ্যামলা জননীকে আমরা বার বার নমস্কার করি!

আপনারা আজ যে গৃহের আঙ্গিনায় সবে সমবেত হইয়াছেন, কত ইতিহাস তাহার আছে। কত আলোকোজ্জ্বল প্রভাত, কত ঘোরা অমানিশার কাহিনী, তাহার অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া আছে। দুর্দ্দাম দুর্ব্বার পদ্মার ভাঙ্গন, কত রাজ্য গড়িয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে। পদ্মার ভাঙ্গন ও গড়ন আজিও থামে নাই; কিন্তু যে ইতিহাস সে

* ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

একবার গড়িয়াছে, সেই পৃষ্ঠা সে নিজেই আবার ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। আপনারা আজ যেখানে আসিয়াছেন, অশ্রান্ত-বারি-বিস্তার পদ্মা আপনাদের বুকে করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু পদ্মার সে গৌরবের দিন নাই,' হে অতিথি! হে নারায়ণ! সে—

* * * * জলপাত্র, দিব্যাসন,
সুরঙ্গ-কম্বল, বহুপ্রকার বসন,
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে --

তাহা আর নাই।

কাল আমাদের ভাগ্যহীন করিয়াছে। চিরদিনই কিন্তু আমরা এমন ছিলাম না। ইতিহাস আলোচনার অবসর এখন নয়। আর আমি ইতিহাস ব্যবসায়ীও নহি। আমি সেই পরশমণির খোঁজেই ছুটিয়াছি। বাঙ্গালীর প্রাণধর্ম্মের আমি কাঙ্গাল। ইতিহাস সেই প্রাণধর্ম্মেই ভিত্তি করে, সেই প্রাণধর্ম্মের ইতিহাসেই জাতির প্রাণের সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। দেশ-মাতৃকার ক্রোড়ে সন্তান চিরদিনই সেই প্রাণের স্নেহরসে জীবিত থাকে। সেই প্রাণধর্ম্মের পরিচয় মার আশীর্ব্বাদে প্রাণের অনুভূতিতেই জাগে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে সে স্বর ধ্বনিয়া উঠে, সন্তান মার স্নেহের সত্য পরিচয় লাভ করে। সেই প্রাণধর্ম্মের দিক হইতেই এই ডাক আমার আসিয়াছে; মা আমাকেও ডাকিয়াছেন, আপনাদের সেবার জন্য; মা আপনাদেরও ডাকিয়াছেন, মিলনের জন্য। প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে, ভাবে ভাবে। এ এক বিশাল প্রাণযজ্ঞ, যে যজ্ঞের হবিঃ প্রাণ, যে যজ্ঞের চরু জীবন, যে যজ্ঞের কামনায় মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, যে যজ্ঞের হোমধূমের মাঝে সাহিত্যের মিলন বাণী ও মন্ত্র ধ্বনিত হয়, জাতি আপনাতে আত্মস্থ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ দেখিতে পায়। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে হে আমার পুরাতন, হে আমার নূতন অতিথি! ব্রীহি, যবধান্য সকলি প্রস্তুত, আপনারা যজ্ঞে বৃত হউন। আজ পূর্ব্ববঙ্গ দরিদ্র হইলেও,

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

দারিদ্র্যের জন্য অন্নদানে অক্ষম হইলেও, অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, চরণ প্রক্ষালনের জন্য জল, আর চতুর্থতঃ প্রিয়বচন—স্বধর্ম্মপরায়ণের গৃহে এ সকলের উচ্ছেদ বা অভাব কদাচ সম্ভব নয়।

অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথির ভক্তি॥

এ অকিঞ্চন যেন চিত্ত-সুখে সেই অকৈতব ভক্তি নারায়ণের জন্য সাজাইয়া রাখিতে পারে। তাই আজ পূর্ব্ববঙ্গ—

শিরে ধরি বন্দে নিত্য কঁম্বো তব আশ।

আমাদের আয়োজন অতি স্বল্প। সে দিন আর আমাদের নাই। কিন্তু আপনারা যে ভূমিতে আজ চরণ-চিহ্ন আঁকিতে আসিয়াছেন, সে ভূমি বহু পুরাতন; হে নূতন! সে পুরাতনের স্বপ্নঘেরা মোহ-তমাচ্ছন্ন দিনের পরপারে সে যবনিকা একবার সরাইয়া দেখিবে না কি—কাল যে অবগুণ্ঠনে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এ সেই ঢাকা নগরী। শুনা যায়, এই নগরীর নাম ঢাকা হওয়ার দু'একটা প্রবাদ কথা আছে। 'ঢাক' বলিয়া এক রকম গাছ এ দেশে প্রচুর ছিল, তাই সেই গাছের নাম হইতে এই নগরীর নামকরণ হইয়াছে। যদিও সে 'ঢাক' গাছ এখন আর মিলে না। কেহ বলে, সম্রাট্‌শেখর বল্লাল, বুড়িগঙ্গার উত্তরে যে অরণ্যানী ছিল, সেই অরণ্যে দশভুজার এক ধাতুমূর্ত্তি পান। অরণ্যের অন্ধকারে সে সিংহবাহিনী ঢাকা ছিল। বল্লাল পিতৃসিংহাসন পাইবার পর, সম্রাট বল্লাল ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এই ধাতুমূর্ত্তিকে—দুর্গামূর্ত্তিকে নগরের অধিশ্বরী-রূপে স্থাপিত করেন, তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী। তাই এই নগরের নাম ঢাকা। আবার কেহ বলেন, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে বুড়িগঙ্গায় আসিয়া, এই নদীবহুলা ভূমিকে মনোরম দেখিয়া, এইখানে রাজধানী করিবার সঙ্কল্পে স্থিরনিশ্চয় হন। আজ যেখানে ঢাকা অধিষ্ঠিত, সেই স্থান হইতে ঢাক বাজাইলে যতদূর ~~অবধি শুনা যায়~~, ততদূর পর্য্যন্ত সহরের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ইহার নাম ঢাকা রাখেন। কীর্ত্তিনাশার বক্ষের উপর দিয়া আজ আপনারা সেই ঢাকা নগরীতে আসিয়াছেন।

শতাব্দীর সেই যবনিকা যদি সরাইয়া দেখেন, তবে দেখিবেন যে, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এই বিশাল জনপদই বঙ্গদেশ—এখন সচরাচর যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলে, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের সময় হইতে গৌড়ের সেনরাজগণের রাজত্ব পর্য্যন্ত তাহাকেই বঙ্গ বলিত। পদ্মা মেখলা এই চিরশ্যামা একদিন কি মহিমায় কোটী সূর্য্যকিরণভাতিতে দীপ্তিময়ী ছিল। ঢাকা, বিক্রমপুর বলিতে সেই পুরাতন গৌড়-বঙ্গের কেন্দ্র বলিয়া মনে পড়ে। গৌড়-বঙ্গ ও মগধের কত না কাহিনী, কত সভ্যতার সংঘর্ষণের ইতিহাস ওতঃ-প্রোতভাবে চলিয়াছে। মগধের কণ্ঠলগ্ন হইবার পূর্ব্বে গাঙ্গেয়গণের বিপুল বলশালী রণ-কুঞ্জরসজ্জিত অসংখ্য বাহিনী-শোভিত এই দেশের প্রাসাদশিখরে গগনস্পর্শী স্বাধীনতা-ধ্বজা সূর্য্যকিরণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত। সপ্তম শতাব্দীতে সে গৌড়-বঙ্গ কালের ঝঞ্ঝায় আঁধারে ডুবিয়া গেল। তারপর একদিন উত্তরাপথের আলোড়নে যুগ বিপর্য্যয় হইল। অবিরাম রাজ্যবিপ্লবে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। এই যুগব্যাপী ঘোর অরাজকতার ভিতরে বাঙ্গালার প্রাণ লুকাইয়াছিল, সে তাহার ধর্ম্মত্যাগ করে নাই। সুপ্ত প্রজাশক্তি সহসা স্বপ্নোত্থিতের মত আঁখি কচলাইয়া ভোরের আলোকে সব দেখিয়া লইল। সিংহপ্রতিম প্রজাশক্তি সমবেত হইয়া সেই "মাৎস্যন্যায়" সেই দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও

অরাজকতার চরম দুর্দ্দশাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। এই যুগেই গৌড়-বঙ্গের শিল্প-প্রতিভায় বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্মের বিকাশ অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুরণ হইয়াছিল; জগতের ইতিহাসে সে কাহিনী সোনার নিকষে রেখা টানিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে। আজ সে দিন গিয়াছে, কালের যবনিকা তাহাকে শুধু তমগূঢ় অন্ধকারে ঘেরিয়াছে। তারপর, কুক্ষণে বঙ্গ গৌড়-বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিচ্ছিন্ন বঙ্গ ও গৌড় এই বিচ্ছেদে হীনবল হইয়া পড়িল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে ভেদবুদ্ধি আসিয়া উভয়কেই নষ্ট করিল। সে দিন বঙ্গ যে মহামণি প্রাণের মণিকোঠায় রাখিয়াছিল, তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। বাঙ্গালার মহানাগ অনন্তের মাথার মণি সেই দিন হারাইয়া গেল। তাহা আর মিলিল না। হায়! গৌড়, কেন এমন মণি হারাইয়া ফেলিলে! তাই সেই বিচ্ছেদের দিনে—সেই বিরহের দিনে—বাঙ্গালীর রাজার মাথার শ্বেতছত্র কে কাড়িয়া লইল? সে উত্তর ইতিহাস আর দিবে কি?

এইরূপে সেই যে দিন গৌড়ের স্বাধীনতা গঙ্গার জলে ভাসিয়া গেল, সে দিনেও এই পদ্মামেখলা শ্রীবিক্রমপুরের প্রাসাদশীর্ষে স্বাধীনতা-সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখাটুকু বঙ্গের ভাগ্যাকাশ হইতে একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। আজ সে শ্রীবিক্রমপুরের সে শ্রী নাই, বুকের উপর দিয়া পদ্মা চলিয়া গেছে, সে ভূভাগকেও টুক্‌রা করিয়া দিয়াছে। সেই স্বপনের দেশ, কোথায় গেল? সুখের সে স্মৃতি আছে, আর কিছু নাই!

আজ পূর্ব্ববঙ্গ শ্মশান—গাঢ়তর অন্ধকার, দিবসে নিশীথ! প্রেতের মত আমরা কয়টী আছি। তবু এই আমাদের ভিটা। তৈল বিনা সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিতে পারি না, ঘরের চালে খড় দিতে পারি না, দেউলে দেবসেবা হয় না! কীর্ত্তিনাশা ভাঙ্গে গড়ে, দুর্ম্মদা মাতঙ্গিনী একবার করিয়া কাঁদে, আরবার গরজি আস্ফালন করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। পেটে অন্ন নাই, কটিতে বস্ত্র নাই, জলাশয়েও জল নাই। যে মহাবীর্য্যের কেন্দ্র হইতে গৌড়-বঙ্গ একদিন প্রয়াগ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিত, যে কেন্দ্র হইতে একদিন বঙ্গ জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে গৌড়ীয় রীতি ভারতে চলিয়াছিল, এ সেই ভূমি! যে ভূমিতে আদিশূর একদিন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এ সেই ভূমি! এই ভূমিতেই সেই সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; যাঁহাদের আশীষমন্ত্র ও শান্তিবারিতে শুষ্ক গজারী বৃক্ষ নব মুঞ্জরায় মুঞ্জরিত হইয়াছিল, এ সেই দেশ! সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে যে বাণিজ্যলক্ষ্মী অর্ণবপোত বোঝাই করিয়া ধন আনিত, সে ধনেশ্বরী আজ নাই। শতাব্দীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘান্ধকারে সে সব কোথায় মিলাইয়া গেছে। তাই আজ মুষ্টিমেয় অন্নের জন্ত নিজ গৃহে পরান্নভোজী, নিজ গ্রামে চিরপরবাসী, জীবন-মরণের সন্ধির মধ্যে না-বাঁচা না-মরা হইয়া আছি। কি দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিব। কবির সে কণ্ঠ

আমার নাই, তাহা হইলে আজ শুনাইতাম—এই অরণ্যানীমুখরিত বনভূম শ্যামতমাল দ্রুম-সুশোভিত দেশের রূপের কথা ; শুনাইতাম—এই অতল জলরাশির অতল তলে কি সৌভাগ্য ও বৈভব নিমজ্জিত ; শুনাইতাম—,যদি আমার এই প্রিয় সুহৃৎ গোবিন্দদাসের মত আমার কণ্ঠ থাকিত, তবে "আদিশূরের যজ্ঞভূমি"—বল্লালের অস্থিভস্মে পরিণত যে দেশের 'পথের ধূলি'—সে দেশের বিগত সমৃদ্ধির কথা ও কাহিনী আপনাদের শুনাই-তাম ; আর শুনাইতাম—অরণ্যের তমাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে, অতল নদীতলে ও ভূগর্ভে মহাসমাধিতে লীন কি কীর্ত্তি, কি বিজয়কাহিনী ! কি দারুণ অদৃষ্টের পরিহাস, কি করুণ কাহিনী এই কীর্ত্তিনাশার ! আর শুনাইতাম,—সেই দানসাগরের কথা, কামরূপ-কলিঙ্গ-কাশী-বিজয়ীর পলায়ন-কলঙ্ক অপনয়ন করিতাম। গাই-তাম,—হরিশ্চন্দ্রের কথা, অতুনা-পতুনার সেই প্রাণমনবিমোহনকারী মধুর কাহিনী ; সেই চাঁদ রায়-কেদার রায়ের বীর্য্যগাথা। হে বাঙ্গলার সন্তান ! এ সেই সোনার দেশ, এই দেশে আজ আপনারা আসিয়াছেন। আজ সে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সে সাম্রাজ্য নাই, সে গৌরবের স্মৃতি আছে ; সেই স্মৃতিই আজ আমাদের পুণ্যকথা, তাঁহাদের সেই পুণ্য-কাহিনী আজ যদি আমাদের আত্মস্থ করিয়া দেয়, যদি এই অসীম জলরাশির বুকে তেমনি করিয়া, আবার পাল তুলিয়া, জীবন-যাত্রায় যাত্রা-গান গাহিতে পারি।

সেই স্বপ্নের দেশে, আজ দেখুন, আমরা কি হইয়া আছি ! দিন গিয়াছে, এই দেশ একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মে কত উন্নত ছিল, সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শীলভদ্র জন্মিয়াছিলেন, তিনিই চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াংএর গুরু। ভারতেতর দেশের পরিব্রাজকেরা জ্ঞানলাভের জন্য এই দেশে আসিতেন। সেই জগ-দ্বিখ্যাত—সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই দেশেই জন্মিয়াছিলেন। আজিও লোকে নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী বলিয়া দেখাইয়া দেয়। এই গৌড়-বঙ্গের বীরদেবই একদিন জগদ্বিখ্যাত নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য্য ও সংঘস্থবির ছিলেন। আপনারা আজ সেই দেশে আসিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বাঙ্গলার প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। সে যুগের পরিচয়, কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই বিশিষ্টভাবে যুক্ত ; তবুও সেই শতবৎসরের মাঝে ব্রাহ্মসংস্কার ও স্বদেশীর মহা-আন্দোলনের দিনে এই আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী কতভাবে কতদিক দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্রশক্তিতে যাহা পারিয়াছি, তাহাই করিয়াছি। কবে আমাদের সব আয়োজন সার্থক হইবে, কবে আমাদের সব চেষ্টা যথার্থ মাতৃপূজায় পরিণত হইবে। কবে সেই মহাযজ্ঞের ধূম নদী-প্রান্তে, অরণ্যশীর্ষে, বনানীর অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিবে ! বড় দুঃসময়ে আপনাদের ডাকিয়াছি—আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে, দেখিয়া যান,—এ সেই পূর্ব্ববঙ্গ !

এই বঙ্গে শুধু আজ আমরা একলা নই, আমাদের আর এক ভাইরা এখানে আছেন। তাঁহাদেরও গৌরবের কথা আছে, তাঁহাদেরও দুঃখের কাহিনী আছে। আজ এই আমাদের মুসলমান ভাইরা। অতিথিপরায়ণ বঙ্গ কখন অতিথিকে ফিরায় নাই। বুদ্ধকে সে স্থান দিয়াছে, মুসলমান ধর্ম্মকেও স্থান দিয়াছে। সে দিন যে ইস্লামের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা হাতে করিয়া, গৌড়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহারা আমাদের প্রতিবেশী। আমাদেরই মত সমদুঃখী। একই মাতৃস্তন্যপানে আমরা বাঁচিয়া আছি, বাঙ্গলা তাহাকে তাহার বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে। ভাই ভাইয়ে কলহ কোন্ দেশে না হয়, তাহা হইলেও তাহারা আমাদের ভাই। সেই ইস্লাম পতাকাবাহীর বংশে মহাপ্রাণ সোলেমান কিরাণী জন্মিয়াছেন; সেই যবন হরিদাস একদিন হরিধ্বনিতে বঙ্গ মাতাইয়াছে; সেই মুসলমান আলোয়াল একদিন পদ্মাবতী রচনা করিয়াছে; সেই মুসলমান কত কবির কত গান, কত ফকির, কত সাধু এই বঙ্গদেশের জন্য ভগবানের কাছে দোয়া করিয়াছে; সেই মুসলমান কবি চাঁদ কাজির গানে আছে—

ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
আর অভাগীয়া নারী হায় সে সাঁতার নাহি জানি॥

মুসলমান কবি এ গান বাঁধিবার সময় বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই এ গান বাঁধিতে পারিয়াছিলেন। এই ঢাকা নগরীতে সেই ইস্লামের বিজয়-তোরণ আজিও দাঁড়াইয়া আছে। একই জমির পাশে পাশে লাঙ্গলের ফলকে হিন্দু-মুসলমান, আপনাদের ক্ষুধার অন্ন যোগাইতেছে। তাহাদের মর্য্যাদা আমরা যেন কখন লঙ্ঘন না করি। সে দিনেও টাকায় আট মণ চাউল মিলিত, এ দারিদ্র্য সে দিনেও আসে নাই।

হে অতিথি! ওই সেই রামপাল, ওই সেই প্রাচীন যজ্ঞবেদী আপনাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে, সে ত মূক নয়, যজ্ঞের মন্ত্রের প্রতিধ্বনি এখনও তাহার প্রাণের তারে ঝনন্ রন্ করিয়া বাজিতেছে। ওই সেই ভস্মসুপ্ত অগ্নি, বুঝি বা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আছে অতিথি, আছে! যে বেদধ্বনি এই যজ্ঞভূমে উঠিয়াছিল, যে ধ্বনি অরণ্যানী শুনিয়াছে, যে ধ্বনি পদ্মায় একদিন ঘোর করিয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও আছে; আকাশে বাতাসে এখনও তাহার সুর বাজিতেছে। এই সেই প্রাচীন হব্যভস্ম মাটী বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই ভস্ম আজি আপনাদের ললাটদেশ শোভিত করুক। এ ভূমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছে। হে ঋত্বিক্! আবার তারস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করুন, অগ্নি জ্বলিয়া উঠুক, দেখিবেন,—এই এতকালের সহিষ্ণু মাটী শতধা দীর্ণ হইয়া, সেই জ্বলিতজ্বলন মহান্ ধূর্জ্জটীকে জ্বলজ্জাল-ললাট দীপিয়া

তুলিয়াছে। যিনি সহস্র সহস্র বৎসরের, বাঙ্গলার মৃতসতীকে স্কন্ধে করিয়া প্রলয়কালের তাণ্ডব-নর্ত্তনে সব রিষ ঈর্ষা অক্ষমতা পরানুকরণের মতিচ্ছন্ন অহঙ্কার আলাইয়া, সেই সৃষ্টিপারাবারের একাকার আনিয়া দিবেন—সংহারের পর আবার নীহারিকায় নূতন বাঙ্গলার সৃষ্টি হইবে। রাহার পীঠের মত সারা ভারতে আবার পীঠস্থানে মন্দির উঠিবে। হে তপনিষ্ঠ সত্যসন্ধ সাহিত্যের রথিগণ, জীবনে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে একাত্ম হইয়া সেই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি আসুন ;' স্বাগ, স্বধা বিবিধ অগ্নিই জ্বলিয়াছে! পূর্ব্ববঙ্গের শ্মশানে, বল্লালের ভিটায় সেই শব-সাধনায় অগ্রসর হউন্। তাই বাঙ্গালরা আপনাদের ডাকিয়াছে! এই শ্মশানে মড়ার হাড়ে ফুলের মালা পরিয়া, কি ভুলে ভুলিয়া আছি, সেই ভুল একবার ভাঙিয়া দিউন।

আমি দেখিতেছি, ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, সেই বাঙ্গলার প্রাণধর্ম্ম ধীরে ধীরে কেমন লীলাচঞ্চল স্রোতের মত চলিয়াছে। 'মাৎস্যন্যায়ের' অরাজকতার যুগে বাঙ্গলা যে গর্জ্জন করিয়াছিল, সে সুর বাঙ্গলা ভুলিয়া যায় নাই। আজ ফেরঙ্গ যুগেও বাঙ্গলা সেই ধর্ম্মের'আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাব্দী পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্ম, যে প্রাণমূর্ত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সময়েই এই নগরোপান্তে সেই অদ্বৈতবংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডেরিয়ার গহনবনে সেই প্রাণধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি, পদ্মা-গঙ্গার লীলার স্রোত একই প্রাণের আন্দোলন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন এই পদ্মাবতী তীরে তাঁর সেই অরুণ-রাঙ্গা চরণ দুখানি রাখিয়াছিলেন, তাই—

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥

আর—

ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে॥

আর—

বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥

আর এই ঢাকা নগরীতে বাঙ্গলার শেষ বৈষ্ণবকবি কৃষ্ণকমল, সেই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ও তাঁহার রাধাভাবের রসে সিঞ্চিত 'রাই-উন্মাদিনীর' প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। আমরাও আজ কৃষ্ণকমলের রাধিকার মত—

তব পথ নিরখিয়ে ব'সে আছি সই!
তুমি চন্দ্রে! একা এলে, প্রাণনাথ কই?

চন্দ্রা রাইকে বলিয়াছিলেন,—

অঘটন ঘটাতে পারি—কৃপা হ'লে তোর—

চন্দ্রা অঘটন ঘটাইয়াছিলেন, আপনারাও 'কৃপা হ'লে' অঘটন ঘটাইতে পারিবেন না কি ?

তারপর, এই ঢাকায় প্রথম 'নীলদর্পণ' হইয়াছিল, সে কথা বোধ হয় আপনাদের কাহারও অজ্ঞাত নাই।

এই প্রদেশের কাছে ভাওয়াল, সাভার, ধামরাই প্রভৃতি যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড ভূভাগে স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাদের কত না কাহিনী, কত না দুঃখ-সুখ এই মাটীর ধূলিতে মিশাইয়া আছে। হায়! তাহার কাহিনী কে আজ গাহিবে। যদি সেই সুপ্ত ইতিহাসের বাণী কোন দিন কেহ সজাগ করিয়া তুলেন, তবে দেখিবেন,—কি শক্তিমান্ এক মহাপ্রাণ জাতি কি গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছে।

সুখ-দুঃখের অনেক কথা আপনাদের শুনাইতে চাই, সব শুনাইতে পারি কই, কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—বুক ফাটিয়া যায়! বুঝি আজিকার দিনের মত বাঙ্গলার ঘরে এমন দুর্দ্দিন কখনও আসে নাই। এত কালের দীর্ঘ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও এত অন্ধকার, দীর্ঘনিশ্বাস ও হা-হুতাশের নিষ্ফল বাণী ফোটে নাই! এমন বিপন্ন আমরা আর কখনও হই নাই। এক রামচন্দ্রের বনবাসে সারা অযোধ্যা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ভাগ্যহীন, কত শত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বনবাসে দিয়া একহাতে চক্ষু মুছিতেছে, আর অন্য হাতে আপনাদের জন্য পাদ্য ও অর্ঘ্য আনিয়াছে। দয়া করিয়া আমাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। সুদিন গেছে, কুদিনে আসিয়াছেন। আপনারা দুর্দ্দিনের অতিথি, দুঃখী-বিদুরের খুদ আছে, আর কিছুই নাই। পূর্ব্ববঙ্গ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাই আপনাদের নিবেদন করে—শ্রদ্ধার হবিঃ গ্রহণ করুন, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ধন্য হউক্, কৃতকৃত্য হউক্।

দরিদ্র সেবক মোরা আছি জন্ম জন্ম।

হে সাত্ত্বিক! আসুন, তবে সমস্বরে মাকে ডাকি। মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন। মার ভাষা দিয়াই মাকে ডাকি, আসুন! মা ত আমাদের আর কোন বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন, আবার আমরা এই ভাগ্যবতী পদ্মাবতী-তীরে মাতৃপূজা করিব। আবার সেই সহস্রদলবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্তচরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবিঃ দান করিব। আর গললগ্নী-কৃতবাসে বলিব,—জননি জাগৃহি!

সভাপতির অভিভাষণ *

বঙ্গবাণীর সেবকগণ, বন্ধুগণ!

মধু-অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা সঙ্গত না হইলেও শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু মধুর স্থলে নিম—মিঠের স্থলে তিত—এ ব্যবস্থার কে অনুমোদন করিতে পারে? অথচ বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্‌যোগকারী ঢাকার অভ্যর্থনা-সমিতি সভাপতি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সম্মিলনে সভাপতির সম্মানের আসন অলঙ্কৃত করিবেন—এইরূপ স্থির হইয়াছিল। যিনি বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের যুগব্যাপী অক্লান্ত সেবার দ্বারা নিজের শরীরে অকালবার্দ্ধক্য আনয়ন করিয়াছেন, যিনি দর্শন বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব তথ্যপূর্ণ বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে দর্শন বিজ্ঞানের ব্যোমবিহারী সুপর্ণকে আমাদের পৃথিবীর মাটীতে নামাইয়া আনিয়াছেন, বঙ্গবাণীর সেই একনিষ্ঠ সেবক, সৌম্য শান্ত সুধী রামেন্দ্রসুন্দরকে এই আসনে সমাসীন দেখিলে আমরা সকলেই ধন্য হইতাম এবং বর্ত্তমান যজ্ঞের প্রজাপতি অভ্যর্থনা-সমিতির উদ্দেশে কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারিতাম—

চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।

কিন্তু 'নরে করে আম্বা, পুরান জগদম্বা'। রামেন্দ্র বাবু এমন পীড়িত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার পক্ষে সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করা অসম্ভব হইল। তখন অভ্যর্থনা-সমিতির সানুগ্রহ দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইল—মধুর অভাবে নিমের ব্যবস্থা হইল। ইহাকেই বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর স্থলে আমি! এ যে 'স্বর্গ হ'তে রসাতলে দারুণ পতন।' অভ্যর্থনা-সমিতি উদারতার যথেষ্ট পরিচয় দিলেন বটে, এবং Any port in storm (তুফানে বন্দরের বাচ্ বিচার নাই) এই প্রাচীন নীতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। কিন্তু আমি প্রমাদ গণিলাম। প্রথম প্রথম নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া বিশেষ দ্বিধা অনুভব করিতে লাগিলাম এবং আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে আমার সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতি নানা অজুহত জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু বন্ধুবর আদ্যোপান্ত সুকবি—

* ঢাকায় সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

তিনি কবিতা-রস-মাধুর্য্য মন্থন করিয়া গৈরিণী ভাষায় বলিলেন, 'অতিদ্রুত—অতিদ্রুত ধাও বীর!' অর্থাৎ যদিও এক অষ্টাহমাত্র সময় আছে, ইতিমধ্যেই তোমার অভিভাষণ লিখিত পঠিত মুদ্রিত করিয়া শীঘ্র ঢাকাভিমুখে অগ্রসর হও। বন্ধুবর ভুলিয়া গেলেন যে, আমি বীর নই—ধীরবিলম্বিত পাদক্ষেপই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অবশেষে ভাবিলাম, আমি রন্ধ্র-শোধক মাত্র—যাহাকে stop-gap বলে—কি লাগে আমার। সেই ভাবেই আমি এখানে আসিয়াছি এবং সেই ভাবেই আপনারা আমাকে গ্রহণ করিবেন। আমার অক্ষমতা, আমার দোষ ত্রুটী, আমার এই অভিভাষণের ভ্রম-প্রমাদ, চিন্তার তরলতা, নীরসতা, পল্লবগ্রাহিতা, গাম্ভীর্য্যের মৌলিকতার অভাব ইত্যাদি যখনই আপনাদিগকে পীড়িত করিবে, তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিবেন যে, এই নিয়মের জগতে উৎকট কর্ম্মের ফল হাতে হাতে ভোগ করিতে হয়—তা সে কর্ম্ম ব্রহ্মহত্যাই হ'ক অথবা অযোগ্য সভাপতির নির্ব্বাচনই হ'ক। আর পারেন যদি, তবে উপনিষদের প্রাচীন উপদেশ স্মরণ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের বাসে আমাকে আবৃত করিয়া আমার ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইবেন—

ঈশা বাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের ভাব-জগতে সূচনা হইবার পর, সুকবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্রের শেষে সাহিত্যসেবিগণ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত করিবার জন্য বরিশাল নগরে সমবেত হন। কিন্তু রাজনীতির কল কোলাহলে, বিশেষতঃ পুলিশ-পুঙ্গবদিগের সুদীর্ঘ 'রেগুলেসান' লাঠীর গুরুগম্ভীর নিনাদে, ঐ মিলিত-প্রায় সাহিত্য-সম্মিলনের বোধন না হইতেই বিসর্জ্জন হইয়া গেল। পরে ১৭ই কার্ত্তিক ১৩১৪ সাল, রবিবারে কাশিমবাজার রাজবাটীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাঙ্গনে বদান্যবর বিদ্যোৎসাহী বঙ্গজননীর সুসন্তান শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রনাথ নন্দী মহোদয়ের উদ্যোগ আমন্ত্রণ ও আয়োজনে এই 'সাহিত্য-সম্মিলন' প্রথম সমবেত হইলেন। ঐ দিন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন প্রথম সর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী সুধীগণ এক বিরাট যজ্ঞশালায় সমবেত হইয়া এক শুভ বাণী-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর বঙ্গ ও বিহারের নানা স্থানে এই সাহিত্য-সম্মিলনের পর পর নয়টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে—আজ আমরা ঢাকাবাসীর আহ্বানে সাহিত্য-সম্মিলনের এই একাদশ অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছি। প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন-স্বরূপ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহার একাংশ আপনাদের শুনাইতে চাই—"সাধকভেদে যেমন জননীর মূর্ত্তিভেদ হয়, সেইরূপ দেশভেদে ও কালভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন।

'বন্দে মাতরম্' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মায়ের এই মূর্ত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই, এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদুপযোগী সাধনার সময় পান নাই।"

* * * *

"অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি ? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্যসেবিমাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্যসেবীর মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তিপথের উপদেষ্টা, কেহ কর্ম্মমার্গের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না, যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন সে সকল ফুলই সেই রাঙ্গাচরণের রক্তজবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়, যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। "যজ্জুহোসি, যদশ্নাসি, যৎ করোষি, দদাসি যৎ",—ভগবতীর আদেশ—সেই সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।" আমিও রাজেন্দ্র বাবুর এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—আজ নহে কাল নহে, 'যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে নিত্য নিরন্তর' আমাদের সমস্ত সাধনার লক্ষ্য, সমস্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার গম্য ঐ শ্যামাঙ্গিনী জননী, ঐ সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, ঐ কাননকুন্তলা, ঐ নদীমেখলা, ঐ সাগরম্নতলা, ঐ সুস্মিতা ভূষিতা জননী। আসুন মাকে প্রণাম করিয়া বলি—"বন্দে মাতরম্"॥

শোকপ্রকাশ।

১৩২৩ সালের পৌষ মাসে বাঁকীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনের পর সাহিত্য-সম্মিলনের দুই জন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার। উভয়েই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন,—তাঁহাদের অভাবে বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যের যে আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার পথপ্রদর্শক এই দুই মহাত্মা। তাঁহারাই প্রথমে সহযোগে চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কবিতা ও কাব্যের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে আজ বহু

বৎসরের কথা। তার পর সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ব্যবহারক্ষেত্রে বহু ধনাগম ও পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ক্রমশঃ হাইকোর্টের জজিয়তী প্রাপ্ত হন; কিন্তু তথাপি কোন দিনই বঙ্গবাণীর সেবায় উদাসীন হয়েন নাই। তাঁহারই কর্ণধারতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ উন্নতির পর উন্নতির সোপান অতিক্রম করিয়াছে এবং এই সাহিত্য সম্মিলন সংবদ্ধ ও সুস্থিত হইয়া সাহিত্যসেবীর গৌরবের বস্তু হইয়াছে।

সাহিত্যগুরু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিষয় আমি বলিতে পারি? বঙ্গমাতার এমন একনিষ্ঠ সেবক আমরা আর কবে দেখিতে পাইব? প্রথম যৌবনের আরম্ভ হইতে স্থবিরত্বের শেষ দিবস পর্য্যন্ত সমান আদরে সমান গৌরবে সমান নিষ্ঠার সহিত কে এমন বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়াছে? কে এমন অবহিত সতর্ক প্রহরীর মত বঙ্গজননীর মন্দিরদ্বারে দিনের পর দিন সজাগ পাহারা দিয়াছে? চুঁচুড়ার ও চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল, তাঁহারা এই প্রবীণ সাহিত্যিকের সাগ্রহ আন্তরিক অমোঘ মর্ম্মবাণী সহসা বিস্মৃত হইবেন না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কথা।

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সম্মিলন-পরিচালনের জন্য কোন নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা হয় নাই; বরং সম্মিলনের শৈশব-দোলায় নিয়মের বজ্রবন্ধনী নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; এবং প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে ঘোষিত হইয়াছিল যে—"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অন্নপ্রাশন-সংস্কার সম্পাদিত হইলে চূড়াকরণ-কালে তাহার ভবিষ্য জীবনের অনাময় নিমিত্ত উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থার আস্থাপন করা যাইবে।" কিন্তু অচিরেই বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। তদনুসারে দ্বিতীয় অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণের নিমিত্ত পাঁচজন ব্যক্তির উপর ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা খসড়া নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে উহা উপস্থিত করিলে, ঐ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়া উক্ত নিয়মাবলী তৎপরবর্ত্তী সম্মিলনে বিবেচিত হইবে, এইরূপ স্থির হয়। কিন্তু ঐ তৃতীয় অধিবেশনেই ভবিষ্যৎ সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান, এই তিন বিভাগের জন্য তিনটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। জাতীয় সাহিত্যের গঠনে দর্শনের স্থান সংকীর্ণ বিবেচিত হওয়ায় বোধ হয় ঐ অধিবেশনে দর্শনের জন্য কোন ভিন্ন শাখা-সমিতি-গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। পরবর্ত্তী অধিবেশন, যাহা ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই অধিবেশনে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি গৃহীত হয়। ঐ নিয়মাবলীতে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছিল,—

"বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা, প্রচার ও সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময় সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিসম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্যনির্ণয় উক্ত উদ্দেশ্যের বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গণ্য হইবে ; তজ্জন্য এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য ও স্থানীয় লোকদিগকে তৎসম্বন্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতি বর্ষেই সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হইবে।"

পরে সংশোধিত হইয়া সম্মিলনের উদ্দেশ্য এখন এই ভাবে প্রকাশিত হইতেছে,—

"সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার, বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী-জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্যনির্ণয় এবং জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

প্রথম প্রথম দর্শন সাহিত্যিক শাখার অঙ্গীভূত ছিল, কিন্তু পরে দর্শন স্বতন্ত্র শাখায় নিজের যোগ্য আসন লাভ করিয়াছে। এখনকার নিয়মে কার্য্যের সুবিধার জন্য সম্মিলনের কার্য্য নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে। (ক) সাহিত্য শাখা (খ) দর্শন শাখা (গ) ইতিহাস ও ভূগোল শাখা (ঘ) গণিত ও বিজ্ঞান শাখা।

চুঁচুড়ায় সাহিত্য-সম্মিলনের যে পঞ্চম অধিবেশন হয়, ঐ অধিবেশনে প্রথম বিজ্ঞান শাখার স্বতন্ত্র সভার অনুষ্ঠান হয়। তৎপরবর্ত্তী চট্টগ্রামের অধিবেশনেও ঐ প্রণালী অনুসৃত হইয়াছিল। কলিকাতা নগরীতে সাহিত্য-সম্মিলনের যে বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল, ঐ অধিবেশনেই প্রথমতঃ সম্মিলনের কার্য্য উক্ত চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখার স্বতন্ত্র সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তদবধি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধারণ সভাপতি ব্যতীত চারি শাখায় চারি জন বিভিন্ন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেছেন, এবং প্রত্যেক সভাপতি স্ব স্ব শাখার উপযোগী স্বতন্ত্র অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন। ইহার ফলে সমাগত সুধীবৃন্দ অনেক সময় ইচ্ছা স্বত্বেও সকল শাখার রসাস্বাদে বঞ্চিত হইতেছেন। কারণ, সময়াভাবে প্রায়ই এক সময়েই চারি শাখার ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অধিবেশন করিতে হইতেছে। শ্রোতৃবৃন্দ যোগসিদ্ধির অভাবে কায়ব্যূহ-রচনায় অসমর্থ হইয়া হয় এক শাখায় সুস্থিত থাকেন, অথবা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ করিয়া যুগপৎ শ্রান্তি ও নির্ব্বেদ অনুভব করেন। ইহার একটা সদুপায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে সদুপায়ের প্রধান অন্তরায় পঠিতব্য প্রবন্ধের বাহুল্য।

সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রবন্ধ-সংগ্রহের জন্য সারা দেশময় নারদের নিমন্ত্রণ করেন। তাহার ফলে প্রত্যেক শাখাতে পাঠের জন্য নানা বিষয়ে উত্তম মধ্যম বহুসংখ্যক প্রবন্ধ

উপস্থিত হয়। সময়াভাবে অধিকাংশ প্রবন্ধই পঠিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় এবং যদি বা দু' এক জন সৌভাগ্যবান্ লেখকের ভাগ্যে প্রবন্ধপাঠে সুবিধা ঘটে, তথাপি সেই সকল প্রবন্ধ চারি শাখার যুগপৎ অধিবেশনের হট্টগোলে যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। এইরূপে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হয়। সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই বিষয়ের প্রতিবিধান করিবার জন্য আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান—এই চারি শাখায় বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা যে সঙ্গত ও সমীচীন, এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। এই চারি শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশনও যে বাঞ্ছনীয়, তাহাও বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই সকল বিশেষ অধিবেশন সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দের মিলন-স্থান না হইয়া বিশেষজ্ঞের চিন্তাবিনিময় ও গবেষণা-পরিচয়ের কেন্দ্র করিলে কিরূপ হয়? এবং প্রত্যেক শাখার বিশিষ্ট সভাপতির অভিভাষণ যুগপৎ পঠিত না হইয়া সাধারণ সভায় পর পর পঠিত হইবার ব্যবস্থা করিলে কেমন হয়? যেন সমবেত সুধীবৃন্দ ইচ্ছা থাকিলে কেহই ঐ সকল অভিভাষণের রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত না হন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ প্রবন্ধের বাহুল্য-ঘটা সঙ্কুচিত করিয়া প্রত্যেক শাখার আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক বা দুই জন ব্যক্তিকে সাধারণ শ্রোতার উপযোগী করিয়া স্ব স্ব বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করিলে ভাল হয়। শুনিয়াছি, এমন এমন একটি প্রবন্ধ শুনাইবার জন্য ইংলণ্ডের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক সর্ব্বদাই এটল্যান্টিক সমুদ্র পার হইয়া আমেরিকায় যান, এবং আমেরিকার বিশিষ্ট লোক [illegible]তে আসেন। আমাদের বিশিষ্ট মহোদয়েরা এক জেলা হইতে অন্য জেলায় আসিতে পারিবেন না কি?

এইরূপ করিলে প্রতিবর্ষে সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যেক শাখায় সেই শাখার সভাপতির অভিভাষণ এবং একটি কিংবা দুইটি বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সম্মিলনের গৌরবের সামগ্রী হইতে পারিবে এবং ঐ সমস্ত প্রবন্ধই সাধারণ সভায় সমবেত সকল সুধীবৃন্দের বিনোদন ও শিক্ষণের উপায়স্বরূপ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের বৈঠকে কূট প্রশ্ন ও সমস্যার আলোচনা চলিবে। তৎসঙ্গে প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রালিপি, আলেখ্য শাসন মূর্ত্তি প্রভৃতির প্রদর্শন, আলোকচিত্রের সাহায্যে সরল ও সরসভাবে জ্ঞানবিস্তার এবং সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও ভাববিনিময় দ্বারা সাহিত্য-সম্মিলনের এই আনন্দের মেলা শুধু হাসিখেলা ও হট্টগোলে শেষ না হইয়া সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করিবে।

আপনাদের স্মরণ হইবে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিগত দশম অধিবেশনে সম্মিলনকে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী দ্বারা বিধিসিদ্ধ বৈধতা

প্রদান করিবার জন্ত সেই সম্মিলনের ,সভাপতি মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং আমাকে লইয়া একটী শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতি বর্ত্তমান নিয়মাবলীর আদর্শে কতকগুলি নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যকরী সমিতি প্রভৃতির নিকট বিবেচনার্থ পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত প্রাপ্ত হইলে রেজেষ্টরীকারী-সমিতি আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া বোধ হয় সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিতে পারিবেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ।

দশম অধিবেশনের সভাপতি-রূপে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী যে আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার ধ্বনি নিশ্চয়ই আপনাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে এখনও ঝঙ্কৃত হইতেছে। "দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব। আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব। আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশ জন অন্য মায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে।" এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে আমাদিগকে অভিষিক্ত হইতে তিনি উপদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধনির্ম্মাণকল্পে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনি উদ্দীপনায় ভাষায় বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালী জাতির ইতর ভদ্র সকলের মনে একবার কোন ক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের, তথা মদীয় জাতির অভ্যুদয় গ্রথিত; বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট, বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতর ভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, একমনে সকলে মধুর বাসন্তীমূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে এক ভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির বিমল প্রভায় বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভূজা বঙ্গভারতী, দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। 'বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জলে' পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।"

আমরা সমস্বরে দেবভাষায় বলি—বাঢ়ম্, বাইবেলের ভাষায় বলি, Amen—আরও বলি "সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

কিন্তু সরস্বতী মহাশয় ধ্যাননেত্রে ভাবরাজ্যে যে মহনীয় চিত্র দর্শন করিয়াছেন, যদি তাহাকে আকার দান করিয়া বাস্তবে পরিণত করিতে হয়, তবে প্রথমেই বঙ্গভাষাকে বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে হইবে—তাহা না পারিলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে, সমস্ত আশা ভগ্ন হইবে।

কথাটা এত গুরুতর যে, একটু বিস্তার করিয়া বলি। বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে অনেকগুলি নিপুণ কর্ম্মঠ স্থপতির দরকার—এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এখন প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা ঐরূপ স্থপতির উদ্ভব হইতেছে কি না? আমার এক পরিহাসরসিক বন্ধু বলেন যে, গবর্মেণ্টের প্রবর্ত্তিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণোদিত শিক্ষার ফলে কেবল দুই শ্রেণীর জীব তৈয়ারী হইতেছে—এক গোলাম, অন্য গুণ্ডা। কথাটা যে একেবারে অমূলক তাহা নহে; কিন্তু হয় ত ইহাতে কিছু অত্যুক্তি আছে। অতএব যাঁহারা আমার বন্ধুর মত চটুল নহেন, যাঁহারা গম্ভীর ভাবুক দায়িত্ব-জ্ঞানী লোক, তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাউক। প্রথমতঃ, আমাদের সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর উপর এমন বিরক্ত ছিলেন যে, আমাদের শিক্ষিতদিগকে ভারবাহী গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—"খরো যথা চন্দনভারবাহী"। তার পর যিনি বিধিদত্ত অধিকারে বঙ্কিমবাবুর সাহিত্য-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেন? তিনি আমাদিগকে চলন্ত নোটবুক্ ও স্ফুরন্ত ফণোগ্রাফ বলিয়াছেন, এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মৌলিকতা ও সজীবতার অভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মুখে এই কবিতাটী বসাইয়াছেন :—

"ভয়ে ভয়ে যাই ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই!"

পূর্ব্ব ও পশ্চিম—যুক্ত-বঙ্গের গৌরব কবিবর নবীনচন্দ্র সেন আত্ম-জীবনচরিতে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীকে শিশুমুণ্ডমালিনী মহাকালী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এবং ঐ শিক্ষার ফলে অকালে কত শিশুহত্যা হইতেছে, তাহার বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার ভাব অবলম্বন করিয়া আমার এক অভিন্নকলেবর বন্ধু একটী ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাদের শুনাইতে চাই—

নিজ শিব পদে দলে,
শিশু মুণ্ডমালা গলে,
সংহার-রূপিণী, ঘোরা, মুখে অট্টহাস!

লোল রসনা লকে,
রুধির বলকে ঝকে,
পূতনারূপিণী বামা বঙ্গে পরকাশ ॥

ইহা আপনাদের নিকট কবিতার অত্যুক্তি মনে হইতে পারে। অতএব, এক জন ধীর স্থির প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি শুনুন। ইনি দেশপূজ্য মারাঠা জননায়ক জষ্টিস্ রাণাড়ে। তিনি এই শিশুহত্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ;—

"The chief of the causes leading to the premature deaths of our students is over-study and the strain caused by the stiff system of frequent competitive examination in subjects which have to be mastered in a foreign language and which tax the powers of students beyond their endurance. * * *

* * * Attempting to secure thoroughness, as it is called, the University system directly produces the unhappy result of ***killing many of the brightest students*** who come within its influence * * * * The true etiology of what I call nervous or vital exhaustion and atrophy of energies must be sought in the deeper recess of the educational system. The bow is too much bent, and when it is relaxed it refuses to unbend again except under pressure and enforced order." দেহক্ষয় অপেক্ষা এই যে মনের অপচয়— মানসিক পঙ্গুতা— ইহা আরও মারাত্মক।

আমাদের দেশমান্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি আজীবন শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন, এবং যিনি স্বভাবসুলভ ধীরতার বশে "প্রত্যেক শব্দ ওজন করিয়া উচ্চারণ করেন, তিনি এ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন,—

"The existing system of English Education in this country has failed to produce satisfactory results * * The time for change of method has certainly arrived." আমার স্মরণ আছে, একবার কলিকাতার সেণ্টজেভিয়ার কলেজের অধ্যক্ষ Father Lafont, যাঁহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তিনি আমাদের শিক্ষা-প্রণালীকে huge sham বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জানত এমন কয়েকটী ছাত্র আছে, যাহারা উপাধি-পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ সেই সেই বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এ কথায় বোধ হয় আমরা অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে সমর্থন করিতে পারি। আমি একজন দর্শনশাস্ত্রের এম-এর কথা জানি, যিনি কেবল নোট পড়িয়া পাশ হইয়াছেন, একখানিও দার্শনিক গ্রন্থ উল্টাইয়া দেখেন নাই। সম্প্রতি

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, এক জন Astronomy-সংযুক্ত গণিত বিভাগে এম এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, অথচ কোন দিন গগনবিহারী গ্রহনক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দূরবীক্ষণে চক্ষুঃ-সংযোগ করেন নাই। অনেকেই শিক্ষিতদিগের পঙ্গুতা ও শিক্ষার বন্ধ্যাত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের ডাক্তার ভাণ্ডারকর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন—"the languid interest which our graduates feel in literary pursuits in after life"। দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয়সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপন ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেন না, ইংরাজীতে একটী কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকটে আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন পাশ যেখানকার ছাত্রদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতিবিধান কিংবা যে কোন প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়-মূলক কার্য্যের সাফল্যসম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত।"

ডাক্তার রায়ের বহু পূর্ব্বে মনস্বী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধে" আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেশে বিজ্ঞানশালার প্রতিষ্ঠা করিলে কি হইবে, দেশের মধ্যে এখনও বৈজ্ঞানিকতার অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। এই সকল গুরুকল্প ব্যক্তিদিগের কথার পর আমি কি বলিতে পারি? আর যদিই বা বলিতে যাই, হয় ত কিছু কটু কঠোর বলিয়া ফেলিব। তবে আমার যাহা বক্তব্য, এক জন আইরিস্ লেখক আয়ারল্যাণ্ডের শিক্ষা-বিভ্রাটের বর্ণনায় তাহা যথাযথ বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিই—আপনারা ঐ উক্তিতে আয়ারল্যাণ্ডের স্থানে ইণ্ডিয়া বসাইয়া লইবেন:—

"Education in Ireland encumbers the intellect, checks the fancy, debases the soul and enervates the body. It cuts off the Irishman from his tradition and by denying him a country debases his soul; it stores his mind with lumber and nonsense; it destroys his fancy by cutting him off from his traditions and enervates his body by denying him physical culture."

যে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এত দোষ, তাহার আমূল সংস্কার না হইলে আমাদের জাতির কি ভরসা আছে? যদি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়,

তবে তাহার জন্য অনেকগুলি মানুষ চাই—কয়েক জন অতিমানুষও চাই—মেষের দ্বারা সে কার্য্য হইবে না, মহিষের দ্বারাও হইবে না। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্বতন্ত্র স্বালম্ব স্বনিষ্ঠ স্বাধীন সামাজিক প্রস্তুত হইবে; যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে দৃঢ়তা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে, এক কথায়, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে, দেশে নূতন শিল্প নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে, নূতন সাহিত্যের নবগঙ্গা আনয়ন করিবে; নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা করিবে; নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে। কেন বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে এইরূপ মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না? বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, অধ্যবসায়ের অভাব নাই, তথাপি এইরূপ হইতেছে কেন? আমাদের দেশে শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিত কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, বাঙ্গলাকে শিক্ষার বাহন না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষা-দান। এইরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর কোথায়ও কখনও ছিল কি না, তাহাও জানা যায় নাই। কেবল কিছুদিনের জন্য ছিল নরম্যান-বিজয়ের পর নিপীড়িত ইংলণ্ড দেশে। কিন্তু ইংরেজ জাতি প্রকৃতি-সুলভ অমোঘতায় শীঘ্রই নরম্যানকে আত্মসাৎ করিয়া নিজের শিক্ষা স্বাভাবিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিল। এদেশে কত দিনে এই শুভ ঘটনা সংঘটিত হইবে?

আমাদের শিক্ষার্থীদিগকে cram-কারী বলিয়া বিদ্রূপ করা হয়। তারা মুখস্থ করিয়া পাশ করে; বস্তু শিখে না বাক্য শিখে, ভাব শিখে না ভাষা শিখে; তারা গতানুগতিক—তাহাদের মৌলিকতা নাই, স্বাধীন চিন্তা, আত্মনির্ভর নাই, গবেষণার প্রবৃত্তি নাই। তাহারা কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে, বান্তনিষেবন করে। তাহারা নিজের পথ কাটিয়া লইতে পারে না, জাতীয় জীবনের প্রদীপ্ত হোমানলে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সুবিধা আহুতি দিতে পারে না। সমস্তই স্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ইহার জন্য তাহারা দায়ী, না তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী দায়ী? আমার স্মরণ আছে, যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বারে উপনীত হইবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলাম, তখন ইংরাজী ভাষায় ইতিহাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্য কি গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে পরাভূত হইয়া কিরূপে key ও catecheismএর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অথচ যাদের 'ভাল ছেলে' বলে, মেধাবী পরিশ্রমী তীক্ষ্ণবুদ্ধি সচ্চরিত্র আমি তাহাদের একজন ছিলাম। অবশ্য আমার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনাদের একথা বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আমার যে বর্ত্তমান আমি, সেটা পুরাতন আমির ধ্বংসাবশেষ মাত্র—এ আমি পরীক্ষা-ঘানির ঘর্ঘর-নিষ্পিষ্ট নিঃসার জীব। কিন্তু চিরদিন এমন ছিলাম না! তবে জানেন ত'—পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—নিজেরা ছাত্র দশায় যে সকল মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলাম, এখন শিশু পুত্রদের মধ্যে তাহার পুনরভিনয় দেখিতেছি। আমার একটী নয় বৎসরের পুত্র আছে। সে সখ করিয়া বিনা সাহায্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পড়ে। অবাধে পড়িয়া যায়, নিঃশেষ না করিয়া নিরস্ত হয় না। কিন্তু দেখিতে পাই ইংরাজি পড়িতে হইলে তাহার হৃৎকম্প হয়। দুই বৎসরের বিবিধ চেষ্টাতেও সে এখনও first book সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিল না। শিক্ষা এ দেশে কত সুখের কত আনন্দের প্রস্রবণ হইতে পারিত, যদি না বিদেশী ভাষা-শিক্ষার বিকট ছায়া শিক্ষাঙ্গনে নিপতিত হইয়া শিশুদের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার করিত। বাঙ্গালি জাতি নাকি অজেয় অমর জাতি, তাই এত শিক্ষা সঙ্কটের মধ্যেও বাঙ্গালীর প্রতিভা একেবারে ম্লান হইয়া যায় নাই; এবং তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একেবারে ভোতা হইয়া যায় নাই। এই প্রণালী সত্ত্বেও যে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রাসবিহারী ঘোষ, সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনস্বী পুরুষ (বিদেশে যাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ধরিলাম না) আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাতে আশা হয় যে বাঙ্গালীকে কেহই পরাভূত করিতে পারিবে না। সার আশুতোষও গতবারে বলিয়াছিলেন—'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই একটা সঞ্জীবনী-শক্তি আছে যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না, হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না। তবে এ কথা আমি বলিতে বাধ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে যদি আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিতে হইত, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতেন কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। কিন্তু শ্বেতভুজা শতদলবাসিনী নাকি তাঁহার হৃৎপদ্মে আপনার রক্তচরণ চিহ্নিত করিবেন পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন, সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা অবধি পঁহুছিতে পারিলেন না। ধরণী স্বস্তিশ্বাস মোচন করিলেন, দেবতারা দুন্দুভি নিনাদ করিলেন, দিক্‌বালারা অম্লান পারিজাত-মালা হস্তে লইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, বঙ্গদেশ আর একজন মহাকবির সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হইল। বাস্তবিক ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে যাহারা উপেক্ষিত, অনেক সময়ে তাহাদের মনীষাই দেশকে সুবাস বিতরণ করে। সকলেই জানেন ডব্লিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় এন্‌ট্রেন্‌স পাশ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ ইংরাজীতে ফেল হইয়াছিলেন। সম্প্রতি যে ২৩ বর্ষীয় মান্দ্রাজী যুবক কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে

প্রথম এফ্, আর, এস্, রূপ জয়-টীকা ললাটে ধারণ করিয়াছেন, তিনি ৬বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় গলাধাক্কা খাইয়া পোর্টইঞ্জিনিয়ার আফিসে কেরাণীগিরি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু দুষ্ট সরস্বতীর এমনই প্রেরণা এবং প্রতিভার এমনই অপ্রতিহত গতি যে, সেই কেরাণী যুবক অপ্রত্যাশিত ভাবে কেম্ব্রিজে নীত হইল এবং অনুকূল অবস্থার গুণে তাহার মনীষাপুষ্প বিকসিত হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালাকে যে সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করা উচিত্ এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে ইহা আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু দেখিয়াছি যে, সকলে এ সম্বন্ধে এক মত নহেন। সেই জন্যই এ বিষয়ে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে হয়। সে যুক্তি-তর্ক নিজের কথায় না দিয়া কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে না, তাঁহাদের কথাতেই দিব। প্রথমতঃ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁহার মত যোগ্য কে? তাঁহার উক্তি শুনুন।

"Except in the lowest forms, the different subjects of study have at present, all to be learnt in our schools and colleges in English, and this throws no small burden on our students. English is a very difficult language for a foreigner especially a Bengalee, to learn, because English and Bengali differ so widely, not only in their vocabularies but also in their grammatical structures and idioms And this difficulty is really so great that it not only overtaxes the energy of our students, but also cramps their thought * * . The ignorance of the middle ages was not dispelled and the Revival of learning was not complete until knowledge began to be disseminated through the modern languages. Nor can we expect any revival of learning here until it is imparted not merely in its primary stage, but in the higher stages as well, through the medium of the vernaculars"

অনেক বৎসর হইল বঙ্গদর্শনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন, অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটী মোটামুটী শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট দশ বৎসর লাগে। ভাষা শিক্ষাটী অথচ কিছুই নহে, ভাষা শিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায় —উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় ব্যয় ও এত পরিশ্রম! তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি?

* * *

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে আঁক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা

দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন? ইংরেজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজী মুখে শিখিতে হয়।"

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচয়িতা Vincent Smith একজন সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার কি অভিমত শ্রবণ করুন :—

The Indian universities suffer from the want of root. They are merely cuttings,—struck down in an uncongenial; and kept alive with difficulty by the constant watering of a paternal Government.

As a consequence of their extraneous origin is the necessity that all instruction has to be given in the English language. Only Indian teachers can realise what an impediment to real culture is the system of making foreign language the medium of all instruction."

আর একজন সুযোগ্য ব্যক্তির অভিমত শুনুন। ইহাঁরও শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ইহাঁর নাম Sir Henry Craik.

"We might surely endeavour to link intellectual training which we give most closely to their life and their tradition and to abandon the senseless attempt to turn an oriental into a bad imitation of a western mind. Why should we teach them that education is impossible without acquiring the English language? * * * It is not a triumph for our education—it is, on the contrary, a satire upon it—when we find the sons of leading natives expressly discouraged by their parents from acquiring any knowledge of their vernacular."

কিন্তু বিদেশীর নিকট ধার করা বাণী সংগ্রহ করিতে যাই কেন? আমাদের দেশের জন্য যাঁহারা ভাবেন, দেশকে যাঁহারা চিনেন, যাঁহারা দেশের অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাজন, তাঁহাদের মত ত শুনিলাম। যদি আরও অভিমত সংগ্রহ করিয়া পুঞ্জীকৃত পাহাড় রচনা করা দরকার হয়, তাহাও পারি। কিন্তু তাহাতে বিরত থাকিয়া কেবল আর একটীমাত্র অভিমত উদ্ধৃত করিব। কারণ আমার বিশ্বাস এ অভিমতের পর অন্ততঃ সাহিত্য-সম্মিলনে আর দ্বিমত হইবে না। এ অভিমত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—"বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজী ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তা'রা কোনোমতে এণ্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়—উপরের সিঁড়ী ভাঙ্গিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতর দুর্গতির অনেকগুলি কারণ আছে। একে ত যে ছেলের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, তার পক্ষে ইংরেজী ভাষার মত বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভাল শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজী শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়,—গরীবের ছেলের ত হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয় ;—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজী বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানেরা এমনতর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে, তারা শেষ পর্যান্ত উদ্ধার পাইয়া যায়—কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না, তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য। * * * ভালোমত ইংরেজী শিখিতে পারিল না, এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাঙ্গালা দেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না ?"

আপত্তি উঠিবে যে, বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক কোথা যে আমরা বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিব ? উত্তরে বলিতে চাই যে, প্রবেশিকা ও আই, এ, পরীক্ষায় তোমরা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ইংরেজী কেতাব পড়াও, তাহার সমতুল্য গ্রন্থ বাঙ্গালাতে এখনও প্রচুর আছে। রবীন্দ্রবাবু 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে এই আপত্তির যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি শুনুন—

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চ শিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় উচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই ? নাই, সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে ? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারী করিবে,—কিম্বা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয়, তবে পাতার যোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাঙ্গালায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাঙ্গালার জন্য যোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং

প্রবেশিকা ও এফ, এ পরীক্ষার যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাঙ্গালার বাহনে বিতরিত হয় তজ্জন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বোধ হয় আপনাদের অবিদিত নাই। আপনাদের স্মরণ হইতে পারে যে, ১৩০১ বঙ্গাব্দে যখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন, সেই সময় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া এই বিষয়ের উপায় বিধান জন্ত একটী কমিটী গঠিত হয়। ঐ কমিটীর আমিও একজন সদস্ত ছিলাম। ঐ কমিটী অনেক আলোচনার পর নিম্নলিখিত মন্তব্যদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন :—

I. That the University be moved to adopt a regulation to the effect that at the F. A. Examination and in the A Course of the B. A. Examination where a classical language is taken as the third subject, one paper should be set containing—(i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India, recognised by the Senate,—(ii) a subject for original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style.

II. That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrance Examination the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate.

কমিটির মন্তব্য পরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত হইবার পর পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত-মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে দত্ত মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"In accordance with the resolution of the Parishad just referred to, I beg, under para. 12 of the Bye-laws relating to the Syndicate, to propose for the consideration of the syndicate the following regulatoin :—

That at the F. A. Examination and at the B. A. Examination in the A course where a classical language is taken as the third subject, paper be set containing (i) passages in English for translation into one of she vernaculars of India recognised by the Senate, (ii) a subject of original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style.

And I beg further to request that the Vice-Chancellor and the Syndicate will be pleased to consider how far under present circum-

stances the second recommendation referred to in the preceding paragraph may be given effect to."

বলা বাহুল্য যে এই উদ্যম সফল হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা ঐ সময়ে হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, দ্বিতীয় প্রস্তাব তাঁহারা বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের পর মহাপ্রাজ্ঞ সেনেট-মণ্ডলী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী এইরূপ স্থির করেন যে, এফ এ ও বি এর পরীক্ষার্থীদিগকে বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে বিকল্প দেওয়া হউক এবং সুযোগ্য পরীক্ষার্থীদিগকে একখানা করিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হউক। * ইহার কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য লর্ড কর্জ্জন সম্মার্জ্জনী হস্তে আসরে অবতীর্ণ হন। তিনি যে ইউনিভারসিটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের ১৯০২ সালে প্রকাশিত রিপোর্টের ৯৭-৯৫, প্যারায় দেশীয় ভাষাসমূহের প্রতি কিছু কৃপা-কটাক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল "The vernacular languages should be introduced in combination with English as a subject for the M. A. Examination. The M. A. Examination in the vernacular should be of such a character as to ensure a thorough scholarly study of the subject. The encouragement of such study by graduates who have completed their general course should be of great advantage for the cultivation and development of vernacular languages." পুনশ্চ :—We hope that the inclusion of vernacular languages in the M. A, course will give an impetus to their scholarly study, and * * we consider that the establishment of professorships in the vernacular languages is an object to which university funds may properly be devoted. We also think that vernacular composition should be made compulsory in every stage of the M. A. course, although there need be no teaching on the subject. Further encouragement might be given by the offer of prizes for literary and scientific books of merit in the vernacular languages." ইহার পর ১৯০৪ সালের এক গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ১৩ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে ইংরাজীদ্বারা শিক্ষা দেওয়া অনুচিত এবং ইহাও বলা হয় যে প্রবেশিকা স্কুলের ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা হইতে একেবারে বঞ্চিত করা অনুচিত।

* An optional examination be held in original composition in Bengali and other vernaculars for the F A. and B. A. candidates, proficiency in it entitling candidates to a special certificate. (Minutes of the Calcutta University 1895—96 p. p. 63—64 and 1896—97 p. p. 288—90 & p. 38—59.

বিস্ময়ের কথা নহে কি? এই স্বতঃসিদ্ধ কথাও গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যের দ্বারা প্রচারিত করিতে হইল। আমাদের দেশের অনেকই বিশেষত্ব, কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে বিশিষ্ট বিশেষত্ব ইহাই।

ইহার পর প্রধানতঃ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার একটু বিশিষ্ট স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর এক কোণায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন প্রবেশিকা, এফ্. এ, বি-এ পরীক্ষার্থী সকল বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়। এবং রচনার নীতি শিখাইবার জন্য models of style রূপে কয়েকখানি পুস্তকের নাম নির্দ্দেশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা কবিতার কোনও বই পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে না। এমন কি বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যও কোন পরীক্ষার বা প্রশ্নপত্রের বিষয় হয় না। এ সম্বন্ধে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। জানি লোহার বাসর ঘরে ছুঁচ হইয়া ঢোকাও শক্ত; কিন্তু ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট নহি। এ যেন বড় মানুষের ভোজের টেবিলে দরিদ্র আত্মীয়ের ধিক্কৃত কষ্টাসন। সেইজন্য আপনাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় 'বাঙ্গালার কথায়' দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, উদ্দেশ্য—শুধু বাঙ্গালা লিখিবার রীতি শিখান হইবে, আর কিছু হইবে না। এ কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষার যে অশেষ সম্পদ্, তাহাতে কি বাঙ্গালী ছাত্রের কোন আবশ্যক নাই? বাঙ্গালা ভাষার যে অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যের যে একটা অতল প্রাণ আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া কি আমাদের শিক্ষা প্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে? আমার বাঙ্গালা ভাষা যে রাজরাণী, আপনার গৌরবে সে স্ব-গরবিণী। এই যে তোমরা বল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রবেশ করিয়াছে, মনে রাখিয়ো, তাহার যে নিজস্ব গৌরব, সে গৌরবে তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও নাই, সামান্যা দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটা কোণায় তাহাকে বসিবার একটু ঠাঁই দিয়াছ মাত্র।"

আমি জানি কেহ কেহ অল্পেই সন্তুষ্ট। তাঁহারা বলেন, "নেই মামার অপেক্ষা কাণা মামা ভাল। অল্পেই তুষ্ট হও বেশীর তৃষা ত্যাগ কর।" একথা কিন্তু এদেশের শিক্ষা দীক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা কখনই অল্পে সন্তুষ্ট নই, অল্পে সন্তুষ্ট হইব না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমরা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া এখনও বলি "মারি ত হাতী"। সেইজন্য দেখিতে পাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলন অল্পে তুষ্ট না হইয়া অধিক পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণীতে দেখিলাম, প্রায় সর্ব্ব-সম্মতি-মতে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি গৃহীত হইয়াছিল। "বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ধন্যবাদ জানাইতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিশ্বাস,—বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব আরও প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি আপাততঃ সত্বর অবলম্বন করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা গ্রহণে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষাবিজ্ঞান এম এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত-ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সুখের বিষয় এ সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের সকরুণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। বিগত আগষ্ট মাসে সিমলা-শৈলে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষগণের যে সম্মিলন হয়, সেই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে আমাদের বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমস্‌ফোর্ড এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

Lastly I come to the subject of the media of instruction. As you all know the vernaculars and English are both the media of instruction in our schools and it sometimes overlooked to what a large extent the Vernacular figures at the present time as a medium of instruction. But it is certainly worth our while to examine from the educational stand-point what the relative position of these media should be to each other, having in view the one ob'ect viz, that the pupil should derive the greatest possible advantage from his schooling. * * * I reco,nise the value of large and generous ideals in the sphere of education, but we must never forget the need from time to time of examining and making sure of our foundations. And what

more important, what more practical task in this connection could be laid upon you than the duty of devising means whereby students may be enabled to obtain a better grasp of the subjects which they are taught and to complete their secondary course with more competent knowledge than at present ?

বড়লাটের এই সকল বাণীতে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতিকে লইয়া একটী-শাখা-সমিতি গঠিত করেন। আমিও ঐ শাখা সমিতির একজন সভ্য আছি। শাখা-সমিতির আলোচ্য বিষয় এই ছিল যে "উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় অথচ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা যাহাতে রীতিমত হয় এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে বঙ্গভাষা রীতিমত পুষ্টিলাভ করিয়া পরিণামে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা-প্রদানের উপযোগী হইতে পারে, ইহার জন্ম আমাদের বর্ত্তমানে কি কর্ত্তব্য ?" শাখা-সমিতি বহু আলোচনার পর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম :—

(১) শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরাজী শিক্ষার বাধাজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে—এ আশঙ্কা অমূলক।

(২) কি নিম্ন, কি উচ্চ সকল প্রকার শিক্ষাই যতদূর সাধ্য শিক্ষার্থীর মাতৃ-ভাষাতে দেওয়া উচিত। যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দেশ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গ্রন্থের কোন অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভ্রাটেরও আর কোন আশঙ্কা নাই। মধ্য (Intermediate) পরীক্ষাতেও অধিকাংশ বিষয়েরই আবশ্যক গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তত্তদ্‌বিষয়ের গ্রন্থের অভাব অতি সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় এবং সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও বাধা দেখা যায় না যে, বিএ, এম্ এ পরীক্ষার বিষয়ও এক দিন বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। দুই বৎসর পরে হউক, আর ৫ বৎসর পরে হউক, বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক একবার প্রচারিত হইলে অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

৩। আর একটি বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা কেবল রচনা শিক্ষার জন্ম এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য উভয় বিষয়ই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয়, ইহা প্রয়োজনীয়।

৪। এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গ-ভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা—যাহাতে আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এ সম্পর্কে এই সাহিত্য-সম্মিলনের কিছু কর্তব্য আছে কি না, সমবেত সুধীবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত উপাধি বিতরণ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস্ চ্যান্সলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত Research বা অনুসন্ধান কার্য্য যে বাঙ্গালাতেই হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। সে কথাগুলি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

With the field of research daily expanding, the question of its vehicle must come to the fore. No country has done real research work on a large scale and with lasting results that has been handicapped by the language difficulty, aswe have been. Though a knowledge of other languages, preferably modern, is essential for research, and though results of research in many subjects, may for the time being have to be published in English, the place of vernaculars regard to many other subjects, must be clearly and at once recognised. We have begun recognition of the vernacular at one end and have done well so far. Unless, however, we recognise and encourage it at the other end, neither it nor research will really thrive. This is a larger bid, in some sense, on behalf of our Vernaculars than has hitherto been made ; but I hope it is not unreasonable, nor untimely.

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আমাদের গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয় বিশ্বর মুখে কয়েকটি আশার বাণী শুনাইয়াছেন।

"The first fundamental fact that stares one in the face is that in India all higher education is imparted in a language which is not the student's mother tongue. I am not going to enter into the well worn controversy as to whether University teaching should be in the Vernacular or in English ; so far as that goes, I take things as I find them ; and, assuming that the medium for imparting Western learning must be the English language, I made

early enquiries as to what steps were taken to give the Indian boy a sound working knowledge of the English tongue. The general tenour of the replies which I received to my enquiries was that English is the worst taught subject in our secondary schools. I have found, indeed, a disconcerting consensus of opinion to this effect and I also found this general view endorsed by the Dacca University Committe from whose report I learned that though 'the young undergraduate must be treated as a University student, and not as a school boy, yet he is hardly ripe for a course of true University lectures, nor in many cases is his knowledge of English sufficient to enable him to profit by them."

শুনিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধন জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, আমাদের বিগত সম্মিলনের সভাপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাহার একজন প্রতাপী সভ্য—সেই কমিশন বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কমিশনের সদস্যদিগের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাঁহাদের শিরে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। আমরা তাঁহাদের আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। কালিদাসের সময়ে আশা-বন্ধ কুসুমসদৃশ সদ্যঃপাতী প্রণয়ী হৃদয়কে বিপ্রয়োগে নিরুদ্ধ রাখিত। এখন ইহা দুঃশিক্ষা-পীড়িত সাত কোটী নরনারীর অবসন্ন হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিবে।

শিক্ষালয় ও শিক্ষা-প্রণালী।

কিন্তু শুধু বাঙ্গলাকে শিক্ষার বাহন করিলেও চলিবে না—শিক্ষালয়গুলির আব্‌হাওয়া বদ্‌লাইতে হইবে, শিক্ষা-প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে। এখনকার স্কুল-কলেজ নামধেয় বিদ্যাবিপণিগুলিকে বিদ্যামন্দিরে—অন্ততঃ বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে, এবং তাহার অঙ্গনে প্রাচীন ভারতের গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধের মিষ্ট বাতাস প্রবাহিত করিতে হইবে, এবং শান্ত তপোবনের মুক্ত আকাশ বিলম্বিত করিতে হইবে। দেখুন, অশ্রদ্ধার দানে দাতা ও গৃহীতা—উভয়েই পতিত হয়। আমাদের ছাত্রেরা যে ইঁহাদের প্রদত্ত বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তাহার অন্যতম কারণ শিক্ষকের প্রতিকূল ভাব। পূর্ব্বকালে শিক্ষক সেবক ছিলেন—বিদ্যাকে সেবার ভাবে শ্রদ্ধার সহিত সম্ভ্রমের সহিত সংযমের সহিত ভয়ের সহিত দান করিতেন। 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং হ্রিয়া দেয়ং ভিয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ং অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ম্'। সেইজন্য বিদ্যা বিদিতা হইয়া ছাত্রকে গরীয়ান্ করিত।

আচার্য্যাদ্ধৈব বিদিতা বিদ্যা সাধিষ্ঠং গময়তি

কিন্তু এখন? কদর্য্য দাতা যেমন অবজ্ঞার সহিত ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দেয়, অনেক

স্কুলে বিদেশী অধ্যাপক তেমনি অবজ্ঞায় ছাত্রদিগকে, বিদ্যার ক্ষুদ বিতরণ করেন। আমরা একজন অধ্যাপকের নিকট পড়িতাম। তিনি প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন—কত বিদ্যা তাঁহার বিশোদরে নিহিত ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু তিনি কোন দিন আমাদের মুখের দিকে তাকান নাই—তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা স্বীয় বুটের উপর সংলগ্ন থাকিত—কদাচিৎ কেতাবের উপর পড়িত—কিন্তু কোন কারণে কোন দিন আমাদের উপর পড়ে নাই। আমরা সে সময়ে রঘুবংশে বাল্মীকির তপোবন হইতে আনীতা সীতার বর্ণনা পড়িতাম—কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা, এবং মনে মনে তাঁহার সহিত আমাদের অধ্যাপকের তুলনা করিতাম। ইনি যদিও 'কষায়-পরিবীত' ছিলেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই 'স্বপদার্পিতচক্ষু' থাকিতেন।

এই শ্রদ্ধার ও অশ্রদ্ধার দান লইয়া একবার দেবলোকে তুমুল কলহ হইয়াছিল। শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দান বড়, না পতিতের শ্রদ্ধার দান বড়। উভয় পক্ষের বক্তৃতার পর ভোট লওয়া হইল, দেখা গেল, দুই দিকের ভোট-সংখ্যা সমান। তখন দেব-লোকের সভাপতি প্রজাপতি ঠাকুর উঠিয়া বলিলেন, "মা কৃধ্বং বিষমং সমম্"। অসমান জিনিসকে সমান করিও না—কারণ, "শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য হতমশ্রদ্ধয়েতরৎ।" পতিতের শ্রদ্ধাপূত দান শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধায় দেওয়া হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। আমরাও এই কথা বলি। আমরা দিগ্‌গজ পণ্ডিতের অশ্রদ্ধার বিদ্যা-বিতরণ চাই না, অপণ্ডিতের শ্রদ্ধাপূত দানই আমাদের শিরোধার্য্য।

আরও দেখুন, প্রাচীনকালে গুরু চাহিতেন যে, যেমন দিক্‌বিদিক্ হইতে নদনদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ দশ দিক্ হইতে ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহার আশ্রমে মিলিত হউক।

"যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরং
তথা মা ব্রহ্মচারিণঃ ধাতর্ আয়ান্তু সর্ব্বতঃ"

আমরা কিন্তু বিদেশী ভাষার এবং বিকট রেগুলেশনের লৌহময় প্রাচীর রচনা করিয়া শত প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে বিদ্যা-বধূকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি। যদি কোন দিগ্-বিজয়ী বীর ঐ সকল আয়সী পুরী ভেদ করিয়া অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে হয় ত বিদ্যার চকিত চমৎকৃতি কোন দিন প্রত্যক্ষ করিবে।

এদেশে যদি বিদ্যার প্রকৃত আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হয়, এবং সেই সোনার অলঙ্কার রচনা করিয়া বঙ্গবাণীর বর অঙ্গের শোভা-বর্দ্ধন করিতে হয়, তবে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর হাব ভাব আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ইয়ুরোপের বিশেষত্ববর্জ্জিত-হীন অনুকৃতি না করিয়া, ইহাকে ভারতীয় বিদ্যা, ভারতীয় ভাব, ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস দর্শন-চর্চ্চার

কেন্দ্রস্থান করিতে হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, আমরা পাশ্চাত্য culture হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত করিব। আমরা য়ুরোপের সাহিত্য, দর্শন, কলা-বিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভূতপরিমাণে শিক্ষা ও গ্রহণ করিব। কিন্তু পূর্ব্বকালে যেমন করিয়া গ্রীক্‌, হূণ, শক, পহ্লব প্রভৃতিকে আপনাদিগের মধ্যে হজম করিয়াছিলাম, সেইরূপ পাশ্চাত্য বিদ্যা ও জ্ঞানকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিব। তাহারা আমাদের 'ওদন' হইবে, 'উপসেচন' হইবে, তাহারা এখনকার মত আমাদিগকে অভিভূত পরাভূত করিতে পারিবে না। ঐ সকল বিদ্যা ও কলাকে আমাদের ভারতী সরস্বতীর সম্রাজ্ঞী হইতে দিব না, শুদ্ধদাসী করিয়া রাখিব।

এ সম্বন্ধে কয়েক জন অভিজ্ঞ ইংরাজের উক্তি ও উপদেশ আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। আপনারা দেখিবেন যে, আমরা যাহা অবাধে উপেক্ষা করি, দূরদৃষ্টিশীল এই সকল বিদেশীয়েরা তাহাকে কি চক্ষে দেখে। প্রথম সার্ জর্জ্জ বার্ডউড্-এর কথা শুনুন। তিনি অনেক দিন বোম্বাই প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার সহিত সুপরিচিত ছিলেন।

"I hail with delight any symptom of the spontaneous revival of the indigenous and traditional, literary and artistic, and philosophical and religious life of India—India of the Hindus. The first thing to do is to take the whole of your higher education more into your own hands. * * Science is almost the exclusive creation of modern Europe. It is to modern Europe, therefore, that you must directly look for your scientific culture, and in the present economic condition of India you cannot have too much pure and applied (technical) scientific instruction in all your schools, primary, secondary and higher. But for your literary and artistic and your philosophical and religious, in a word, your spiritual culture, you already possess your own – the indigenous growth of 4000 years of Aryan supremacy in India; and you must never surrender it, but to the utmost of your ability and power, strengthen it and extend its influence."

ভূতের মুখেও রামনাম শুনিতে পারা যায়, এই নীতি অবলম্বন করিয়া বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড সিডেনহাম—যিনি সম্প্রতি ইঙ্গ-ভারতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের বিদেহ-মুক্তির ব্যবস্থা করিতেছেন—তাঁহার একটা উক্তি আপনাদিগকে শুনাইব।—

"We cannot, by education, transform the intellect of an ancient

people or reconstruct their tastes and opinions in exact accordance with foreign models. Even if such proceeding were practicable, it would be eminently undesirable, because a process of artifical conversion, which take no account of inherent genius and aptitude, is more likely to in ure than to elevate a native populat on."

এই উক্তির মধ্যে ছুইটা খুব দরকারী শব্দ আছে— "artificial conversion।" আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর যেটা বিশিষ্ট ব্যাধি—বিদ্যা-অজীর্ণ (mental dyspepsia) তাহার নিদান ঐখানে। যন্ত্রসিদ্ধ ভোজন দ্বারা একটা সমগ্র জাতিকে কখনও পীন ও পুষ্ট রাখা যায় না।

আর এক জন অভিজ্ঞ ইংরাজের কথা শুনাইব—ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ। অন্ত প্রসঙ্গে ইহার কথা একবার বলিয়াছি, তাঁহার কথাগুলি অতি সারগর্ভ এবং আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিত্তালয় কেন দেশের হৃদয়ে শিকড় পাতিয়া সজীব মহীরুহে পরিণত হইতেছে না, তাহার কারণ আমরা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয়ের কথার মধ্যে পাইয়াছি। গাছের ডাল কাটিয়া যদি ঊষর ভূমিতে প্রোথিত কর, তবে রাজকীয় জলসেক দ্বারাও তাহার কিছু বিকাশ হইবে কি?

"When an Indian student is bidden to study Philosophy he should not be forced to try and accommodate his mind to the unfamiliar forms of European speculation, but should be encouraged to work on the lines laid down by the great thinkers of his own country, who may justly claim equality with Plato, Aristotle and Kant.

The lectures and examinations in philosophy for the student of an Indian University should be primarily on Indian Ethics and Metaphysics, the European systems being taught only for the sake of contrast and illustration. So far as I know, the courses prescribed by the Indian Universities are not on these lines. * * * * * * * * * History too, should be treated in the same way, and be approached from the Ea tern, not the Western side. This change also would impose no small strain on the present staff, and require extensive alterations in the prescribed books and in the whole spirit of the teaching. It is usiess to ask an Indian University to reform itself, because it does not possess, the power. Some day perhaps, the man in power will arise, who is not hidebound by the University traditions of his youth, who will perceive that an Indian University deserving of the name must devote itself

to the development of Indian thought and learning, and who will care enough for true higher education to establish *a real University in India.*"

আমরা ঐরূপ শক্তিধর মহাপুরুষের আশাপথ চাহিয়া আছি—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং যিনি ভারতবাসীর স্থগিত ভাবধারা এবং স্তম্ভিত চিন্তাস্রোতকে আবার গতিদান করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত উপাধি বিতরণ উপলক্ষে রেক্টর মহোদয় লর্ড রোণাল্ডসে ইউনিভারসিটী কর্ত্তৃক ভারতীয় দর্শনের বয়কট প্রসঙ্গে এরূপ কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, যাহাতে আমাদের হৃদয়ে কিছু আশার সঞ্চার হইয়াছে।

"Now let me touch on only one other feature which caused me some surprise. I have made some attempt when visiting the colleges of Bengal to ascertain which subjects are the most popular with the students. The result of such limited enquiries as I have been able to make seem to show that philosophy takes a high place in general favour. I am not surprised at that, for the genius of India has always lain in the direction of abstract speculation. What did surprise me was to learn that up to the B. A. degree Indian philosophy finds no place in the curriculum. It is Western philosophy only that is taught. And it is only those who proceed with their studies beyond the B. A. degree who receive at the hands of their University a draught from those springs of profound philosophic thought which have welled up in such rich measure from the intellectual soil of their own country. Frankly, that strikes me as a stupendous anomaly. * * * *

For him the study of the systems would surely be a task of love and burning interest—a study of things congenial to his national genius. Yet he may leave his own University after taking a course of philosophy as one of his subjects (and indeed if he pursues his studies no further than the B. A. degree will do so) without so much as hearing of these things. That an Indian student should pass through a course of philosophy at an Indian University without even hearing mention of shall I say Sankara, the thinker who perhaps has carried idealism farther than any other thinker of any other age or country or of the subtleties of the Nyaya system which has been handed down through immemorial ages and is today the pride and glory of the Tols of Navadwip does indeed appe-

ar to me to be a profound anomaly. I should have expected to find the deep thought of India, which has sprung from the genius of the people themselves, discussed and taught as the *normal course* in an Indian University; and the speculations and systems of other peoples from other lands introduced to the students at later stage after he has obtained a comprehensive view of the philosophic wisdom of his own country.

লর্ড রোণাল্ডসে যাহাকে stupendous anomaly বলিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বিরাট বেখাপ্পাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপুরুষদের চক্ষে এতদিন পড়ে নাই; একেই বলে চক্ষু থাকিতে অন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রেক্টর মহোদয়ের উক্তিতে উৎসাহিত হইয়া কেহ কেহ আশা করিতেছেন যে, হয় ত এবার একটা কিছু সদ্গতি হইবে। এই সকল উক্তি লক্ষ্য করিয়া ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় সেদিন কলিকাতার এক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ঐদিন বোধ হয় অদূরবর্ত্তী, যে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ভাবে ভাবিত হইবে এবং জাতীয় সৌরভে বাসিত হইবে। বিধাতা সে শুভ দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের কয়েকটি করণীয় আছে। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিগত অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে,—"বঙ্গের যে অশিক্ষিত জনরাশি, তাহাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যতদিন না করিতে পারিব ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" এরূপ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার বিবাদ মিটাইতে হইবে। আমরা "কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ-নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এরূপ বাঙ্গালা চাই না "আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম, ফাষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকান্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্টন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় "হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল" —এইরূপ ইঙ্গ-বঙ্গীয় ভাষাও আমরা চাই না। এবং "মোরা হলাম পল্লিবাসী, সারাখুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগেচি, নূন না থাকৃলে নূন চেয়ে আনচি, তেলপলাডা তেলপলাডাই আনলাম, ছেলেডা কান্তি নাগলো গুড় চেয়ে দেলাম ;– বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ থেয়ে মোরা আর ওনাদের খবর থাকিনে।"—সাহিত্যের জন্য এইরূপ গ্রাম্যভাষাও চাই না। আমরা চাই এমন ভাষা, যাহা সাধু হইবে অথচ সরল হইবে, চলিত হইবে অথচ ইতর হইবে না। এই মধ্যপথ অবলম্বন করিলে কিরূপ হয়? এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানে আমাদিগকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ রাখা ভাল। "দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে, অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে সকল কথা ভদ্রলোকের কাছে বলিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে।" আর এক জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন। "সাহিত্যের ভাষা যেন কথোপকথনের ভাষা হইতে এমন দূরে সড়িয়া না পড়ে যে সাহিত্যের সঙ্গে কথোপকথনের সম্পর্ক লোপ পায়। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষার যত নৈকট্য থাকে, যত ঘনিষ্ঠতা থাকে, ততই ভাল; দুইএর অন্তর যত অধিক হয় ততই মন্দ। বিচ্ছেদ হইলে কেহ কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না; একই ভাষা ক্রমে দুইটী পৃথক্ ভাষা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে কেবল যে ভাষার অনিষ্ট তাহা নহে, সমাজেরও বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা হয়।" ইন্দ্রনাথবাবুর শেষ কথাটা মনে রাখিবার কথা। শিক্ষা ও সাহিত্যকে যদি লোকায়ত্ত করিতে হয়, তবে লিখিত ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে একটা পদ্মার প্রবাহ সৃষ্টি করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাকল্ সাহেব অনেক দিন হইল, আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথার উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—"মহামতি বাকল্ ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণ দেশের শিক্ষাবিস্তার তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণদেশে সর্ব্ববিষয়ে অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে, জার্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক "পণ্ডিতী" ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ 'গণ্ডীর' মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতমস্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে একরূপ একটি অনতিক্রম্য প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিষয়ক সাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূল মর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের অত্যধিক প্রবল।"

সঙ্গে সঙ্গে টোলের প্রচলিত সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষার মিশ্রণ ও মিলন করিতে হইবে। সংস্কৃতশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী যে নবীন জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবেন, এবং গরীয়সী বঙ্গবাণীকে তাঁহাদের বিমাতা ভাবিয়া বিমুখ ভাব অবলম্বন করিবেন, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের কথা। আমরা জানি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সেদিনও বঙ্গভাষা যে ভাষাপদের বাচ্য নহে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য নব্য ন্যায়ের

পাঁয়তারা করিয়াছেন। কিন্তু এমন পণ্ডিতও বিরল নহেন, যিনি সংস্কৃত-ভারতীর সহিত মাতৃভাষারও পূজা করেন। আমরা চাই যে, টোলে সংস্কৃত-বিদ্যার্থীকে বাঙ্গালার সাহায্যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছু কিছু পড়ান হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের গদ্য-পদ্যের অমৃতধারায় অভিষিক্ত হন। সংস্কৃতই তাঁহাদের তপস্যার নিধি থাকুক, কিন্তু তাঁহারা যেন দেশমাতৃকার সেবা হইতে একেবারে বঞ্চিত না হন।

পরিভাষা-সঙ্কলন।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে নূতন শব্দ গড়িতে হইবে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্মিলন হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে কতক চেষ্টা ও আয়োজন হইয়াছে। সেই আয়োজন এখন সম্পূর্ণ করিবার সময় আসিয়াছে। দর্শনের পরিভাষা-সঙ্কলন সম্বন্ধে আমি বর্দ্ধমান-সম্মিলনে যাহা বলিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আপনাদের প্রণিধান প্রার্থনা করিতেছি। "যত দিন না বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য-দর্শনের পঠন পাঠন সাধিত হইবে, ততদিন প্রকৃত দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সজীব দর্শনচর্চ্চা দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করি-বেন। সেই সকলের মধ্যে যাহা যোগ্যতম, তাহাই টিকিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমা-দিগকে বহু আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শন-সাহিত্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সূচী সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহা একের সাধ্য নহে. সমবেত চেষ্টা এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় ভিন্ন এ কার্য্যে সফলতা হইবে না।"

দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। এইপ্রসঙ্গে আমা-দের লক্ষ্য করা উচিত যে, ইংরাজী শিক্ষিতেরা যখন প্রথম বাঙ্গালা লিখিতে শুরু করিলেন, তখন তাঁহারা সংস্কৃত দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, অলঙ্কারে, নীতি-শাস্ত্রে, কলা-শাস্ত্রে যে শব্দসম্পদ্ আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং তাহার সাহায্য না লইয়া মনগড়া কিম্ভূতকিমাকার অনেকগুলি শব্দ রচনা করিলেন। ঐ সকল শব্দ বাঙ্গালীর মুখেও নাই, এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং ঐ সব কষ্ট-কল্পিত বাক্যই এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিত হইয়াছে। ঘরে টাকা থাকিতে ধার করা যেমন আহাম্মকী, এও সেইরূপ আহাম্মকী—কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার উপায় নাই। এখন আমরা যে সকল পরিভাষা রচনা করিব তৎসম্বন্ধে যেন বাঙ্গালা ভাষার জাতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখি * এবং সংস্কৃত সাহিত্যের খনির মধ্যে যে সকল শব্দ-মণি প্রচ্ছন্ন আছে তাহার সন্ধান লই।

* শ্রীযুক্ত-প্রমথনাথ চৌধুরীর রাজসাহীতে পঠিত অভিভাষণ।

যশোলিপ্সা-সংযম।

এখনও দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নূতন আবিষ্কার নূতন গবেষণার ফল ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বিবৃত ও প্রচারিত করিলে শীঘ্র যশস্বী হওয়া যায়। এই ইংরাজীর দ্বারে যশের লোভ আমাদের সংবরণ করিতে হইবে। দেখুন, আমাদের মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম জীবনে ইংরাজীতে রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল রচনা আজ কোথায়? কোন্ বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। আমাদের যে কিছু প্রতিভা, যাহা কিছু আলোচন, অন্বেষণ, আবিষ্কার, সমস্তই বঙ্গবাণীর চরণ-সরোজে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে। এ সম্বন্ধে গত অধিবেশনে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ বলিয়াছিলেন।—"কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশঃ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গলার সম্পত্তি বাঙ্গলার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না।"

আমরা চাই যে, গীতাঞ্জলির মত, চিত্রার মত, বিষবৃক্ষের মত, আনন্দ-মঠের মত, কাব্য, নাটক বাঙ্গালা হইতে ভাষান্তরিত হইবে। আমরা আরও চাই যে, আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত মনীষিগণ তাঁহাদের মৌলিক চিন্তা, মৌলিক গবেষণা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিবেন, যেন বিদেশীয়েরা মধুলোলুপ-ভৃঙ্গের মত ঐ সকল অমূল্য বস্তুর আহরণের জন্য বাধ্য হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের তপোবনে সমিৎ-হস্তে উপসন্ন হয়।

উপসংহার।

বাঙ্গালী জাতির এমন দুর্দ্দশার দিন গিয়াছে, যখন বাঙ্গালা দেশনায়কদিগকে বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার দ্রোহ করিতে হইত। আমি এক জনের কথা জানি, যিনি বঙ্গজননীর কৃতী সুসন্তান ছিলেন অথচ ইংরেজমহলে পসারের জন্য তাঁহাকে বলিতে হইত যে, তিনি বাঙ্গালা জানেন না। কি শোচনীয় অবস্থা! অবশ্য যে সকল শাপভ্রষ্ট শ্বেতাঙ্গ বিধাতার ভৌগোলিক ভ্রান্তির ফলে আমাদের এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—

আমরা বাংলা গিয়াছি ভুলি, আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা, আর মুটেদের ডাকি কুলি—

যাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ অনেক দিন হইল বলিয়া গিয়াছেন, I read English, write English, talk English, speechify in English think in English, I dream in English,—বিধাতার আজব সৃষ্টি সেই সকল অদ্ভুত জীব দেশ হইতে বিলুপ্ত না হইলেও বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে যত্ন করা সময়ের অপব্যয়। কিন্তু আমরা—যাহারা বঙ্গবাণীর চিহ্নিত সেবক,আমরাও কি তাঁহার ভাবে মসগুল,বিভোর হইতে পারিয়াছি ? আমরা কি তাঁহার সেবায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারিয়াছি। এক কথায়, আমরা কি তাঁহাকে পরায়ণ করিতে পারিয়াছি ? এখনও আমাদের সাহিত্য হইতে বিলাতীর বোটকা গন্ধ গেল না। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের এক জন লেখক তাঁহার সহযোগীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ভাব ইংরাজীতে উদয় হয়, তত দিন যেন কেহ বাঙ্গালা লিখিতে না বসেন। বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন বাঙ্গালার ভাষা শিক্ষা করা হয়। এই অনুরোধ কি আমরা পালন করিয়াছি ? পালন না করার ফল কিরূপ হইয়াছে ? অনেক স্থলে বাঙ্গালার অর্থ করিতে হইলে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া তবে বুঝিতে হয়। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা মূঢ়ের মত মুক থাকিয়া অগত্যা অবশেষে লেখকের জয় জয়কার করেন। * এইরূপ অঘটন-ঘটন সম্পাদন করিয়া আমরা কখনই একটা বিশ্ববিজয়ী সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিব না। অথচ ঐরূপ সাহিত্য আমাদের গড়িয়া তুলিতেই হইবে নতুবা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সমস্ত উদ্যম পণ্ড হইবে এবং আমাদের ভাষার নিয়তি ব্যর্থ হইবে। তাহা আমরা কখনই হইতে দিব না।

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আমরা ইংরাজী অথবা হিন্দী কিংবা হয় ত উভয়েরই ব্যবহার করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও আমরা বাঙ্গলারই শরণাপন্ন হইব। ইংরাজী অথবা হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হয় হউক, কিন্তু আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাব অভাব, অনুসন্ধান, আবিষ্কার, আলোচনা, আন্দোলন, সমস্তই বাঙ্গালাতে প্রচার করিব। আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, উপকথা—সমস্তই বাঙ্গালাতে প্রকাশ করিব। যে ভাষার উৎপত্তি সরিদ্বরা গঙ্গার ন্যায় উত্তুঙ্গ, যাহার প্রবাহ যমুনার ন্যায় নির্ম্মল, যে ভাষায় চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে ভাষায় চৈতন্যদেব ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, যে ভাষায় কৃত্তিবাস কাশীদাস রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন, মুকুন্দরাম, ঘনরাম যে ভাষার পল্লীকবি, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কান্তকবি যাহার ধর্ম্ম-সঙ্গীত-রচয়িতা ; যে ভাষায় অবসাদ সময়েও ভারতচন্দ্রের মত কবি, দাশুরায়ের মত পাঁচালীকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; যে ভাষায় মধুসূদন কম্বুনাদে মেঘনাদ শুনাইয়াছেন, হেমচন্দ্র

* ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার।

উদাত্তস্বরে বৃত্রসংহার' গাহিয়াছেন, নবীনচন্দ্র . রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া কৃষ্ণলীলা ধ্যান করিয়াছেন ; যে ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আছে, রমেশ-চন্দ্রের 'শতবর্ষ' আছে, যে ভাষায় দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ-প্রসাদ নাট্যকবি ; যে ভাষায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার গদ্যকর্ত্তা ; কালী-প্রসন্ন,চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র গদ্যলেখক, যে ভাষায় হরপ্রসাদ, রজনীকান্ত, অক্ষয়কুমার, নগেন্দ্র-নাথ, দীনেশচন্দ্র ইতিহাস-রচয়িতা, যে ভাষায় কালীবর, দ্বিজেন্দ্রলাল, চন্দ্রকান্ত দর্শন রচনা করিয়াছেন, যে ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, শিশিরকুমার,বিজয়কৃষ্ণ,বিবেকা-নন্দ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অজেয় ও অমোঘ লেখনী চালনা করিয়াছেন—সেই ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। এমন মায়ের গৌরবে আমরা কে না গৌরবিত, এমন মায়ের মহিমায় আমরা কে না মহীয়ান্? যারা এমন মায়ের সন্তান, তারা অজর, অমর, অক্ষয়, তারা মৃত্যুঞ্জয়, তারা বিশ্বজয়ী। এমন মায়ের সেবায় কে না আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারে?

আসুন, আমাদের আরাধ্যা, হৃদয়ের রাণী, বঙ্গবাণীর জয়ধ্বনি করিয়া জীবন সার্থক করি—জয় বঙ্গবাণীর জয়!!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সুতরাং মনুস্মৃতির সিদ্ধান্ত অধিকাংশ পরস্পর বিরোধপূর্ণ। কিছু কিছু বিরোধপূর্ণ সিদ্ধান্তের উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সর্ব্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

মনু ১ম অঃ ২১।

ইহাতে বেদ শব্দ হইতে সমস্ত নাম ও কর্ম্মের সৃষ্টি বলা হইয়াছে। আবার পরে

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ম্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থ মৃগ্যজুঃ সামলক্ষণম্॥

ইহাতে অগ্নি বায়ু ও রবি হইতে বেদের সৃষ্টি লিখিত হইয়াছে। হয়ত অগ্নি বায়ু রবির নাম ও কর্ম্ম বেদ নহে। যেহেতু ইহারা বেদের পূর্ব্বে ছিলেন। যদি বা বেদ হইতেই অগ্নি, বায়ু, ও রবির নাম কর্ম্ম সৃষ্টি হইয়াছে তবে ইহারা বেদের পরে উদ্ভুত। ইহাদের দ্বারা বেদ সৃষ্টি হইতে পারে না।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

ইহাতে ব্রহ্মার মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। আবার পরে—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাংসবিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥
তপস্তপ্ত্বা সৃজদ্যাংস্তু স স্বয়ং পুরুষোবিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমঃ॥

মনু ১।৩১।৩২।৩৩

ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মা স্বদেহকে দ্বি-ভাগ করিয়া অর্দ্ধ দেহে পুরুষ ও অর্দ্ধ দেহে নারী হইলেন ও সেই নারীতে বিরাট্‌কে উৎপন্ন করিলেন। আর সেই বিরাট্ তপ করিয়া সমস্ত জগতের স্রষ্টা যে "আমি" তাহাকে উৎপন্ন করিলেন।

এখন বিচার্য্য এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিটী বর্ণ যখন পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছে, তখন মনু সর্ব্বজগতের স্রষ্টা কিরূপে হইলেন? যদি কেহ বলেন যে মনুষ্য-সৃষ্টির কর্ত্তাই মনু, মনুর পূর্ব্বে মনুষ্য ছিল না; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারা কি পূর্ব্বে মানুষ ছিলেন না? যদি তাহাই হয় তবে এখন

ইহারা মানুষ হইল কি করিয়া? আর এই চাতুর্ব্বর্ণ পূর্ব্বে অমানুষ হইয়াও যদি বর্ত্তমানে মানুষ হইয়াছেন, তবে উন্নতি ক্রমে না অবনতি ক্রমে? আর একটি সংশয় এই যে, চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টির পরে যখন ব্রহ্মা স্ত্রী-পুরুষরূপে রূপান্তরিত হইলেন, তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বের চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি কিমাকার ছিল? পুরুষ না নারী? না উভয় ভিন্ন?

ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবৎ গ্রাহয়ামাস মরিচ্যাদিনৃস্তহং মুনিন্।

মনু ১।৫৮

ইহাতে মনু বলিতেছেন যে ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে (মনুস্মৃতি) নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে বিধিবৎ পড়াইলেন। পরে আমি মরিচাদি মুনিগণকে পড়াইলাম। কিন্তু বর্ত্তমান স্মৃতিতে এইরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে ইহার নির্ম্মাণকাল অতি অর্ব্বাচীন কাল বোধ হয়।

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তা ধময়োনিজা সারঙ্গী মন্দপালেন।

মনু ৯।২৩

অর্থ—অক্ষমালা বশিষ্ঠের সহিত ও সারঙ্গী মন্দপালের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিল।

পৃথোরপীমাম্ পৃথিবীম্ ভার্য্যাম্ পূর্ব্ব বিদোবিদুঃ।

মনু ৯।৪৪

পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা এই পৃথিবীকে পৃথু রাজার ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করেন।

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মোবিগর্হিতঃ।
মনুষ্যানামপি প্রোক্তো বেনে রাজ্যম্ প্রশাসতি।
স মহীমখিলামভুঞ্জন্ রাজর্ষি প্রবরঃ পুরা
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতন।

মনু ৯।৬৬।৬৭

বিধবা স্ত্রীকে অন্য পুরুষে নিয়োগ করা পশুধর্ম্ম। এই পশু ধর্ম্মকে পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা নিন্দা করিয়া থাকেন। পুরাকালে বেন রাজার সময়ে এই পশুধর্ম্ম মনুষ্যদিগের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছিল। সেই রাজর্ষি-প্রবর সমস্ত পৃথিবীকে ভোগকরতঃ বর্ণের সঙ্কর করিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহার চিত্ত কামোপহত ছিল।

অজিগর্ত্তঃ সুতং হন্তুমুপাসর্পৎ বুভুক্ষিত।

অর্থ—বুভুক্ষিত অজিগর্ত্ত আপনার পুত্রকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

শ্বমাংসমিচ্ছয়া র্তোর্ত্তুং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ।
প্রাণাণাং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্॥

অর্থ—ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচক্ষণ বামদেব ঋষি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, প্রাণরক্ষার জন্ত কুকুরের মাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াও দোষে লিপ্ত হন নাই।

ভরদ্বাজঃ ক্ষুধার্ত্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধোস্তক্ষো মহাতপা॥

অর্থ—ভরদ্বাজ ঋষি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পুত্রের সহিত বিজন বনে বাসকরতঃ বৃধু নাম্ন তক্ষার কতকগুলি গাভী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্ষুধার্ত্তশ্চাত্তুমভ্যাগাৎ বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘ্নীং।
চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ॥

অর্থ—ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণ বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে কুকুরের জানুদেশ লইয়া খাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

এই সকল উল্লিখিত বচন দ্বারায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই "মনুস্মৃতি" সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই। কারণ ইহাতে অক্ষমালা ও বশিষ্ঠের বিবাহ, সারঙ্গী ও মন্দপালের বিবাহ, পৃথু রাজার কথা, বেন রাজার কথা, অজিগর্ত্ত, ভরদ্বাজ, বামদেব ও বিশ্বামিত্রের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহাদের আবির্ভাবের পরে গ্রন্থ রচনা না হইলে এই সকল ইতিহাস কিরূপে উদ্ধৃত করা হইল? এইরূপ অনেক পরস্পর বিরোধভাব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত মনুস্মৃতিতে দেখা যায়।

আর দেখুন—

দশসূনা সমং চক্রম্ দশচক্রসমোধ্বজঃ।
দশধ্বজ সমো বেশো দশবেশসমোনৃপঃ॥
দশ সূনা সহস্রানি যোবাতয়তি সৌনিকঃ।
তেন তুল্যঃ স্মৃতো রাজা ঘোরস্তস্য প্রতিগ্রহ॥

জীবহিংসা করিয়া যে জীবিকা করা হয় তাহার নাম সূনা। দশসূনার সমান একটি চক্র অর্থাৎ তেলি। ও দশ তেলির সমান একটি ধ্বজ অর্থাৎ মদ্যবিক্রয়ী। দশ ধ্বজের সমান একটি বেশ। আর দশ বেশের সমান একটি রাজা। ইহাতে দশ গুণ দশ গুণ করিয়া পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অর্থাৎ দশ হিংসা তুল্য চক্র। শত হিংসার তুল্য ধ্বজ। সহস্র হিংসার তুল্য বেশ। আর দশ সহস্র হিংসার তুল্য রাজা। ইহার উদ্দেশ্য এই যে প্রতিদিন দশ সহস্র জীব হিংসা করিয়া যে সৌনিক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহার প্রতিগ্রহ গ্রহণে যে পাপ হয়, রাজার প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিলেও তদ্রূপ পাপ হয়। ইহাতে রাজ-প্রতিগ্রহ নিতান্ত পাপ কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আবার অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে রাজার নিকটে ধন-গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে।

যাজতো ধনমন্বিচ্ছেৎ সংসিদন্ স্নাতকঃ ক্ষুধা।

স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধাতে পীড়িত হইয়া রাজার নিকটে ধন যাচ্ঞা করেন, এমন কি মনু-স্মৃতিতে যুক্তিবিরুদ্ধ অনেক কথাও দেখা যায়।

যন্তুং কর্ম্মণি যস্মিন্ স্নযুক্ত প্রথমম্ প্রভু।

সত্যাদেব স্বয়ং ভেজে স্বজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥

মনু ১।২৮

অর্থ—প্রভু প্রথম সৃষ্টি সময়ে যাহাকে যে কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন, সে বারংবার সৃষ্টি-তেও সৃষ্ট হইয়া সেই কর্ম্মকে ধারণ করিয়া থাকে। কি যুক্তিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত! যদি শ্রীভগবান্ কিংবা ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভেই জীবগণের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব বিধান করিয়া-ছেন, এবং সেই সেই স্বভাব যদি বারংবার তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে জীবের পাপপুণ্য কেন; এবং বিধাতা যাহা বিধান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহা মিটাইবার ক্ষুদ্র জীবের কি শক্তি? তাহা হইলে সমস্ত সাধন ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বৃথা!

এইরূপ অনেক পরস্পর বিরুদ্ধভাব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত ও অযৌক্তিক বিষয় সন্নিবেশিত থাকায় এরূপ অনুমিত হয় যে, এই মনুসংহিতা সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মার নির্ম্মিত আদি শাস্ত্র নহে।

মনু স্মৃতির টীকাকার মেধাতিথিও এই মতের পোষণ করেন।

মনুর্বহুভির্বহুঃ শাখাধ্যায়িভিঃ শিষ্যৈরন্যৈশ্চ শ্রোত্রিয়ৈঃ।

সঙ্গতস্তেভ্যঃ শাখাঃ শ্রুত্বা গ্রন্থং চকারতাশ্চ।

মূলত্বেন প্রদর্শ্য গ্রন্থং প্রমাণীকৃতবান্।

মেধাতিথি টীকা মনু ২।৬

অর্থ—মনু বহু শাখাধ্যায়ী বহু শিষ্যগণ ও অন্য শ্রোত্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের নিকটে বেদের শাখা সকল শ্রবণ করিয়া, এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন; ও সেই সকল মূল শাখা দেখাইয়া তাৎকালিক সমাজে এই গ্রন্থকে প্রমাণিত করিলেন।

আমরা যে সমস্ত বর্ত্তমান মনুস্মৃতির পূর্ব্বাপর বিরোধ দেখাইয়াছি, তাহার কারণ এইরূপ অনুমিত হয় যে, বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পণ্ডিতগণ মনুস্মৃতির নামে সংগীত বচন সকল সংগ্রহ করেন; ও পরে তাহা প্রকরণে প্রকরণে সন্নিবেশিত করা হয়। কিন্তু পরিহার-পূর্ব্বক সংশোধন করা হয় নাই।

যো যস্য মাংসমশ্নাতি সতন্মাংসাদ উচ্যতে।

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদঃ তস্মাৎ মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।

মনু ৫।১৬

অর্থ—যে যাহার মাংসাদ খায়, সে তাহার মাংসাদ হয়। যে মৎস্য খায় সে সর্ব্ব মাংসাদ হয়। এই জন্যই প্রবাদ আছে "মৎস্যানি সর্ব্বভক্ষাণি", সেই জন্য মৎস্যকে

বর্জ্জন করিবে। এ স্থানে মৎস্ত-ভক্ষণের প্রবল নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে ২০৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ধান, মৎস্ত, পয়, মাংস, শাক যে কেহ দিবে তাহারই নিকট লইবে। নিষেধ করিবে না।

ধানান্ মৎস্তান্ পয়ো মাংসং শাকং চৈব ন নির্ণুদেৎ।

ইহাতে মৎস্তকে জগন্নাথের প্রসাদের মতন সকলের কাছেই লইতে বলা হইয়াছে।

স্বহস্তায়াশ্চ যো ভুংক্তে সভুংক্তে পৃথিবীমলং।

ইহাতে কন্তার ধন গ্রহণ করা একান্ত নিষিদ্ধ। আবার

মাতামহমাতুলঞ্চ স্বস্রিয়ং শ্বশুরং গুরুং।
দৌহিত্রং বিটপতিং বন্ধুমৃত্বিগ্যাজ্যৌচ ভোজয়েৎ॥

মনু ৩।১৪৮

ইহাতে মাতামহ ও শ্বশুরকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান বিধান করা হইয়াছে। বলিতে পারা যায় না যে, মাতামহ ও শ্বশুর কন্তার অন্ন ভিন্ন দৌহিত্র বা জামাতার কি খাইবে? এইরূপ অনেক বিরোধ মনুস্মৃতিতে দেখা যায়। সে সকলের উল্লেখ করিলে আর এক খানি মনুস্মৃতির সমান গ্রন্থ হয়, সুতরাং দিগ্দর্শন মাত্র করা হইল।

সম্প্রতি বেদ হইতে যে সমস্ত বিরোধ উঠিয়াছে, তাহা দেখান হইবে।

অপএব সসর্জ্জাদৌ।

মনু ১।৮

ইহাতে ১ম জলের সৃষ্টি লেখা হইয়াছে। কিন্তু বেদে

আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ।
বায়োস্তেজঃ তেজস আপ।

ইহাতে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ ও তেজ হইতে জলের সৃষ্টি লিখিত হইয়াছে। ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত।

অগ্নিবায়ু-রবিভ্যস্তু এয়ং ব্রহ্ম সনাতনং
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধার্থমৃগ্যজুঃ শামলক্ষণং।

মনু ১।২৩

ইহাতে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে বেদের সৃষ্টি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বেদে

যোবৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবে বেদাংশ্চ প্রহি নোতি তস্মৈ

অর্থ—যে পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে বিধান করে ও যে ব্রহ্মাকে বেদ প্রেরণা করে, ইহাতে শ্রীভগবান্ হইতে বেদের সৃষ্টি লিখিত হইয়াছে।

বেদে লিখিত আছে যে, বশিষ্ঠ শাক্ত্যঃ অর্থাৎ শক্তির পুত্র ও ভৃগুবৈ বারুণিঃ। ভৃগুকে বরুণের পুত্র লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মনুস্মৃতিতে প্রথম অধ্যায় ৩৫শ শ্লোকে মনু বশিষ্ঠকে ও বরুণকে নিজ পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহাও বেদবিরুদ্ধ।

নো হ্যনা হিতাগ্নে র্ব্রতচর্য্যাস্তি মানষোহ্যেবৈষ
তাবৎ ভবতী যাবদনা হিতাগ্নি তস্মাদপি
কামমেব নক্তমশ্নীয়াৎ।

যজুর্ব্বেদ শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।৪।২

অর্থ—অনাহিতাগ্নি পুরুষের ব্রতচর্য্যা নাই। যেহেতু যে পর্য্যন্ত অগ্নি আধান করা হয় না, সে পর্য্যন্ত সে মানুষই থাকে। অতঃ রাত্রিতেও যথা কাম ভোজন করিতে পারে। কিন্তু মনু ইহার ঠিক বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন যে, অহিতাগ্নির ব্রত নাই।

ঋণানি ত্রিণ্যপা কৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ

মনু ৬।৩৫

অর্থ—তিন ঋণ নির্বৃত্ত করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে। স্মৃতিশাস্ত্রে তিনটি ঋণের কথা লেখা আছে। ইহা বেদবিরুদ্ধ। যেহেতু বেদে চারিটি ঋণের কথা বলা হইয়াছে।

ঋণম্ ইবে জায়তে যোস্তি সজায় মাস।
এব দেবেভ্যঃ ঋষিভ্যঃ পিতৃভ্যঃ মনুষ্যেভ্যঃ।

অর্থ—যে কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার চারিটি ঋণ হয়। দেবগণের একটি, ঋষিগণের একটি, পিতৃগণের একটি, মনুষ্যগণের একটি।

মনো হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয় সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাম্ পুত্রাপিতৃগণা স্মৃতাঃ॥
বিরাটসুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাম্ পিতরঃ স্মৃতা।
অগ্নিষাত্তাশ্চ দেবানাম্ মরীচালোকবিশ্রোতাঃ।
দৈত্যদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
সর্পাণাং কিন্নরানাঞ্চ স্মৃতাঃ বর্হিষদোত্রিজা।

মনু ৩।১৯৪।১৯৫।১৯৬

হিরণ্যগর্ভের পুত্র মনুর, যে মরীচ্যাদি ঋষিগণ পুত্র সকল আছেন, তাঁহাদের যে পুত্র তাহারই পিতৃগণ। বিরাটের পুত্র যে সোমসদ সাধ্যগণের 'পিতর'। আর মরীচির পুত্র, অগ্নিষাত্ত দেবগণের "পিতৃ"। আর অত্রির পুত্র বর্হিষদ, দৈত্য দানব দক্ষ যক্ষ গন্ধর্ব্ব উরগ রাক্ষস সুপর্ণ ও কিন্নরগণের 'পিতৃপুরুষ'। ইহাতে সোমসদ, অগ্নিষত্ত ও বর্হিষদ, পিতৃগণকে এক একটি ভিন্ন জাতির পিতৃপুরুষ বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইহা বেদ বিরুদ্ধ। বেদে ত্রিবিধ কর্ম্মকর্ত্তা মনুষ্যগণকেই এই ত্রিবিধ পিতৃরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। যাহারা সোম যজ্ঞ দ্বারা যাজন করেন, তাহারা মৃত্যুর পরে 'সোমসদ' বা সোমবন্ত বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। যাহারা পক্ক অন্নাদি দান করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পরে 'বর্হিষদ' নামে অভিহিত হন। আর যাহারা সোমযজ্ঞ করেন নাই ও পক্ক অন্নাদি দানও করেন নাই, কেবল জীবনের শেষে অগ্নি, দাহকরতঃ যাহাদিগকে আস্বাদন করে, তাহারা 'অগ্নিষাত্ত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তস্মে সোমে নেজানাঃ তে পিতরঃ সোমবন্তোথ
যে দত্তেন পক্কেন লোকং জয়ন্তি তে পিতর বর্হিষদোথ
যে ততো নাস্ততরর্চ্চন যামাগ্নিরেব দহন্
স্বদয়তি তে পিতরোগ্নিষাত্তা এত উতে যে পিতরঃ।

যজুর্ব্বেদ শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৬।৪।৭

কেবল কর্ম্মের অনুসারে মানবসকল মৃত্যুর পরে ত্রিবিধ পিতৃগণ নামে অভিহিত হন। ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। এইরূপ বেদবিরুদ্ধ বিষয় সকল দেখিয়াই বোধ হয় মীমাংসা দর্শন বার্ত্তিক এবং বেদান্তদর্শনসূত্রে স্মৃতিকে বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়। আমরা অন্যান্য দুই চারি গাণ্ডা পুঁথি স্মৃতিশাস্ত্রের কথা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করি নাই। কারণ স্মার্ত্তজগতে একটি পরিভাষা প্রচলিত আছে যে

'মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে'

অর্থাৎ মনুস্মৃতির বিরুদ্ধে যে স্মৃতি সকল তাহা...................(অপ্রমাণ) মনুস্মৃতি সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের চূড়ামণি, তাহাই যদি বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়, অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় স্মৃতিসকলের কথা কি ?

মনু স্মৃতির প্রাচীনত্ব ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে স্মার্ত্তজগতের আর দুইটি প্রবল যুক্তি আছে। কিন্তু বিচার করিলে সেই দুইটি কিছুই নয় প্রথমটি এই যে, রামায়ণ ও মহাভারতে মনু স্মৃতির বচন সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ও দ্বিতীয়টি এই যে, বেদে মনুস্মৃতির প্রামাণ্য সম্বন্ধে একটি বচন দেখা যায়। প্রথমে প্রথমে যুক্তির আলোচনা করা যাইতেছে।

বাল্মীক রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৮ শ্লোক ৩০।৩১।৩২

শ্রুয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চরিত্রবৎসলৌ
গৃহীতৌ ধর্ম্ম কুশলৈ স্ত............তৎ চরিতম্ ময়া
রাজভির্ধৃত দণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ
নির্ম্মলম্ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা।
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেন পাপাৎপ্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্ত তদবাপ্নোতি কিলবিশম্।

অর্থ—মনুর গীত চরিত্র বৎসল দুইটি শ্লোক আছে। যাহা ধর্ম্মকুশল লোককর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, আমিও তদ্রূপ আচরণ করিয়াছি। মানব সকল পাপকর্ম্ম করিয়া রাজা কর্ত্তৃক ধৃত দণ্ড হইয়া সুকৃতির ন্যায় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাজা যদি তাহাদিগকে শাসন করিয়া দেন কিংবা মুক্তিদান করেন, তাহা হইলেও স্তেন জন পাপ মুক্ত হয়। ও অপরাধীকে শাসন না করিলে সেই পাপ রাজা প্রাপ্ত হন। এই প্রমাণের দ্বারা অনেক লোকে বিশ্বাস করেন যে মনুস্মৃতি 'রামায়ণের অপেক্ষা প্রাচীন। এইরূপ মহাভারতে শান্তিপর্ব্ব অধ্যায়ে ৫৬তে মনুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মনুনা চৈব রাজেন্দ্র! গীতৌ শ্লোকৌ মহাত্মনা
অদ্ভ্যোগ্নিব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতং
তেষাং সর্ব্ব……তেজঃ স্বাসুয়োনিষু শাম্যতি।

অর্থ—হে রাজেন্দ্র এই দুইটি শ্লোক মহাত্মা মনুগান, জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও পাষাণ হইতে লৌহ উত্থিত হইয়াছে। অগ্নি ক্ষত্রিয় ও লোহের তেজ সর্ব্বত্র কাজ করিতে পারে কিন্তু ইহারা স্ব কারণে শক্তিশূন্য হয়। অর্থাৎ জলের দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, ব্রহ্মতেজের সম্মুখে ক্ষাত্রতেজ পরাভূত হয় ও পাষাণের উপর আঘাতে লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়। ইহাই মহাভারতে মনুস্মৃতির প্রামাণ্য এবং এতদিরিক্ত

"মনুনা বিহিতং শাস্ত্রং ধর্ম্মাত্মা মনুরব্রবীৎ।"

এইরূপে আরও দুই চারি স্থানে মনুর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বচনের দ্বারা মনুস্মৃতির কোনও প্রামাণ্য হয় না। কারণ প্রাচীনকালে ঋষিগণ ও পণ্ডিতগণ এক একটি শ্লোক রচনা করিতেন ও সেই শ্লোকটি সাধারণ লোকেরা কণ্ঠস্থ রাখিতেন।—অনুমান হয় যে, মহাত্মা মনু এইরূপ অনেকগুলি শ্লোক করিয়াছিলেন। তাহাই সেই সময় সাধারণ লোকেরা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। ইহাতে যে এই বর্ত্তমান মনুস্মৃতি হইতেই এই শ্লোক সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। যে হেতু এইরূপ প্রমাণ প্রাচীন ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী স্মৃতিরত্ন।
বৃন্দাবন।

অগ্নিমিত্রের ভাঁড়

রাজা দুষ্মন্তের ভাঁড়টি একটু বোকা বোকা, এ কথাটি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু অগ্নিমিত্রের ভাঁড়টি সেরূপ নহে, খুব চালাক, চটপটে; চালবাজ ও হুঁসিয়ার। একটা কথা পড়িলেই তাহা তলাইয়া দেখিতে পারে এবং আপনার কাজ কখন ছাড়ে না। আপনার কাজ অর্থাৎ রাজার কাজের জন্য সে সব করিতে পারে। একজনকে আজ রাণী করলে, কাল আবার তাঁকেই পায় ছানলে। ভাঁড়রা সব সময়েই রসিকতা করিবার অর্থাৎ লোককে হাঁসাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু এ বিদূষকটির কথা অনেক সময় খরধার বিদ্রূপে পূর্ণ; লোকের মর্ম্ম স্পর্শ করে। ব্যঙ্গ করা, বিদ্রূপ করা ও সেই সঙ্গে বেশ দু কথা শুনাইয়া দেওয়া, তাহার বেশ আসে কখন বাধে না।

রাণী ধারিনীর এক ভাই আছেন। তিনি জাতিতে রাণীর চেয়ে অনেক ছোট, সে কালে ত চারিবর্ণে বিবাহ ছিল। রাণীর বাপ চারবর্ণের বিবাহ করিয়াছিলেন। রাণীর মার চেয়ে ঐ ভাইটির মা জাতে খাট ছিল, সুতরাং তাঁর ছেলেও জাতে খাট হইয়াছে। সে ভাইটির নাম বীরসেন। তিনি ভগিনীপতির একজন সেনাপতি। তিনি একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে উদ্ধার করেন এবং মেয়েটি সুন্দরী ও শিল্পকার্য্যে দক্ষ দেখিয়া আপন ভগিনীকে উপহার দেন। রাণীর এক চাকরাণী নাচে ও গানে রাজাকে মুগ্ধ করিয়া রাণী হইয়া বসিয়াছে এবং বড়রাণীর উপর চালবাজী করিতেছে, এটা তাঁহার অসহ্য হইয়াছে। কিন্তু তিনি কিছুই করিয়াও উঠিতে পারিতেছেন না। নূতন মেয়েটি পাইয়া বড়রাণীর আশা হইল যে, সে ত সুন্দরী বটেই, তাহার উপর তাকে যদি নাচ গানে তৈয়ার করিয়া তোলা যায়, রাজা তাহাকে দেখিলেই মেজরাণীকে আপনা আপনি ত্যাগ করিবেন, বড়রাণীর একটি কণ্টক দূর হইবে। তাই তিনি একজন ওস্তাদ রাখিয়া নূতন দাসীটাকে নাচ গান শিখাইতেছেন। কিছুতেই তাহাকে রাজার কাছে যাইতে দেন না এবং যাহাতে রাজা নূতন দাসীর সেবা না পান, সে বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকেন।

কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। একদিন রাণী ছবির ঘরে দাঁড়াইয়া নূতন আঁকা একখানি ছবি দেখিতেছিলেন, এমন সময় রাজা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী আসিয়া রাজার সঙ্গে এক আসনে বসিলেন। রাজার নজর ঐ নূতন ছবিখানির উপর পড়িল। রাজা দেখিলেন, ছবিখানি রাণীর। কিন্তু তাহার সঙ্গে তাহার অনেক দাসী আছেন, আর তাহার মধ্যে রাণীর কাছেই যে বালিকা দাসীটী ছিল, তাহাকে দেখিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অপূর্ব্ব দাসীটি কে?"

রাণী সে কথায় কান দিলেন না। রাজা বারবার জিজ্ঞাসা করায় রাণীর ছোট্‌ট মেয়ে বসুলক্ষ্মী বলিয়া ফেলিল, "বাবা তুমি ওকে জান না, ও যে মালবিকা।" এই ঘটনার পর রাণী আরও সাবধান হইলেন এবং যাহাতে রাজা কিছুতেই মালবিকাকে দেখিতে না পান, তাহার বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাজাকে বিদূষকের শরণ লইতে হইল। সেও খুব মজবুত! মালবিকাকে রাজার কাছে আনাইবার এক অদ্ভুত উপায় বাহির করিল।

রাণী যে ওস্তাদকে দিয়া মালবিকাকে নাচগান শিখাইতেছিলেন, তাহার নাম গণদাস। বিদূষক গণদাসের কাছে গিয়া বলিল, "দেখ রাজার যে গানের ওস্তাদ আছেন তাহার নাম হরদত্ত। তাহার বড় অভিমান যে, নাচগান শিখাইতে তিনি অদ্বিতীয়; তিনি বলেন কি তা জানেন, যে গণদাস আমার পায়ের ধূলার সঙ্গে সমান নয়।" গণদাস এইকথা শুনিয়া বলিল, "হাঁ হাঁ, জানা আছে, আমার আর তাঁর তুলনাই হয় না। সমুদ্রের সঙ্গে কি ডোবার তুলনা হয়।" বিদূষক এ কথাটি হরদত্তের কাছে গিয়া শুনাইয়া দিল। এইরূপে দোলাগাগিরি করিয়া দুইজন ওস্তাদে বেশ ঝগড়া বাধাইয়া দিল। দুজনেই একদিন রাগে গর্‌গর্‌ করিয়া রাজার কাছে গিয়া নালিশবন্দী হইলেন। গণদাস বলিলেন, "হরদত্ত আমায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়াছেন।" হরদত্ত বলিল, "উনিই আগে করিয়াছেন, আমি কেবল জবাব দিয়াছি মাত্র।" দুজনেই বলিলেন, "আপনি আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া, আর আমাদের ওস্তাদী দেখিয়া, একটি বিচার করিয়া দিন।" রাজা বিদূষকের উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া কানে কানে তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। ওস্তাদজীদের বলিলেন, "আমি যদি একা বিচার করি, দেবী বলিতে পারেন পক্ষপাত হইয়াছে, অতএব তাঁহাকেও এখানে আনান হউক্‌।" এই বলিয়া দেবী ও পণ্ডিত কৌশিকীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। রাণী ঝগড়াটা মিটাইয়া দিবার খুব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সব চেষ্টা বিফল হইল। বিদূষক এমনি কলকাটি খাটাইয়াছে যে, রাণীর কোন মতলবই খাটিল না। তিনি প্রথম পণ্ডিত কৌশিকীকে বলিলেন, "আপনি এ ঝগড়াটা কেমন বুঝেন?" অর্থাৎ পণ্ডিত কৌশিকী বলুন যে, ঝগড়া কখনই ভাল নয়, ওটা থামাইয়া দেওয়াই ভাল। কৌশিকী কিন্তু সে দিক দিয়া গেলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার পক্ষ যে অসপত্ন হইবে, সে আশঙ্কা নাই। গণদাস খুব ওস্তাদ। এখানে মুখ না পাইয়া রাণী গণদাসকে যত থামাইতে চান, সে তত রাগিয়া উঠে; বলে, আপনি যদি আমার পরীক্ষা দিতে না দেন, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন বলিয়া মনে করিব।" সুতরাং রাণী হার মানিলেন। পণ্ডিত কৌশিকী মধ্যস্থ হইলেন। রাণী বলিলেন, "বেশ হইয়াছে তোমরা দুইজনেই তোমাদের ছাত্রীদের নাচ কৌশিকী ঠাকুরাণীকে দেখাও।" কৌশিকী বলিলেন, "তাও কি হয়,

আপনিও দেখিবেন, রাজাও দেখিবেন, একা কি বিচার হয়।" স্থির হইল,—প্রেক্ষাগৃহে ওস্তাদেরা উদ্যোগ করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইবেন, আর ইহাঁরা সকলে গিয়া সেখানে উপস্থিত হইবেন, সেইখানে গণদাসের শিষ্যা মালবিকা প্রথম নাচ দেখাইবেন, কেন না গণদাস বয়সে বড় সুতরাং তাঁহার পরীক্ষাই আগে হওয়া উচিত।

এই যে এতক্ষণ, বিদূষক কি চুপ করিয়া ছিলেন? না, তিনি ব্যঙ্গ করিয়া সকলকেই উস্কাইয়া দিতেছিলেন। রাজা যখন বলিলেন যে, রাণী ধারিণী ও পণ্ডিত কৌশিকীর সমক্ষেই বিচার হইবে, তখন গোতম বিদূষক বলিল, "ঠিক বলিয়াছ অর্থাৎ দেবী আসিয়া দেখুন, কেমন কলে তাঁহাকে ফেলিয়াছি, তাঁহার আর লুকাইবার জোটি নাই।" আবার যখন দেবী ও কৌশিকী আসিতেছিলেন, তখন বিদূষক কৌশিকীকে পীঠমর্দ্দ বলিয়া ঠাট্টা করিতেছিলেন। কামতন্ত্রে যাহারা সহায় হয়, তাহাদের পীঠমর্দ্দ বলে। বিদূষক বোধ হয় মনে করিতেন যে, কৌশিকীর সন্ন্যাসিনীর বেশটা ভণ্ডামী মাত্র। ওটা কেবল তাহার আসল কথাটা ঢাকিবার জন্য। তাই সে তাহাকে এরূপ কড়া ঠাট্টা করিয়া ফেলিল।

রাণী যখন বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, ইহাদের বিবাদটাই আমার ভাল লাগিতেছে না—তখন গণদাস একবার বলিয়া উঠিলেন, "আপনি মনেও করিবেন না যে, আমি হরদত্তের কাছে হারিয়া যাইব।" তখন বিদূষক বলিলেন, "দেবি, আমাদের একটু মেড়ার লড়াই দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, এতদিন বৃথা বেতন দেওয়া হইতেছে, একটু মজা দেখিব না?" দেবী বলিলেন, "তুমি বড় ঝগড়াটে।" গোতম বলিলেন, "এ কথাই নয়; দুটা মত্তহস্তী লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে, এদের একটা না হারিলে একেবারে রক্ষা নাই।" কৌশিকী যখন বলিলেন, "কোন ওস্তাদরা নিজে বেশ কর্ত্তোপ দেখাইতে পারেন, আবার কোনও ওস্তাদ সাকরেদ শিখাইতে দক্ষ বৃহস্পতি। যিনি দুই পারেন তিনিই ত বড় ওস্তাদ কি না?" বিদূষকের বড় স্ফূর্ত্তি, সে বলিল, "শুনিলে ইহার অর্থ, এই হইল যে, সাকরেদের নাচ দেখিয়া ও গান শুনিয়া মীমাংসা হইবে।" দেবী আবার যখন গণদাসকে ধমক দিয়া বলিলেন, "নিরর্থক কাজ লইয়া কেন গোল কর।" তখন গণদাসকে খেপাইবার জন্য বিদূষক বলিলেন, "আর ভাই গণদাস, চাকরী ত পাইয়াছ সরস্বতীর প্রসাদী মোয়াও খাইতেছ। ঝগড়া করিয়া কেন মুস্থ প্রাণ ব্যস্ত কর।"

দেবীর শেষ চেষ্টা—যখন রাজাই কৌশিকীকে মধ্যস্থ হইবার ব্যবস্থা করিলেন, তখন কৌশিকী একলাই সাকরেদদের গান শুনুন। তাহাতে কৌশিকী বলিলেন, "তাও কি হয়, সর্ব্বজ্ঞ হলেও একলার কথায় লোকের আস্থা হয় না।" তখন রাণী বুঝিলেন, এ সন্ন্যাসিনীও ঐদিকে অর্থাৎ রাজা যাহাতে মালবিকাকে দেখিতে পান সেই দিকে তাঁহারও চেষ্টা; তাই তিনি বিরক্ত হইয়া মুখ বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইলেন।

রাজা কৌশিকীকে রাণীর ভাব দেখিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কৌশিকী রাণীর রাগের আসল কথা বুঝিতে পারিয়াও বলিলেন, "রাজার উপর আপনি বিরক্ত হইলেন কেন? এ বিরক্তির ত কোন কারণ নাই।" বিদূষক তখন বলিল, "আছে বই কি? আপনার লোকের মান ত রাখিতে হইবে; ওহে গণদাস, তুমি বাঁচিলে; রাগের ছলে রাণী তোমায় উদ্ধার করিয়া দিলেন।" যখন সব ঠিক হইয়া গেল, তখন বিদূষকই বলিয়া দিল, "তোমরা দুই পক্ষই রঙ্গমঞ্চে গিয়া সব উদ্যোগ করিয়া লও, তারপর আমাদের খবর পাঠাইও, অথবা মৃদঙ্গ শব্দ শুনিলেই আমরা যাইব।" রাজা যখন মৃদঙ্গ শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি যাইতেছেন, তখন বিদূষক তাঁহাকে চুপি চুপি সাবধান করিয়া দিল, বলিল, "আস্তে আস্তে যাও, রাণী কাছে আছেন, একটা গোল বাধাইয়া ফেলিবেন।"

এইখানে বিদূষকের প্রথম কীর্ত্তি শেষ হইল। রাণী অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালবিকাকে রাজার সম্মুখে বাহির করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার কোন কৌশলই খাটিল না। তিনি যেন ইঁদুর কলে পড়িলেন। এ সবই গোতমের চালাকি?

নাচ দেখাইয়াই ত মালবিকা চলিয়া যান, বিদূষকই তাঁহাকে থামাইয়া বলিল, "আমার একটা কথা আছে, উত্তর দিয়া যাও।" থামাইয়া রাজাকে মালবিকার স্থির-মূর্ত্তি দেখাইল। আবার যখন "কি তোমার কথা" জিজ্ঞাসা করা হইল, সে তখন বলিল, "কথাটা আর কিছু নয়, প্রথম নাচটা দেখাইলে তাহার আগে ব্রাহ্মণের পূজাটা করিলে না।" শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল,-মালবিকাও হাসিল। রাজা মালবিকার হাসিমুখও দেখিলেন। বিদূষক দেখিল, রাজার কাজ হাঁসিল, আর কেন। সে বলিয়া উঠিল, "আহারের কোনও উদ্যোগ হইল না। আমি অবোধ চাতক, শুকনা মেঘের কাছে জল চাহিলাম, পাইলাম না। অথবা আমরা মূর্খ লোক, পণ্ডিতের কথাই বিশ্বাস করিয়া যাইতে হয়। তাই যাই, তবে এ বেচারা ত বেশ গেয়েছে একে ত কিছু বকসিস্ দিতে হয়, এই দিই।" বলিয়া রাজার হাতের বালা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। রাণী ভারি চটিয়া গেলেন বলিলেন, "আর একজন পরীক্ষার্থী আছে, তাহার গুণাগুণ না জানিয়াই যে একজনকে বকসিস্ দিতে যাইতেছ।" "তা কি জানেন রাণী, পরের জিনিস কি না, তাই দিতে গিয়াছিলাম।" মালবিকা ত নাচঘর থেকে চলে গেলেন। বিদূষক রাজাকে বলিল "আমার বুদ্ধি-বিদ্যার দৌড় এই পর্য্যন্ত।" "না হে, না, এইখানে শেষ হলে চলিবে কেন? সে যে চলে গেল আমার যে ধৈর্য্য থাকে না—" "তোমার দেখ্‌চি দশা খারাপ, যেমন দরিদ্র রোগী বৈদ্যের কাছে ভাল ঔষধ চায় তোমারও তাই।"

রাজা হরদত্তের সাকৃরেদের গান শুনিতে যাইতেছেন,—এমন সময়ে বৈতালিকেরা গান ধরিয়া উঠিল, বেলা দুই প্রহর হইয়াছে গান শুনিয়াই বিদূষক বলিয়া উঠিল,

"আর কি আমাদের ভোজন বেলা, অবেলায় খাইলে অনেক অসুখ হয়। সকলে চলিয়া গেলে, রাজা মালবিকার রূপ ও গুণের প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন, "একে ত সুন্দরী তার পর এত গুণ, এ যে দেখ্‌চি শুধু মদনের বাণ নয়, তাতে বিষ মাখান। যাহোক ভাই, আমার ভাবনাটা ভেবো।" "তুমিও আমার ভাবনাটা ভেবো। আমার পেটটা, দোকানের তুন্দুলের মত ভেতরে ভেতরে পুড়ে যাচ্ছে।"

"তুমি আমার কাজ একটু শীঘ্র কর।"

"সেত বুঝলুম, কিন্তু জ্যোৎস্না যেমন মেঘে ঢাকা পড়ে তেমনি রাণী তাকে ঢেকে রাখবে। আর তুমি কি? তুমি মাংসের দোকানের গিধিনীর মত, এ দিকে মাংসের জন্ত মরিতেছে, অপরদিকে ভয়ও খাইতেছ। এখন ভরসা করে কাজে লাগ।"

গোতম ঠাকুরের দ্বিতীয় কীর্ত্তিটী অদ্ভুত। তিনি দেখিলেন, বড় রাণী সুস্থ শরীরে থাকিলে ও সকল জায়গায় যাইতে আসিতে পারিলে, রাজার সঙ্গে মালবিকার মিলন দুষ্কর হইয়া পড়িবে। তাই রাণীকে শয্যাধরা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুবিধাও হইল। বসন্তকাল দোলায় চড়ার ধুম পড়িয়া গেল। আমরা এখন দেখি যে বসন্তে কেবল রাধা আর কৃষ্ণই দোল খান। তখন কিন্তু বসন্তে সকলেই দোল খেত। বড় রাণীও দোল খেতেন। বিদূষক একদিন চালাকী করে বড় রাণীকে দোলা থেকে ফেলে দিল; পড়িয়া রাণীর পায়ে ব্যথা লাগিল। তিনি শয্যাধরা হইয়া রহিলেন, বিদূষকের দূতীগিরিতে অনেক সুবিধা হইল।

এখন রাণীর একটী বড় পিয়ারের অশোক গাছ ছিল। মালিনী আসিয়া বলিয়া গেল যে, সেটীর ফুল ধরিতে দেরী হইতেছে। তাহার 'দোহদ' করা দরকার। যে কার্য্যের দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র ফল ফুল হয় তাহার নাম দোহদ। সার দেওয়া একটা দোহদ। কিন্তু অশোকের দোহদ আর একরূপ। কোন পরমাসুন্দরী যদি পায়ে আল্‌তা এবং নূপুর দিয়া আর অশোকের কচিপাতা কানে দুলাইয়া দিয়া বাঁ পায়ে অশোককে লাথি মারে, তবে তাহার ফুল হয়। মালিনী অশোক গাছে দোহদের কথা বলিলে, রাণী বড় বিপদে পড়িলেন। এ সকল কাজ ত তাঁহারই একচেটিয়া কিন্তু তাঁহার ত পায়ে ব্যথা তিনি ত যাইতে পারিবেন না। কাকে পাঠান যায়? ওস্তাদজীদের ঝগড়ায় মালবিকার জন্তই রাণীর পক্ষ জয়লাভ করিয়াছে, সুতরাং মালবিকাকে কিছু বক্‌সীস দেওয়া চাই। রাণী বলিলেন, "আচ্ছা বেশ মালবিকা, আমার পায় ব্যথা, আমি পারিব না, তুমি যাও অশোকের দোহদ করিয়া আইস। যদি পাঁচদিনের মধ্যে অশোকের ফুল ফোটে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" মালবিকার কি মনোবাঞ্ছা রাণী তাহার কি জানেন না জানেন সে কথায় এখন আমাদের কাজ নাই। আমরা গোতমের কথা কহিতে আসিয়াছি, তাই কহিয়া যাই।

রাজা ত অধীর, দেরী সয় না, গোতমকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, বিদূষকও রাজার ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া আর এক কীর্ত্তি করিয়া বসিল। সে মালবিকার সখী বকুলাবলীকে দূতীগিরিতে লাগাইয়া দিল। তাহাকে খুলিয়া বলিল, "রাজার এই অবস্থা, তুমি মিলাইয়া দাও।" সে বলিল, "দেবী অতি সাবধানে মালবিকাকে লুকাইয়া রাখিতেছেন, ব্যাপার সহজ নহে তথাপি আমি যেরূপে পারি ঘটাইয়া দিব।"

ইরাবতী রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, প্রমোদবনে রাজার সঙ্গে দোলায় চড়িবেন। রাজার যাইবার ইচ্ছা নাই। বিদূষক বলিলেন, "তাও কি হয়, তোমার মনে যাই থাক সকলের মন রাখিয়া চলিতে হইবে।" রাজা প্রমোদবনে চলিলেন। গোতম মূর্খ হইলেও বেশ সমজদার লোক। বসন্তের শোভায় সে উন্মত্ত হইল ও রাজাকে বসন্তের শোভা দেখাইয়া তাঁহার মনের যাহাতে তৃপ্তি হয় করিতে লাগিল। কালিদাসের প্রথমকার লেখার স্বভাবের শোভাই বড়, স্ত্রীলোকের শোভা তাহার কাছে লাগে না, এখানেও তাই। রাজা ও গোতম দুজনেই বসন্তলক্ষ্মীর সহিত যুবতীগণের তুলনা করিতেছেন এবং তুলনায় বসন্ত-শোভাই বাড়িয়া যাইতেছে।

এমন সময়ে বড় রাণীর চেলী পরিয়া, নানা অলঙ্কারভূষিতা হইয়া, মালবিকা আসিয়া সেই অশোক গাছের তলায় একখানা বড় পাথরের উপর বসিল। গোতম বলিল, "মাতালের কাছে মিছরির চাট আসিয়া জুটিল।" রাজা বলিলেন "কি? কি?" গোতম বলিল, "আবার কি? মালবিকা একা, বড় উৎকণ্ঠিতা।" রাজা "কোথায়, কোথায়" "গাছের আড়াল থেকে এই দিকেই আসিতেছে, উহাকেও বোধ হয় তোমার রোগে ধরিয়াছে, 'উৎকণ্ঠিত উৎকণ্ঠিত' বলিতেছে।" রাজা—"ও কিসের উৎকণ্ঠা কে জানে?" গোতম—"দূরে যেন ইরাবতী আসিতেছে।" রাজা—"আসুক, হাতী যখন পদ্মবনে পশে তখন কি হাঙ্গরের ভয় করে?"

এমন সময়ে বকুলাবলী পায়ের গহনা লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বকুলাবলীর সঙ্গে মালবিকার যে কথাবার্ত্তা হইল, রাজা ও গোতম দুজনেই সে কথা শুনিতে পাইলেন। মালবিকা স্বীকার করিল যে, রাজার জন্য সে তাহার মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। বকুলাবলীও বেশ দূতীগিরি করিয়া উহার মনস্থির করিয়া দিল, মালবিকার এক পায়ে আলতা দেওয়া হইল, নূপুর দেওয়া হইল। রাজা গোতমকে বলিলেন, "এ পায়ের লাথী খাবার যোগ্য ব্যক্তি কে কে? হয় অশোক, না হয় আমি।" গোতম জবাব দিল, "অপরাধ হইলেই তোমায়ও প্রহার খাইতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "আহা, ব্রাহ্মণের বাণী কবে সফল হবে?"

আবার যখন বকুলাবলী আলতাপরা পা খানি মালবিকাকে দেখাইয়া বলিল, "এ পা তোমার মনে ধরে?" তখন মালবিকা জিজ্ঞাসা করিল, "এ বিদ্যা তুমি কোথায় শিখিলে?"

সে বলিল, "রাজা এতে আমার গুরু।" তখন গোতম বলিল, "আর কি এখন যাও গুরুদক্ষিণাটা আদায় করিয়া লইয়া আইস।"

অশোক-গাছে লাথী মারা হইলে পর, রাজা ও গোতম হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইল। গোতম বলিল, "করলে কি, অশোকটী রাজার প্রিয়বয়স্ত, উহাকে লাথি মারিলে? বকুলাবলী তুই ত সব জানতিস্, তুই কেন এমন অন্যায় কাজটা বন্ধ করিয়া দিলি না?" বকুলাবলী বলিল, "আমরা কি করিব, দেবী হুকুম দিয়াছেন, আর আমরা করিয়াছি। আমাদের কোনই দোষ নাই।"

এই মহাসুখের মিলনের সময়েই যখন রাজা মালবিকাকে বলিতেছেন, "তুমি অশোকের দোহদটা ত পূরণ করিলে, আমার আর ধৈর্য্য নাই, আমার মনোবাঞ্ছাটী পূর্ণ কর।" এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে ইরাবতী তথায় উপস্থিত—মালবিকা ও তাহার সখী ত তখনই চম্পট। রাজা গোতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায়।" গোতম বলিল, "যখন চোরকে হাতে হাতে ধরে তখনও সে বলে, আমি সিঁধকাটা অভ্যাস করিতেছি।" রাজা তখন ইরাবতীকে বলিলেন, "তোমার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম। মাঝে মালবিকা এল, ওর সঙ্গে দুটী কথা কহিতেছিলাম।" ইরাবতী মর্ম্মান্তিক দুঃখে কাতর হইয়া বলিল, "এমন দুটী কথা কবেন যদি জানিতাম, আমি এ কাজ করিতাম না।" পাষণ্ড গোতম সে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া বলিল, "তা রাজার ত সকলেই সমান, রাণীর দাসীদের সঙ্গে কথা কহাও কি অপরাধ হইল? এই তোমার ব্যাপার লইয়াই বোঝ না কেন?" অর্থাৎ তুমি ত রাণীর দাসী ছিলে, তোমার সঙ্গেও এইরূপ কথাবার্ত্তা তখন হইত, সেটা কি দোষের হইত? ইরাবতী বলিলেন, "তা হোক না, কথাবার্ত্তাই হোক্। আমি আর কেন ক্লেশ পাই।" এই বলিয়া চলিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু মদের ঝোঁকে পারিল না, কোমরের চন্দ্রহার গাছটা পায়ে জড়াইতে লাগিল। যাহা হউক ইরাবতীর যখন রাজা পায়ে পড়িলেও মান ভাঙ্গিল না ও সে রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেল, তখন গোতম বলিলেন, "আর কি এখন ওঠ। ইরাবতী তোমার উপর খুব খুসী। এত অপরাধের পর সে যে গেছে, এই আমাদের ভাগ্য; এখন এস আমরা পালাই, নইলে মঙ্গলগ্রহের মত আবার বেঁকে রাশির মধ্যে ঢুকিবে।"

গোতমের চতুর্থ কীর্ত্তি আরও চমৎকার। ইরাবতী গিয়া বড়রাণীর কাছে সব কথা বলে দিল। রাণী মালখানায় মালবিকা ও বকুলাবলীকে আটকাইয়া রাখিলেন। সেখানে ত যথেষ্ট পাহারা। তার উপর রাণীর এক দাসী মাধবিকা বেশীর ভাগ সেখানে পাহারা দিতে লাগিল। রাণী তাহাকে বলিয়া দিলেন, "আমার আঙ্টী না দেখিয়া তাহাদের কাহাকেও ছাড়িবে না।" এই সব কথা শুনিয়া গোতম এক মায়াজাল বিস্তার করিয়া বলিল, "মহারাজ বড়রাণীর অসুখ হইয়াছে, চলুন আমরা দেখিতে যাই। আপনি

আগেই যান, আমি একটু পরেই যাইতেছি। শুধুহাতে ত রাজারাজড়ার সঙ্গে দেখা করিতে নাই, তাই আমি একটা ফল কি ফুল, বাগান থেকে নিয়ে আসি।" রাজা গিয়া বড়রাণীর সঙ্গে আত্মীয়তা আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে গোতম কেয়াপাতার কাঁটা ছুটা বুড়া আঙ্গুলে ফুটাইয়া, বুড়া আঙ্গুলটার গোড়ায় পৈতা জড়াইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। কি ব্যাপার? "রাণীর জন্য একটা ফুল হাতে করে আনিব, তাই এক থোলো অশোকের ফুল তুলিতে গিয়াছিলাম, আর কোটরের ভিতর থেকে একটা সাপ এসে আমায় কামড়াইয়া দিল। সে সাপ নয়, সে সাক্ষাৎ কাল! আমার আর নিস্তার নাই। ভাই আমি ছেলে বেলা থেকে তোমার বয়স্য। আমার থাক্‌বার মধ্যে এক মা আছেন, তুমি ভাই তাঁকে খেতে পর্‌তে দিও।" বলিয়াই বেচারা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল; আশীবিষের বেগে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। রাণী বলিলেন, "আহা আমার জন্য বেচারার এই দশা।" রাজা বলিলেন, "ভয় নাই—ভয় নাই, ধ্রুবসিদ্ধি আছেন, তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি আসিয়া বিষ ঝাড়িয়া দিবেন।" "ওরে কে আছে, ডাক ধ্রুবসিদ্ধিকে?" সে বলিল, "গিয়াছিলাম, ধ্রুবসিদ্ধি আসিল না; বলিল, গোতমকে এইখানে লইয়া আইস।" সুতরাং দুই তিন জনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ধ্রুবসিদ্ধি বলিলেন,—ব্যাপার কিছু কঠিন। জলের কলসীতে সর্পমুদ্রা দিতে হইবে, অতএব একটি সর্পমুদ্রা খুঁজিয়া আন।" রাণী—"আহা হা! তা হোলেই ব্রাহ্মণ বাঁচে, তা এই নাও সর্পমুদ্রা-ওয়ালা আংটী। ওটা আমার হাতেই ফিরাইয়া দিও।" এই আঙটী পাবার জন্যই গোতমের এত ফাঁদ পাতা। আঙটি পেয়েই সে মালখানায় পঁহুছিল। মাধবিকাকে আঙটী দেখাইল। মাধবিকা ত আঙটী দেখাইলেই মালবিকা ও বকুলবালিকাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। তথাপি সে অনেক জেরা করিল। গোতম বলিল, "রাণী ত আর নিজের ইচ্ছায় এদের আটকান নাই, ইরাবতীর মান রাখিবার জন্যই এ কাজ। তা এখন একজন গণক বলিয়াছেন যে, রাজার নক্ষত্র বড় খারাপ, এখন সকল বন্দীকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। তা রাজার হুকুম রাণি কি করিবেন, তাই আঙটী দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

যেমন ছাড়া পাওয়া, আর গোতম ওদের দুজনকে সমুদ্রঘরে লইয়া গেল। একটা ছুতা করিয়া রাজাকে রাণীর রোগমন্দির হইতে ডাকিয়া আনিয়া সমুদ্রঘরে পঁহুছাইয়া দিল। সমুদ্রঘরে আসিবার সময় দূরে দেখা গেল, রাণীর চন্দ্রিকা নামে এক দাসী আসিতেছে। রাজা অমনি পাশ কাটাইলেন। গোতম বলিল, "চোর আর কামুক দুজনে চন্দ্রিকার হাত এড়াইতে চেষ্টা করে।" ইহার পর সে নিজে দরজায় পাহারা রহিল। সেখানে ফটিকের থামে মাথা দিবামাত্র বেচারার ঘুম আসিল, বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইতে লাগিল।

গোতম ঘুমাইতেছে, এমন সময় ইরাবতী ও নিপুণিকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রিকা তাহাদের বলিয়া দিয়াছে যে, গোতম ঐখানে আছে। গোতমকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া নিপুণিকা বলিল, "বাজারের বলদের মত গোতম বসেই ঘুমুচ্ছে। মুখখানি বেশ প্রসন্ন, বোধ হয় বিষবিকার একেবারেই নাই।" এমন সময়ে গোতম স্বপ্নে বলিয়া উঠিল, "ভবতি মালবিকে ইবাবতীকে ছাড়াইয়া উঠ।" শুনিয়া তারা দুজনেই চটিয়া গেল। নিপুণিকা বলিল, "দেখুন চিরদিন আপনার স্বস্তিকরণের মোয়াখোর, এখন কি না মালবিকাকে স্বপ্নে দেখিতেছে। আচ্ছা, ওকে জব্দ করচি। সাপকে ও বড় ভয় করে, তাই বাঁকা লাঠী গাছটা উহার গায়ে ফেলিয়া দিই।" যেমন লাঠী গায়ে ফেলিয়া দেওয়া, আর সে সাপ সাপ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে যে পাহারা দিতেছিল, সে সব বিগড়িয়া গেল; রাজা বাহির হইয়া পড়িলেন, মালবিকা দেখা দিলেন, বকুলাবলী দেখা দিলেন। ইরাবতীর সঙ্গে রাজার বেশ একটু টগুাই হইয়া গেল। ইরাবতী আরও জানিতে পারিলেন যে, বড় রাণীকে ফাঁকি দিয়া গোতমই এ সব যোগাযোগ করিয়াছে। গোতম তখন মালবিকার ভাবনায় অস্থির। মনে করিতেছে, কি সর্ব্বনাশ! বাঁধন কাটাইয়া পায়রা কি না বিড়ালের মুখে পড়িল। এমন সময়ে ইরাবতী বলিল,—"তবে রা বামনা, এসব তোমারই নীতি?" সে বলিল, "আমি যদি নীতির এক বর্ণও পড়িতাম, তাহা হইলে রাজাকে আমি চালাইয়া লইয়া বেড়াইতাম।" এমন সময়ে একজন খবর আনিল যে, একটা পিঙ্গলবাসা রাজকন্যা বসু-লক্ষ্মীকে বড় ভয় দেখাইয়াছে এবং সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। শুনিয়া সকলেই সেইদিকে চলিল, গোতম বলিয়া উঠিল, "বাহবা রে বানর, তুমি আপনার দলের লোক-টাকে খুব উদ্ধার করিলে!"

গোতমের লেখাপড়া ভাল থাকুক আর নাই থাকুক, সে ভদ্রবংশের ছেলে; তাহার সামাজিকতা বেশ ছিল সে স্বভাবের শোভা বেশ বুঝিত। তাহার মত সমজদার অতি অল্পই পাওয়া যায়। সে রাজাকে বলিয়া দিল, "আজ তোমার নিমন্ত্রণ, সেই অশোক গাছের তলায়। পাঁচদিন না যাইতেই তাহার কি চমৎকার ফুল ফুটিয়াছে, যেন হঠাৎ তার ভরা যৌবন আসিয়াছে,আর সে যেন যৌবনে ঢলঢল করিতেছে। সেখানে মালবিকাও আসিতেছে। কৌশিকীকে রাণী বলিয়াছেন, "তুমি ভারী গুমর কর যে, তুমি বিয়ের ক'নে খুব সাজাতে পার, আচ্ছা বিদর্ভ দেশের ক'নের মত তাহাকে আজ সাজাও দেখি। এ সব দেখে শুনে বোধ হয় আজ বা তোমার কপাল ফেরে।" শেষে যখন সব প্রকাশ পাইল, মালবিকা বিদর্ভের রাজার মেয়ে আর কৌশিকী সেখানকার রাজ-মন্ত্রীর ভগিনী, তখন রাণী বিশেষ আদর করিয়া মালবিকার হাত ধরিয়া রাজার হাতে সঁপিয়া দিতে গেলেন। রাজা একটু লজ্জিত হইলেন। রাণী বলিলেন, "এ কি মহারাজ,

আমার প্রার্থনা আপনি পূরণ করিবেন না।" তখন বিদূষক বলিলেন, "রাণী রাগ করিবেন না, লোক-ব্যবহার এই যে, নব্য বর একটু লজ্জাতুর হয়।" রাজা বিদূষকের দিকে চাহিলেন। বিদূষক বলিলেন, "ইহাঁকে দেবী বলিয়া রাজার হাতে দিলে তিনি লইবেন।" রাণী বলিলেন, "উহার যে বংশমর্য্যাদা তাহাতেই উহাকে দেবী বলিতে হইবে। আমি আবার নূতন করিয়া দেবী বলিব কি?" তাহার পর দেবী যখন ভাল রেশমী কাপড়ের ঘোমটা দিয়া মালবিকাকে রাজার হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন, তখন বিদূষক বলিল, "আহা দেবী আমাদের বড়ই অনুকূল" এই পর্য্যন্ত বিদূষকের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক। ইহা ইহাতেই বিদূষকের চরিত্র বেশ বুঝা যায়; সে যে খুব চালাক চটপটে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু সে যে বেইমান। সে যাহার খায় তাহারও খাতির রাখে না। রাণী ও ইরাবতী তাহাকে কতই খাওয়াইয়াছেন পরাইয়াছেন, কিন্তু আপনার কাজের সময় সে কাহারও এক পয়সার খাতির রাখে নাই। কটকট করিয়া কটু কথা শুনাইয়া দিয়াছে। ইরাবতী যখন সব অন্ধকার দেখিতেছে, তখনই সে যে এককালে দাসী ছিল, সে কথাটা মনে করাইয়া দেওয়াটা কি বেইমানের কাজ নয়? শুধু কি তাই, সে স্বপ্নেও মালবিকা দেখিতেছে, আর ইরাবতীর অমঙ্গল চিন্তা করিতেছে। রাণী ধারিণীর এত খাইয়াও তাহার দেবী শব্দটা কাড়িয়া লইয়া মালবিকাকে দেওয়া, এসব কি কম বেইমানী! কিন্তু একটা কথা ঠিক। সে রাজার খায় রাজার গায়। ধারিণী ইরাবতী, রাজা তাহাকে ভালবাসেন বলিয়াই তাহার খাতির করেন, নইলে করিতেন না। সে তাহা বেশ জানে। সে আলুরও চাকর নয়, বেগুনেরও চাকর নয়, সে রাজার চাকর, রাজার যাতে ভাল হয়, তাই করে। এতে কেহ তাহাকে বেইমান বল নাচার।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কমলের দুঃখ

(মায়া—কমল)

আজ তোমারে প্রণয় বিষের দাহনের কথা বল্‌তে আসি নি ; আজ তোমার কাছে প্রেমের অভিসারিকা হয়ে আসি নি ; আজ এ নববসন্তের বকুলসুবাসে, কোকিলের কুহরে, আম্রমুকুলের গন্ধে, তোমায় জাগাতে আসি নি ; ভোলা কথা, ছেঁড়াফুলের ভালবাসা—যা হাওয়ায় ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছ, তা কুড়িয়ে গাঁথতে আসি নি ; বসন্তের কিসলয়ের উপর পূর্ণিমার হাসিতে নূপুরগুঞ্জন শুনাতে আসি নি ; যে পঞ্চবাণ সহস্র সহস্র হ'য়ে রন্ধ্রভেদ করেছে—তার খবর দিতে আসি নি ; যে গৃহে দীপ জ্বেলে সে ঘর ভেঙেছে, তার কথা সুধাতে আসি নি ; মলয় হাওয়ায় প্রাণ কেমন করে গা শিউরে রোমাঞ্চ হয়, কাকে কখন মনে পড়ে, সে সোহাগ রচ্‌তে আসি নি ;—আজ এসেছি অন্তের বার্ত্তা নিয়ে। বসন্তের নূতন হাওয়ায় ফুল ফোটবার দিনে কেমন করে ফুল ঝরে যায়, তাই বল্‌তে এসেছি। যে মাধবীটী সহকারে জড়িয়ে উঠেছিল, সে মাধবী কেমন অনিয়মে শুখ্‌নো মুকুলের আঘাতে মরে যায়, তাই জানাতে এসেছি। কোকিলের গান অর্দ্ধেক ডাক্‌তে ডাক্‌তে থেমে যায়, পাপিয়া তান ভুলে বেসুরো হয়, বিষণ্ণমুখে কপোতী কপোতের কথা ভুলে কেঁদে ফেলে, পূর্ণিমার চাঁদ মেঘের আড়ালে ঘোম্‌টা টানে, মলয় হাহা করে ফুলের বনে, তৃষ্ণা শুরু হয়, তারি খবর দিতে এসেছি।—কেমন করে শস্যশ্যামলা মরুভূমি হয়, কেমন করে বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়, তাই বল্‌তে এসেছি। কেমন করে হাস্‌তে হাস্‌তে বুকে ব্যথা ধরে—কেমন করে ফুলশয্যায় মরণ আলিঙ্গন করে—তাই দেখাতে এসেছি। কাঁদ্‌তে আসি নি ; চোখ নিঙড়ে নিশ্বাস বয়ে নিয়ে এসেছি, মৃত্যুর বাণে কেমন করে পাখী স্থির হয়ে চোখ বুজে, তাই জানাতে চাই। যে স্নেহের কাম্যবনে কল্পলতার ছায়ায় কাম্যফল পাব বলে আশার ছলনে ভুলেছিলাম—সে কাম্যবন জ্যোৎস্না রাত্রে কোথায় মিলায়ে গেল। কল্পলতা শুকায়ে গেছে। আশার ফাঁকিতে শুক্‌নো হাসি রচনা হয়েছে—সে স্নেহের ছায়া মরে গেছে—দাবানলের অগ্নি নিয়ে এদের ঘরে এসেছিলাম, এদের ঘরও বুঝি তাই জ্বলে গেল। দাবানল যেখানে জ্বলে, সে বন জ্বলে যাবার আগে যার ভিতর থেকে যে শুক্‌নো কাঠে আগুন জ্বলে উঠে সে আগে নিজে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ বন পুড়ে গেল, ফুল ফুটতে গিয়ে ঝড়ে তাপে ঝল্‌সে গেল,—পাখী গাইতে গিয়ে দগ্ধপক্ষ হয়ে স্বর বের হতে না হতে মরে গেল—তবু কাঠখানা ছাই হল

না। আমি যেমন তেমনি রইলাম, সবাই বেশ চলে যায়—ইন্দু দিদিও চলে গেল। কেবল আমার যাওয়াই হ'ল না। সকলে নিশ্চিন্ত হয়, আমি কই তা পাইনে।

যেটা ধরে বাঁচতে যাই, সেইটা ডুবে যায়—তবু বেঁচে থাকি। তারা সব মরে বাঁচল। আমি বেঁচে মরে আছি! তোমাকে শেষ জীবনে মরবার সময় দেখতে না পাওয়া তার একটা দুঃখ রয়ে গেল। আশ্চর্য্য, যে দিনে ইন্দু দিদি জন্মেছিল,—ফাল্গুনের পূর্ণিমায়, ইন্দু দিদির বিয়ে হয়—সেই পূর্ণিমায়—ইন্দুদিদি চলে গেল—সেই পূর্ণিমায়। যে কুঁড়িটী এসেছিল চাঁদের আলোয়, ফুটেছিল চাঁদের আলোয়, ঝরে গেল তেমনি ভরা জ্যোৎস্নায়। আমি জন্মেছি আমাবস্তের দিন, কাটাচ্ছি সেই অন্ধকারে, ডুবে যাব—হবেও—বা কোন্ তমোময় ঘুমঘোরে। কি করে কার পরিণতি এমন হয়, জানিনে।

আজ কয় মাস ধরেই তার একটু একটু জ্বর হ'ত, বললেও গ্রাহ্য করতো না। সুধীর ত আর সেই মিহির যাবার পর থেকে কি হ'য়ে গেছে। কোন্ খবরই কার, সে নিত না—তোমার ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে কত বললুম, বড়দিদি কত বোঝালে, যে দিনকতক গিয়ে থাক—মনটাও একটু ভাল থাকে—তা শুনলে না—বললে হেসে উড়িয়ে দিত। একদিন কেবল জবা অনেকক্ষণ ধরে বকাবকি করায় বল্লে, "জবা, তোর বাড়ীতে যাব—যাব—" জবা, দিদির সঙ্গে খুব বকাবকি করত। আমায় বললে, "মামা, এই ঘরটা আমার জগতের মাঝে সব চেয়ে ভাল লাগে; এই ঘরে আমার ফুলশয্যা হয়েছে, এই ঘরে আমার মিহির থাকতো, এই ঘর থেকে আমার মিহির গেছে, এই ঘর থেকে আমার যা হারিয়েছে তা আর মিলবে না—আমি এ ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না—না মামা, আমি এইখানেই থাকব—আর কোথায় যাব? আর কোথাও যাব না—না!" জবা কেঁদে ফেললে। ইন্দুদিদি বললে, "এ্যাঁ তুই আবার কাঁদলি যে" জবা বললে—'না না'—হেসে ফেললে। জবার কান্না দেখলেই দিদি চোখ মুছে ফেলত। কারও কান্না সে দেখতে পারত না। বলত "জবা, ছেলে মানুষে কাঁদে না—শুধু হাসে।" এদানি অসুখ খুব বেড়েছিল, প্রায় উঠতে পারত না, শুয়েই থাকত—তবু খাবার সময় হ'লে, আমাকে জবাকে কাছে বসে খাওয়াত। আমায় বলত আমি সব দেখতে পারি নে বলে, তোদের খাওয়াই হয় না। সুধীরের কোন খবরই পাওয়া যেত না, হয় ত কখন এল টল্ টল্ করতে করতে - কিছু কথাও নেই, বার্ত্তাও নেই, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে একবার তাকালে—তার পর টলতে টলতে চলে গেল। মধ্যে একদিন এসেছিল, ইন্দুদিদিকে দেখে বললে, "এই যে—বাঃ বাঃ—তুমি পথ অনেকটা কমিয়ে এনেছ; বাঃ বাঃ বেশ, তা আমি কি করব—আমি কি করব। আমার দুটো পিদিম ছিল, আকাশ চোখে কাপড় বেঁধে একটা নিবিয়ে দিয়ে কেড়ে নিয়েছে, আর একটারও তেল ফুরিয়ে বুক পুড়ে উঠেছে। বাঃ বাঃ বেশ, তা আমি কি করব—আমি কি করব। ডাক্তার ত আসে

শুনি, তা ওষুধগুলো কি পাশের গলিতেই যায়—তা বেশ তা বেশ—মাটীতেই সব যাবে।" তারপর টল্‌তে টল্‌তে ফিরছিল—ইন্দু দিদি ডাকলে। সেদিন দিদির বড় জ্বর উঠতে পারছিল না, বল্লে "এদিকে এস, বোস তোমার মুখ অত শুকনো কেন? তুমি কি হ'য়ে গেছ! একটু বোস, জবাকে ডাকি, চাকরদের ডেকে দিক্।" তখন দেখি পাগলের মত দরজার গোড়ায় বস্‌ল—বসে বলছে, "আমার মুখ শুকিয়ে গেছে—না? ঠিক ঠিক—দেখ—এই বাড়ীটাও শুকিয়ে গেছে, হাসে না; ওই ফুল গাছগুলো মরে গেছে, ফুল ফোটে না; ওই দেখ পায়রাগুলোর খোপ খালি হয়ে গেছে—আর তারা ডাকচে না। শুকিয়েছে দেখ না, বাড়ীটার ছাদের বার্ণিশ অবধি ধুলোয় ছেয়েছে। শুকিয়েছে, শুকিয়েছে,—যেটা স্বপ্ন সেটা সত্যি হয়েছে; যেটা সত্যি, সেটা স্বপ্ন হয়েছে। তা আমি কি করব—তা আমি কি করব! যাক্—যাক্, এই যে তুমিও শুকিয়েছ, হাহা—হাহা—তা আমি কি করব—কি করব!" তার পর ধড়মড় উঠ্‌ল—উঠে কোথায় চলে গেল। মাঝে মাঝে সহিসটা খবর দিত—বাগান থেকে আস্‌ত। তার পর এই তিন মাস আর আসে নি।

তার পরদিন দিনের বেলা ইন্দুদিদি উঠ্‌লো, জবাকে ডাক্‌লে—আমাকে ডাক্‌লে, লোকজন দরোয়ানদের ডেকে বলে দিলে, সমস্ত বাড়ী ঘর দোর সব পরিষ্কার ক'রতে। তার পর দুদিন ধরে যত ভিখিরী ছিল, তাদের পয়সা চাল ডাল সব দিলে। ওই বাগানের পাশের জমীতে কত কাঙালী ভোজন করালে। একটা কাণা ছেলের হাত ধরে একটা মাগী এসেছিল, তাকে একশ টাকা দিলে—মাগী টাকা পেয়ে কেঁদেই অস্থির; বলে, 'মা এত টাকা আমি কোথায় রাখ্‌ব?' এত গরীবও আছে। তার পর থেকে রোজই সব পরিষ্কার—সব দেখা শোনা করত।

পূর্ণিমের রাত্রিতে চাঁদ উঠেছে—আমায় ডেকে বল্‌লে, 'মায়া, দেখ কেমন চাঁদ উঠেছে, এমনি দিনে আমার বিয়ে হয়েছিল, আর এমনি দিনেই আমি যাচ্ছি; পূর্ণিমার রাত্তির আজ আর পালাতে পাচ্ছে না, আমিই আজ পালাব, রোজই পালিয়ে যায়।'—আমরা কেঁদে ফেল্‌লাম, জবা যেন কেমন হয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে উঠ্‌তে লাগল। ইন্দুদিদি তখন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, আপনার মনে চাঁদের পানে চেয়ে বলছে—'কি দেখছ চাঁদ, আমার জন্ম দেখেছিলে, আমার ফুলশয্যা দেখেছিলে, আজ কি দেখ্‌ছ চাঁদ,—আবার যে দিন ফিরে আস্‌ব সেদিনও কি এমনি করে তাকিয়ে দেখ্‌বে, তুমি বুঝি কেবল তাকিয়েই দেখ। একটু পরে যেন কেমন হয়ে এল,—ঠিক সেই সময়ে সুধীর এল—একেবারে যেন উন্মত্ত—মাথার চুলগুলো রুক্ষ, খালি গা, টল্‌তে টল্‌তে ঘরে ঢুক্‌ল—হাতে একখানা চিঠির মত কাগজ, আর এক হাতে একটা মদের গেলাস। ঘরে ঢুকেই 'ইন্দিরা, ইন্দিরা' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"যেয়ো না, এত শীগ্‌গির যেয়ো না—এই দেখ পানপাত্র

ফেলে দিলাম, ইন্দিরী ফিরে চাওন' গেলাসটা ছুঁড়ে ঘরের মেজেতে ফেলে দিলে, ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হোল, রক্তের মত লাল মদ মাটীতে ফেণা তুলে গড়িয়ে গেল। ইন্দুদিদি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে ছিল, তারপর আস্তে আস্তে বল্লে,—"এসেছ—কাছে এস, আমি তোমায় কি বলব মনে করে রেখেছিলুম, ভুল হয়ে যাচ্ছে, সে যেন আমায় 'মা' 'মা' করে ডাকছে, আমি সব ভুলে যাচ্ছি—দেখ আমার গলার ভেতর যেন ঠাণ্ডা জমাট কুয়াশায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, চোখে যেন কেমন সব ঘোর হয়ে আসছে,—দেখ সেই চাঁদ কি—এই চাঁদ! সেই রাত্তিরের আর—এই যে? দেখ তোমায় এখন, সব থেকে তফাৎ করে দেখছি, তুমি সত্যি বড় সোন্দর—তুমি—তুমি।" তারপর আর কথা কইলে না, হঠাৎ চারিদিক থেকে কোকিল ডেকে উঠল, ছুটো তিনটে পাপিয়া চেঁচিয়ে উঠল, ঘরের ভেতর বাতিদানের কাছে কার্পা থেকে গোলাপ-ফুলের পাপড়ি ঝরে গেল, একটা হাওয়া এল—বাতিটা নিভে গেল। সুধীর উন্মাদের মত হাহা হাহা হাহা করে ছুটে বেরিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি,—ফুটন্ত ফুলের মাঝে ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার মত চাঁদের আলোয় সে ঘুমিয়ে পড়েছে, নিমীলিত আঁখির দুই কোণে দু ফোঁটা জলের রেখা লেখা রয়েছে—শুকোয় নি।

আজ কত বছর কেটে গেল—বেশ ত কেটে যায়, নদীর স্রোতের মত চলেছে। কি দ্রুত চলে—চলেই যায়—বাধা মানে না; কোন কথা শুনলে না,—দিব্যি উথলে হেসে দুকূল ভাসিয়ে স্রোত খর হয়ে চলে গেল। তারও আশা থাকে সাগরে মেশ্বার। উঃ! মাগো! পৃথিবীটা কি! আমার কিসের আশা। সকলেরই মরণের তীরে সাগরের আশা, সকলেই দিনের শেষে সংসারের আপনার প্রাণের লোকের কাছে, প্রাণের ভাষায় তার বল্বার যা তা বলে যায়,—আমার সে আশা মেটাবার আশাও মরে গেছে। সমুদ্রের তীরে গিয়ে বালুর ঘর করেছিলাম,—প্রবল তরঙ্গে কোথায় ধুয়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে গেল। আজ শুধু সূর্য্যাস্তের পানে চেয়ে থাকি, আঁধার নেমে আসছে জানি, কতক্ষণে আসবে তাই ভাবছি। চারিধারে অথৈ জল কল্ কল্ করছে, সামনে ডুবছে সূর্য্যি, পিছনে আঁধার। ঢেউগুলো লক্ষ ফণা নাগিনীর মত খেলা করছে, ঘাটে একখানিও নৌকা নেই—তাই ভাবছি। শুধু জনহীন নির্জ্জন নীরব দ্বীপে দাঁড়িয়ে—চারিপার্শ্বে কেবল জলের কোলাহল।

আজ ক'দিন হল আমরা এখানে এসেছি, জবাও এসেছে, কেবল কাঁদছে—খেতে চায় না, ওঠে না, কেবল কাঁদে।—এখন আমার স্থান কোথায়? সুখের আশা তো করেছিলুম—কিন্তু সত্যি দুঃখের কতটা নিয়ে আছি। দুঃখ এই—আজ অধিকার দেবার জন্যে প্রাণ ছটফটিয়ে মরছে—তবু ত—হায়! কেউ নেই যে অধিকার করে। আমার কথা আর তোমায় বল্বার অধিকার রাখতে দাও নি, আমার কথা কভু তোমায় বলতে

চাই না, আর শ্রাবণে মেঘের দৌত্য রচনা হবে না ; . কিন্তু জবা যে তোমার আশ্রয়ের জন্তে এসেছিল, সে আশ্রয়ের তুমি কি করলে ? যে পিতৃহীনা মাতৃহীনা তোমাকে আশ্রয় নিলে, তাকে কোথায় রাখবে ? আমার কাছে ? যদি আদেশ দাও, অনুমতি কর, তবে আমার কাছেই রাখব। ইন্দু দিদি যেমন বুকে করে করে রেখেছিল, তেমনি করে রাখতে দ্বিধা করব না। আমি নারী, জানি নারী সব সইতে পারে,—ত্যাগ সইতে পারে না। তবুও যে দিদির আশ্রয় পেয়েছে – তাকে, সে যদি হলাহল উগারে দেয়, তবু তাকে বুকে করে রাখব। আমার বিষের দাহন দিদি যদি সয়েছিল, তবে আমি কেন সইব না। সইতে পারব না কেন,—সইব—সকলই সইব।

(অমর—কমল)

কমল দাদা,

কখন তোমায় চিঠি লিখি নি, কখন তোমার অভাব বোধ করি নি, আজ জগতের শ্রেষ্ঠ স্নেহ হারিয়ে তার অভাবে তোমার অভাবও জেগেছে। আমি কখন কাঁদি নি, আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছা রোধ করেও চখের জল আটকাতে পাচ্ছি নি। কারো কাছে কেঁদে ভার নামাতে সাধ হচ্ছে, কে আছে—এখন আর আমার তুমি ছাড়া। আমি কখন 'মা নেই' তা মনে আনতে পারতুম না, আজ আমি সত্যই মাতৃহীন! দিদি - আমার মার মত দিদি—আমার তার স্নেহের কোল থেকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। আমি মাতৃহীন হলাম। মৃত্যু যে এত বড় ভীষণ, এত ব্যথা দিতে জানে, এমন করে মূর্ম্মুর দাহ আনতে পারে, মিহিরের মৃত্যুতে তা আমি বুঝিনি। আজ তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করছি। বুকের রক্তে গিয়ে আঘাত করছে—প্রাণের সমস্ত তারগুলো ঝন্ ঝন্ করছে—যেন মাঝে মাঝে আর বাজে না—সব কেমন যেন হয়ে আসে। দর্শনশাস্ত্র এখানে মূক, সে ব্যথায় ঔষধ দিতে পারে না। সমগ্র জগতের দর্শনশাস্ত্র স্তূপীকৃত করে আমার দিদিকে—আমার মার মত দিদিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। এত দিন ধরে এ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে আমার লাভ! শুধু কথার কাটাকাটি ও মারামারি, কেবল ছেদ, ভেদ, কেবল বাক্যের লূতা-তন্তু সান্ত্বনা কই দিলে না। যে শোকাগ্নিতে মানুষ পুড়ে খাক্ হয়—তার ইন্ধনই যোগায়, কই শান্তি তো দিলে না। দুঃখ ঘোর করে আরও বাড়ে—নিবৃত্তি কোথায় ? যে দুঃখে রাজপুত্র ভিখিরী হয়, মহাপণ্ডিত উন্মাদবৎ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করে ছুটে যায়, মায়া-মরীচিকাময় জগৎ সংসার যে মহাজ্ঞানীর চোখের সামনে জগন্মিথ্যা মনে হয়—সেও ছাগের জন্তে হাড়ি কাটে গলা দেয়। মহাপ্রেমিক ক্ষতদুর্গন্ধ-কৃমীকীট-জড়িত, গোলমাংস পলিত-রোম কুকুরকে কোলে করে তুলে। জগৎ মিথ্যা—মায়া—কোথায় ? আজ থেকে সমস্ত দর্শন শাস্ত্র ত্যাগ করলাম,—এ সব অন্ধকারকে আরো ঘনিয়ে

তোলা, শোকই আমার ভাল—যে, গেছে তার জন্তে কান্নাই আমার মনের একমাত্র শান্তি। হায়! কে আমায় বলে দেবে, এ জগৎ সত্য কি মিথ্যা। এ জগৎ যদি মিথ্যা —তবে সত্য কি? সবই মিথ্যা—কেবল ওই মৃত্যুটা সত্য? তা হয় না, যার জীবন আছে তারি মৃত্যু আছে। না, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ন্যায়ের ফাঁকি নয়—যে বলে সে মূর্খ। আমি সে মূর্খতা আর চাইনে—আমার কান্নাও এ শোকে মিষ্টি—তবু তায় একটু শান্তি আছে। দর্শনশাস্ত্র অতলজলে থাক্,—আমার এ কান্নাই ভাল'।"

আমি আগে খবর পাই নি। সকাল বেলা ভালই দেখেছি। আজ কাল বরং উঠ্‌ত, সংসারের সকল কাজই নিজে আগেকার মত দেখত। তবে বুঝি নিভবার আগে যেমন প্রদীপ একবার জ্বলে উঠে, দপ্ করে খানিকটা আলো হয়—তাই। আমি যখন গেলাম, তখন সব ফুরিয়ে গেছে। মায়াদিদি জবাকে নিয়ে সুখোর মাকে নিয়ে বাড়ী গেছেন। এ বাড়ী এখন খালি পড়ে আছে, আমি আছি, আর কাঁদ্‌ছি; কি করব, শ্রাদ্ধ ত আমা-কেই করতে হবে। সুধীরের ত কোন উদ্দেশ নেই। শ্মশানে যখন সব শেষ হয়ে এসেছে, তখন সেই উন্মত্তের মত, টল্‌তে টল্‌তে একবার এল, এসে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল; যখন অগ্নিতে সব ছাই হয়ে গেল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে। এত জোর নিশ্বাস পড়ল যে, পোড়া ছাই বাতাসে উড়ে গেল। পাগলের মত হেসে উঠল,—চিতা থেকে একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে, গাময় ছড়িয়ে দিলে, সেই তপ্ত-ভস্মভার বুকে মাখলে, 'ইন্দিরা' 'ইন্দিরা' বলে দুবার ডাকলে, সে স্বরে যেন ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হয়ে যায়,—শ্মশান কেঁপে উঠল, গঙ্গাজলে তার প্রতিধ্বনি হল, মাথার উপরে বটগাছের ডাল থেকে একটা কাক ভয়ে ডেকে গেল। চন্দ্র তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে, স্বচ্ছ আকাশে চন্দ্রমার জ্যোৎস্না প্লাবনের মত গঙ্গাজলে পড়েছে, শ্মশানের অধিবাসীরা নিদ্রায় মগন, দু একজন এক কোণে বসে গাঁজা খাচ্চে, আর বিকৃত কফগ্রস্ত ভাঙ্গা স্বরে দু একবার কাশ্‌ছে। তটের উপর গঙ্গার কেবল অবিরাম আঘাতে কলোচ্ছাস ধ্বনিত হচ্চে। গ্যাসের আলোর ধারে পতঙ্গেরা উড়ছে, একটা টিক্‌টিকী তাই খাবার জন্ম স্থিরদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করে রয়েছে, বটগাছে একটা পেঁচা তাই আবার লক্ষ্য করছে। সুধী-রের হাত ধরে স্নানের জন্ম নিয়ে গেলাম, ঘাটে নামবার আগে একবার আমার মুখের পানে চাইলে—বল্‌লে 'কে অমর!—ভাই!' ব'লেই চোখের জলে নিজের বুক ভাসালে, বুকের ছাইগুলো ধুয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ উন্মত্তের মত হাত ছিনিয়ে নিয়ে বল্‌লে—'ভেঙ্গেছে—স্বপ্ন ভেঙ্গেছে।' 'কোথা যাও, কোথা যাও' বলে তার পিছু পিছু ছুটলাম। ফিরে দাঁড়াল, হাস্‌লে—সে কি ভীষণ হাসি! এখনও আমার কাণে সেই হাহাকার বাতাসের সঙ্গে গর্জ্জন করছে। বললে—'অমর! এ সব কিছু নয়—সব ছাড়িয়ে আর কিছু পাই কি না—আছে কি না জানি না—বোধ হয় আছে, আমার এইখানেই শেষ,—রইল

সব ছাই আর পাঁশ, যা করবার তুমিই কর!' বলে চলে গেল। তখন গ্যাস নিভিয়েছে—চাঁদের আলোয় দেখতে দেখতে সে কোথায় মিলিয়ে গেল। 'সুধীর,' 'সুধীর' করে বার কয়েক চীৎকার করলাম—জলে প্রতিধ্বনি শুধু জেগে উঠল, 'ধীর' 'ইর,' 'ইর'—তারপর কল কল ছলাৎ শব্দ। কাঁদতে কাঁদতে ছুটলাম, 'সুধীর', 'সুধীর,' 'সুধীর'—নির্জ্জন নীরব পথে যে দিকে সে গেল, সে দিকে ছুটলাম,—আবার চীৎকার করে কাঁদতে লাগলাম, কান্নার গলা চেপে চেপে ধরতে লাগল। মনে হল, পাশের এই পথে ওই বুঝি সে দ্রুত চলেছে। 'সুধীর' 'সুধীর' বলে ডাকতে ডাকতে ছুটলাম—প্রায় সেই মদনমোহনের বাড়ীর কাছ বরাবর। দু একজন গঙ্গাস্নান যাত্রী চলেছে, আমার অবস্থা দেখে সভয়ে সরে গেল। আমি তখন এক রকম উন্মত্ত, হঠাৎ সামনে বাধা পেলাম। এক জন নেশায় জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল,—'কে বাবা পীর,—দোলের রাতে ধাক্কা মেরে ছুটেছ, কে দেখি—ও সম্বন্ধি ভায়া, আরে বাহা বাহা!' দেখি যে, পাঁচ সাতজন লোক স্ত্রী ও পুরুষ—সব নেশায় চুরচুরে—হোলীর ধুমে রাস্তা কাঁপিয়ে চলেছেন। আর যে আমার আটকালে সে কে বোধ হয় বুঝতে পারছ—সে নগেন। সঙ্গে সেই মাষ্টার আর ইয়াররা, আর তিনটে মাগী। সম্বন্ধি নামটা শুনে সবাই খুব হেসে উঠল—আমার তখন মনের ভিতর কি হচ্ছে, তা তুমি অনুভব কর। আমায় জিজ্ঞেস কল্লে 'তুমি এখানে'—তা বললুম যে, দিদি মারা গেছেন রাত্রি দশটার সময়, তাই শ্মশান থেকে আসছি। সুধীর এ দিকে কোথায় গেল, তাই—শুনেই বললে 'আরে ছ্যাঃ, তোমার আর মরবার দিন পেলে না, আরে ছ্যাঃ! এমন দিনে সুধীরচন্দ্র বিধবা হয়ে গেল, আরে ছ্যাঃ! তোমার বরাৎ নইলে তোমায় নিয়ে আজ, করতুম কত আমোদ হে, কি বল হীরে, এমন দোলের দিন ছ্যা-রা-রা-রা-রা-রা, সম্বন্ধি ভায়া এস একপাত্র, এসং, টান। আমি ধাক্কা দিয়ে চলে এলাম, ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে ঠিকরে গেল, বললে 'যা, শালা, তোর শ্মশান জাগাগে যা, শালা নেহাৎ বেরসিক; বুঝলে হীরে! শালা দোলের রাত্রিতে তোর এত গোল কিসের রে?' হীরে না কে, সে উত্তর করলে, 'আরে দুর্ দুর্, মরণ আর কি, মরবার দিন পেলে না, ন্যাকা মাগী, মাগী ছুটো কুমকুম খেয়ে যা—মাইরি বলছি নগি, মাইরি ছুটো কুমকুম খেয়েও গেল না, আরে ছ্যাঃ! আমি একটু দাঁড়িয়ে ভাবলুম, এই জগৎ—এরি সঙ্গে মায়াদিদির বিয়ে হয়েছে। হল্লা করতে করতে মাতালের দল চলল, একজন তাদের মধ্যে থেকে বলছে 'সম্বন্ধি বাবা' দানা পেওনি—দানা পেওনি ঘর যাও চাঁদ, ঘর যাও।—সে সেই হারুমাষ্টার। 'প্রাণ পিয়ারীর দাঁত কপাটী লাগবে, ঘর যাও বাবা ঘর যাও; শ্মশান জাগা সম্বন্ধি—বাপ!' কাঁদতে কাঁদতে গঙ্গায় ফিরে এলাম, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এলাম, এখনো কাঁদছি—কমল দাদা দিদি কেন ফেলে গেল। মায়া দিদির কি হবে?

কমলদাদা! দুঃখ কাকে বলে এখন আমি জেনেছি। এ দুঃখের কি সত্যই শেষ নেই। তুমি একদিন এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় দেখবে বলেছিলে, তা পেয়েছ কি? বলতে পার, এ দুঃখ কিসে নিবৃত্তি হয়? কেউ কেউ বলেছে, দুঃখই দুঃখের পরিণাম। কারো কারো কাছে হতে পারে, যারা শক্তিহীন, দুঃখের শেষ হতে পারে না, কেননা যার গোড়া ও শেষ এক হয়ে যায়, সে অনন্ত। অনন্ত দুঃখ হয় না, অনন্ত সুখও হয় না। দুটো অনন্ত হয় না, অবশ্য এ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। দুঃখ আছে বলেই তার নিবৃত্তির উপায় আছে, নইলে থাকত না; কিন্তু সে উপায় কি? দুঃখ ফেলে দিলে হয়, ফেলে দিলেও ত সে যায় না; আমি ত তাকে ছাড়তে চাই, সে ত আমায় কিছুতেই ছাড়ে না। এই দ্বন্দ্বেই কি জীবন, শেষ মৃত্যু তীরে এসে নীরব হয়—হবে! কান্নাই এখন আমার সার। কাঁদি খুব কাঁদি, চোক ঝাপ্সা হয়ে আসে, জানি, বুঝেছি দিদিকে পাব না, তাই দুঃখ। তবু কাঁদি, যদি ঝাপ্সা ঘোর কেটে আলোয় এনে দেয়। যদি সে আলোয় দেখতে পাই—দিদি কোথায়, আর আমরা কোথায়, তবে যদি এই দুঃখের শেষ হয়। মার কোল পাই!'

জগতে এক একজন আসে, তাদের সঙ্গে আলো, বর্ণ, মাধুর্য্যে ভরা—চলে যায়, দশ দিক অন্ধকার হয়ে যায়। দুঃখই অন্ধকার।

(নগেন – কমল)

দুর্নাম! দুর্নাম! বিষ! বিষের আগ্নেয় হলাহল আকণ্ঠ পান করিয়েছ। মজ্জায় মজ্জায় রক্ত ঢেলে দিয়েছ; শিরায় শিরায় উষ্ণ স্রোত বয়ে চলেছে, তার শুধু তপ্ত বিষের দাহন-যাতনা। আত্মা দপ্ দপ্ করে উঠ্‌ছে। প্রতিরোমে রোমে বিষদিগ্ধ বাণ প্রবেশ করেছে, প্রতি রোমকূপ হ'তে বিস্ফোটক জেগে উঠেছে। এতদিন প্রকৃতি যুঝছিল, আজ দেহের বল হারিয়েছে—যে বিষ ঢেলে ছিলে এই শিরায়—আজ তার চরম পরিণতি, যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়ে বের হতে চায়। ওহো ওহো! এই সে কারণ। এরি জন্যে—জন্যে—জন্যে—জন্যে,—এরি জন্যে, শাস্তির জন্যে বাঁচিয়ে ছিলে, প্রতিশোধের জন্যে বাঁচিয়ে-ছিলে,—পলে পলে মৃত মৃত, যায় জীবন্মৃত হয়ে থাকি,—তারির জন্যে! তুমি না ভাই,—তুমি না দাদা,—তুমি না শক্তিশেল বুকপেতে নিতে পার, বটে, তাই এমন শক্তিশেলে বাঁচিয়ে রাখলে, তাতে জীবন শুধু অগ্নিময় হোক্! জ্বালায় জ্বলে মরুক্। ওহো, এইত স্নেহ এইত মমতা! বোধ হয়, মার পেটের ভাই হ'লে পারতে না।

খুব ভাল! কি শুভক্ষণে মায়াকে আমি বিয়ে করেছিলুম, আর কি শুভক্ষণেই তুমি বাঃ—বাঃ—বাঃ যা ভাষায় মানুষে ব্যক্ত করে শেষ করতে পারে না। এ বড়

মনোরম কাহিনী, বড় মিষ্টি, যত দুর যায় জালায়, জল্ অল্ করতে করতে যায়।"—এ আমার সুরার চেয়েও মিঠে ; উঃ, ভাই হয়ে কি করে এমন আবরণ শিখেছিলে। ছোরা খেয়েও বুকে করে নিতে পারে, কিন্তু বিষ চাই-ই-চাই। উঃ, তুমি যে এতদুর নৃশংস হতে পার, মানুষ যে এতদূর কল্পনা করতে পারে, আমার জ্ঞানে তা আসে না। এই ত প্রতিশোধ, সব দেব, বাঁচিয়ে রাখব, দেখব কেমন জলে মরে! মায়া ত্যাগ করেছিলুম, হেনাকে ভেজাল মনে করে সর্ব্বস্ব পণে বাণিজ্য করলুম,—তুমি কল্পতরু সর্ব্বস্ব ফিরিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ নিলে, হেনাটাকে কেড়ে নিলে। চমৎকার! এর আর অন্য ভাষা নেই—চমৎকার! অতি মধুর!

শুধু একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে, কোন্ ধর্ম্মমতে কোন্ কর্ম্মমতে কোন্ স্নেহ, কোন্ আকর্ষণে ভ্রাতৃত্ব ভুলতে পেরেছ? শুনেছি দাদা গুরু তুমি, যে বড় সে পিতৃসম, তাই তোমার এই—? এর নিবৃত্তি কোথায় উপদেশ দাও, তোমার মৃত্যু—না আমার?—বল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

কবি গোবিন্দদাসের কবিতা। *

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি যে, "ভারতী"র সম্পাদক অথবা যম, একদা কিছুদিন পূর্ব্বে 'তাতলসৈকতে' পদটি, যে গোবিন্দদাসের স্কন্ধে আরোপ করিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে এক বিষম গোবিন্দ-বিভ্রাট ঘটাইয়াছিলেন,—এ গোবিন্দদাস কিন্তু সে-গোবিন্দদাস নয়।

এ সেই গোবিন্দদাস যিনি লিখিয়াছেন,—

"ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।"

এ সেই গোবিন্দদাস, যিনি পদ্মা-মেখলা এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের এক অঞ্চলে বসিয়া, তাঁহার ভিটামাটীর উদ্দেশে গাহিয়াছেন,—

"শত স্বর্গ শত কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি,
অই যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হ'তে ভাই, পুণ্যতোয়া ও চিলাই
কত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার।"

এ এক শ্রেণীর দেশাত্মবোধ। ব্যাপকতায় হয়ত ইহা সমুদ্রের পরপারে বিশেষ বিশেষ দেশগুলিকে নাগাল পায় না। কিন্তু ইহার গভীরতার মধ্যে ডুবিবার মত ডুবুরীও বোধ হয় এই ফানুসী সাহিত্যের দিনে বেশী মিলিবে না। তুলনায় সমালোচনা হয় হউক। তাহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। কবি গোবিন্দদাসের দেশাত্মবোধ,—এই স্বতন্ত্র, স্বাধীন, পূর্ব্ববঙ্গের একগুঁয়ে ও একনিষ্ঠ দেশাত্মবোধ,—বঙ্গসাহিত্যে তুলনায় সমালোচনারই যোগ্য।

ফুটের ফিতা হাতে করিয়া বিশ্বকে মাপা যায় না। কোন বিশেষ দেশকে,—বিশেষতঃ বিদেশকে,—'বিশ্ব' (?) বলিয়া ধরিয়া লইয়া, দেশাত্মবোধের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার যে অহমিকতা ও স্পর্দ্ধা, তাহাও বোধ হয়,—আজকালের বঙ্গসাহিত্য ভিন্ন অন্য কোথায়ও মিলে না। সুতরাং দেশাত্মবোধের এমন এক ভাব বিপর্য্যয়ের সন্ধিক্ষণে, কবি গোবিন্দদাসের দেশাত্মবোধমূলক কবিতাগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব,

* ১লা বৈশাখ ১৩২৫,—ঢাকায় সাহিত্য-সম্মিলনে লেখককর্ত্তৃক পঠিত।

সাহিত্যের দিক দিয়া ও জাতীয় জীবনের দিক দিয়া,—আলোচনা ও অনুশীলন খুব সময়োপযোগী সন্দেহ নাই।

কিন্তু গত শতাব্দীতে আমাদের বিদেশী ঢংএর রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুকারী ও প্রতিধ্বনিস্বরূপ যে সমস্ত দেশপ্রীতির কবিতা কবি লিখিয়াছেন,—তাহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ নাই,—এমন নহে। তবে কল্পকলার দিক দিয়া, বাঙ্গালীর স্বভাব ধর্ম্মের দিক দিয়া, বিচার করিলে তাহা কবির কবিতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে না। অথচ দুঃখের বিষয় অনেকে ঐ সমস্ত কবিতাগুলিকেই দেশপ্রীতির শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া মনে করেন।

কাব্যের বিচার,—সাহিত্য ও কল্পকলার দিক দিয়া করাই সমীচীন। কাব্য,—ব্যক্তি বা জাতির জীবনে কোন উদ্দেশ্য সাধন করে না,—ইহা অতি বড় দুঃসাহসের কথা। কিন্তু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কবিতা, বিশেষতঃ গীতি-কবিতা লিখিতে বসিয়া, কোন ঋষিই বোধ হয়, কল্পকলার রূপান্তরে, তাঁহার কাব্যকে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ করিতে পারেন না। সমালোচ্য কবির যে সমস্ত কবিতা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া সৃষ্টি হইয়াছে,—তাহা দেশপ্রীতিই হউক, আর সমাজ বা ধর্ম্মসংস্কারই হউক, খুব বড় সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু যে যুগে আমরা বাস করিতেছি,—আমি বাঙ্গলাদেশের যুগের কথাই বলিতেছি,—'বিশ্ব' (?) যুগের কথা বলিতেছি না,—এ যুগ একটা সমস্যাপীড়িত যুগ। গত শত বৎসরে বাঙ্গালাদেশে কোন কবিই বোধ হয় এই যুগভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই। কাজেই সমস্যা ও উদ্দেশ্যমূলক কবিতার হস্ত হইতে শুধু গোবিন্দদাস কেন,—এ যুগের বড় ছোট মাঝারী কোন শ্রেণীর কবি-প্রতিভাই মুক্ত নহে। অ-কবিরা ত নহেই।

ইহা ছাড়া কবি গোবিন্দদাসের বিচিত্র জীবনে এমন সব অঘটন ঘটিয়াছে যে, তাঁহার কতকগুলি কবিতা উদ্দেশ্যমূলক না হইয়া যায় নাই। কল্পকলার দিক হইতে যেমন ইহার প্রতিকূল সমালোচনা উঠিতে পারে,—তেমনি অন্য পক্ষে কবির জীবনের দিক দিয়া ইহার একটা সার্থকতা আছে। কাব্য, জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। যেখানে জোর করিয়া এ দুইকে বিচ্ছিন্ন করা হয়,—সেখানে জীবন ও কাব্য দুই-ই—সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্য্যাদাহীন হইয়া পড়ে। এই জন্য কবি গোবিন্দদাসের অনেকগুলি উদ্দেশ্যমূলক কবিতা—কল্পকলার দিক দিয়া—একটা বড় পরিণতি লাভ করিতে না পারিলেও—তাঁহার নিজের জীবনের দিক হইতে সত্যভ্রষ্ট হইয়া মর্য্যাদাহীন হইয়া পড়ে নাই। একটি কবিতা দেখুন,—

"দরিদ্র ভাওয়ালবাসী, কাতরে কাঁদিছে আসি,
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে।

সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান,   কে আছ বীরের প্রাণ,
বাড়াও সবলহস্ত পাপের সংহারে।
দুর্ব্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে।"

কে পিশাচ? কে রাক্ষস? কিসের অত্যাচার? কবি অস্পষ্ট নয়?—খুব সহজ এবং স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন,—

"যে জাতি যেখানে থাক,   সতীর সতীত্ব রাখ,—
আপনার মা বোনেরে স্মর একবার।"

ভাওয়ালের কবি ভাওয়ালবাসীর এমন একটি মর্ম্মন্তুদ ব্যথার কথা কাব্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, তাহা মোহাচ্ছন্ন বাঙ্গালীকে একদিন নিজ নিজ মা বোনেরে স্মরণ করাইয়া,—তাহার সুপ্ত মনুষ্যত্বকে হয় ত বা জাগাইয়া দিবে। ইহা উদ্দেশ্যমূলক হইলেও—যাকে বলে 'বস্তুতন্ত্রহীন'—তাহা নহে। এই কবিতার সঙ্গে, ভাওয়ালের তৎকালীন ইতিহাসেরও একটা ছাপ রহিয়া গেল কি, না,—কে জানে? সুতরাং ইহা ব্যর্থ নয়। এ শ্রেণীর কবিতারও একটা সার্থকতা আছে।

কবি গোবিন্দদাসের উদ্দেশ্যমূলক কবিতার মধ্যে কলাকলার দিক হইতে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে—তাঁহার অতুলন ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি। উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে বেশী নাই। অথচ ঈশ্বর গুপ্তের পর হইতে এ বিষয়ে যে অল্পাধিক সকল কবিই একবার হাত মক্স না করিয়াছেন,—তাহা নয়। কিন্তু এই সমস্ত প্রচলিত ব্যঙ্গ কবিতা প্রায়ই বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণ দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাজেই বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ব্যঙ্গের ভাব ও ঢং হইতে ইহা বহু পরিমাণে স্খলিত হইয়াছে। রুচির দোহাই দিয়া, এমনি করিয়া হয় ত বা সাহিত্যের একটা বড় অঙ্গকে আমরা নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় ও শ্রীহীন করিয়া ফেলিয়াছি। তাহাতে যে সাহিত্য ও জীবন কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কে বলিবে? কিন্তু গোবিন্দদাসের না আছে বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণের বালাই, আর সব চেয়ে না আছে রুচির বালাই।

"[illegible]

মা গঙ্গার তীরে জন্মিয়া, মা গঙ্গার জলেই যেন গত শত বৎসরের খ্রীষ্টানী রুচির কুরুচি ধুইয়া মুছিয়া যায়। সম্ভবতঃ তাই কবি গোবিন্দদাস ব্যঙ্গ কবিতায় এত সহজ সরল ও স্বাভাবিক হইতে পারিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের মাটীর গুণেই হয়ত বা—তাহা এমন নির্ভীক হইয়াছে, এবং সেইজন্যই তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতা কাব্য হিসাবে এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

"কালার কাহিনী রাধা কি শুনিবি আর ?"
লম্বা লম্বা কয় কথা, সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা,
একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নিরাকার !
ওলো রাধা আয়ো শোন্, সবি নাকি ভাই বোন্
সমস্ত মানব নাকি একি পরিবার !"

অর্থাৎ—"বিশ্ব"!!

"সে সাধনা বড় উচ্চ, তার কাছে ব্রজ তুচ্ছ,
অতি তুচ্ছ ভালবাসা ব্রজ অবলার ;
কালার কাহিনী রাধা, কি শুনিবি আর ?"

আর একটা দেখুন,—

"সে জানে না ভ্রাতৃভাব, সে জানে না 'কিরি-লাভ',
যায় না বাগান পার্টি, ভেরী আগ্লি ভেরী ডার্টি,—
ইয়ায়ের ডিয়ায়ের চীয়ারে ডরায়।
নিরাকার নাহি বুঝে, ইতর 'ক্ষেতর' পূজে,
একটু মাখম রুটি, চা কি কফি ডিম্ দুটি
অভাগিনী একটু না ব্রেকফাষ্ট খায়।
ধর্ম্মে "এক",—প্রণয়েতে "অনন্ত" যথায়।
গেল না সে হতভাগী 'সমাজে' তথায় ॥"

তারপর,—

"সে জানে না ক্লিওপেট্রা, মেরীরাণী এটসেট্রা,
দেয়নি সে কোর্টসিপে, বেছে নিতে টিপে টিপে,—
ফাটন্ত যৌবন, ভরা জ্যাকেটে জামার।
বডিভরা ভালবাসা লেডী সে না হায় ॥"

একটু বাড়াবাড়ি বোধ হইল ? হইবে বা। মিঠেকড়া না হইয়া চাবুক শুধু কড়া হইলে মন্দ কি ? অনেক গর্দ্দভের পৃষ্ঠের চামড়াও ত, কম শক্ত নয়—।

যাহা হউক, ঐ চিত্রেরি আর একটা অংশ,—

"লইয়া সখের প্রাণ, বেড়াইতে নাহি যান,
ইডেন গার্ডেনে একা আর্য্যের ললনা।
গাউনে সাজিয়া মেম, বলিয়া নিগার ডেম্,
দরিদ্র স্বামীরে নাহি করে বিড়ম্বনা।" ইত্যাদি।

ব্যঙ্গের বেয়াকুব চিত্রকরের, তুলিকায় যদি—"নির্জলা-একাদশী," "পতি-দেবতা" প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে,—তবে গোবিন্দদাসের এই শ্রেণীর ব্যঙ্গ চিত্রগুলি কি যোগ্যতর তুলিকার অপেক্ষা করিতে পারে না?

কবির ভালবাসার কবিতার বিশেষত্বও খুব স্পষ্ট। অস্পষ্ট ভালবাসায় ততোধিক অস্পষ্ট কবিতার বহুল প্রচারের দিনে, এ দিকেও দৃষ্টি অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। স্ত্রীপুরুষের ভালবাসায় দেহের সম্পর্কটা বাদ দিতে পারিলে,—অন্ততঃ বাদ দিয়া লিখিতে পারিলে,—এবং কেবল মানসিক ভাব-অনুভাবের বিচিত্র কুচিত্রগুলি, স্বপ্নে কুহকে স্মৃতিতে পদলালিত্যে ও ঝঙ্কারে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই আজকাল প্রথমশ্রেণীর প্রেমের কবিতা হয়। গোবিন্দদাসের প্রেমের কবিতা ইহার ঠিক বিপরীত শ্রেণীরও যদি না হয়,—তবে অন্ততঃ সে শ্রেণীর কোঠা হইতে অনেক দূরে। প্রেমের সম্পর্কে কবি গোবিন্দদাস দেহকে অপবিত্র মনে করিয়া বাদ দেন নাই। তিনি বলেন,—

"আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংস সহ।
আমিও নারীর রূপে,
আমিও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি কালীদহ।
ও কর্দ্দমে ওই পঙ্কে,
অই ক্লেদে ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ।
* * *
থাক্ তার মহাকুষ্ঠ,
আমি যে তাতেই তুষ্ট,
চন্দন আতর সম,
তার পুঁজ প্রিয় মম
আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংসসহ।
* * *
জড় কিসে নীচ তুচ্ছ,
আত্মা কিসে মহা উচ্চ.
আমি ত বুঝি না ভেদ তোমরাই কহ।
প্রকৃতি দেহার্দ্ধ মম
প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মহাকাল দেখে নাই তাহার বিরহ।

সুন্দর কুৎসিত হোক
উলঙ্গ আবৃত রোক
কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক নিগ্রহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংসসহ।"

ইহার যেরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা আশঙ্কা করা যায়, তাহার উত্তরও কবি এই কবিতার মধ্যে ব্যঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন।

"চখে চখে চোখ বোজা,
হাভায়ে পীরিত খোঁজা,
তার চেয়ে এ যে সোজা চখে দেখে লহ।"

'আমার ভালবাসা' নামক কবিতায় সম্ভোগের যে একটি চিত্র কবি আঁকিয়াছেন, তাহার তুলনা এ যুগে খুব বেশী মিলিবে না। জীবনের অনুভূতি কি করিয়া বিশ্ব-ব্যাপকতা লাভ করে,—কাব্যে কি করিয়া কল্পকলার রূপান্তর ঘটে, ইহা তাহারি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"আলিঙ্গনে ভাঙ্গে চুরে
শ্বাসে হিমালয় উড়ে,—
চুম্বনে চূর্ণিত হয় গ্রহ-উপগ্রহ।
আমাদেরি কেলি ভরে
পৃথিবী উলটি পড়ে,—
ও নহে সাগরে বান তোমরা যা কহ।
মর্দ্দনে মন্থনে বুকে
অগ্নি উঠে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ।

সম্ভোগের এমন চিত্র যে দেশের কবি এই কৃমীকীটসঙ্কুল—কি আর কহিব,—মধ্যে আঁকিতে পারেন, সে দেশের অন্তর্নিহিত তেজবীর্য্যসম্বন্ধে আমরা একেবারে নিরাশ হইতে পারি না।

এই ভালবাসার কবিতা সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন উঠিবে যে, কবি গোবিন্দ দাস বড় অশ্লীল। আজকালের দিনে বঙ্গসাহিত্যে এই অশ্লীলতা এক অতি বড় প্রশ্ন। এক কথায় ইহার উত্তর সম্ভবে না। অশ্লীলতা সাহিত্যের আবর্জ্জনা, সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্লীলতা কাহাকে বলে? কি অশ্লীল? এবং কেন অশ্লীল—? শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সার্ম্মনের, ও দেখাদেখি দেশীয় পাদ্রীদের বক্তৃতার পরে বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতার একটা ভাল রকমের বিচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অশ্লীলতাসম্বন্ধে আমাদের জাতিরও

একটা সংবিৎ ছিল,—এবং এখনও আছে। সাহিত্যের অতিবড় অবসাদের সময়েও অশ্লীলতাসম্বন্ধে আমাদের সংবিৎ কোন দিন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অশ্লীলতা কেন যে দোষের, সাহিত্যে কেন তাহা বর্জ্জনীয়, তাহার কারণও খুব ব্যাপক। অর্থাৎ সকল দেশের সভ্যতা ও সাহিত্যেই তাহার একটা উত্তর মিলে। অশ্লীলতা যে দোষের, সে বিষয়ে সকলেই একমত। তবে অশ্লীলতা কি, কি—সেই সম্বন্ধেই তর্ক। আমি তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইতে পারিতাম যে, কার মতে এবং কেন, কোন্ শ্রেণীর কবিতা অশ্লীল! কিন্তু বর্ত্তমান স্থান ও কাল তাহার উপযোগী নয়। তবু এক গোবিন্দ দাস হইতেই বিভিন্নশ্রেণীর অশ্লীল দার্শনিকদের,—অর্থাৎ অশ্লীলতা-দর্শনে বিভিন্নশ্রেণীর যাহারা, তাঁহাদের মত ও রুচি অতি সংক্ষেপে দেখাইতেছি। "আমি দিব ভালবাসা" এই কবিতায়,—

> "তটিনী দেশে দেশে, ফিরে উদাসী বেশে
> জনাম.আর নাহি ঘরে সে যায়,
> কে নিবি ভালবাসা, আয়, আয়।"

ভালবাসার এই ফিরি,—(ইংরেজী 'ফ্রী' নহে!) এবং এই প্রকার উপমা অশ্লীলতার ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। ইহা একশ্রেণীর অশ্লীল দার্শনিক বলিবেন। কিন্তু ইহার স্বাভাবিক সহজ অর্থ দ্বারা দেখা যাইবে যে, ইহাতে কোনই অশ্লীলতা নাই। এবং এমন কি আবার এক শ্রেণীর আধ্যাত্মিক বাতিকগ্রস্ত শ্লীল দার্শনিক এই তিন ছত্রের ত্রিশ ছত্র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিবেন যে, ইহা প্রায় শ্রীমদ্ভাগবতের কাছাকাছি। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লীলতা সম্বন্ধেও আজকাল খুব জোর করিয়া বলা একেবারে নিরাপদ নহে। এমনি অবস্থা—! সুতরাং এমন অবস্থায় উপায় কি? যার মন যেমন। তথাপি অশ্লীলতার একটা সাধারণ লক্ষণ'ত নির্দ্দেশ করিতে হইবে—! কবি গোবিন্দদাস তাঁহার কাব্যে তাই করিয়াছেন। সব চেয়ে যাকে বলে—সেই কবিতাটি দেখুন,—

> "আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী।
> সে লাবণ্য মুক্ত বক্ষে, কে পারে সহিতে চক্ষে
> নগন জঘনে কাম মগন আপনি।"

আর না। এই শব্দ শ্রবণমাত্রেই হয়ত অনেকের ভাব বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। কেন না সাহিত্যিক বাঙ্গালীর স্নায়ুর সুস্থতা সম্বন্ধে আজ কে শপথ করিয়া বলিবে? এখন এক শ্রেণী বলিবেন ইহা অশ্লীল। এ কি চিত্র! উলঙ্গ রমণী! কিন্তু কবির কৈফিয়ৎ এই কবিতাতেই আছে—তিনি বলেন, উলঙ্গ রমণী অশ্লীল নয়। তবে বস্ত্রহরণের গোয়ালিনীরা উলঙ্গ হইয়াও কিঞ্চিৎ অশ্লীল বটে। কেন না,—

"দুদিকে দুহাত দিয়ে, দুকূল রাখিতে গিয়ে
অকূলে ডুবালী বৃথা কাঞ্চন-তরণী।
ঘৃণা লজ্জা মান প্রাণ, প্রেমের দক্ষিণা দান,
কেননা পারিলি দিতে কুণ্ঠিতা এমনি।
হিয়ার ভিতরে তোর, নিয়া যদি মনোচোর—
দেখা'ত উলঙ্গ করি—হৃদয় ধমনী,—
তবে,—
আরো ভাল বাসিতাম তোরে গোয়ালিনী।"

সুতরাং উলঙ্গ হইলেই অশ্লীল হয় না। যাহা মনে হইতেছে অশ্লীল,—অথচ কিসের জন্য জানি না—তাহার খানিকটা খুলিয়া, আবার খানিকটা শ্লীলতার খাতিরে আবৃত করিয়া, প্রকাশের যে চেষ্টা,—কুণ্ঠা লজ্জা মান অপমান এই দুকূল রাখিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যে নগ্নতা,—যেরূপ বাঙ্গলা, সাহিত্যে ও 'ঘরে বাইরে' যাহার জন্য হাতমক্স করিতেছেন,—এত মতে,—কবি গোবিন্দদাস বলেন—তাহাই অশ্লীল। এবং আমরাও বলি তাহাই অশ্লীল। বঙ্গসাহিত্যে এই অর্দ্ধেক ঢাকিয়া, অর্দ্ধেক খুলিয়া, এই একূল ওকূল দুকূল রাখিয়া যে গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় অশ্লীলতা শ্লীলতার নামে, মিথ্যা আর্টের আবরণে অবাধে চলিয়া যাইতেছে,—আমরা বলি তাহাই অশ্লীল। তাহাই তিনি সেকাল ও একালের বস্ত্রহরণের গোয়ালিনীদের অপেক্ষা—

"অসুর শোণিতনদে, নাচে শ্যামা রণমদে
গৈরিক প্রবাহে যেন মত্ত মাতঙ্গিনী -"

এই বিবসনা মাতৃমূর্ত্তিকে আরো বেশী ভাল বাসিয়াছেন। তার পর "শ্মশানে রমণী" চিতাচুল্লীতে উলঙ্গিনী হইয়া দগ্ধ হইতেছে,—কবি সবার অধিক তাঁহাকেই ভালবাসিতেছেন. ভক্তির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিতেছেন।

নিষ্কলঙ্ক-নির্ব্বিকার, যৌবনের জ্যোৎস্না তার,
নিত্যবুদ্ধ সত্যশুদ্ধ আনন্দরূপিনী।
সে মুক্ত রূপের কাছে, সৌন্দর্য্য কোথায় আছে,
লাবণ্যে ভাসিয়া গেছে আকাশ-অবনী।"

ইহার সহিত কবির দুঃখবহুল জীবনের এক অতি মর্ম্মবিদারক বাস্তব ঘটনা জড়িত। যাহা হউক, নানাশ্রেণীর—এই উলঙ্গ রমণীর স্তবে নানাশ্রেণীর অশ্লীল দার্শনিক নানারূপ বিভীষিকাময় অশ্লীলতা দেখিবেন। কিন্তু শ্মশানে উলঙ্গ রমণী—আর মাতৃমূর্ত্তি শ্যামা উলঙ্গিনীকে দেখিয়াও যাহারা অশ্লীলতা দেখিতেছেন বলিয়া নাসিকা

কুঞ্চিত করিবেন, তাহাদের মত বিষ্ঠার ক্রমীকীটদের সম্বন্ধে—সাহিত্য কোনরূপ আলোচনা করে না, আমিও করিব না।

অশ্লীলতাকে গালি দিতে হয় দাও। সাহিত্যে অশ্লীলতা কেন, আসে, তাহা একবার নিজ নিজ জীবনের দিকে তাকাইয়া বুঝ। তাহা না করিয়া ঘরে বাইরে—ধার করা ফেরঙ্গ অশ্লীলতার ধ্বজা উড়াইয়া,—মা কালী উলঙ্গিনী হইয়া যে দেশে পাঁঠা খায়,—আর বাবাজান বুড়োশিব' যে দেশে উলঙ্গ হইয়া ডমরু বাজায়,—সেই দেশের বুকের উপর দাঁড়াইয়া অবনতিশীল ইউরোপীয় আর্টের অন্ধ-অনুকরণে, খ্রীষ্টানী মাপকাঠিতে,—শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিচার করিতে তুমি আস,—স্পর্দ্ধা বটে! গেঁয়োর গোবিন্দদাসের কবিতা ছাড়িয়া দিলাম। বাঙ্গালেরা একটু গেঁয়োরই বটে। কিন্তু যে বৈষ্ণব সাহিত্যে স্বয়ং মহাপ্রভু—শুধু সাহিত্য নয়,—ধর্ম্মগ্রন্থহিসাবে আজীবন নিত্য পাঠ করিয়া গিয়াছেন, আজ দেশের দণ্ডকর্ত্তা হইতে বঞ্চিত—বহিষ্কৃত বিতাড়িত,—ফেরঙ্গ-ভাব-দাসত্বের আশ্রয়ে আজন্মপালিত, মূর্খ বলে কি না যে, 'ইহা পাশব মিথুন-রাগের সাহিত্য। ইহা, কি বলে ঐ "ট্রুবেদার" সাহিত্য! ইহা অশ্লীল! কবি গোবিন্দদাসের অশ্লীলতা বিচারের ভার আমরা এইরূপ ফেরঙ্গ-বুদ্ধি-পরিচালিত, দেশের সাধনা-ভ্রষ্ট, 'বালখিল্য' (ত বটেই!) বাচাল বা তোতা সমালোচকের হস্তে তুলিয়া দিতে পারি না। কবি গোবিন্দদাসের অশ্লীলতার বিচার করিতে হয় কর, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকে বুঝাইয়া দাও যে, বাঙ্গালার বহুযুগব্যাপী সাধনার সঙ্গে তোমার কিঞ্চিৎ মাত্রও পরিচয় আছে। শ্লীল-অশ্লীলসম্বন্ধে মানবধর্ম্মের সাধারণ ভূমি, আর বাঙ্গালী-ধর্ম্ম ও সাধনার বিশেষ ভূমির উপর দিয়া তিন পুরুষে তুমি অন্ততঃ একবারও পাদচারণ করিয়া আসিয়াছ। বাঙ্গালীর স্বাভাবিক সাহিত্য, তাহার ধর্ম্ম ও সাধনা হইতে কোনদিন বিচ্ছিন্ন ছিল না,—আজও তাহারা বিচ্ছিন্ন হইবে না। তোমরা চেষ্টা করিয়াও পারিবে না। বাঙ্গালী এত যুগ ধরিয়া অশ্লীলতার সাধনা করিয়া আসে নাই। অশ্লীলতায় কোন বড় বাঙ্গালী জন্মে নাই। অশ্লীলতার কোন ব্যাপারী, এমন কি ছোট বাঙ্গালীও বাঁচে নাই। তোমরা কে তা জানি না,—জানিতে চাই না। * * *

বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মের এক কণিকা এই পূর্ব্ববঙ্গের কবি গোবিন্দদাসের মধ্যে হয় ত বা আছে। আজও আছে। কিন্তু,—আমরা যে নাই!—চিনিব কি করিয়া?

কবি গোবিন্দ দাসের সাধারণ সুর বিষাদের। তিনি নিজে দুঃখী মানুষ। তাঁহার কবিতাও দুঃখের। শুনিবেন—?

"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?

আজ যে আমি উপোস্ করি, না খেয়ে শুকিয়ে মরি ;
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্ ;
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?"

আরো শুনিবেন— ?

"প্রাণের এ হাহাকার, কেহ না শুনিল আর—
আর না শুনাতে চাই,—আর না শুনাতে চাই—
ফিরে যাই, ফিরে যাই।"

বঙ্গ-ভাষা জননীর শ্রীঅঙ্গে এই ব্যথার সঙ্গীত, কত দুঃখেই না কবি জড়াইয়া দিয়াছেন,—তাহা ভাবিবার অবসর আমাদের কোথায় ? দু'দিনের এই সাহিত্য-বাসরে, এই ঢাকা মহানগরীর 'ভদ্র'নামধারী সাহিত্যিকদের ব্যবহার, তাঁহাদের এই একমাত্র কবির উপর কতদূর 'অভদ্র' তাহাও চক্ষে দেখিয়া গেলাম।

কবি গোবিন্দদাসের জীবনে বৈচিত্র্য নাই, ইহাও যেমন ভুল, তাঁহার কাব্যে বৈচিত্র্য নাই, ইহা ততোধিক ভুল। কবির সুর সাধারণতঃ বিষাদের হইলেও আগ্নেয়-গিরির গৈরিক স্রাব এই কবির কণ্ঠে যেমন হইয়াছে, তেমন বুঝি এ যুগের কোন কবির কণ্ঠেই হয় নাই। ইহা বাঙ্গাল দেশের এই কাঙ্গাল কবির নিজস্ব ও এক অতিবড় গৌরব, যাহার ছটায় পূর্ব্ববঙ্গবাসী আমরাও গৌরবান্বিত।

"আমারি আমারি দেশে, আমারে খেদায় এসে—
আমারি মায়ের কোলে, নাহি মোর ঠাঁই !"

এই দুটি ছত্রেই—কি জ্বালা, কি আক্ষেপ, কি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহারি নাম পাঁচ দিয়া কবিতা না-লেখা। ইহারি নাম স্বাভাবিক কওয়া,

"ছিন্ন জিহ্বা সিংহ সম, জীমূত গর্জ্জন মম,
হৃদয়-কন্দরে নিত্য নীরবে লুকাই।"

শুনিলেন ?

যে কবি লিখিয়াছেন—

"আয় বালিকা খেল্‌বি যদি এই এক নূতন খেলা—"

তাঁহার পরশুরামের তর্পণ শুনুন,—

"প্রচণ্ড জ্বলন্ত দ্বাদশমিহির, মহা জ্যোতির্ম্ময় বিরাট শরীর,
অঞ্জলি পুরিয়া লইয়া রুধির;—দাঁড়ায়ে হ্রদের তীরে।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ধৃত উপবীত, ডাকিছে গম্ভীরে পৃথিবী স্তম্ভিত,
শত মেঘ-মন্দ্রে নভ বিকম্পিত, সমীর বহিছে ধীরে।

হে ঋচিক আদি পিতৃ-দেবগণ,

নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশবার, সমস্ত ভারত সমস্ত সংসার,

প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার লয়েছি অঞ্জলি ভরি।

আমি জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয় অন্তক, সৃজিয়াছি এই সমন্ত পঞ্চক,

ক্ষত্রিয়-শোণিতে রক্ত গঙ্গোদক, এস হে তর্পণ করি।"

তার পরে যখন তর্পণ শেষ হইয়া গেল, তখন—

"ভ্রমিতে লাগিল স্তব্ধ ভূমণ্ডল, গতিরুদ্ধ সৌর নক্ষত্রমণ্ডল,

মহাজ্যোতির্ম্ময় নব-গ্রহদল, গেল সে প্রলয় ধূম।"

"গুরুগোবিন্দ সিংহের প্রতিজ্ঞা—" আপনাদিগকে শুনাইবার সময় আমার এ যাত্রা হইল না,—সেই

"দিব তবে টান সুমেরু ধরিয়া, উপাড়িব ক্ষিতি বক্ষ বিদারিয়া--"

আপানারা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাই যদি ছিন্ন জিহ্বা সিংহের গর্জ্জন, তবে জিহ্বা থাকিলে ভাবিতে পারি না, সে গর্জ্জন কিরূপ শুনাইত।

আর কি লজ্জা! এই কবির জিহ্বা ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ক। বৈচিত্র্য নাই? "শ্মশানে নিশান" কবিতাটির জুড়ি কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে আমায় কেহ খুঁজিয়া দিতে পারেন কি?

"শ্রাবণের শেষ দিন মেঘে অন্ধকার,

দিনমান প্রায় শেষ, ব্যাপিয়া আকাশ দেশ,

মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার,

উলঙ্গ এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল,

বিকট ভৈরব-নাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার।

নয়নে কালাগ্নি ঢালি, উন্মত্তা শ্মশানকালী

ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যামূর্ত্তি তারকার।

উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজ্জ্বলা

ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খ মালা।

* * *

হেন ঘোর অন্ধকার এ হেন সময়

উড়িছে শ্মশানে এক ধবল নিশান।

ঘোর অন্ধতার শিরে, সে নিস্তব্ধ নদীতীরে—
স্তিমিত স্তম্ভিত ঘোর গম্ভীর সে স্থান।
উড়িতেছে শত শত শ্মশানে নিশান।"

সাহিত্য-রথিগণ,—ইহাই আজ পূর্ব্ববঙ্গ। পূর্ব্ববঙ্গ আজ শ্মশান। কবি তাই আপনাদিগকে শ্মশানে আহ্বান করিতেছেন। এই শ্মশানের অন্ধকারে দরিদ্র কবি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা শুনুন,—

"—অকস্মাৎ রজত জ্যোৎস্নায়,—
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়।
রজত ধুতুরা কর্ণে বিমল রজত বর্ণে,
রজত বিভূতি মাখা তুষারের প্রায়।
আহা, কিবা সেই সৌম্যমূর্ত্তি অমল-ধবল,
ধবল-বৃষভপর বিরাজিত বিশ্বম্ভর,
ধবল অস্থির মালা গলে ঝলমল
ধ্যানগত আত্মা তাঁর নাহি দেখে ত্রিসংসার,
জ্ঞানময় মহামূর্ত্তি স্থির অবিচল।"

হে সমস্ত বাঙ্গলার সকল সাহিত্যিকবৃন্দ! আপনারা আমার এই প্রিয় কবির শ্মশান স্বপ্ন সফল করুন্‌ সাহিত্যের সৃষ্টিতে আপনাদের আত্মা ধ্যানস্থ হউক,—জ্ঞানময় স্থির অবিচল মহামূর্ত্তিতে আপনারা পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-শ্মশান রজত জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যান।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

পরাণে ক্ষ্যাপা

(কথা চিত্র)

জহি মন পবনহিঁন সঞ্চরই
রবি শশী নাহ পবেশ।

আঁধারের উপর শুধু আঁধার জমাইয়া আকাশ স্তব্ধ হইয়াছিল। গভীর রাত্রি, ক্ষ্যাপা নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে বসিয়া গানের এক কলি গাইয়া উঠিল।

জহি মন পবন ন সঞ্চরই
রবি শশী নাহ পবেশ।

ক্ষ্যাপা চেঁচাইয়া উঠিল, "দুর্ শালা, বলে কি না, চন্দর সুয্যি যায় না সেখানে, আঃ তোর ভালা হোক্—গঙ্গায় ডুব দিয়ে বাঁচি।" "মা-মা" করিয়া পরাণে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জলের মধ্যে ওলট্‌পালট্ খাইয়া জল তোলপাড় করিয়া তুলিল। আবার তান তুলিল,

জহি মন মরই পবন হো কৃথঅ জাই

আবার চেঁচাইয়া উঠিল, "মন মরে যায়—মন মরে যায়,—পবন হয় লো ক্ষয়—দুর্ শালা জলের ঢেউই চলেছে, জলের ঢেউই চলেছে।"

জল হইতে উঠিয়া ক্ষ্যাপা নদীর তীরে তীরে চলিয়া আসিতেছিল। পথের ধারে কয়েকটা চাঁপা ফুলের গাছ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া চাঁপা ফুল তাহার মাথায় গায়ে পায়ে ঝরিয়া পড়িল, ক্ষ্যাপা গাইয়া উঠিল—

"ফুলের উপরে কলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ,
ঢেউয়ের উপরে ঢেউয়ের বসতি
এ কথা জানয়ে কেউ।

দূর্ শালা, এ রসের কথা বোঝেই বা কে ? এ যে—

ভাবের অন্তরে ভাবের উদয়

তাহার উপরে ভাব ।

ফুলের মধু চাঁপার পাখড়ি

গন্ধেতে দিল লাভ ।”

পরাণে গান গাইতে গাইতে ঘরের দিকে ফিরিল ।

৩

পরাণে ঘরে ফিরিল । নবদ্বীপের একপ্রান্তে গঙ্গার তীরের অতি নিকটেই তার ঘর । ভিজা কাপড়েই পরাণ ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল । অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল—

“কামে কাম না কামে জাম !

কাম থেকেই জন্ম, কি জন্ম থেকেই কাম ! দূর শালা, এই কামের কথা ভেবে ভেবেই মানুষগুলো ফতুর হয়ে গেল ।”

৪

পরাণের বউ বড় সুন্দরী । ভোমরার মত কাল চুল, পদ্ম-পাপড়ির মত পায়ের পাতার রঙ, চোখ দুটী যেন বনের হরিণ সদাই চমকিয়া উঠিতেছে । পরাণ ঘরে আসিয়া দেখিল, শুনিল, গুরু তাহার বউকে বলিতেছেন, “আমি চণ্ডিদাস তুমি রজকিনী, তুমি রাধা, আমি শ্যাম ।” পরাণে শিহরিয়া উঠিল,—একবার একটু হাসিয়া আপন-মনে কহিল,—“রস রসানের কথা, কইলেই হোল—তার আর কি !”

৫

পরাণ সারা রাত হাসিয়াই খুন । আপন মনে হাসে আর গায় । উহুঁ—

শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন

তখন হয়েছে বউ –

ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে

ইহা না বুঝয়ে কেউ

ক্ষ্যাপা তোর ঘর কোন্ দেশে ?—এ দেশে না বিদেশে ?

এ দেশে তো, কপাট দিলে, সে দেশ তো পাই,

বাহির গাঁয়ে কাম নাই, চলো ভিতর গাঁয়ে যাই ॥

রাত্রি যখন ভোর হইয়া আসিল, পাখীর ডাকের সঙ্গে সূর্য্যের আলোর রাঙা আভা আকাশকে রঙিন করিয়া দিল, তখন পরাণে পূর্ব্বমুখে তাকাইয়া কি ভাবিল। আবার গান ধরিল,—

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিয়ে আলা।

তাহার পর, গুরুর সম্মুখে গিয়া বলিল, গুরুদেব—

মাটীর জনম, না ছিল যখন,
তখন করেছি চাষ।

এখন এই ক বিঘে ভুঁই, এই বউ, আর এই পয়সাটা দক্ষিণে রইল, আমি তবে চল্লুম।

পরাণের বউ চক্ষু নত করিয়া পায়ের বুড় আঙ্গুলের নখ দিয়া মাটী খুঁটিতে লাগিল। আর গুরুদেব বিস্ময়ে চোখের তারা দুটো একটু বেশী বড় করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। পরাণ গুরুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

৬

পরাণে অনেক ঘুরিল। তীর্থে তীর্থে, পথে পথে কেবল ঘুরিল। কেহ দয়া করিত, কেহ পাগল বলিত, কেহ দু মুঠা খাইতে দিত। আবার কেহবা দূর দূর করিত।

চৈত্রমাস রৌদ্রে কাঠ ফাটিতেছে। গঙ্গার তীরে ঘাটের ধারে ক্ষ্যাপা বসিয়া ছিল। একটী বালক পরাণকে বলিল, "পাগলা চল, আমাদের বাড়ী আজ খাবি।"

পরাণে বলিল, "না, পরশু তোদের বাড়ী খেয়েছি, রোজ রোজ কেন খাব রে! এই এখানে রইলুম বসে, একদিন খাব না, দুদিন খাব না, তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন,—যদি না খাই তার পর?—তার পরে ব্রহ্মাণ্ড জলে যাবে। না—যাব না [redacted] চোখের জলের সঙ্গে ভয়বিহ্বল চাহনিতে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেল। পরাণে আর একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

৭

বারো বছর পরে প্রয়াগে কুম্ভের মেলায়—পরাণে, ছেঁড়া কাপড়, মলিন দেহ, রুক্ষ চুল টলিতে টলিতে চলিয়াছে। এক সন্ন্যাসী তাহাকে ডাকিয়া সুধালেন—"কি চাও?"

"কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত হইয়া রয়"

সন্ন্যাসীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল, কহিলেন,—

"গোপতের পথ না রয় বেকত রসিক জনার সনে,

তবে—

এ দেহে সে দেহে একই রূপ
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ

পরাণে হো হো করিয়া হাসিল।

৮

ঢেউ চলিয়া গেল। ভাসিতে ভাসিতে আর এক ঢেউয়ের মাথায় দেখা গেল পরাণে ক্ষ্যাপা। ঢেউয়ের মাথায় নাচিতেছে। সাগর তীর্থে বহুলোক আসিয়াছে। লোকে পরাণেকে সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করিল। কত কাপালিক সাধনের আধার খুঁজিতে লাগিল। বড় বড় সন্ন্যাসী পরাণেকে চেলা করিবার জন্য ভারি ব্যস্ত। পরাণ কেবল হো হো করিয়া হাসে আর গায়—

মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা
সেইত মানুষ সার!
ওরে মানুষ সবার পার।

পরাণে ধেই ধেই করিয়া নাচে আর গায়—"ওরে মানুষ সবার পার। ওরে মানুষ সবার পার।"

এক মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিল, "দাঁড়াও শালা!" সে পরাণের হাত পা বাঁধিয়া গলায় পাথর বাঁধিয়া সাগরে ফেলিয়া দিল। পরাণ ডুবিল।

জলের আবর্তে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় তলাইয়া গেল।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে? কতদিন পরে ব্রাহ্মমুহূর্তে স্বর্গদ্বারে পরাণ সমুদ্রতীরে—বালির চড়ায় পড়িয়া রহিয়াছে। নীল-উজ্জ্বল বারিরাশি তাহার সর্বাঙ্গ একবার করিয়া ধুইয়া

দিতেছে। লোক সমাগম হইল, সমুদ্রে কে ডুবিয়াছিল ভাসিয়া আসিয়াছে। যখন রৌদ্রের তাপ হইল, পরাণের সংজ্ঞা হইল, লোকে দুগ্ধ পান করাইল, পরাণেকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল,—সে হো হো করিয়া হাসিয়া গান ধরিল।

সমুদ্রে পশিব নীরে না তিতিব,
নাহি সুখ দুখ ক্লেশ।

ভিড়ের ভিতর এক উৎকট আকার দৈত্য রঙ্গ এক সন্ন্যাসী হাসিল, কহিল,—

কোটীকে গুটিক কোন একখানে
রসিক পাইয়া থাবে।

৯

বহুকাল পরে নবদ্বীপের ধূলায় ধূসরিত দেহ, উন্মত্ত পরাণে পথের ধারের আঁস্তাকুড়ের ভাত কুড়াইয়া খাইতেছিল, একখানা ছেঁড়া পাতার উপর উচ্ছিষ্ট কিছু পড়িয়াছিল, একটা কুকুরের গলা জড়াইয়া তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া পরাণে সেই এঁটোকাটা কুড়াইয়া খাইতেছিল। বালকেরা ঢিল মারিল, চীৎকার করিয়া তাহাকে খেপাইতে লাগিল—

পরাণে পরাণে গন্ধ কয়
দেখলে পরাণে সন্দ হয়।

ওরে ওই ক্ষেপা
তোর ভুঁই মিলে চযে আর তুই রইলি বসে।

পরাণে উঠিয়া চলিতে চলিতে গাইল,—

মাটীর জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

গান

তাই তোমার ও কাল রূপে,
ডুব দিয়েছি আলোর আশায়।
প্রাণের পিদীম্ জ্বেলে নিয়ে,
জ্বলে মরি প্রাণের নেশায়॥

ওই অঙ্গ কাল তোমার
মোর অঙ্গ ধলা—
এই কাল-ধলায় মেলা-মেশায়,
ঘুচ্‌বে মনের মলা গো
ঘুচ্‌বে মনের মলা—

এই মলা মাটির মন নিয়ে গো,
মেলা-মেশা তোমায় আমায়।
তাই কাল জলে ডুব দিয়েছি,
তোমার প্রাণের আলোর নেশায়॥

শ্রী :—

নারায়ণ

(অগ্রহায়ণ ১৩২৪ হইতে কার্ত্তিক ১৩২৫)

৪র্থ বর্ষের সূচীপত্র

(বিষয়ভেদে বর্ণানুক্রমিক)

বিষয় পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

(লেখক ও লেখিকাগণের বর্ণানুক্রমিক নাম)